তাফসীরে
ওসমানী
১ম খন্ড
শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা
শাববীর আহমদ ওসমানী
কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
AL-QURAN ACADEMY LONDON
আল কোরআন একাডেমী লণ্ডন

তাফসীরে ওসমানী

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা
শাব্বির আহমদ ওসমানী

তাফসীরের অনুবাদ
হাফেজ মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী
অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

[১ম খন্ড]

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

প্রকাশক
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
ডাইরেক্টর, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

প্রকাশ কাল
জানুয়ারী ১৯৯৬
মাঘ ১৪০২
রমযান ১৪১৬

কম্পিউটার কম্পোজ
এম, সি, এস নেটওয়ার্ক
৪৪/৮, পশ্চিম পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা

বিনিময়
আর্ট পেপার দুইশত পঁচাশি টাকা মাত্র
অফসেট পেপার দুইশত পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র
সাদা কাগজ দুইশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র

BENGALI TRANSLATION OF
'TAFSIR-E-OSMANI'
1ST VOLUME

TAFSIR
MAULANA SHABBIR AHMED OSMANI

TRANSLATION OF THE HOLY QURAN
HAFEZ MUNIR UDDIN AHMED

DIRECTOR, AL QURAN ACADEMY, LONDON
118 HUBERT GROVE LONDON SW9 9PD
ENGLAND
TEL: 0044 171 733 9781
FAX: 0044 171 738 3314

PUBLISHED ON
JANUARY 1996
RAMADAN 1416

PRICE
ART PAPER TK. 285 $ 12.90 £ 9.50
OFFSET PAPER TK. 265 $ 9.90 £ 8.00
WHITE PAPER TK. 245 $ 8.50 £ 6.50

প্রকাশকের নিবেদন

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার দরবারে অসংখ্য শোকরগুযারী করছি, তিনি 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন'-এর মতো একটি নগন্য প্রতিষ্ঠানকে এ যুগের দুটো সেরা কোরআনের তাফসীরকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার সৌভাগ্য-ধন্য করেছেন। গত বছরের শুরুর দিকে শহীদ সাইয়েদ কুতুব-এর কালজয়ী তাফসীর গ্রন্থ 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ হাতে নেয়ার পর এক বছর শেষ না হতেই-- আমরা আপনাদের হাতে আমাদের দ্বিতীয় উপহার 'তাফসীরে ওসমানীর' বাংলা তরজমা তুলে দিতে সক্ষম হলাম, এই অস্বভাবিক সাফল্যের জন্যে হাজার বার মালিকের দুয়ারে কৃতজ্ঞতার মাথা নোয়ালেও তার যথাযথ 'হক' আদায় হবে না।

গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে প্রথমেই আমরা সমস্যায় পড়লাম, কোরআনের বাংলা তরজমা নিয়ে। মূল তাফসীরে শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান-এর যে তরজমা রয়েছে তার বাংলা রূপান্তর করতে গিয়ে দেখা গেলো তা' কোরআনের ভাবকে আরো জটীল করে তুলছে। তাছাড়া শাব্দিক অনুবাদ উর্দু ভাষায় চালু থাকলেও বাংলা ভাষার ব্যবহার রীতি ও ভাষা বোঝানোর জন্যে এই পদ্ধতি এখন অনেকটা সেকেলে। অবশেষে 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন'-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা কোরআনের ভিন্ন অনুবাদ ব্যবহার করলাম। এই অনুবাদের দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণতঃ আমার নিজস্ব, আল্লাহ তুমি আমার ভুল-ক্রটি ক্ষমা করো।

এটা করতে গিয়ে আমরা পড়লাম আরেকটি সমস্যায়। মওলানা ওসমানী তার ওস্তাদ হযরত মাহমুদুল হাসান-এর তরজমাকে সামনে রেখে টিকা লিখেছেন, কিন্তু আমরা যখন কোরআনের ভিন্ন তরজমা ব্যবহার করেছি, তখন স্বাভাবিকভাবেই মাঝে মাঝে তরজমার সাথে টিকার কিছুটা অসংগতি দেখা দেয়। কারণ যে শব্দটির তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, সেই শব্দটি আদৌ হয়তো আমাদের অনুদিত তরজমায় আসেনি। আবার আসলেও বাংলা ভাষার বাক্য রীতিতে হয়তো তা স্থানান্তর হয়ে টিকার নম্বরের আগে পরে বসে গেছে। এই সব সমস্যা যে আমরা সর্বাংশে সমাধান করতে পেরেছি-- সে কথা বলার সাহস আমার নেই, তবে আমরা আমাদের চেষ্টায় ক্রটি করিনি এটুকু বলার সাহস আমার আছে। টিকার নং বসাতে গিয়েও মাঝে মাঝে আমরা দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছি, তরজমা এবং তাফসীরের পার্থক্য বুঝানোর জন্যে আমরা সর্বত্রই একটা স্বতন্ত্র রেখা টেনে দিয়েছি।

এই মূল্যবান তাফসীরটি প্রধানত অনুবাদ করেছেন, কোরআন মজীদের আলেম ও হাফেজ আমার একান্ত সুহৃদ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী। তিনি এই অনুবাদের কাজটি শুরু করেছেন আজ থেকে ১৮-১৯ বছর আগে। বিগত দেড় যুগ ধরে এই তাফসীরটি প্রকাশনার জন্যে তিনি চকবাজার, বাংলাবাজার, বায়তুল মোকাররম-সহ দেশের বহু নামী-দামী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে ধর্না দিয়েছেন বহুবার। বহু লোক তাকে ওয়াদা দিয়েছে; কিন্তু মূল পান্ডুলিপি যেই তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই রয়ে গেলো।

হাফেজ সিদ্দিকী এই গ্রন্থের অনুবাদ শুরু করেছেন দেড় যুগ আগে। তাই বাংলা ভাষায় একে উপস্থাপনার সার্থে এর একটা সার্বিক সম্পাদনার প্রয়োজন ছিলো। আজ যে

তরজমাটি আপনার হাতে আছে, তা মূলত এর সম্পাদিত অনুবাদ। অবশ্য হাফেজ সিদ্দিকী নিজেও আমার সম্পাদিত এই অনুবাদের ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকেবহাল।

হাফেজ গোলাম সোবহান সিদ্দিকীর মরহুম পিতাও ছিলেন একজন উঁচুমানের আলেম ও পন্ডিত ব্যক্তি, মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি এই অমূল্য তাফসীরটি তার সুযোগ্য ছেলের হাতে দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করার কথা বলেছিলেন। আজ এই মোবারক গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে আমরা তার মাগফেরাতের জন্যেও আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করি।

আরেকটি কথা--

'কোরআনের ৭ মনযিল' এই বরকতপূর্ণ কথাটির সাথে সংগতি রেখে আমরা কোরআনের ৭ মনযিলকে ৭ খন্ডে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মনযিল হিসেবে কোনো তাফসীরের প্রকাশ সম্ভবতঃ এই প্রথম। আল্লাহ পাক চাইলে এই সামান্য সাদৃশ্য টুকুকেও তো একদিন নেয়ামতের একটা মহিরূহ করে দিতে পারেন।

আরো যে অসংখ্য ভুল ত্রুটি রয়ে গেছে তার কৈফিয়ত কিভাবে দেবো--

আমার নিজের কর্মস্থল এখান থেকে ৭ হাজার মাইল দূরে থাকার কারণে যতোবারই তাফসীরের খন্ডগুলো ছাপার জন্যে আমি এখানে আসি, ততোবারই আমাকে একাজে তাড়াহুড়ো করতে হয়। এই সীমিত সময়ের ভেতর অনুবাদ গুলোকে যথারীতি সম্পাদনা করতে হয়, আবার সম্পাদিত কপি অনুযায়ী প্রুফের সংশোধন ও তদারক করতে হয়। এছাড়াও রয়েছে এই বিশাল তাফসীরের মুদ্রণ ও প্রকাশনার সাথে জড়িত আরো বহু ধরনের জটীলতা। ওদিকে আবার রাজনৈতিক অশান্তি ও অস্থিরতা থেকেও তো আমরা মুক্ত নই। একথা স্বীকার করতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই যে, আমরা কোরআনের এই মহামূল্যান সম্পদের যথার্থ 'হক' আদায় করতে পারিনি। হে মালিক, তুমি আমাদের ভেতরের দিকে তাকিয়ে বাইরের এই অক্ষমতা গুলোকে ক্ষমা করে দিয়ো।

আমি গুনাহগারের জীবনে যদি আদৌ কোনো ভালো কাজ থাকে- তার সবটুকুর পেছনেই প্রেরণা ও উৎসাহ রয়েছে আমার দো-জাঁহানের সাথী- সুলেখিকা খাদিজা আখতার রেজায়ীর। 'আদ দা'ল্লো আ'লাল খায়রে কা কা'য়েলিহী' (যে যাকে যতোটুকু ভালো কাজের পথ দেখাবে সেও তারই সমান বিনিময় পাবে)। প্রিয় নবীর হাদীস অনুযায়ী তার জন্যে আমার তো মুখ খুলে কিছুই চাওয়ার প্রয়োজন নেই। যার ভান্ডারে কোনো অভাব নেই তার কাছে চাওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য দেখিয়ে কি লাভ?

তাফসীরের মুদ্রণ ও প্রকাশনায় অনেকে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে একে তরান্বিত করেছেন- অনেক ক্ষেত্রেই তা ছিলো তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের চাইতে বেশী-- আল্লাহ তায়ালা এদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন।

আগামীতে আল্লাহর এই কিতাবের উপস্থাপনাকে যথার্থ সুন্দর ও নিখুঁত করার জন্যে একাডেমীর কর্মপদ্ধতিকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ- এখন আল কোরআন একাডেমী লন্ডন- বাংলাদেশে তাফসীর প্রকল্পের জন্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ করে তার নিজস্ব কার্যালয়ও স্থাপন করেছে।

এই উভয় তাফসীরের আগামী খন্ডগুলো ইনশাআল্লাহ সুন্দর ও সুষ্ঠু হবে, এই আশাবাদটুকু ব্যক্ত করে আমি আবারও আমাদের অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তির জন্যে আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিচ্ছি। 'ওয়া মা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।'

বিনীত

মুনির উদ্দীন আহমদ

তাফসীর ও তাফসীরে ওসমানী

আল-হামদু লিল্লাহ!

সমস্ত তারিফ আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তায়ালার, যিনি আমাদের মতো কিছু নগণ্য গুনাহগার বান্দাহকে এটুকু তৌফিক দিয়েছেন যে, আমরা তাফসীরের জগতের বিশাল জ্ঞানের ভান্ডার সমূহকে বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি।

লক্ষ কোটী সালাম ও দরুদ, রাহ্‌মাতুল লিল আ'লামীন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর পবিত্র নামে, যিনি না আসলে দুনিয়ার মানুষ শুধু কোরআনের উপহার থেকেই বঞ্চিত হতো না, গোটা আদম সন্তানই অজ্ঞতা ও অন্ধকারের আঁধারে হাবুডুবু খেতো।

মানব সন্তানকে জাহেলিয়াতের এই অন্ধকার থেকে দ্বীনের রৌশনীতে নিয়ে আসার জন্যে আল্লাহ্ রাববুল আ'লামীন যুগে যুগে তার নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন, আর এই নবী-রাসূলদের হাতে তিনি তুলে দিয়েছেন-- অন্ধকারে পথ চিনে নেয়ার জন্যে আলোর এক একটি মশাল। হেদায়াতের এই ধারাবাহিকতার সিঁড়ি বেয়ে একদিন আল্লাহ্ তায়ালা সর্বকালের মানুষের জন্যে একটি সার্বজনীন গ্রন্থ্ দিয়ে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া সাল্লাম)-কে পাঠালেন।

আল্লাহর নবী যেদিন হেরার গুহা থেকে আস্তে আস্তে পাহাড়ের চড়াই উৎরাই বেয়ে নীচে নামলেন তখন এই কিতাবে ব্যবহৃত আল্লাহর ভাষার ব্যাখ্যার ব্যাপারটি ছিলো-- একান্তভাবে তার নিজস্ব। স্বয়ং কিতাব যার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তার চাইতে ভালো করে কে বলতে পারে, তার প্রভু- কোথায় কি বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন। তার তিরোধানের পর তার ওপর অবতীর্ণ এই কিতাবের ব্যাখ্যার দায়িত্ব এলো তার সংগী-সাথী সাহাবায়ে কেরামদের ওপর।

রাইসূল মোফাসসেরীন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে কোরআনের তাফসীর লেখার যে পবিত্র ধারা শুরু হলো, তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এই ভূখন্ডে আদম সন্তানের শেষ পদচারণার দিন পর্যন্ত এ ধারা অব্যহত গতিতে চলবে। আমাদের ইতিহাসের এই সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছর ধরে এই ধারায় কোরআন ব্যাখ্যাতার তালিকায় নাম লিখিয়েছেন এমন সৌভাগ্যবান মানুষের সংখ্যা যেমনি অনেক, তেমনি তাদের রচিত তাফসীরের সংখ্যাও অগণিত। বর্তমান দুনিয়ার বহু ভাষায় রচিত হাজার হাজার তাফসীর গ্রন্থ্ নিয়েই আজ কোরআনের এই বিশাল সংগ্রহ্ শালা সমৃদ্ধ। যে যুগে বিশ্বের এই জ্ঞান-তাপসরা এই সংগ্রহ্ শালাকে তাদের দানে সমৃদ্ধ করছিলেন তখন আমাদের উপমহাদেশের মনীষীরাও বসে থাকেননি, বিশ্ব ভান্ডারে তারাও তাদের যথার্থ অবদান রেখে গেছেন।

পাক ভারত বাংলাদেশ-- এই উপমহাদেশে বিখ্যাত তাফসীরকারকদের তালিকায় শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী যেমন একজন শীর্ষস্থানীয় মুফাসসীর, তেমনি তার রচিত 'তাফসীরে ওসমানী'ও একটি শীর্ষস্থানীয় তাফসীর। এই একই সময়ে প্রকাশিত অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থ-- মওলানা আশরাফ

আলী থানভীর 'বয়ানুল কোরআন', আল্লামা আবুল কালাম আযাদের 'তরজমানুল কোরআন', মুফতী মোহাম্মদ শফির 'মায়ারেফুল কোরআন', মওলানা আবুল আলা মওদূদীর 'তাফহীমুল কোরআন' ইত্যাদির তুলনায় এটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মাওলানা ওসমানী অবশ্য একে তাফসীরের আকারে লিখতে শুরু করেননি। তার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শায়খুল হিন্দ হযরত মওলানা মাহমুদুল হাসান নিজেও এটাকে তাফসীরের মতো করে সাজাতে চাননি। তিনি শাব্দিক অর্থের ওপর ভিত্তি করে উর্দু ভাষায় কোরআনের একটি অনুবাদের কাজটাই শুরু করেছিলেন।

অনুবাদের কাজ শেষ করে গোটা অনুবাদে টিকা হিসেবে কিছু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তিনি পাশে জুড়ে দিতে শুরু করলেন। কোরআনের ছয় মনযিল পথ তখনো বাকী; কিন্তু তিনি তার জীবনের শেষ মনযিলে এসে উপনীত হলেন। তার ইন্তেকালের পর তার সুযোগ্য ছাত্র মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী এ অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত করলেন। একজনের তরজমায় আরেকজনের টিকা লাগানোর কিছু পদ্ধতিগত সমস্যা সত্তেও অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথেই তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র কোরআনের এই সংক্ষিপ্ত তাফসীরের কাজটি সম্পন্ন করলেন। পরবর্তীতে এটিই 'তাফসীরে ওসমানী' নামে খ্যাতি লাভ করে। সেই থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই মূল্যবান তাফসীরটি উর্দু ভাষায় একটি শীর্ষস্থানীয় তাফসীর হিসেবে সারা দুনিয়ায় ব্যাপক ভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে।

সম্ভবত এর এই সার্বজনীন গ্রহণ যোগ্যতার কারণেই সৌদী আরবের 'কিং ফাহদ কোরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স' উর্দু ভাষায় সারা দুনিয়ায় বিনা মূল্যে বিতরনের জন্যে এই গ্রন্থটিকেই বাছাই করে নিয়েছেন এবং সেই সুবাদে গত কয়েক বছরে সারা বিশ্বে এই তাফসীরের লক্ষ লক্ষ কপি বিতরণ করা হয়েছে। আজ একথা বললে মনে হয় মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, উর্দু ভাষায় সম্ভবত আজ এটিই কোরআনের সর্বাধিক প্রচারিত ও পঠিত তাফসীর।

পরিশেষে এই মহান খেদমতটি আল্লাহর যে দু'জন প্রিয় বান্দা আঞ্জাম দিয়েছেন তাদের সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন।

শায়খুল হিন্দ হযরত মওলানা মাহমুদুল হাসান--

হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান একদিকে যেমনি ছিলেন উপমহাদেশের একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম, তেমনি তিনি ছিলেন ভারতের মাটিতে ইংরেজ বেনিয়াদের উচ্ছেদ আন্দোলনের এক সংগ্রামী নেতা। তার যৌবন কেটেছে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় খেলাফত তুরস্কের সাথে পশ্চিমা শক্তির শুরু করা 'বলকান' যুদ্ধের জন্যে অর্থ ও রসদ যোগাতে। এমন কি যখন তিনি ঐতিহ্যবাহী দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান, তখন মুসলমানদের এই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্যে হাদীস কোরআনের দরসকে বন্দ করে ছাত্র ও শিক্ষকদেরও তিনি মাঠে নামিয়ে দিয়েছিলেন।

ইতিহাসের কোনো অধ্যায়েই কোনো মর্দে মোজাহিদকে বাতিল শক্তি লাল গালিচা বিছিয়ে দেয়নি-- শায়খুল হিন্দের ব্যাপারেও তা ছিলো অমোঘ সত্য।

সংগ্রামী পুরুষ মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধির সাথে মিলে তিনি 'জামিয়াতুল আনসারের' ভিত্তি স্থাপন করেন। এটা ছিলো ১৩২৭ হিজরীর ঘটনা। ঠিক এ সময়

ইংরেজরা তাদের তল্পীবাহী কতিপয় মুসলিম সুলতান ও রাষ্ট্র প্রধানদের নিয়ে, বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দাবিয়ে দেয়ার জন্যে, ভারতের ওপর এক সর্বাত্মক সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা করে।

ইংরেজদের এই চক্রান্তের মোকাবেলায় শায়খুল হিন্দ নিজে দুনিয়ার অন্যান্য মুসলমান নেতাদের সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে হেজাযের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে পাঠান কাবুলে। তিনি হেজাযে পৌঁছে তুরস্কের গালেব পাশা ও আনোয়ার পাশা সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের ইংরেজদের অভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করেন। এ পর্যায়ে বিস্তারিত পরিকল্পনার জন্যে তিনি নিজেই তুরস্কের দিকে যাবার সিদ্ধান্ত করলেন। পথিমধ্যে তদানিন্তন হেজাযে ইংরেজদের আশীর্বাদপুষ্ট শাসক তাকে 'তায়েফে' গ্রফতার করে এবং বাকায়দা সামরিক হেফাজতে মাল্টা পাঠিয়ে দেয়। এটা ছিলো ১৩৩৫ হিজরীর ২৭শে রবিউস. সানীর ঘটনা। সেখানে তার ওপর রাষ্ট্রোদ্রোহীতার মামলা চালানো হয় এবং তল্পীবাহীদের বিচারে তাকে সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়।

পৃথিবীর অন্যান্য মহাপুরুষদের মতো মাল্টার বন্দী জীবনে বসেই কোরআন মজীদের এই অবিস্মরণীয় তরজমার কাজটি তিনি আবার শুরু করেন এবং মাত্র এক বছরের মধ্যে গোটা কোরআনের তরজমা সম্পন্ন করেন। সুরায়ে 'নেসা' পর্যন্ত প্রথম মনযিলের টিকাও এতে তিনি সংযোজন করেন।

এর কিছুদিন পর বন্দি দশা থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং ১৩৩৮ হিজরীতে পুনরায় দারুল উলুম দেওবন্দে শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই সময় ভারতে ইংরেজ বিরোধী খেলাফত আন্দোলন তুংগে। তিনি আবার তার রাজনৈতিক তৎপরতায় নেতৃত্বদানের জন্যে এগিয়ে আসেন।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জন্যে তিনি সেখানে যাবার সময় রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতঃপর ১৮ রবিউল আওয়াল ১৩৩৯ হিজরীতে এই সংগ্রামী মোজাহেদ ও মহান আলেমে দ্বীন দিল্লীতে মওতের ফেরেস্তার ডাকে মালিকের দুয়ারে হাযিরা দেয়ার জন্যে চলে যান।

শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা শাব্বীর আহ্মদ ওসমানী--

শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী জন্মসূত্রে তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের বংশধর। জন্মগত নাম মোহাম্মদ ফজলুল্লাহ্। দশই মোহাররম তথা 'আশুরা' দিবসে জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে আপনজনরা নাম রাখলো 'শাব্বীর', আস্তে আস্তে মূল নামের বদলে এটাই হয়ে গেলো আসল।

জন্মস্থান বেজনুরেই তিনি প্রথম জীবনের পড়া শুরু করেন। এরপর দেশের সেরা কয়টি দ্বীনি মাদ্রাসায় পড়াশোনা শেষ করে এলমে হাদীসের চূড়ান্ত ডিগ্রীর জন্যে তদানিন্তন ভারতের দ্বীনী এলেমের কেন্দ্র ভূমি-- দেওবন্দে চলে আসেন। এখানে এসে তিনি ভারতের শীর্ষস্থানীয় আলেম ও মুহাদ্দীসদের সান্নিদ্ধে আসেন। বিশেষ করে মুফতী মোহাম্মদ শফি, মওলানা গোলাম রসূল ও শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান-এর সরাসরি সোহবতে আসার সুযোগ পান। ১৩২৫ হিযরীতে তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকেই এলমে হাদীসে প্রথম বিভাগে কামিয়াব হন, ১৩২৮ হিযরীতে দারুল উলুম দেওবন্দের 'মজলিসে শুরার' অনুরোধে তিনি পুনরায় দেওবন্দে হাদীস পড়াতে শুরু করেন।

১৩৫২ হিযরীতে শায়খুল হাদীস হযরত মওলানা আনোয়ার শাহ্ কাশমিরীর ইন্তেকালের পর দেওবন্দে তিনি শায়খুল হাদীস মনোনীত হন। ১৩৫৪ হিযরীতে দারুল উলুম দেওবন্দের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের মোহতামেম (অধ্যক্ষ) নিযুক্ত হন।

এলমে হাদীস ও এলমে তাফসীরের বিপুল খেদমতের পাশাপাশি তার ওস্তাদের মতো তিনিও ছিলেন একজন অগ্রগামী মোজাহেদ। গোটা ভারতে বৃটিশ খেদা আন্দোলনে তিনি হামেশাই ছিলেন সংগ্রামী। মওলানা ওবায়েদুল্লা সিন্ধীর 'জমিয়াতুল আনসার', 'খেলাফত আন্দোলন', 'ভারতীয় কংগ্রেস'-এর সব কয়টি জায়গায়ই তিনি ছিলেন পুরোভাগে। ১৩৬৬ হিযরী সনে তিনি 'জমিয়াতুল ওলামায়ে হিন্দ'-এ যোগদান করেন।

এদিকে কংগ্রেস ও জমিয়াতুল ওলামায়ে হিন্দের সাথে মুসলিম লীগের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মধারা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তিনি মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত আল্লামা ইকবাল ও কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগে যোগদান করেন, মুসলিম লীগে যোগদানের পর তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পূর্ব বাংলার সিলেটসহ বিভিন্ন এলাকার 'রেফারেন্ডামে' পাকিস্তানের পক্ষে জনমত সংগ্রহ করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারই প্রচেষ্টার ফলে এসব অঞ্চল 'রেফারেন্ডামে'র মাধ্যমে পাকিস্তানে যোগদান করে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে তিনি দেওবন্দ থেকে করাচী রওনা হয়ে যান। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তাঁর পবিত্র হাত দিয়েই পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করান।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই নব গঠিত দেশটিকে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে তিনি সংগ্রাম শুরু করেন। এই মহান সংগ্রামী মোজাহেদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই পাকিস্তান গণ-পরিষদ ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে আদর্শ প্রস্তাব পাশ করে পাকিস্তানকে নিয়মাতান্ত্রিকভাবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে।

১৩৬৫ হিজরীতে ভাওয়ালপুরের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ভাওয়ালপুর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার জন্যে তিনি সেখানে গমন করেন। পথেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। একই সালের ২১শে সফর তারিখে তিনি ৬৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু শারীরিক ভাবে অর্ন্তধান হলেও শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী 'তাফসীরে ওসমানীর' মাধ্যমে অনাগত দিন ধরে কোটী কোটী মুসলমানের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন।

আল্লাহ্ তায়ালা তাদের এ অমূল্য খেদমতকে কবুল করুন এবং আমাদের সবাইকে কোরআনের পথে চলার তাওফীক দান করুন।

আমীন!

সূরা আল ফাতেহা

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বর ঃ ১, আয়াত সংখ্যা ৭
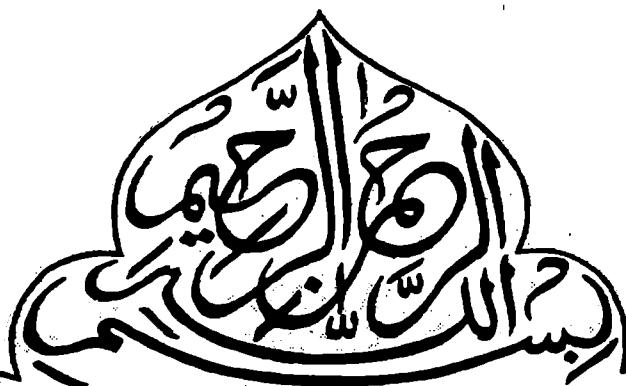
রহমান রাহীম[১] আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার[২], যিনি সমগ্র দুনিয়া জাহানের প্রতিপালক।[৩] ২. তিনি অসীম দয়ালু, অত্যন্ত মেহেরবান। ৩. তিনি বিচার দিনের মালিক।[৪] ৪.(হে মালিক) আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।[৫] ৫. আমাদের সরল সঠিক পথ দেখাও। ৬. তাদের পথ, যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ করেছো।[৬] ৭. তাদের পথে নয়, (তোমাকে অস্বীকার করার কারণে) যাদের ওপর তুমি অভিশাপ দিয়েছো, (হেদায়াতের আলো থাকা সত্ত্বেও) যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।[৭]

১- 'রাহমান' এবং 'রাহীম' উভয়ই হচ্ছে আরবী ভাষার আধিক্য জ্ঞাপক শব্দ, রাহমানের মধ্যে এটা পরিমানে একটু বেশী।

২- অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত উত্তম প্রশংসা হয়েছে এবং হবে, আল্লাহ তায়ালাই সব পাওয়ার যোগ্য। কারণ তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর স্রষ্টা, সব কিছুর দাতা। সে দান সরাসরি হোক বা অন্য কিছুর মাধ্যমে। যেমন সূর্যের মাধ্যমে কেউ তাপ বা আলো লাভ করলে তা মূলতঃ সূর্যেরই দান। ফারসী কবির ভাষায় ঃ 'প্রশংসা সত্যিকার অর্থে তোমার সাথেই সম্পৃক্ত। মানুষ যে দরবারেই গমন করুক না কেন, আসলে তা তোমারই দরবার।' সুতরাং 'সকল প্রকার প্রশংসা খোদারই প্রাপ্য' এ তরজমা করা সংকীর্ণতার পরিচায়ক। জ্ঞানবান ব্যক্তিরা এটা ভালো করেই বুঝতে পারেন।

৩- সৃষ্ট জগতের সমষ্টিকে বলা হয় 'আলম' বা দুনিয়া। আর এ অর্থে শব্দটির বহুবচন হয় না। কিন্তু আয়াতে আলমের অর্থ হচ্ছে, প্রতিটি সম্প্রদায় (যেমন আলমে জিন আলমে ইন্‌স্ আলমে মালাইকা, জিন জাতি, মানব জাতি, ফেরেশতাকূল ইত্যাদি) তাই আলমের বহুবচন 'আলামীন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে সৃষ্ট জগতের সমুদয় বস্তুই যে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি, তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। (মূলতঃ আলম বলা হয় যা দিয়ে স্রষ্টাকে জানা যায়)।

৪-এর উল্লেখ করা হয়েছে প্রধানতঃ এ কারণে যে,এ দিন বিরাট বিরাট বিষয়সমূহ উত্থাপিত হবে। এমন ভয়ংকর দিন যা ইতিপূর্বে কখনো আসেনি এরপর কখনো হবে না। আজ কার রাজত্ব, কর্তৃত্ব? কার— পরাক্রমশালী এক আল্লাহর।

৫-এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর সত্ত্বা ছাড়া অন্য কারো কাছে মূলতঃ সাহায্য চাওয়া সম্পূর্ণ না-জায়েয। অবশ্য কোন মাকবুল বান্দাকে অর্থাৎ নবী রসূলকে সতন্ত্র মনে না করে নিছক খোদার রহমতের মাধ্যম মনে করে বাহ্যতঃ তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে— তা জায়েয হবে। কারণ, এতো মূলতঃ আল্লাহ তায়ালার কাছেই সাহায্য চাওয়া।

৬-যাদেরকে ইনাম দেয়া হয়েছে তারা চারজন- আম্বিয়া, ছিদ্দীকীন, শুহাদা ও ছালেহীন। আল্লাহর কালামের অন্যত্র এটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আর যারা আল্লাহ এবং তাঁর কালামের আনুগত্য করবে, তারা এমন লোকদের সাথে থাকবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, আর তারা হচ্ছেন, আম্বিয়া,ছিদ্দীকীন, শুহাদা ও ছালেহীন। এরা কতইনা উত্তম সাথী! এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। জ্ঞানী হিসাবে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। 'মাগদুব' এর অর্থ ইহুদী এবং দাল্লীন অর্থ খৃষ্টান। অন্যান্য আয়াত এবং রেওয়াতে এর প্রমাণ রয়েছে। সঠিকপথ থেকে বঞ্চিত লোকেরা মোট দুরকমের হতে পারে, না জেনে গোমরাহ হওয়া এবং জেনে-শুনে গোমরাহ হওয়া পূর্বাপর সকল গোমরাহ দলই এ দুটির অন্তভূক্ত। প্রথম পর্যায়ে খৃষ্টানরা আর দ্বিতীয় পর্যায়ে ইহুদীরা এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ।

৭-আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের যবানীতে এ সূরাটি শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমার দরবারে হাযির হয়ে এ ভাবে আমার কাছে মোনাজাত করবে। এজন্য সূরাটির এক নাম 'তা'লীমুল মাসআলা' বা মুনাজাত শিক্ষা— দেয়া হয়েছে। সূরাটি শেষ করে আমীন বলা সুন্নাত। অবশ্য এ শব্দটি কোরআন শরীফের অন্তর্ভূক্ত নয়। এর অর্থ-এলাহী, এমনি হোক (বা তুমি কবুল কর)। অর্থাৎ মাকবুল বান্দাদের অনুসরণ এবং না-ফরমানদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকার তাওফীক দাও। এ সূরার প্রথমাংশে আল্লাহ তায়ালার তারীফ স্তুতি আর দ্বিতীয়াংশে বান্দাহদের জন্য দোয়া রয়েছে। আরবী ব্যাকরণ অনুসারেই এখানে তরজমা করা হয়েছে। কোন কোন অনুবাদক এর যে তরজমা করেছেন, তা আরবী ভাষার বাক্য সংযোগ রীতি এবং উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

সূরা আল বাকারা

মদীনায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ২, আয়াত সংখ্যা ২৮৬, রুকু সংখ্যা ৪০

রহমান রাহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকু ১

১. আলিফ লা-ম মী-ম।[১]

২. এই মহান গ্রন্থ (আল কোরআন)। এতে কোনো প্রকারের সন্দেহ নেই।[২] যারা আল্লাহকে ভয় করে এই কিতাব (শুধু) তাদের জন্যেই পথ প্রদর্শক।[৩-৪]

৩. যারা না দেখে (আল্লাহ তায়ালাকে) বিশ্বাস করে[৫], যারা (সে বিশ্বাসের দাবী মোতাবেক ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে) নামায প্রতিষ্ঠা করে[৬], যারা আমার দেয়া সম্পদ থেকে (আমারই নিদের্শিত পথে) ব্যয় করে।[৭]

৪. যারা (হে মোহাম্মদ) তোমার ওপর নাযিল করা কেতাবের ওপর ঈমান আনে, ঈমান আনে তোমার আগে (অন্যান্য নবীদের ওপর) নাযিল করা কিতাব সমূহের ওপর, (সর্বোপরি) যারা পরকালের জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করে।[৮]

১-এ হরফ গুলাকে বলা হয় 'মুকাত্তায়াত'— বিচ্ছিন্ন হরফ। এর আসল অর্থ কারো জানা নেই, এটা আল্লাহ এবং রাসূলের মধ্যে এক গোপন রহস্য। বিশেষ কারণে এর অর্থ প্রকাশ করা হয়নি। অতীতের কোন কোন মনীষী থেকে এর যে অর্থ বর্ণীত হয়েছে, তা দ্বারা নিছক উদাহরণই উদ্দেশ্য— এর অর্থ এই নয় যে, এটাই আল্লাহর উদ্দেশ্য। তাই বলে এটাকে নিছক ব্যক্তি বিশেষের অভিমত বলে উড়িয়া দেয়াও ঠিক নয়। এটাও আলেমদের গভেষণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

২-অর্থাৎ এটা যে আল্লাহর কালাম এবং এতে সন্নিবেশিত সমুদয় বিষয় যে বাস্তব ভিত্তিক, তাতেবিন্দু মাত্রও সন্দেহ নেই। এখানে একথাটা জেনে রাখা দরকার যে, কোন কালামে সন্দেহ থাকার দু'টি রূপ হতে পারে। এক, স্বয়ং সে কালামে কোন ভুল-ভ্রান্তি বর্তমান থাকা। দুই, শ্রোতার বুঝার মধ্যে কোন ত্রুটি থাকা। প্রথম অবস্থায় সন্দেহ-স্থল হচ্ছে সেই কালাম। আর দ্বিতীয় অবস্থায় মূলতঃ সন্দেহস্থল হবে শ্রোতার বোধশক্তি। এখানে কালাম একান্তই সত্য। যদিও শ্রোতার নির্বুদ্ধিতার কারণে তাতে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। এ আয়াতে প্রথম প্রকার সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে। এই কালাম যে খোদার বাণী এবং সত্য-সঠিক, এ ব্যাপারে তো কাফেররাই সন্দেহ পোষণ করে থাকে। তা হলে 'এতে সন্দেহ নাই' এ কথা বলার অর্থ কি- -এহেন আপত্তি আপনা-আপনি দূরীভূত হয়ে যায়। অবশ্য দ্বিতীয় প্রকার সন্দেহ সর্ম্পকে পরে আরেক আয়াতে বলা হয়েছে।

৩- আমাদের সঠিক পথ দেখাও— একথা বলে বান্দাহদের পক্ষ থেকে যে প্রার্থনা করা হয়েছিল, এখান থেকে কোরআন শরীফের শেষ পর্যন্ত তারই জবাব দেয়া হয়েছে।

৪-অর্থাৎ যে সব বান্দাহ আল্লাহকে ভয় করে, এ কিতাব তাদেরকেই কেবল পথ প্রদর্শন করে। কারণ, যারা আল্লাহকে ভয় করবে, তাঁর পসন্দ অপসন্দ অর্থাৎ ফরমাবর্দারী ও নাফরমানী অবশ্যই তাদেরকে ত্যাগ করতে হবে। আর যে না-ফমানের অন্তরে খোদার ভয়ই নেই, তার তো আনুগত্যের কোন চিন্তাই নেই, নাফরমানীরও নেই কোন শংকা।

৫-অর্থাৎ যেসব বিষয় তাদের বিচার, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রীয় অনুভতির অতীত, যেমন জান্নাত-জাহান্নাম-ফেরেশতা ইত্যাদি। আল্লাহ-রাসূলের বাণী অনুযায়ী এসবকে সত্য-সঠিক বলে বিশ্বাস করে। এ থেকে জানা যায় যে, এসব গায়েবের বিষয় অস্বীকার কারী ব্যক্তি হেদায়াত থেকে বঞ্চিত।

৬- 'ইকামাতে সালাত' অর্থাৎ নামায কায়েম করার অর্থ হচ্ছে এর হক আদায় করে সর্বদা যথা সময়ে নামায আদায় করা।

৭-সকল ইবাদাত-আনুগত্যের উৎস হচ্ছে তিনটি। এক যে সব বিষয় অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। দুই, দেহের সঙ্গে যেসব বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে। তিন, অর্থ সম্পদের সঙ্গে যেসব বিষয় জড়িত। আয়াতে তিনটি উৎস সম্পর্কে পর্যায় ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে।

৮- যে সব মোশরেক ঈমান এনেছে অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে সে মক্কাবাসীদের কথা বলা হয়েছে। যে সব আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী খৃস্টান ইসলাম গ্রহণ করেছে, বর্তমান আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ

أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا

بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَادِعُونَ

৫. এরাই আল্লাহ তায়লার দেয়া সঠিক পথের ওপর রয়েছে এবং এরাই হচ্ছে স্বার্থক ও (সকল পর্যায়ে) সফলকাম।[৯] (আর এই গুন সম্পন্ন লোকদেরই এই কিতাব পথ দেখাবে।)

৬. যারা (এ মৌলিক বিষয়গুলো) অস্বীকার করে তাদের তুমি (পরকালের কথা বলে) সাবধান করো আর না করো (কার্যতঃ) উভয়টাই (তাদের জন্যে) সমান। এরা কখনো ঈমান আনবে না।[১০]

৭. (এই ভাবে জেনে বুঝে আল্লাহর পথকে অস্বীকার করায়) আল্লাহ তায়ালা তাদের মন মগজ ও শ্রবণ শক্তির ওপর সিল মেরে দিয়েছেন। এভাবে এদের দৃষ্টিশক্তির ওপরও আবরণ পড়ে আছে।[১১] এবং এই ধরনের লোকদের জন্যেই রয়েছে কষ্টদায়ক এক ভীষণ প্রকারের শাস্তি।

রুকু ২

৮. মানুষদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা (মুখে) বলে আমরা আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছি কিন্তু সত্যিকার অর্থে (এদের কর্মকান্ড দেখলে তুমি বুঝতে পারবে যে) এরা মোটেই ঈমানদার নয়।[১২]

৯-অর্থাৎ ঈমানদারদের উভয় দল দুনিয়ায় হিদায়াত লাভ করবে আর আখেরাতে তাদের সব আকাংখ্যা পূর্ণ হবে। এ থেকে জানা যায় যে, যারা ঈমানের নিয়ামত এবং নেক আমল থেকে বঞ্চিত, তাদের দুনিয়া আখেরাত সবই বরবাদ হয়েছে। মোমেনদের উভয় দল সম্পর্কে আলোচনা করার পর কাফেরদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১০-এ কাফেরদের দ্বারা সেসব বিশেষ লোক বুঝানো হয়েছে, যাদের জন্য কুফরী নির্দিষ্ট হয়েছে এবং এরা ঈমানের সম্পদ থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়েছে, যেমন আবু জাহাল, আবু লাহাব সহ অন্যান্য কাফেররা। অন্যথায় এটা স্পষ্ট যে, অনেক কাফেরই পারে ঈমান এনেছে এবং ভবিষ্যতেও আনবে।

১১-এদের অন্তরের ওপর মোহর মারা হয়েছে অর্থাৎ সত্য কথা এরা বুঝতে পারেনা। কানের ওপর মোহর মারা হয়েছে অর্থাৎ মনোযোগ দিয়ে সত্য কথা এরা শুনতে পায়না। আর চোখের ওপর পর্দা পড়ে রয়েছে অর্থাৎ সত্য পথ এরা দেখতে পায়না। কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা শেষ করে পরবর্তী ১৩ আয়াতে মোনাফেকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১২-অর্থাৎ অন্তর দিয়ে এরা ঈমান আনেনি— যা সত্যিকার ঈমান তা এরা গ্রহণ করেনি। ধোঁকা দেয়ার জন্য শুধু মুখে মুখেই ঈমানের কথা প্রকাশ করে।

اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ

وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ

مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝١٠

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا

نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ۝١١ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ

لَّا يَشْعُرُوْنَ ۝١٢ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ

قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَاۤءُ ۗ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاۤءُ

৯. (মুখে মুখে ঈমানের দাবী করে) এরা মুলতঃ আল্লাহ তায়ালা ও তার নেক বান্দাহদের প্রতারণা করতে চায় মাত্র। কিন্তু তারা আসলে (এই কাজের মাধ্যমে) নিজেদের সাথেই প্রতারণা করে যাচ্ছে, যদিও এ ব্যাপারে তাদের কোনো প্রকারের চৈতন্য নেই।[১৩]

১০. (আসল কথা হচ্ছে) এদের মনের ভেতর রয়েছে এক ধরনের মারাত্মক ব্যাধি (ক্রমাগত এই প্রতারণার পথে চলতে থাকার কারণে) আল্লাহ তায়ালা এদের এই মনের রোগকে বাড়িয়ে দিয়েছেন[১৪] (তাদের জানা উচিত তাদের এ মিথ্যা বেসাতির জন্যে) আল্লাহ তায়ালার পীড়াদায়ক আযাব তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।[১৫]

১১. তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা খোদার (এই শান্তিপূর্ণ) যমিনে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তারা বলে, না, আমরা তো ভালো কাজই করে যাচ্ছি ।

১২. (অথচ) এরাই খোদার যমিনে যাবতীয় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী যদিও তাদের এ ব্যাপারে কোন চেতনা নেই।[১৭]

১৩. তাদেরকে যখন বলা হয়, অন্য লোকেরা যেমন ঈমান এনেছে তোমারাও তেমনিভাবে ঈমান আনো। তারা বলে[১৮] (তুমি কি চাও যে) আমরাও সে নির্বোধ

১৩-অর্থাৎ তাদের প্রতারণা আল্লাহ্ তায়ালার ওপর চলেনা, কারণ তিনি তো আলেমুল গায়েব। মোমেনদের ওপরও তাদের প্রতারণা চলে না; কারণ, আল্লাহ্ তায়ালা পয়গাম্বরদের মাধ্যমে এবং অন্যান্য উপায়ে মোনাফেকদের প্রতারণা সম্পর্কে মোমেনদেরকে অবহিত করেন। বরং তাদের প্রতারণার অনিষ্ট ও অকল্যাণ মূলতঃ তাদের নিজেদের ওপরই বর্তায়। কিন্তু নিজেদের অজ্ঞতা, অবহেলা আর শয়তানীর কারণে তারা নিজেরা সে বিষয়ে চিন্তা করেনা, কিছুই বুঝেনা। চিন্তা করলে এরা বুঝতে পারতো যে, এ প্রতারণা দ্বারা মুসলমানদের কোন ক্ষতি হয়না, ক্ষতি যা হয় তা তাদের নিজেদেরই হয়। হযরত শাহ আব্দুল কাদের (রঃ)-এর চিন্তার সূক্ষ্মতা এই যে, তিনি এর বাহ্যিক অনুবাদ ত্যাগ করে এর তরজমা করেছেন, 'তারা চিন্তা করেনা।'

১৪- অর্থাৎ তাদের অন্তরে মোনাফেকী, দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণা আর মুসলমানদের সম্পর্কে হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে। তাদের এ ব্যাধি আগে থেকেই বর্তমান ছিল। এখন কোরআন নাযিল, ইসলামের বিকাশ এবং ঈমানদারদের উন্নতি দেখে তাদের এ ব্যাধি আরও বেড়ে গেছে।

১৫- এ মিথ্যা বলার অর্থ ইসলামের মিথ্যা দাবী যে, আমরা ঈমান এনেছি অর্থাৎ কঠোর শাস্তি মূলতঃ তাদের মোনাফেকীরই দন্ড— এটা নিছক মিথ্যা বলার শাস্তি নয়। হযরত শাহ সাহের(রঃ)-এ সুক্ষ্ম পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য এর তরজমা করেছেন 'মিথ্যা বলা।'

১৬-সার কথা এ যে, মোনাফেকরা কয়েকটি উপায়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো। প্রথমত, তারা খাহেশে নফসানী অর্থাৎ মনস্কামনায় ডুবে থাকত। শরীয়তের বিধান মেনে নেয়ার ব্যাপারে তারা ছিল অলস এবং পলায়নপর। দ্বিতীয়ত, কাফের এবং মুসলিম উভয়ের কাছে তারা যাতায়াত করতো এবং নিজেদের মান-সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য একের কথা অন্যের কাছে পৌছাতো, তৃতীয়ত, কাফেরদের সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিতা এবং ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হতো এবং দ্বীনের ব্যাপারে বিরোধিতার জন্য কাফেরদের প্রতি আদৌ রুষ্ট হতোনা। দ্বীনের ব্যাপারে কাফেরদের অভিযোগ, আপত্তি মুসলমানদের কাছে প্রকাশ করতো, যাতে দুর্বল মনা এবং দুর্বল বিশ্বাসের লোকেরা শরীয়তের বিধানের ব্যাপারে দোদুল্যমান হয়ে পড়ে। আর কেউ এসব বিপর্যয় থেকে তাদেরকে বারন করলে তারা জবাব দিতো, আমরাতো সংস্কার -সংশোধন চাই। আমরা চাই যে, দেশের সকল মানুষ অতীত কালের মতো এক হয়ে থাকুক। নুতন ধর্মমতের কারনে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তা দূরীভূত হোক। মূলতঃ স্বার্থান্বেসী মহলরা সব যুগেই এ রকম করে থাকে।

১৭- অর্থাৎ আসল সংস্কার-সংশোধন তো হচ্ছে এ যে, সত্য দ্বীন সকল মতবাদের ওপর বিজয়ী হবে এবং দুনিয়ার সকল স্বার্থ ও কল্যাণের ওপর শরীয়তের নির্দেশকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হবে এবং দ্বীনের ব্যাপারে কারো সমর্থন বা বিরোধিতার তোয়াক্কা করা হবেনা। কবির ভাষায়ঃ 'ভিন্ন মতাবলম্বীদের বন্ধুত্ব , সৌহার্দ ধূলায় ধূসরিত হোক।'

মোনাফেকরা সুকৌশলে যা করছে তা নিছক বিপর্যয়। তারা যদিও এটা উপলব্ধি করতে পারছেনা।

১৮- অর্থাৎ নিজেরা মনে মনে এটা বলত অথবা পরস্পরে মিলে এসব বলতো; কিংবা যে সব দুর্বল মুসলমান কোন কারণে এদের অন্তরঙ্গে বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল— তাদেরকে এরূপ বলত।

وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا

اٰمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَوْا إِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا إِنَّا مَعَكُمْ ۙ

إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٤﴾ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٥﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۪ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ

وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي

اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ

بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾ صُمٌّۢ

بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ

فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ أَصَابِعَهُمْ فِيْٓ

اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۭ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ

بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۭ

লোকদের মতো ঈমান আনি?[১৯] (সত্যি কথা হচ্ছে) এরা নিজেরাই নির্বোধ, যদিও তারা (এ সত্যি কথাটা) জানে না![২০]

১৪. (এই মোনাফিক লোকদের অবস্থা এই যে) এরা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো ঈমান এনেছি। আবার যখন একাকী নিজেদের শয়তানী চক্রের সাথে মিলিত হয়[২১], তখন বলে আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি[২২], আমরা তো (আল্লাহ ও তার অনুসারীদের সাথে) ঠাট্টা করছিলাম মাত্র।[২৩]

১৫. (আসলে) আল্লাহ তায়ালাই তাদের সাথে ঠাট্টা করে যাচ্ছেন।[২৪] তিনি তাদের বিদ্রোহের রশিকে লম্বা করে দিয়েছেন । অন্ধের মতো এরা গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে আছে।[২৫]

১৬. এরা (জেনে বুঝে) হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহীর পথকে কিনে নিয়েছে, অবশ্য এই (বেচাকেনার) ব্যবসায়[২৬] এদের জন্যে মোটেই লাভ জনক হয়নি। এরা সঠিক পথের অনুসারীও নয়।[২৭]

১৭. এদের উদাহরণ হচ্ছে সে (হতভাগ্য) ব্যক্তিদের মতো, যারা অন্ধকারে আগুন জ্বালালো। যখন তার চারদিকের পরিবেশ আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তখন (হঠাৎ করে) আল্লাহ তায়ালা তাদের দেখার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিলেন। (বাইরের আলো দেখার জন্যে তাদের নিজ চোখের আলো তখন আর বাকী রইলো না)। তাদেরকে এমন অবস্থায় ফেলে রাখা হলো যে, তারা আর কিছুই দেখতে পেলো না।[২৮]

১৮. (এদের অবস্থা হচ্ছে) এরা কানেও শোনে না চোখেও দেখে না, মুখ দিয়ে কথাও বলতে পারে না। এসব লোক আর কোনো দিনই সঠিক পথের দিকে ফিরে আসবে না।[২৯]

১৯. (এদের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে সেই অবস্থা) যেমন আসমান থেকে মুষলধারে বৃষ্টি নামে, এর সাথে থাকে আবার অন্ধকার মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের চমক, (ভয়াল অবস্থায় পতিত হয়ে) এরা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের কানে নিজেরাই আংগুল ঢুকিয়ে রাখে। (এই নির্বোধরা জানে না) আল্লাহ পাক কাফেরদের সকল দিক থেকে ঘিরে রেখেছেন।[৩০]

১৯-'সুফাহা' বা বোকা বলা হয়েছে সত্যিকার মুসলমানদেরকে, যারা খোদার নির্দেশের প্রতি মনে প্রাণে এতটা তন্ময় ছিল, যে, অন্যদের বিরোধিতা এবং এর অশুভ পরিণতি এবং যুগের হাওয়া বদলের নানাবিধ অকল্যাণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার

চিন্তাও করতোনা। কিন্তু মোনাফেকেরা ছিল এদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এরা মুসলিম কাফের উভয়ের সঙ্গে বাহ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতো। ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে আখেরাতের কথা চিন্তাও করতোনা। স্বার্থ চিন্তা এতটা প্রবল ছিল যে, ঈমান এনে শরীয়াতের বিধান মেনে চলার কোন প্রয়োজনই এরা উপলব্ধি করেনা। কেবল মুখে মুখে ঈমানের দাবী এবং একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে কিছু বাহ্যিক আমল করাকেই এরা যথেষ্ট মনে করে।

২০- অর্থাৎ আসলে মোনাফেকরাইতো বোকা। পার্থিব স্বার্থ চিন্তায় তারা পরকাল বিস্মৃত হয়েছে। অবিনশ্বরকে ত্যাগ করে নশ্বরকে গ্রহণ করা কতটা বোকামী! আল্লাহ্ আলেমুল গায়েবকে ভয় না করে তাঁরই সৃষ্ট জীবকে ভয় করা এবং এদের হাত থেকে বাঁচার জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করা কত বড় অজ্ঞতা! আল্লাহ্ আহকামুল হাকেমীন এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিরোধিতা করে বাতিলের সঙ্গে সম্পর্ক ও আপোষ করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেনা বিন্দুমাত্র। কিন্তু মোনাফেকরা এত বোকা যে, এতটা সাদামাঠা বিষয়ও তারা বুঝতে পারেনা।

২১- 'শায়াতীন' অর্থ দুষ্ট লোক। এর অর্থ সেসব কাফের, যারা সকলের কাছে নিজেদের কুফর প্রকাশ করে অর্থাৎ এ দ্বারা মোনাফেক সর্দারদের বুঝানো হয়েছে।

২২-অর্থাৎ কুফরী এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ তোমাদের সাথে আছি। কোন পরিস্থিতিতে আমরা তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবোনা।

২৩-অর্থাৎ বাহ্যতঃ মুসলমানদের সঙ্গে আমরা যেভাবে সম্পর্ক দেখাই,তা দ্বারা তোমরা একথা বুঝবেনা যে, 'আসলেই আমরা তাদের সঙ্গে একমত। আমরা তো কেবল তাদের সঙ্গে বিদ্রূপ করছি। আর তারা যে বোকা, তা সকলের কাছে প্রকাশ করছি। আমাদের কাজ আমাদের কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেও তারা এত বোকা যে,আমাদের মুখের কথা দ্বারা আমাদেরকে মুসলমান মনে করে। আমাদের অর্থ-সম্পদ এবং পরিবার-পরিজনের ওপর হস্ত প্রসারিত করেনা। গনীমতের মালে আমাদেরকে অংশীদার করে। আমাদের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে। আর আমরা তো গোপন বিষয় প্রকাশ করে বেড়াই। তারা এর পরও আমাদের প্রতারণা বুঝতে পারেনা।'

২৪- যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালা মোমেনদেরকে বলে দিয়েছেন যে, মোনাফেকদের সঙ্গে মোমেনদের অনুরূপ আচরণ করবেন কখনো তাদের জান মালের ক্ষতি সাধন করবে না। এর ফলে মোনাফেকরা বোকামীর কারণে বুঝে নিয়েছিল যে, ঈমান আনার ফলে মুসলমানরা যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করে থাকে, নিছক মুখে ইসলামের কথা প্রকাশ করে আমরাও সেসব তো সুযোগ-সুবিধা লাভ করছি। এ কারণে তারা অত্যন্ত নিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। অথচ পরিনামে এটা মোনাফেকদেরকে ভীষন বিপদে ফেলবে, এর পরিণতি হবে অত্যন্ত মারাত্মক। তবে এখন তুমিই বল, আসলে বিদ্রূপ মুসলমানদের সাথে হয়েছে, না মোনাফেকদের সাথে? আর এ বিদ্রূপ করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে ভীষণ শাস্তি দেবেন।

২৫-অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদেরকে বিদ্রূপের ঢিল দেয়া হচ্ছে। তারা ঔদ্ধত্য অবাধ্যতায় খুব বেড়ে গিয়েছে। তারা এমনই বিভ্রান্ত ও বিপদগামী হয়েছে যে, এর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে কোন চিন্তাই করেনি। তারা এ বলে খুশী হয়েছে যে, আমরা মুসলমানদের সাথে উপহাস করছি। অথচঃ ব্যাপারটি হচ্ছে উল্টা।

২৬. তেজারতের অর্থ হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী ক্রয় করে নেয়া।

২৭. অর্থাৎ মোনাফেকরা বাহ্যতঃ ঈমান গ্রহণ করেছে, আর অন্তরে কুফর গোপন রেখেছে। এর কারণে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত আর ইহকালে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে এদের অবস্থা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেছেন যে ঈমান আনলে দুনিয়া-আখেরাত-উভয় জায়গায় এরা সফলকাম হবে। তাদের তেজারত নিজেদের কোন কল্যাণে আনেনি— দুনিয়ারওনা, আখিরাতেরও না। আর তারা কিছু বুঝেওনি। নিছক মৌখিক ঈমানকে যথেষ্ট এবং কল্যাণকর মনে করে এ অকল্যাণ অপমানে নিপতিত হয়েছে। এদের অবস্থার উপযোগী দু'টি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

২৮-অর্থাৎ তাদের উদাহরণ এমন, যেমন কোন ব্যক্তি ঘুট ঘুটে অন্ধকার রাত্রিতে আগুন জ্বালায় জঙ্গলে পথ দেখার জন্য। আগুন জ্বলে উঠলে আল্লাহ তায়ালা আগুন নিবিয়ে দেন। সে ব্যক্তি অন্ধকার রাত্রিতে দাঁড়িয়ে থাকে, কিছুই দেখতে পায়না, তেমনিভাবে মোনাফেকরা মুসলমানদের ভয়ে কালেমায়ে শাহাদত দ্বারা কাজ উদ্ধার করতে চেয়েছে। কিন্তু তাৎক্ষণিক কিছু ন্যায্য ফায়েদা হাসিল হলেও— যেমন জান-মাল রক্ষা করা— কালেমায়ে শাহদাতের নুর এবং সত্যিকার ফায়েদা সবই বিনাশ হয়ে যায়, আর মৃত্যুর সাথে সাথেই তারা কঠোর শাস্তিতে নিপতিত হয়।

২৯-অর্থাৎ বধির যে, সত্য কথা শুনতে পায়না, বোবা যে সত্য কথা বলতে পারেনা, অন্ধ যে নিজের লাভ ক্ষতি ও ভালো মন্দ দেখতে পায়না। সুতরাং যে ব্যক্তি বধির এবং বোবা, সে কিভাবে পথের দিশা লাভ করবে। কেবল অন্ধ হলে তো কাকেও ডেকে বা কারো কথা শুনে পথে আসতে পারতো । সুতরাং এরা গোমরাহী থেকে সত্যের দিকে ফিরে আসবে- এমন আশা কিছুতেই করা যায়না।

৩০- মোনাফেকদের দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে, সেসব লোকদের মতো,যাদের ওপর আসমান থেকে মষল ধারে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, এতে রয়েছে আরও কয়েক প্রকার অন্ধকার, যেমন ঘন-কালো অন্ধকার মেঘ আর বৃষ্টির ফোটাও প্রবল এবং নিরবচ্ছিন্ন; ওদিকে রাত্রিও অন্ধকার ঘুট ঘুটে কালো, অন্ধকারের সাথে সাথে বিদ্যুৎ-বজ্রপাতের ঘনঘটা এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, তারা প্রাণের ভয়ে কানে আঙ্গুল দিয়েছে যেন বিকট শব্দে প্রাণ বহির্গত হয়ে না যায়! এমনিভাবে মোনাফেকরা শরীয়তের বিধি-বিধান এবং কঠোর দন্ডের কথা শুনে এবং নিজেদেরকে লাঞ্ছিত অপমানিত হতে দেখে এবং দুনিয়ার স্বার্থ চিন্তা করে এক বিস্ময়কর দ্বন্দ এবং ভয়-ভীতির আতংক ও অস্থিরতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। তারা

অর্থহীন কৌশল অবলম্বন করে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার অসীম শক্তি সবদিক থেকে কাফেরদের পরিবেষ্টন করে আছে। তাঁর পাকড়াও এবং শাস্তি থেকে তারা কিছুতেই রক্ষা পাবেনা।

كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ۙ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ

قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿২০﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿২১﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا

وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ص وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ

بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿২২﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا

عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ص وَادْعُوا

شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿২৩﴾

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿২৪﴾

২০. আকাশে বিদ্যুতের চমকানীতে (এদের অবস্থা এমন নাজুক হয়ে পড়ে যে,) মনে হয়, এখনিই বিদ্যুত এদের চোখকে নিস্প্রভ করে দেবে। (এই ভয় ও আতংকজনক অবস্থায়) সামান্য কিছু আলো দেখলেই এরা সেদিকে ধাবিত হয় আবার অন্ধকার হয়ে গেলে থমকে দাঁড়ায়। অথচ আল্লাহ পাক চাইলে তিনি সহজেই তাদের শোনার ক্ষমতা ও দেখার ক্ষমতা চিরতরে ছিনিয়ে নিতে পারতেন, নিশ্চয়ই তিনি সর্ব শক্তিমান।[৩১]

রুকু ৩

২১. হে মানুষ, তোমরা সেই মহান আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব স্বীকার করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের আগের সকল মানুষকে পয়দা করেছেন। (আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করে তার আনুগত্য স্বীকার করার পরই আশা করা যায়) তোমরা নিজেদেরকে (শয়তানের যাবতীয় প্ররোচনা থেকে) বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।

২২. তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি এই যমিনকে তোমাদের জন্যে শয্যা বানালেন, আসমানকে বানালেন ছাদ, আসমান থেকে পানির ব্যবস্থা করলেন- যার সাহায্যে আবার নানা প্রকারের ফল মূল উৎপাদন করে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করলেন। (এই সব সত্য) তোমরা যখন জানোই[৩২] তখন আল্লাহর সাথে আর কাউকেই শরীক করো না।

২৩. আমি আমার বান্দাহর ওপর যে কিতাব নাযিল করেছি, তার ব্যাপারে যদি তোমাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে যাও- এই কিতাবের সূরার মতো একটি সূরা অন্তত রচনা করে হাজির করো।[৩৩] এক আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য যেসব সমর্থক ও বন্ধুবান্ধব রয়েছে তাদের ডাকো (এবং তাদের সহযোগিতাও গ্রহণ করো।) যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও![৩৪]

২৪. কিন্তু তোমরা যদি তা না করতে পারো (আর এটাতো জানা কথাই যে), তোমরা তা কখনোই (কোরআনের সূরার মতো সূরা রচনা) করতে পারবে না (সে অবস্থায়) তোমরা দোজখের সেই কঠিন আগুনকে ভয় করো যার ইন্দন হবে মানুষ ও পাথর। কাফেরদের জন্যে এই আযাব নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।[৩৫]

---

৩১. সারকথা এই যে, মোনাফেকরা নিজেদের গোমরাহী এবং অন্ধকার সুলভ চিন্তা ধারায় নিমজ্জিত রয়েছে। কিন্তু ইসলামের বিজয়ের আলো স্পষ্ট 'মোজেযা' প্রকাশিত হতে দেখে এবং শরীয়তের তাকীদ ও কঠোর দন্ডের কথা শুনে শংকিত হয়ে প্রকাশ্যে 'ছেরাতে মোস্তাকীমের'— সঠিক পথের দিকে মনোনিবেশ করার ভান করে। আর যখন

কোন পার্থিব কষ্ট দেখে, তখন আবার কুফরীর দিকে ফিরে যায়। যেমন কঠোর বৃষ্টি এবং অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা দিলে কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু আল্লাহ যেহেতু সবকিছু জানেন, কোন কিছুই তাঁর অসীম ক্ষমতা বহির্ভূত নয়, সুতরাং তাদের এ সকল ছল চাতুরী আর কূটকৌশল কোনই কাজে আসবেনা।

সূরার শুরু থেকে এখান পর্যন্ত তিন ধরনের লোকের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে মোমেন, পরে কাফের- যাদের অন্তরে মোহর মারা হয়েছে যারা কখনো ইমান আনবেনা- তৃতীয় মোনাফেক, যারা দেখতে মুসলমান, কিন্তু তাদের অন্তর একমুখী নয়।

৩২. এখন মোমেন, কাফের, মোনাফেক সহ সকল বান্দাহকে সম্বোধন করে তাওহীদ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এ তাওহীদই হচ্ছে ঈমানের জন্য সব চেয়ে বড় উৎস, তথা সব উৎসের মূল। সারকথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী সকলকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের প্রয়োজন এবং কল্যাণের সব কিছুই তিনি পয়দা করেছেন। অতপরঃ তাকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে মাবু'দ বানানো— যে তোমাদের উপকারও করতে পারেনা, ক্ষতিও না— যেমন মূর্তী। এটা কত বড় বোকামী এবং অজ্ঞতা! অথচঃ তোমরা জান যে, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

৩৩- উপরে বলা হয়েছে যে, এ কালামে পাকে সন্দেহের কারণ হয়তো এ হতে পারে যে, এতে সন্দেহজনক কিছু রয়েছে। 'সন্দেহ নেই' বলে তার নিরসন করা হয়েছে। অথবা সন্দেহের কারণ এ হতে পারে যে, কারো বুদ্ধির অভাব অথবা অতি বিদ্বেষ বশতঃ এ সন্দেহ দেখা দিয়েছে। মূলতঃ তাদের ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছিল এবং এটাই সেখানে বর্তমান ছিল। তাই এটা নিরসনের উত্তম এবং সহজ উপায় বলে দিয়েছে যে, এটি মানুষের বানানো কালাম, তোমাদের মনে এমন সন্দেহ দেখা দিয়ে থাকলে তোমরাও এমন উন্নত মানের তিনটি আয়াত রচনা করে আন দেখি! ভাষার লালিত্য সৌন্দর্য মাধুর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তোমরা যদি একটা ক্ষুদ্র সূরার মোকাবিলা করতে সক্ষম না হও তা হলে বুঝতে হবে যে, এটি আল্লাহর কালাম— কোন মানুষের কালাম নয়, এ আয়াতে দলীল প্রমাণসহ রসূলের নবুওয়াত বর্নীত হয়েছে।

৩৪. অর্থাৎ এটা মানুষের কালাম-এ দাবীতে তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে যত যোগ্য কবি-সাহিত্যিক বর্তমান আছে, তাদের সকলের সাহায্য-সহযোগিতায় এর একটা ক্ষুদ্র সূরা রচনা করে আন। অথবা এর অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত তোমাদের যত মাবুদ আছে, সকলের কাছে অনুনয়-বিনয় করে দোয়া করো, তারা যেন এ মুশকিল আসানের কাজে তোমাদের কিছুটা সাহায্য করে।

৩৫. এত সব কিছুর পরও যদি তোমরা অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আনতে সক্ষম না হও, আর এটি তো নিশ্চিত যে, তোমরা এমনটি কস্মিমকালেও করতে সক্ষম হবেনা— তা হলে দোযখের আগুনকে ভয় কর এবং তা থেকে বেঁচে থাক, যার ইন্দন হবে

কাফের এবং পাথর— তোমরা যাদেরকে পূজা কর। আর দোযখের আগুন থেকে বেচে থাকার উপায় হলো এ যে, তোমরা কালামে এলাহীর প্রতি ঈমান আনবে। আর সে আগুন কাফেরদের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে, যারা কুরআন শরীফ এবং নবী করীমকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ط كُلَّمَا رُزِقُوا

مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا لا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا

مِنْ قَبْلُ لا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ط وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ

مُطَهَّرَةٌ ق وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي

أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ط فَأَمَّا

الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ج

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا

مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا لا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ط

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ

اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ص وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ

يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ط أُولَٰئِكَ هُمُ

২৫. অতঃপর যারা এই কিতাবের ওপর ঈমান এনেছে এবং (ঈমানের দাবী মোতাবেক) নিজেদের জীবনে ভালো কাজ করেছে, তাদের তুমি (হে মোহাম্মদ) সুসংবাদ দাও– এমন এক জান্নাতের যার নীচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত হতে থাকবে। যখনি তাদের (এ জান্নাতের) কোনো একটি ফল দেয়া হবে, তারা বলবে, এ ধরনের ফল তো ইতিপূর্বেও (পৃথিবীতে কিংবা অন্য কোথায়ও) আমাদের দেয়া হয়েছিলো।[৩৬] তাদের এমনি ধরনের জিনিসই দেয়া হবে। তাদের জন্যে সেখানে থাকবে পবিত্র সহধর্মী ও সহধর্মীনি এবং তারা সেখানে অনন্ত কাল ধরে অবস্থান করবে।[৩৭]

২৬. (সত্য প্রমাণের জন্যে প্রয়োজন বোধে) আল্লাহ তায়ালা মশা কিংবা তার চাইতেও কোনো নিকৃষ্ট মানের[৩৮] কিছুর উদাহরণ দিতে (মোটেই) লজ্জাবোধ করেন না। যারা (আল্লাহর বাণীতে) বিশ্বাস স্থাপন করে তারা এসব উদাহরণ দেখেই জেনে নেয় যে, এই সত্য আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে। আর যারা আগেই সত্যকে অস্বীকার করেছে তারা (না মানার মিথ্যা অজুহাত দিতে গিয়ে) বলে আল্লাহ এসব (নিকৃষ্ট জীব জন্তুর) উদাহরণ দ্বারা কি বুঝাতে চান? (এভাবে) একই ঘটনা অনেক লোককে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করলেও বহু লোককে তা (আবার) হেদায়াতের পথও দেখায়।[৩৯] গোহরাহীর পথে এ দিয়ে তারাই শুধু নিমজ্জিত থাকে যারা (খোদার নির্দেশ অমান্য করে) সীমালংঘনের পথই বেছে নিয়েছে।

২৭. (অমান্যকারী এসব ব্যক্তি হচ্ছে) যারা তার ফরমান মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভংগ করে (ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে) তিনি যেসব সম্পর্কের ভীত মজবুত করতে বলেছেন তা ছিন্ন করে।[৪০] সর্বোপরি এই যমিনে সার্বিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে।[৪১] এ (অন্যায়ে নিয়োজিত) ব্যক্তিরাই হচ্ছে (সর্বদিক থেকে) ক্ষতিগ্রস্ত।[৪২]

২৮. তোমরা আল্লাহকে কিভাবে অস্বীকার করবে? তিনি কি তোমাদের মৃত[৪৩] অবস্থা থেকে জীবন[৪৪] দান করেননি? আবার কি মৃত্যুর[৪৫] মাধ্যমে তিনি তোমাদের এ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন না? সর্বশেষে তিনিই কি আবার তোমাদের জীবন[৪৬] দান করবেন না এবং এভাবেই তোমাদেরকে একদিন (চূড়ান্তভাবে) তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।[৪৭]

২৯. তিনিই সেই মহান সত্বা যিনি এই পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের ব্যবহারের জন্যে পয়দা করেছেন। অতপর তিনি আসমানের দিকে লক্ষ্য করলেন এবং সাত আসমান তৈরী সম্পন্ন করলেন। তিনি সবকিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত আছেন।[৪৮]

৩৬-জান্নাতের ফল-মূল দেখতে দুনিয়ার ফল-মূলের মত হবে, কিন্তু স্বাদে আকাশ-পাতাল ব্যবধান হবে। অথবা জান্নাতের সব ফল দেখতে এক রকম হবে, কিন্তু স্বাদ হবে পৃথক পৃথক। কোন ফল দেখে বলবে, এতো সে ফল, যা ইতিপূর্বে দুনিয়াতে বা জান্নাতে আমি খেয়েছি। কিন্তু খেলে স্বাদ ভিন্ন হবে।

৩৭. জান্নাতের নারীরা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ না-পাকী হতে মুক্ত হবে। এপর্যন্ত তিনটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এক, উৎস অর্থাৎ কোথা থেকে আমাদের আগমন ঘটেছে এবং আমরা কি ছিলাম। দুই, আমরা কি খাবো এবং কোথায় থাকবো। তিন, 'মাআদ' অর্থাৎ আমাদের শেষ পরিণাম কি হবে।

৩৮. প্রথম আয়াত সম্পর্কে কাফেররা যে আপত্তি উত্থাপন করেছে, এ আয়াতে তাঁর জবাব দেয়া হয়েছে। জবাবের সার কথা এই যে, একটা ছোট সূরা রচনা করাও যখন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, যখন প্রমানিত হয়েছে যে, এটা আল্লাহর কালাম,তখন কাফেররা বলল, আমরা কালামে এলাহীর মোকাবিলা করতে সক্ষম না হলেও অন্য দলীল দ্বারা আমরা প্রমাণ করব যে, এটা আল্লাহর কালাম নয়— মানুষের কালাম। আর তা হচ্ছে এই যে, মহান মর্যাদাবান ব্যক্তিরা তাদের কালামে ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখ থেকে বিরত থাকেন। আলাহ তায়ালা তো সকল মহান ব্যক্তির চেয়েও মহান। তিনি কি করে তাঁর কালামে মশা-মাছির মতো ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখ করেন? তাদের এই আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা মশা-মাছির মাকড়শার উদাহরণ দেবেন, এতে লজ্জার কি আছে? দৃষ্টান্ত ভালো করে বুঝিয়ে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতা এবং মহত্ত্বের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, যার উদাহরণ দেয়া হবে তা তুচ্ছ হলে সে জন্য উদাহরনও দেয়া হবে তুচ্ছ জিনিসের। অন্যথায় উদাহরণ স্পষ্ট হবেনা। হা', অবশ্য যদি এতে উদাহরণ দাতার সাথে সামঞ্জস্য জরুরী হত, তবে এ নির্বোধদের আপত্তি চলত। কিন্তু কোন বোকাইতো একথা স্বীকার করবেনা। এমনকি তাওরাত ইঞ্জীল এবং রাজা-বাদশাহদের উক্তিতে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এর সমালোচনা করা কাফেরদের বোকামী এবং বিদ্বেষের পরিচায়ক। আর-এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতায় এই দুনিয়া মশা-মাছির চেয়েও নীচে, যেমন মশার ডানার কথা বলা হয়েছে। কোন কোন হাদীসে দুনিয়ার দৃষ্টান্তে এর উল্লেখ রয়েছে।

৩৯-অর্থাৎ ঈমানদাররা তো এ সব উদাহরণকে সত্য আর কল্যাণকর মনে করে। আর কাফেররা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের স্থলে বলে, এমন ক্ষুদ্র-তুচ্ছ উদাহরন দ্বারা খোদার কি উদ্দেশ্য আর কিইবা এর অর্থ হতে পারে? এর জবাবে বলা হয়েছে যে, হেদায়াতে পরিপূর্ন এ কালাম দ্বারা অনেককে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করা আর অনেককে সোজা পথে আনাই তাঁর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সত্যপন্থী আর বাতিলপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য করাই তাঁর উদ্দেশ্য। এটা অতীব জরুরী এবং কল্যাণকর।

৪০- যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, আম্বিয়ায়ে কেরাম, নেককার, দ্বীন, ওয়ায়েযীন-মোমেনীন এবং নামায ও অন্যান্য সমুদয় বিষয় এড়িয়ে চলা।

৪১-ফাসাদ বা বিপর্যয়ের তাৎপর্য এই যে, ঈমান সম্পর্কে এরা জনমনে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করতো, ইসলাম বিরোধীদেরকে ক্ষেপিয়ে মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ে নিয়োজিত করতো আর ছাহাবায়ে কেরাম এবং উম্মতের দোষ খুজে বের করে তা প্রচার করে বেড়াতো, যেন রসূল(সাঃ) এবং দ্বীন ইসলামের মূল্য হীনতা মানুষের মনে গেঁথে যায়। তারা মূসরমানদের গোপন কথা বিরোধীদের কাছে পৌছাতো এবং ইসলামের রীতি-নীতির বিরুদ্ধে নানা রকম রেওয়াজ বেদআত কুপ্রথা বিস্তারে সচেষ্ট থাকতো।

৪২. অর্থ এ যে, এসব অবাঞ্ছিত কর্মকান্ড দ্বারা এরা নিজেদেরই ক্ষতি করে থাকে; ইসলামের অবমাননা এবং উম্মতের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কিছুই সাধিত হবেনা।

৪৩. অর্থাৎ প্রাণহীন পদার্থ, যাতে কোন অনুভূতি ছিলনা। প্রথমে এটা নিছক বস্তু ছিল, পরে পিতা-মাতার খাদ্যে পরিণত হয়েছে। অতঃপর বীর্য, তাঁর পর জমাট রক্ত এবং সর্বশেষে গোশতে পরিণত হয়েছে।

৪৪. অর্থাৎ পূর্ববর্তী পর্যায় সমূহের পর রূহ ফুঁক দেয়া হয়েছে। যার ফলে মাতৃগর্ভে এবং অতঃপর দুনিয়ায় জীবিত ছিল।

৪৫. অর্থাৎ যখন দুনিয়ায় মৃত্যুর সময় উপস্থিত হবে।

৪৬. অর্থাৎ হিসাব-কিতাবের জন্য কিয়ামতে জীবিত করা হবে।

৪৭. অর্থাৎ কবর থেকে বের হয়ে হিসাব-কিতাবের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার সম্মুখে দাঁড়াবে। সুতরাং এখন ইনছাফ কর। তোমরা যখন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের জন্য ঋণী, সকল অবস্থা এবং সকল প্রয়োজনে তাঁর মুখাপেক্ষী এবং প্রত্যাশী; এরপরও কুফরী করা, তাঁর না-ফরমানী করা সত্যিই এক বিস্ময়কর কাজ!

৪৮. এ আয়াতে দ্বিতীয় নেয়ামতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জীবন ধারণ এবং কল্যাণ সাধনের জন্য দুনিয়ায় সব জিনিস প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন। খাওয়া, পান করা, আহার এবং পরিধান করার জিনিস এবং এসব জিনিসের জন্য উপায়-উপকরণ এর পর অনেক আসমান বানানো হয়েছে। এর মাঝেও তোমাদের জন্য নানা ধরণের কল্যাণ রয়েছে।

الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا
فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ
جَمِيْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ
سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْۤا
اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ
اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا
ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ
هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ
اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ

রুকু ৪

৩০. আল্লাহ তায়ালা যখন ফেরেশতাদের (সম্বোধন করে) বললেনঃ আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি[৪৭] পাঠাতে চাই, ফেরেশতারা বললো, আপনি কি এমন

কাউকে আপনার প্রতিনিধি বানাতে চান যারা আপনার যমিনে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং (স্বার্থের জন্যে আপনার দুনিয়ায়) রক্তপাত করে বেড়াবে। (প্রশংসা সহকারে) আপনার তসবীহ্ পড়া ও আপনার মহান পবিত্রতা[৫০] বর্ণনা করার জন্যে তো আমরাই আছি। আল্লাহ্ তায়ালা বললেনঃ আমি যা জানি তা তোমরা জানো না।[৫১]

৩১. আল্লাহ্ তায়ালা অতঃপর (তার প্রতিনিধি) আদমকে সব ধরনের জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন। পরে (এক পর্যায়ে) তিনি তা ফেরেশতাদের কাছেও পেশ করে বললেনঃ (আমার প্রতিনিধি সম্পর্কে তোমাদের ধারনা যদি সত্য হয় তাহলে দেখি) তোমরা এ নামগুলো বলো তো?

৩২. ফেরেশতারা বললো একমাত্র আপনিই (সকল দোষ ত্রুটি মুক্ত এবং) পবিত্র, আমরা তো শুধু সে টুকুই জানি যা আপনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। সব কিছুর জ্ঞান ও হেকমত তো একমাত্র আপনারই জানা রয়েছে।[৫২]

---

৪৯. এখন এক বড় নেয়ামতের কথা বলা হচ্ছে যা সকল আদম সন্তানের প্রতিই করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির কাহিনী। এ কাহিনী সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে আর তাকে 'খলীফাতুল্লাহ'-আল্লাহর প্রতিনিধি করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে যা বলা হয়েছে সে বিষয়ে কেউ অস্বীকার করলে হযরত আদমের এই কাহিনী হবে তাঁর জবাব।

৫০, ফেরেশতাদের যখন এ ধারণা হয়েছিল যে, এমন এক সৃষ্টি, যারা মানুষের মাঝে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এবং রক্তপাতকারী পর্যন্ত হবে, আমাদের মতো অনুগতদের বর্তমানে থাকতে তাদেরকে খলীফা বানানোর প্রয়োজন কি? এতে তাদের আপত্তি ছিলনা মোটেই বরং এটা ছিল জানার জন্য তাদের একটা জিজ্ঞাসা মাত্র। প্রশ্ন দাঁড়ায়, বনী আদমের এ অবস্থা সম্পর্কে ফেরেশতারা জানল কিভাবে? জিন জাতির ওপর তারা অনুমান করেছে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে আগেই বলে দিয়েছিলেন, বা 'লওহে মাহফুজে' তাদের কথা তিনি লিখিত দেখিয়েছিলেন, অথবা তাঁরা একথা বুঝে নিয়েছিল যে, যুলুম-বিপর্যয় দেখা দিলে তবেই তো হাকিম-খলীফ-শাসক-প্রতিনিধির-প্রয়োজন দেখা দেবে, অথবা হযরত আদমের আকৃতি দেখে তারা বুঝতে পেরেছিলো। যেমন ইবলীস হযরত আদমকে দেখে বলেছিল যে, সে বাহলুন-মজনু বা আপন ভোলা হবে। আর সত্যিই হয়েছিলও তাই।

৫১. ফেরেশতাদেরকে তাৎক্ষণিক এ জবাব দেয়া হয়েছে সংক্ষেপে। এর সৃষ্টিতে যে হেকমত-রহস্য রয়েছে, তা আমরা ভালো করেই জানি, তোমাদের এখনও সে রহস্য বলা হয়নি। তা জানলে তার খেলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বে তারা সন্দেহ করতনা।

৫২. সার কথা এই যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদমকে প্রতিটি জিনিষের তাৎপর্য-বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা-অপকারিতাসহ এর নাম শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কোন বাক্যের আশ্রয় ছাড়াই সরাসরি তাঁর অন্তরে এ জ্ঞান দান করেছিলেন; কারণ, জ্ঞানের এ পরিপূর্ণতা ছাড়া খেলাফত এবং দুনিয়ায় শাসন-কর্তৃত্ব সম্ভব নয়। অতঃপর ফেরেশতাদেরকে এ হিকমত সম্পর্কে অবহিত করার কারণে তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় যে, তোমরা খেলাফতের দায়িত্ব পালনে সক্ষম-এ ধারণায় তোমরা সত্য হলে এসব বস্তুর গুণ-বৈশিষ্ট্যসহ নাম বল। কিন্তু তারা অক্ষমতা স্বীকার করলো এবং বুঝতে পারলো যে, এ সবকিছু সাধারণ জ্ঞান ছাড়া কেউ দুনিয়ায় খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারেনা। এ সাধারণ জ্ঞানের অংশ বিশেষ আমাদের অর্জিত হলেও তা দ্বারা আমরা খেলাফতের যোগ্য হতে পারিনা। এটা বুঝতে পেরে তারা বলে উঠে যে, তোমার জ্ঞান এবং হেকমত পর্যন্ত কেউ পৌছতে পারেনা।

يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ

اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا

رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا

مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا

مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ
حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ
إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

৩৩. আল্লাহ তায়ালা এবার আদমকে বললেন, সে সব জিনিসের নাম ফেরেশতাদের বলে দিতে। আদম (আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক) নামগুলো (সুন্দর ভাবে) ফেরেশতাদের বলে দিলেন। এবার আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আসমান যমিনের যাবতীয় গোপন রহস্য জানি। তোমাদের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত তথ্য আমি ভালো ভাবেই অবগত আছি।[৫৩]

৩৪. অতঃপর আল্লাহ পাক যখন ফেরেশতাদের বললেন, তোমরা আদমের কাছে নতি স্বীকার করো। ফেরেশতারা (একবাক্যে আল্লাহর আদেশ মেনে নিয়ে) আদমের সামনে অবনত হলো, শুধু মাত্র ইবলিস[৫৪] আদমের সামনে নতি স্বীকার করলো না। সে তার অহংকারের বড়াই করলো এবং পরিণামে আল্লাহ তায়ালার না-ফরমানদের তালিকায় নিজেকে শামিল করে নিলো।[৫৫]

৩৫. এবার আমি আদমকে লক্ষ্য করে বললামঃ তুমি এবং তোমার স্ত্রী পরম সুখে এই বেহেশতে বসবাস করতে থাকো। (বেহেশতের) এই ভান্ডার থেকে যা তোমাদের মনে চায় তাই তোমরা স্বাচ্ছন্দের সাথে ভোগ করে, তবে কোনো

অবস্থায়ই গাছটির পাশেও যেওনা। অন্যথায় তোমরা দুজনই সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।[৫৬]

৩৬. কিন্তু শয়তান (শেষতক) তাদের উভয়কেই (সেই বিশেষ গাছটি সম্পর্কে আল্লাহর সাবধানবাণী অমান্য করার কাজে) প্ররোচিত করলো। তারা উভয়েই বেহেশতের পরম সুখে) যেখানে ছিলো সেখান থেকে তাদের বের করেই ছাড়লো।[৫৭] আমি তাদেরকে বললাম, (তোমরা এখন আর বেহেশতে থাকতে পারবে না।) এখান থেকে নেমে পড়ো, (এবার তোমাদের গন্তব্যস্থল হবে পৃথিবী)। (তবে মনে রেখো) তোমরা এবং শয়তান (চিরদিনের জন্যে) একে অপরের দুশমন।[৫৮] (সেখানে জীবন যাপনের) সামান থাকবে এবং একটি নিদৃষ্ট সময় পর্যন্ত তোমরা জীবন যাপন করবে।[৫৯]

৩৭. অতঃপর আদম আল্লাহর কাছ থেকে (হেদায়াত সম্বলিত) কিছু বাণী পেলো, আল্লাহ তায়ালা তার তওবা গ্রহণ করে তাকে মাফ করে দিলেন। আল্লাহ তায়ালা বড়োই মেহেরবান ও ক্ষমাশীল।[৬০]

৩৮. আমি তাদের বললাম, তোমরা সবাই এবার এখান থেকে নেমে যাও।[৬১] (নতুন গন্তব্য স্থলে গিয়েও মনে রেখো তোমরা কিন্তু স্বাধীন নও)। সেখানে অবশ্যই আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন বিধান সম্পর্কিত) হেদায়াত আসবে। যারা আমার সেই বিধান মেনে চলবে তাদের কোনো ভয়, উৎকণ্ঠা ও চিন্তার কারণ থাকবে না।[৬২]

৩৯. আর যারা আমার বিধানকে অস্বীকার করবে এবং এ বিধানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (তাকে প্রত্যাখ্যান করে লাগামহীন জীবন যাপন করবে) তারা অবশ্যই জাহান্নামের বাসিন্দা হবে। সে বাসস্থান হবে চিরন্তন।

---

৫৩. এর পর হযরত আদম (আঃ) কে দুনিয়ার সমুদয় বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি সাথে সাথে সব কিছু ফেরেশতাদেরকে বলে দেন যে, তারা বিস্মিত হয়ে পড়ে, হযরত আদমের জ্ঞানের পরিধি দেখে তারা অবাক হয়ে উঠে। তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বললেন, বল, আমি কি বলিনি যে, আসমান-যমীনের সকল গোপন রহস্য আমারই জানা আছে? তোমাদের অন্তরে যেসব কথা গোপন রয়েছে, সেসবও আমার জানা আছে।

এ দ্বারা এবাদাতের ওপর ইলমের ফযীলত প্রমাণিত হয়েছে। দেখুন, ইবাদতে ফেরেশতারা এতটা অগ্রসর ছিল যে, তারা মা'ছুম— নিস্পাপ কিন্তু যেহেতু জ্ঞানে তাদের মূল্য কম, তাই খেলাফতের মর্যাদায় মানুষকেই অভিষিক্ত করা হয়েছে, আর

ফেরেশতারাও তা মেনে নিয়েছেন। এটা হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কারণ, এবাদত তো সৃষ্টিকূলের বৈশিষ্ট্য, খোদার গুণ নয়। অবশ্য জ্ঞান, খোদাতায়ালার সর্বোচ্চ গুণ। তাই এ জ্ঞানের গুণেই মানুষ খেলাফতের যোগ্য হয়েছে।

৫৪. হযরত আদম (আঃ)-এর খলীফা হওয়া স্বীকৃত হলে ফেরেশতাদেরকে এবং তাদের সাথে জিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তার প্রতি সেজদা কর। যেমন শাসনকর্তারা প্রথমে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে, অতঃপর অন্যান্যদের-নির্দেশ দেয়, তাদের সামনে নযর-নিয়ায এবং সম্মান প্রদর্শন করার জন্য, যাতে কারো অবাধ্যতার অবকাশ না থাকে। নির্দেশ মতো সকলেই উপরোক্ত সেজদা আদায় করে, কেবল ইবলীস বাদে। আসলে ইবলীস ছিল জিনদের পর্যায়ভূক্ত। অবশ্য ফেরেশতাদের সাথে তাঁর বেশী মেলামেশা ছিল। এ অবাধ্যতার কারণ ছিল এই যে, জিন জাতি কয়েক হাজার বছর ধরে দুনিয়ায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং আসমানেও তাদের যাতায়াত ছিল, তাদের বিপর্যয়-রক্তপাত বৃদ্ধি পেলে ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশে তাদের কতেককে হত্যা করে, আর কতেককে জঙ্গল-পাহাড় এবং দ্বীপে ছড়িয়ে দেয়। ইবলিস ছিল তাদের মধ্যে বড় আলেম এবং আবেদ— খুব বড় জ্ঞানী এবং এবাদাত গুজার। সে জিন জাতির বিপর্যয়ের সাথে তাঁর নির্লিপ্ততা প্রকাশ করে। ফেরেশাতাদের সুপারিশে সে বেঁচে যায় এবং তাদের মধ্যেই বসবাস করতে থাকে। 'সকল জিনের স্থলে এখন কেবল আমিই দুনিয়ায় কর্তৃত্ব করবো, এ আশায় অনেক বেশী এবাদাত করতে থাকে। তাঁর ধারণা ছিল দুনিয়ায় তাঁরই খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। হযরত আদমের খেলাফত সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ প্রকাশিত হলে ইবলীস নিরাশ হয় এবং আল্লাহর এবাদাত বিফল গেছে মনে করে হিংসায় জ্বলে-পুড়েই এসব কিছু করে এবং একদিন সত্যিই 'মলউন' অভিসপ্ত হয়।

৫৫. অর্থাৎ আল্লাহর ইলমে সে তো আগেই কাফের ছিল, যদিও অন্যদের কাছে তা এখন প্রকাশ পেয়েছে। অথবা এমনও বলা যায় যে, এখন কাফের হয়েছে এ কারণে যে, গর্ব করে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছে। খোদার নির্দেশকে 'হেকমত-মাছলাহাতের' পরিপন্থী এবং লজ্জার কারণ মনে করেছে; সেজদা করেনি কেবল এটাই শেষ নয়।

৫৬. প্রসিদ্ধ আছে যে, গাছটি ছিল গমের গাছ। কারো কারো মতে গাছটি ছিল আঙ্গুর-আনজীর বা কমলা লেবুর। আল্লাহ্ই তায়ালাই ভালো জানেন।

৫৭. কথিত আছে যে, হযরত আদম ও হাওয়া জান্নাতে বাস করতে থাকেন আর শয়তানকে তাঁর সম্মান ও স্থান হতে বের করে দেয়া হয়। এর ফলে শয়তানের হিংসা-বিদ্বেষ আরও বেড়ে যায়। অবশেষে ময়ূর এবং সাপের সাথে মিলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে এবং বিবি হাওয়াকে নানা উপায়ে এমন করে ফুসলিয়ে বিভ্রান্ত করে যে, তিনি সে গাছের ফল খান এবং হযরত আদমকেও খাওয়ান। শয়তান তাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলে যে, এ গাছের ফল খাবে, সব সময় আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। আল্লাহ তায়ালা যে এটা

খেতে নিষেধ করেছেন। আরও নানা মনগড়া ব্যাখ্যা তার সামনে উপস্থাপন করে। আগামীতে এ কাহিনী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

৫৮. এ অপরাধের শাস্তি হিসাবে হযরত আদম-হাওয়া এবং অনাগত সকল সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তোমরা জান্নাত থেকে যমীনে গিয়ে বসবাস কর। তোমরা হবে— একে অপরের দুশমন। জান্নাত শত্রুতা-অবাধ্যতার স্থান নয়। এ সবের উপযুক্ত স্থান হচ্ছে দুনিয়া। আর এ দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের এই বাধ্যতা অবাধ্যতার পরীক্ষার জন্য।

৫৯. অর্থাৎ দুনিয়ায় তোমরা চিরকাল থাকবেনা, বরং একটা নির্দিষ্ট সময় যেখানে থাকবে এবং সেখানকার জিনিষগুলো উপভোগ করবে। অতঃপর আমার সামনে তোমাদেরকে হাযির হতে হবে। আর সে নির্দিষ্ট সময়টি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত, আর গোটা বিশ্বের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত।

৬০. হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ তায়ালার শাস্তিমূলক নির্দেশ শুনে জান্নাত থেকে বের হয়ে লজ্জা আর আক্ষেপ-অনুতাপে অনবরত ক্রন্দনে নিয়োজিত থাকেন। এ অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ইলহাম দ্বারা কতিপয় বাক্য শিক্ষা দান করেন। এ বাক্য দ্বারা তাঁর তাওবা কবুল হয়। বাক্যগুলো অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে।

৬১. অর্থ এ যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদমের তাওবা তো কবুল করেছেন। কিন্তু তাকে পুনরায় জান্নাতে ফিরে যাওয়ার হুকুম দেননি। বরং দুনিয়ায় বাস করার যে হুকুম হয়েছিল, তাই বহাল রেখেছেন। কারণ, এটিই ছিল স্বভাব-আর হেকমতের দাবী। এটা স্পষ্ট যে, খলীফা করা হয়েছিল পৃথিবীর জন্য— জান্নাতের জন্য নয়। আল্লাহ তায়ালা এটাও বলে দিয়েছেন যে, যারা আমাদের অনুগত হবে, দুনিয়ায় বাস করা তাদের জন্য ক্ষতিকর হবেনা; বরং উপকারীই হবে। অবশ্য না-ফরমানদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। এ পার্থক্য আর পরীক্ষার জন্যও দুনিয়া উপযুক্ত স্থান।

৬২. কোন বিপদাপদ আসার আগে সে জন্য যে দুঃখ-আশংকা দেখা দেয় তাকে বলা হয় 'খাওফ' বা ভয় আর বিপদ আসার পর যা হয়, তাকে বলা হয় 'হুযন' বা দুঃখ। যেমন কোন রুগীর মরে যাওয়ার কথা চিন্তা করে যে দুঃখ হয়, তাকে বলা হয় খাওফ, আর মৃত্যুর পর যে আক্ষেপ হয়, তাকে বলা হয় 'হুযন'।

এ আয়াতে 'খাওফ' আর 'হুযন' নিরসন করা হয়েছে। এটা দ্বারা পার্থিব খাওফ আর হুযন অর্থ করা হলে তাঁর অর্থ হবে আমাদের হেদায়াত অনুযায়ী যারা চলবে তাদের জন্য এখানে শংকার কোন অবকাশ থাকবে না। তাদের পিতার কাছ থেকে কার্যতঃ জান্নাত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল-এজন্য তাদেরকে দুঃখিতও হতে হবেনা। কারণ, হেদায়াত প্রাপ্তরা অদূর ভবিষ্যতে আবার এটা লাভ করবে। আর এর অর্থ যদি হয় আখেরাতের খাওফ ও হুযন, তখন তার তাৎপর্য হবে, কিয়ামতে হেদায়াত প্রাপ্তদের জন্য কোন আশংকা আর

কোন দুঃখ থাকবে না। দুঃখ থাকবেনা এতো সকলেই স্বীকার করে, কিন্তু আশংকা নিরসন করায় এ ধারণা দেখা দিতে পারে যে, সেদিন ভয়তো আম্বিয়ায়ে কেরামদের মাঝেও থাকবে। এ ব্যাপারে কেউ সেদিন মুক্ত থাকবে না। কথা হচ্ছে এই যে, ভয় দুই রকম হতে পারে। কখনো ভয়ের কারণ তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়; যেমন শাহী দরবারের অপরাধী। সে বাদশাহকে ভয় করে, সেখানে ভয়ের কারণ হচ্ছে অপরাধ। আর অপরাধী পর্যন্তই এটা সীমাবদ্ধ। আর কখনো অপরাধের কারণ হয় যাকে ভয় করা হয়, তাঁর বিশেষ কোন বিষয়। যেমন কোন ব্যক্তি যদি কোন প্রতাপশালী বাদশাহ বা কোন সিংহের মুখোমুখী হয়, তখন তার ভীত হওয়ার কারণ এই নয় যে, সে বাদশাহ বা সিংহের কাছে কোন অপরাধ করেছে; বরং সেখানে ভয়ের কারণ হচ্ছে বাদশাহর প্রবল প্রতাপ আর সিংহের পাশবিকতা। বাদশাহ বা সিংহই হচ্ছে এ ভয়ের উৎস। এ আয়াত দ্বারা প্রথম প্রকার ভয় নিরসন করা হয়েছে—দ্বিতীয় প্রকারেরটি নয়।

يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىٓ

اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ

وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾ وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا

مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا

بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا

الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ

الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَاسْتَعِيْنُوْا

بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿۴۵﴾

الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۴۶﴾

রুকু ৫

৪০. হে বনী ইসরাইল[৬৩], তোমাদের ওপর আমার দেয়া নেয়ামত সমূহ তোমরা স্মরণ করো।[৬৪] (আমার বিধি বিধান মেনে চলার) যে প্রতিশ্রুতি তোমরা আমাকে দিয়েছিলে তা তোমরা পূর্ণ করো। আমিও (এর বিনিময়ে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবীর) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবো[৬৫], তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো।[৬৬]

৪১. আমি (নতুন করে মোহাম্মদের কাছে) যে কোরআন নাযিল করেছি, তার ওপর ঈমান আনো। এই কিতাব তো তোমাদের কেতাবে প্রদত্ত বানী সমূহকে স্বীকার করে[৬৭], (তাই) তোমরাই প্রথম এই কোরআনকে অস্বীকার করো না[৬৮] এবং (বৈষয়িক স্বার্থের) এই সামান্য মূল্যে আমার 'আয়াত'কে বিক্রী করো না। (এ জঘন্য অপরাধের ব্যাপারে আমার ক্রোধ থেকে) তোমরা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখো।

৪২. আর কখনো মিথ্যার আবরণ দিয়ে সত্যকে ঢেকে দিয়ো না এবং সত্যকে জেনে বুঝে লুকিয়েও রেখো না। ৪৩. তোমরা (ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে) নামায প্রতিষ্ঠা করো। যাকাত আদায় করো। (দুনিয়ায় যে সব নেকবান্দা আমার সামনে অবনত হয় সেই) রুকুকারীদের সাথে মিলে তোমরাও আমার নতি স্বীকার করো।[৬৯]

৪৪. তোমরা অন্যদের ভালো পথে চলার আদেশ করো অথচ নিজেদের (জীবনে নিজেরা তা বাস্তবায়নের কথা সম্পূর্ণ) ভুলে যাও। যদিও তোমরা আল্লাহর কিতাব পড়ো (ভালো পথে চলার আমল নিজের জীবন দিয়ে প্রথম শুরু করার এই সামান্য কথাটি) বুঝার মতো জ্ঞানও কি তোমাদের নেই?[৭০]

৪৫. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা) তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও।[৭১] (যাবতীয় হক আদায় করে) নামায প্রতিষ্ঠা করা অবশ্যই কিছুটা কঠিন কাজ। কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে (হেদায়াত মেনে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেছে) তাদের জন্যে এটা মোটেই কঠিন কিছু নয়। ৪৬. এবং যারা জানে একদিন তাদের সবাইকেই মূল মালিকের সামনাসামনি হতে হবে এবং (এ অস্থায়ী দুনিয়া ছেড়ে) একদিন সবাইকে তার কাছে ফিরে যেতে হবে।৭২ (তাদের জন্যও নামায প্রতিষ্ঠা কঠিন কিছু নয়)।

---

৬৩. প্রথমে সাধারণভাবে গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছিল, বনী আদমকে যে সব নিয়ামত দেয়া হয়েছে, তাঁরও উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন আসমান-যমীন এবং সমুদয় বস্তু তাকে দেয়াকে, অতঃপর হযরত আদম (আঃ) সৃষ্টি করে তাকে খেলাফতের দায়িত্ব দেয়া ইত্যাদি। এখন তাদের মধ্যে বিশেষ করে বনী ইসরাইলকে সম্বোধন করা হচ্ছে, সময়ে সময়ে বংশানুক্রমে তাদেরকে যেসব নিয়ামতে বিভূষিত করা হয়েছে এবং তারা যে নেয়ামতের না-শোকরী করেছে, তাও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে। কারণ, বনী আদমের মধ্যে তারা বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিল, তারা ছিল জ্ঞানের অধিকারী। কিতাব, নবুওয়্যাত আর আম্বিয়াদেরকে তারা চিনতো। তাদের পূর্ব পুরুষ হযরত ইয়াকুব (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত তাদের মধ্যে বার হাজার নবীর আগমন ঘটেছিল। সকল আরবের দৃষ্টি তাদের দিকে নিবদ্ধ ছিল যে, হযরত মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তারা স্বীকার করে কিনা। তাই তাদের প্রতিকৃতি নিয়ামতকে এখানে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে যে, লজ্জা-শরমে পড়ে ঈমান আনে কিনা। অন্যথায় অন্যরা তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে পারলে তাদের কথার কোন মূল্য দেবেনা। ইসরাইল হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নাম। এর অর্থ আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর দাস।

৬৪. তাদের মধ্যে হাজার হাজার নবী প্রেরণ করা হয়েছে। তাওরাত ইত্যাদি কিতাবও নাযিল করা হয়েছে। ফেরাউনের হাত হতে মুক্তি দিয়ে সিরিয়ায় তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তাদের জন্য 'মান্ন ও সালওয়া' নাযিল করা হয়েছে, একটি পাথর থেকে ১২টি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করা হয়েছে। এসব নিয়ামত এবং আর মোজেযা আর কাউকে দেয়া হয়নি।

৬৫. তাওরাতে এটা সাব্যস্ত হয়েছিল যে, তোমরা তাওরাতের বিধান মেনে চলবে, আমার প্রেরিত পয়গাম্বরকে মানবে এর সঙ্গী হয়ে থাকবে, এসব করলে শ্যাম দেশ (বর্তমান সিরিয়া)। তোমাদের অধিকারে থাকবে আর বণী ইসরাঈলরও এটা কবুল করে নিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা অঙ্গীকারে অটল থাকলনা। অসৎ উদ্দেশ্যে উৎকোচ গ্রহণ করে ভুল মাসআলা বলতো, সত্যকে গোপন করে নিজেদের আসর জমিয়েছিল। পয়গম্বরদের আনুগত্য তো করেইনি বরং কোন কোন পয়গম্বরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে। তাওরাতে যেখানে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর বর্ণনা ছিল, তা তারা পরিবর্তন করেছে। এ সব কারণেই এরা গোমরাহ, পথ ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

৬৬. অর্থাৎ দুনিয়ার কল্যাণ হারাবার জন্যে ভয় করবেনা।

৬৭. তাওরাতে বলা হয়েছিল যে, কোন নবী এসে তাওরাতকে সত্য বলে মেনে নিলে তোমরা তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করবে, অন্যথায় সে হবে মিথ্যা নবী। জেনে রাখা দরকার যে, ঈমান আকীদা, নবী-রসূলদের অবস্থা, পরকাল এবং আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি ব্যাপারে কোরআনের বিধান তাওরাতসহ অতীত কিতাবের অনুকূল। অবশ্য কোন কোন আদেশ নিষেধ আছে যা রহিত করা হয়েছে। কিন্তু এ রহিতকরণ বা 'নসখ' তাওহীদের পরিপন্থী নয়। 'তাসদীকের' বিরোধী হচ্ছে 'তাকযীব' যে কোন খোদায়ী কিতাবকে 'তাকযীব' বা অস্বীকার করা কুফর। কোরআন মজীদের কোন কোন আয়াতও তো মনসুখ বা রহিত করা হয়েছে। কিন্তু নাউযুবিল্লাহ! কে একে তাকযীব বা অস্বীকার বলবে?

৬৮. অর্থাৎ দেখে শুনে জেনে-বুঝে প্রথম কোরআন অস্বীকারকারীদের পর্যায়ভূক্ত হবেনা। এটা করলে কেয়ামত পর্যন্ত অস্বীকারকারীদের দোষ তোমাদের ঘাড়েই চাপবে। আর মক্কার মোনাফেকরা যে অস্বীকার করেছে, তা করেছে অজ্ঞতা-মুর্খ তার কারণে, জেনে-শুনে কখনো করেনি। এটাতে তোমরাই তো হবে প্রথম। আর এ কুফর প্রথম কুফর থেকে কঠোর।

৬৯. অর্থাৎ জামায়াতের সাথে নামায আদায় করবে। আগের কোন দ্বীনে জামায়াতের নামায ছিলনা। আর ইহুদীদের নামাযে রুকু ছিলনা। আয়াতের সার কথা এ দাঁড়ায় যে, কেবল ওপরোক্ত বিষয় গুলোই তোমাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়, বরং সকল নীতিতে শেষ নবীর আনুগত্য করবে, নামাযও আদায় করবে তাঁর তরীকা অনুযায়ী যাতে জামায়াতও থাকবে এবং রুকুও হবে।

৭০. কোন কোন ইহুদী আলেম ধমক দেখিয়ে বলত যে, দ্বীন ইসলাম তো খুব ভালো, কিন্তু নিজেরা মুসলমান হতো না। ইহুদী আলেম এবং অধিকাংশ বাহ্যদর্শীরা যেখানে সন্দেহে পতিত হয় এ ভেবে যে, আমরা যখন শরীয়তের বিধান শিক্ষা দানে ত্রুটি করিনা এবং সত্য গোপনও করিনা এখন আমাদের নবীদেরকেও সে বিধানমতে আমল করার কোন প্রয়োজন নেই। অনেকেই যখন আমাদের হেদায়াত অনুযায়ী শরীয়তের বিধান মেনে চলে তখন 'ভালো কাজের পথ প্রদর্শনকারী নিজেও যেন ভালো কাজের অনুশীলকারীর' এ নীতি অনুযায়ী চলাতো আমাদের উচিৎ। এ আয়াত উভয়কে বাতিল বলে অভিহিত করেছে। আয়াতের আসল উদ্দেশ্য এ যে, যিনি ওযায় করেন, তাকে অবশই ওয়ায অনুযায়ী আমল করতে হবে। ফাসেক ব্যক্তি কাকেও নসিহত করবেনা, ভালো কাজের উপদেশ দেবেনা— এটা আয়াতের লক্ষ্য নয়।

৭১. কিতাবধারী আলেমরা সে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও নবীর প্রতি ঈমান আনতোনা, এটার বড় কারণ ছিল পদ-মর্যাদা ও ধন-দৌলতের প্রতি ভালোবাসা। আল্লাহ তায়ালা উভয় বিধ ব্যাধির উপায় বলে দিয়েছেন। ছবর বা ধৈর্য দ্বারা অর্থ-সম্পদের অন্বেষা ও ভালোবাসা দূর হবে, আর নামায দ্বারা বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হবে এবং পদমর্যাদার প্রতি ভালোবাসা হ্রাস পাবে।

৭২. অর্থাৎ ধৈর্য এবং মনোনিবেশের সঙ্গে নামায খুবই কঠিন। কিন্তু যারা বিনয় দেখায় এবং ভয় করে, যারা সব সময় মনে করে যে, আমাদেরকে আল্লাহর সম্মুখে হাযির হতে হবে, তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে অর্থাৎ নামাযে আল্লাহর নৈকট্য এবং যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ হয় অথবা কেয়ামতের দিন হিসাব কিতাবের জন্য তাঁর সামনে হাযির হতে হবে, যারা একথা বিশ্বাস করে তাদের জন্য নামায খুবই সহজ।

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ
اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوْا
يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ
مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾
وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ
الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ
وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٤٩﴾ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ
الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ
تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ
اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا
عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَاِذْ اٰتَيْنَا

রুকু ৬

৪৭. হে বনী ইসরাইল, (পুনরায়) তোমরা আমার দেয়া সেই মহান নেয়ামতের কথা স্মরণ করো (আমার সেই নিয়ামতের মধ্যে একটি ছিলো এই যে) আমি তোমাদের অন্যান্য সৃষ্টি সমূহের ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলাম।[৭৩]

৪৮. (কিন্তু তোমরা এর সব কিছু ভুলে এ পৃথিবীকেই মনে করেছো নিজেদের স্থায়ী নিবাস; কিন্তু আসলে তা নয়)। তোমরা (শেষ বিচারের) সেই ভয়াবহ দিনকে ভয় করো, যেদিন কেউ কারো কাজে আসবে না। কারো সুপারিশও সেদিন গ্রহণ করা হবে না। কোনো মুক্তিপন নিয়ে সেদিন (খোদার আযাব থেকে) কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না। সেই কঠিন দিনে কোনো অবস্থায়ই (এই অপরাধী) ব্যক্তিদের কোনো সাহায্য করা হবে না।[৭৪]

৪৯. তোমরা সেদিনের কথা স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদের ফেরাউনের লোকজনের (গোলামী) থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম। তারা তোমাদের বিভিন্ন রকমের অত্যাচারে জর্জরিত করে রাখতো। তোমাদের মেয়েদের জীবিত রেখে তোমাদের ছেলেদের তারা হত্যা করতো।[৭৫] (একবার ভেবে দেখো) তোমাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এতে কতো বড়ো একটা পরীক্ষা ছিলো?[৭৬]

৫০. (তোমরা সে সময়ের কথাও স্মরণ করো) যখন (ফেরাউনী ষড়যন্ত্র থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করা এবং তাদের ধংস করার জন্যে) আমি সমুদ্রকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলাম এবং এভাবেই আমি তোমাদের (সমূহ মৃত্যুর হাত থেকে) বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম এবং ফেরাউন ও তার দলবলকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছি। (এর কিছুই গল্প নয়) এসবই তোমরা নিজেরা নিজেদের চোখে দেখেছো।[৭৭]

৫১. (আরো স্মরণ করো) যখন মুসাকে (আমি বিশেষ দায়িত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে) ৪০ রাতের জন্যে আমার কাছে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। (তার অবর্তমানে) অতঃপর তোমরা একটি বাছুরের পুজা শুরু করে দিলে। (ভেবে দেখো) এভাবে তোমরা কতো জঘন্য বাড়াবাড়ি করেছিলে।[৭৮]

৫২. (এ জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পরও) আমি পূনরায় তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি, (এই আশায় যে) তোমরা একদিন আমারই কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।[৭৯]

---

৭৩. ছবর আর মনোনিবেশ সহকারে এবাদতের মাধ্যমে তাকওয়া এবং ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জন করা যেহেতু কঠিন, তাই এর সহজ উপায় বলে দেয়া হচ্ছে, আর তা হচ্ছে শোকর। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সময়ে সময়ে প্রদত্ত ইনাম-

ইহসানের কথা স্মরণ করে দিয়ে তাদের অপকর্মও প্রকাশ করেন। নিয়ামত দাতার প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর আনুগত্য হৃদয় মনে প্রোথিত হওয়া এমন একটা ব্যাপার, যা মানুষ তো দূরের কথা জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও বর্তমান থাকে। পরবর্তী কয়েক রুকুতে এটা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

বিশ্ববাসীদের ওপর ফযীলত-শ্রেষ্ঠত্বের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, বনী ইসরাইলের উদ্ভবের পর থেকে কোরআন নাযিল পর্যন্ত এরা ছিল সকল দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেউ তাদের সমকক্ষ ছিল না। এরা যখন কোন নবী এবং কোরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছে, তখন তাদের এ মর্যাদাও লোভ পেয়েছে এবং 'মাগদুব' বা অভিশপ্ত এবং গোমরাহ হিসেবে অভিহিত হয়েছে। আর রসূলের অনুসারীরা লাভ করেছে বা শ্রেষ্ঠ জাতির খেতাব।

৭৪. কেউ কোন বিপদে পড়লে তার বন্ধু এটাই করে থাকে যে, প্রথমতঃ তার ওপর অর্পিত হক আদায়ে চেষ্টা করে। এটা করতে না পারলে চেষ্টা তদবীর করে তাকে বিপদ মুক্ত করতে চায়। এটাও করতে না পারলে ক্ষতিপূরণ দিয়ে ছাড়াবার চেস্টা করে। এটাও করতে না পারলে নিজের বন্ধু বান্ধবদের সহযোগিতায় গায়ের জোরে তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। এ পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, কোন ব্যক্তি আল্লাহর যতই নৈকট্য ধন্য হোক না কেন, আল্লাহর দুশমন কোন নাফরমান কাফেরকে উপরোক্ত চারটি উপায়ের কোন একটিতে-এর উপকার সাধন করতে পারেন। বনী ইসরাইলরা বলত যে, আমরা যত বড় গুনাহই করিনা কেন, আমাদের ওপর আযাব হবে না। আমাদের পয়গম্বর বাপ-দাদারা আমাদেরকে মাফ করায়ে ছাড়িয়ে নেবেন। তাদের এহেন উক্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমাদের এ ধারণা ভুল। 'আহলে সুনাত' যে শাফাআতের কথা স্বীকার করে এটা তার পরিপন্থী। অন্যান্য আয়াতেও এ শাফাআতের উল্লেখ রয়েছে।

৭৫. ফেরাউন স্বপ্ন দেখেছিল, জোতিষীরা তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে যে, বনী ইসরাইলের মাঝে এমন এক ব্যক্তির জন্ম হবে; যিনি তোমার দ্বীন-রাজত্ব নিশ্চিহ্ন করবেন। ফেরাউন নির্দেশ দেয় যে বনী ইসরাইলের পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তাকে মেরে ফেলবে আর কন্যা সন্তান জন্মালে তাকে সেবার জন্যে বেঁচে থাকতে দেবে। আল্লাহ তায়ালা মূসা (আঃ) সৃষ্টি করে বাঁচিয়ে রাখেন।

৭৬. 'বালাউন' শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছে। আরবী শব্দটির ইঙ্গিত ধরে নিলে এর অর্থ হবে বিপদ মুছীবত। নাযাতের প্রতি ইশারা হলে এর অর্থ হবে নেয়ামত। আর সমষ্টির প্রতি ইশারা হলে এর অর্থ হবে পরীক্ষা।

৭৭. অর্থাৎ হে বনী ইসরাইল, সে বিরাট নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের পূর্ব পুরুষরা ফেরাউনের ভয়ে পলায়ন করেছিল। তাদের সামনে ছিল নদী আর পেছনে ছিল ফেরাউনের বাহিনী। আমরা তোমাদেরকে আমি তা থেকে রক্ষা করেছি। আর ফেরাউন এবং এর বাহিনীকে ডুবিয়ে মেরেছি। আগামীতে এ কাহিনী বিস্তারিত আলোচিত হবে।

৭৮. আর এ কাহিনী এবং অনুগ্রহও স্মরন রাখার যোগ্য যে, আমি মূসা (আঃ) কে তাওরাত দান করার জন্য ৪০ দিনের ওয়াদা দিয়েছিলাম, আর সে তূর পাহাড়ে গমন করার পর বনী ইসরাইলরা বাছুরের পূজা শুরু করে দেয়। আর তোমরা বড়ই বে-ইনছাফ যে, বাছুরকে খোদা বানিয়ে নিয়েছিলে! এ কাহিনীটিও পরে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

৭৯. অর্থ এই যে, এহেন স্পষ্ট শেরক সত্ত্বেও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম এবং তোমাদের তাওবা মনজুর করেছিলাম এবং তোমাদেরকে ঠিক তখনই আমি ধ্বংস করে দেইনি। অথচ আমি ফেরাউনের গোষ্ঠীকে এর চেয়েও কম অপরাধের জন্যও ধ্বংস করেছিলাম। এটা করেছি এ জন্য যে, তোমরা আমার শোকর আদায় করে অনুগ্রহ স্বীকার করবে।

مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ

بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا إِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا

أَنْفُسَكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ۭ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۭ

إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ

نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ

وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ

وَالسَّلْوٰى ۭ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۭ وَمَا ظَلَمُوْنَا

وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ
الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۭ وَسَنَزِيْدُ
الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ
قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاۤءِ
بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৩. (সে কথাও স্মরণ করো, তোমাদের এই বাড়াবাড়ি ও অপরাধ থেকে বাঁচাবার জন্যে) যখন আমি মুসাকে কিতাব– ন্যায় অন্যায়ের পরখকারী ফোরকান দান করেছি, এই আশায় যে, এই কিতাব দ্বারা (তোমরা জীবন যাপনের) সহজ ও সরল পথে চলতে শুরু করবে।[৮০]

৫৪. মুসা যখন আল্লাহর বাণী নিয়ে তার নিজ লোকদের[৮১] কাছে এসে বললো (সে সময়ের কথা স্মরণ করে দেখো)ঃ হে আমার মানুষরা, তোমরা (আমার অবর্তমানে) বাছুরকে পুজো করে যে বড়ো রকমের যুলুম করেছো তার জন্যে অবিলম্বে আল্লাহর দরবারে তওবা করো। নিজেদের (জৈবিক প্রবনতাকে হত্যা ও নির্মূল করে দাও।[৮২] একমাত্র এ পন্থা অবলম্বন করার মাঝেই আল্লাহর কাছ থেকে তোমাদের জন্যে ভালাই রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তওবা কবুল করলেন।[৮৩] (কারণ) তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

৫৫. (তোমাদের কি মনে নেই যে) তোমরা যখন মুসাকে বলেছিলে, আমরা আল্লাহকে সরাসরি নিজেদের চোখে না দেখলে কখনো তার ওপর ঈমান আনবো না। (এ অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতার শাস্তি হিসেবে) মুহূর্তের মধ্যেই বজ্রের মতো এক গজব তোমাদের ওপর নিপতিত হলো। অসহায়ের মতো তোমরা তার দিকে চেয়েই থাকলে। (কিন্তু কিছুই করতে পারলেনা)।

৫৬. অতঃপর এই ভয়াবহ ধংসের পর তোমাদের আমি পূনরায় জীবন দান করলাম। (আমি এই পুনরুত্থান সম্পন্ন করলাম) এই আশায় যে, (অতপর) তোমরা (তোমাদের মূল মালিকের) কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।[৮৪]

৫৭. আমি (প্রচন্ড রোদ ও তাপ থেকে বাঁচাবার জন্যে) তোমাদের ওপর মেঘের ছায়াও দান করেছিলাম। 'মান্' এবং 'সালওয়া'[৮৫] (নামক খাবারও) তোমাদের জন্যে পাঠিয়েছিলাম। (তোমাদের বলেছিলাম) সে সব পবিত্র খাবার আমি যা তোমাদের দিয়েছি তা উপভোগ করো।[৮৬] (আমার সাথে যে আচরণ তারা করেছে তা দিয়ে মূলতঃ) তারা আমার কোনোই ক্ষতি করেনি। (এবং আমার নির্দেশ অমান্য করার ফলে) তারা বরং নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।[৮৭]

৫৮. (সে কথাও স্মরণ করো) আমি যখন তোমাদের বলেছিলাম, তোমরা এই শহরে ঢুকে পড়ো[৮৮] এবং এখানকার যাবতীয় খাবার তোমরা উপভোগ করো। (তবে) এই নগরীতে যখন প্রবেশ করবে তখন (পৃথিবীর অন্যান্য বিজয়ী জাতি সমূহের মতো হিংস্র ভাবে প্রবেশ না করে) আমার কাছে মাথা নত করে (কৃতজ্ঞতা আদায় করতে করতে) ঢুকবে।[৮৯] (নগরবাসীদের জন্যে যেমন তোমরা ক্ষমার ঘোষণা দিতে দিতে প্রবেশ করবে, তেমনি নিজেদের ভুল ক্রটির জন্য আমার কাছেও ক্ষমা চাইতে থাকবে) আমি তোমাদের এসব ভুল ক্রটির জন্যে ক্ষমা করে দেবো এবং যারা ভালো কাজ করে হামেশাই আমি তাদের পাওনার অংক বাড়িয়ে দেই।[৯০]

৫৯. কিন্তু (আমার এই সুস্পষ্ট হেদায়াত সত্বেও) যালেমরা এমন কিছু ব্যাপার রদবদল করে ফেললো যা না করার জন্যেই তাদের বলা হয়েছিলো। অতঃপর আমিও যারা আমার আদেশ অমান্য করলো তাদের ওপর আসমান থেকে গজব নাযিল করলাম। এটা ছিলো তাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের ফল।[৯১]

---

৮০. কিতাব হচ্ছে তাওরাত। শরীয়তের যেসব বিধান দ্বারা জায়েয না-জায়েয জানা যায়, তাকে বলা হয়েছে ফোরকান। অথবা ফোরকান বলা হয়েছে হযরত মূসা (আঃ) এর 'মোজেযাকে', এদিয়ে সত্য মিথ্যা এবং কাফের মোমেনের পার্থক্য হয়। অথবা তাওরাতকেই ফোরকান বলা হয়েছে, কারন, তা এমন এক কিতাব যা দ্বারা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সূচীত হয়।

৮১. কাওম এর অর্থ সে সব নির্দিষ্ট ব্যক্তি, যারা বাছুরকে সিজদা করেছিল।

৮২. অর্থাৎ যারা বাছুরকে সিজদা করেনি, তারা সেজদাকারীদেরকে হত্যা করবে। আর কারো কারো মতে বনী ইসরাইলের মধ্যে তিনটি দল ছিল। এক, যারা বাছুরের পূজা

করেনি আর অন্যদেরকেও তা করতে বারণ করেছে। দুই, যারা বাছুর পূজা করেছে। তিন, যারা নিজেরা সেজদা করেনি তবে অন্যদেরকেও বারণ করেনি। দ্বিতীয় দলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো। আর তৃতীয় দলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ওদেরকে হত্যা করো, যাতে তাদের বিরত থাকার জন্যে এটা তাওবা হয়ে যায়। প্রথম দল এ তাওবায় শরীক ছিল না। কারণ, তাদের এ তাওবার দরকার ছিল না।

৮৩. নিজেদেরকে হত্যা করা তাওবা ছিল— না তাওবার পরিশিষ্ট এ ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন, আমাদের শরীয়তেও ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর তাওবা কবুল হওয়ার জন্য নিজেকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের কাছে সোপর্দ করা জরুরী। প্রতিশোধ নেয়া অথবা ক্ষমা করে দেয়ার ইখতিয়ার তাদের।

৮৪. সে সময়ের কথাও তোমরা অবশ্যই স্মরণ করবে, যখন এতসব অনুগ্রহ সত্ত্বে তোমরা বলেছিলে যে, মূসা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করবনা যে, এটা আল্লাহর কালাম। যতক্ষণ না নিজেদের চোখে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহকে দেখে না নেবো। এর পর বিদ্যুৎ তোমাদেরকে ধ্বংস করেছিল। অতঃপর মূসা (আঃ) এর দোয়ায় আমি তোমাদেরকেও জীবিত করেছিলাম। আর এটা সে সময়ের কথা, যখন মূসা (আঃ) সত্তুর জন লোককে বাছাই করে নিয়ে গিয়েছিলেন তূর পাহাড়ে আল্লাহর কালাম শুনার জন্য। আল্লাহর কালাম শুনার পর এরা বলল, হে মূসা! পর্দার অন্তরাল থেকে শুনাকে আমরা বিশ্বাস করিনা। স্বচক্ষে খোদাকে দেখাও। অতঃপর সে ৭০ জন লোককেও বিদ্যুৎ ধ্বংস করেছিল।

৮৫. যখন ফেরাউন ডুবে মরেছিল আর বনী ইসরাইল আল্লাহর নির্দেশে সিরিয়ায় গমন করেছিল, তখন প্রন্তরে তাদের তাঁবু ছিড়ে গিয়েছিল, আর সূর্যের তাপ তাদেরকে দগ্ধ করছিল, তখন সারাদিন মেঘমালা তাদেরকে ছায়া দিতো। যখন কোন খাবার ছিল না, তখন তাদের খাওয়ার জন্য 'মান্ন' ও 'সালওয়া' নাযিল হয়। 'মান'-ধনিয়ার দানা এক প্রকার সুমিষ্টি দ্রব্য- যা কুয়াশায় আকারে ওপর থেকে পতিত হতো। বাহিনীর চতুর্দিকে জমা হতো রাত্রি বেলা। ভোরে সকলে প্রয়োজন মাফিক আহরণ করত। আর 'সালওয়া' বটের পাখীর ন্যায় এক প্রকার পাখী। বিকেলে বাহিনীর চতুর্দিকে হাজারে হাজারে জড়ো হতো। অন্ধকার হলে লোকেরা ধরে এনে কাবাব করে খেতো। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এ ছিল তাদের খাদ্য।

৮৬. অর্থাৎ এ স্বস্বাদু খাদ্য খাও। ভবিষ্যতের জন্য জমা করে রাখবেনা আর অন্য খাদ্য দ্বারা এটা পরিবর্তনের আকাংখ্যাও করবে না।

৮৭. প্রথম যুলুম করেছিল যে, এটা জমা করে রেখেছিল। এটা করার পর গোশতে পঁচন ধরে। দ্বিতীয়তঃ তারা এর পরিবর্তন চাইল যাতে মশুর, গম, শসা, পেঁয়াজ ইত্যাদি লাভ করতে পারে। এর ফলে এরা নানা ধরনের অসুবিধায় পড়ে।

৮৮. এই প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে কাতর হয়ে পড়লে এবং মান্না ও সালওয়া খেয়ে খেয়ে

অস্থির হয়ে গেলে বনী ইসরাইলকে একটা শহরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। এ শহরের নাম ছিল 'আরীহা'। আদ জাতির আমালেকা গোত্র সেখানে বসবাস করতো। কারো কারো মতে এ শহর ছিল বায়তুল মাকদেস।

৮৯. 'এ শহরের দরজা দিয়ে শুকরের সেজদা করতে করতে প্রবেশ কর'। এটা হচ্ছে দৈহিক শোকর। আর কেউ কেউ বলেন 'বিনয়ের সঙ্গে কোমর ঝুকায়ে প্রবেশ কর।'

৯০. আর 'মুখে গুনাহ্ মাফ চেয়ে চেয়ে প্রবেশ কর।' এটা হবে মৌখিক শুকরিয়া। যারা এ দুইটি কাজ করবে, আমি তাদের গুনাহ্ মাফ করে দিব। আর নেক বান্দাদের জন্য সাওয়াব বৃদ্ধি করব।

৯১. তারা এখানে এই পরিবর্তন করেছিল যে, 'হিত্তাতুন' এর পরিবর্তে বিদ্রূপ করে বলতে শুরু করল 'হিনতাতুন' আর সেজদার পরিবর্তে হামাগুড়ি দিতে শুরু করে। শহরে প্রবেশ করলে তাদের প্লেগ দেখা দেয়। এতে ৭০ হাজার ইহুদী মারা যায়।

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا

اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا

وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ

وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ

مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ

أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ

اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۚ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾

রুকু ৭

৬০. (সে কথাও তোমরা আজ স্মরণ করো) যখন মুসা তার লোকদের পানি সরবরাহের জন্যে আমার কাছে দোয়া করলো। আমি তাকে বললাম, হাতের লাঠি দিয়ে তুমি এই পাথরে আঘাত করো। সাথে সাথে আল্লাহর কুদরতে এই পাথর থেকে বারোটি পানির নহর[৯২] বইতে শুরু করলো। প্রত্যেক গোত্রই নিজ নিজ পানির নহর চিনে নিলো। (আমি তোমাদের এও বললাম যে) আমার দেয়া এই নেয়ামত সমূহ উত্তম রূপে উপভোগ করো। এসব খাও এবং পান করো, তবে কোনো অবস্থায়ই আমার যমিনে ফেৎনা ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি (করে একে কলুষিত) করো না।[৯৩]

৬১. (আরো স্মরণ করো) তোমরা যখন মুসাকে বলেছিলে, হে মুসা প্রতিদিন একই ধরনের খাবার খেয়ে আমরা অধৈর্য হয়ে পড়েছি, এবার তুমি তোমার খোদার কাছে বলে (আমাদের ভিন্ন রকমের খাবারের ব্যবস্থা করে দাও– সেই) ভিন্নধর্মী খাবার যা ভূমি উৎপন্ন করে—তরিতরকারী, পেয়াজ[৯৪], রসুন, ভুট্টা, ডাল জাতীয় খাবার (আমরা পেতে চাই)। মুসা (তোমাদের উদ্ভট কথা শুনে) বললোঃ তোমরা কি (আল্লাহর পাঠানো) এই উৎকৃষ্ট জিনিসের বদলে একটি তুচ্ছ ধরনের জিনিস পছন্দ করো?[৯৫] (যদি তোমাদের মানসিকতার এতোই অধঃপতন হয়ে থাকে) তাহলে এই লোকালয় ছেড়ে অন্য কোনো শহরে চলে যাও– যেখানে তোমাদের এসব জিনিস রয়েছে।[৯৬] (আল্লাহর ও তার নবীর ইচ্ছাকে পরোয়া না করার ফলে) শেষ পর্যন্ত অপমান, লাঞ্ছনা, অধঃপতন ও সার্বিক দুর্দশা তাদের কপালের লিখনে পরিণত হয়ে গেলো।[৯৭] এভাবেই চারদিক থেকে খোদার গযব তাদের আকঁড়ে ধরলো। (আল্লাহর এ গযব এই কারণে এসেছিল যে) এরা তখন ক্রমাগত আল্লাহর

আয়াত (নিদর্শন সমূহকে) অস্বীকার করতে থাকলো এবং আল্লাহর নবীদের অন্যায় ভাবে হত্যা করতে শুরু করলো। আর এসব কিছুই ছিলো তাদের খোদার সাথে না-ফরমানী ও খোদার আইনের সীমালংঘন করার পরিণতি।[৯৮]

---

৯২. এ কহিনীও ছিল সে প্রান্তরের। পানি না পেয়ে একটা পাথরে লাঠি নিক্ষেপ করলে ১২টি ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত হয়। আর বনী ইসরাইলের গ্রোত্রও ছিল ১২টি। কোন গোত্রে লোক বেশী, আবার কোন গোত্রে কম। প্রত্যেক গোত্রের লোক অনুপাতে এক একটি ঝর্ণা ছিল। আর এটাই ছিল ঝর্ণা চিনবার উপায়। অথবা এ নিয়ম ছিল যে, পাথরের অমুক দিক থেকে যে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে, তা হবে অমুক গোত্রের জন্য। আর যেসব সংকীর্ণ দৃষ্টির লোকেরা এসব মুজেযা অস্বীকার করে বলে 'এরাতো মানুষ নয় মানুষের পরিপন্থী ভিন্ন কিছু'। চুম্বকতো লোহাকে আকর্ষণ করবেই। এ পাথরে পানির সম্পর্ককে অস্বীকার করার কি কারণ থাকতে পারে।

৯৩. অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বললেন তোমরা মান্ন ও সালওয়া খাও এবং এ ঝর্ণার পানি পান কর দুনিয়ায় বিপর্যয় ছড়াবেনা।

৯৪. এটাও ছিল সে প্রান্তরের কাহিনী। বনী ইসরাইল আসমানী খাদ্য 'মান্ন ও সালওয়া' খেয়ে খেয়ে তাদের বিস্বাদ লাগলে বলত শুরু করে যে, এক ধরনের খাদ্যে আমরা আর সইতে পারবনা, আমাদের জন্য চাই যমিনে উৎপন্ন তরি-তরকারী শাকসব্জী।

৯৫. অর্থাৎ 'মান্ন ও সালওয়া' সব দিক থেকে উত্তম। এর পরিবর্তে তোমরা রসূন পিয়াজ চাও?

৯৬. তোমাদের মন চাইলে অন্য কোন শহরে যাও। তোমাদের কাংখীত বস্তু সেখানে পাবে। অতঃপর তাই হয়েছে।

৯৭. যিল্লতী এই যে, সর্বদা এরা মুসলমান আর খৃষ্টানদের শাসনাধীন এবং প্রজা ছিল। এদের কাছে অর্থ থাকলে কি হবে, শাসক কর্তৃত্ব থেকে এরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। অথচ শাসন-কর্তৃত্বই ছিল ইজ্জতের কারণ। আর দারিদ্র্য এই যে, প্রথমত ইহুদীদের অর্থ সম্পদের স্বল্পতা ছিল। আর কারো কাছে অর্থ-সম্পদ থাকলেও শাসক মহলের ভয়ে নিজেদেরকে এরা অভাবী বলে প্রকাশ করত। অতি লোভ আর কার্পণ্যের জন্য অভাবীদের চেয়েও এদের নিকৃষ্ট মনে হতো। সত্য বটে, অর্থ টাকা-পয়সায় ঐশ্বর্য হয়না— ঐশ্বর্য হচ্ছে অন্তরের জিনিষ। তাই টাকা-কড়ির মালিক হয়েও তারা অভাবীই ছিল। আল্লাহ তায়ালা যে ইজ্জত-মর্যাদা দিয়েছিলেন, তা থেকে ফিরে গিয়ে এরা ক্রোধ অভিশাপ আর গযবে নিপতিত হয়েছিল।

৯৮. অর্থাৎ এ যিল্লতী, দারিদ্র্য আর খোদার গযবে নিপতিত হওয়ার কারণ ছিল তাদের কুফরী এবং নবীদেরকে হত্যা করা। আর এর ফলে এরা বিধি-বিধান অস্বীকার করে শরীয়তের সীমা লংঘন করে।

إِنَّ

الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿৬২﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطُّورَ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿৬৩﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ج فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿৬৪﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ
الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا
قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿৬৫﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا
خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿৬৬﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ط قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا
هُزُوًا ط قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿৬৭﴾

রুকু ৮

৬২. (জাতি ও সম্প্রদায়ের পরিচিতির ওপর কারো মুক্তি নির্ভর করে না। আসল কথা হচ্ছে) মুসলিম (জাতির লোক) হোক- খৃষ্টান, ইহুদী কিংবা সাবী হোক, যে কেউই আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, ঈমান আনে পরকালে এবং (সে বিশ্বাস মোতাবেক) নিজের জীবনে ভালো কাজ করে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদের অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন এবং এসব লোকের কোনো দিনই ভয় পাওয়ার যেমন কোনো কারণ তেমনি উৎকণ্ঠা ও চিন্তারও তাদের কোনো দরকার নেই।[৯৯]

৬৩. (সেদিনের কথা স্মরণ করো) যখন গোটা তুর পাহাড়কে আমি তোমাদের ওপর তুলে ধরে তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলাম, (আরো বলেছিলাম) যে কিতাব তোমাদে আমি দান করেছি, তা শক্ত ভাবে আঁকড়ে ধরো, এর আদেশ নিষেধ সমূহ ভালো ভাবে ইয়াদ করে নাও, (এ উপায়েই) তোমরা হয়তো (শয়তানের প্রতারণা থেকে) নিজেদের বাঁচাতে পারবে।[১০০]

৬৪. (কিন্তু) অতঃপর তোমরা (আমাকে দেয়া সে ওয়াদার কোনো পরোয়া না করে একতরফাভাবে তা থেকে) ফিরে গেলে (তোমাদের এই আচরণের কারণে) আমার নেয়ামত ও অনুদান যদি তোমাদের প্রতি বন্ধ হয়ে যেতো তা হলে তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যেতে![১০১]

৬৫. তোমাদের তো ভালো করেই (নিজেদের কথা) জানা আছে, এরা কি ভাবে শনিবারের (ধর্মীয় গুরুত্ব সম্বলিত আল্লাহর) নিয়ম লঘংন করেছে। (তাদের লজ্জা ও অপমানকর পরিণামও তোমরা দেখেছো)। আমি (শুধু তখন এটুকু) বলেছি, যাও এবার তোমাদের সবাই বানর হয়ে যাও। (এবং এভাবে সারা জীবন শুধু মানুষের) ধিক্কার ও তিরস্কারই তোমরা পেতে থাকবে।[১০২]

৬৬. (আমার বিধান লংঘন করার এ শাস্তির ঘটনাটা) যেমন সেকালের অন্যান্য মানুষদের জন্যে ছিলো একটি উৎকৃষ্ট উদারহণ তেমনি পরবর্তী কালের মানুষ যারা আল্লাহকে ভয় করেছে তাদের জন্যেও এ ঘটনাটা ছিলো একটি জীবন্ত শিক্ষা।[১০৩]

৬৭. (সেদিনের কথাও স্মরণ করো) যখন মুসা তার জাতিকে বললো, আল্লাহ্ তায়ালা তার নামে তোমাদের একটি গাভী[১০৪] কোরবাণী করার আদেশ দিচ্ছেন। তারা (কোরবাণীর কথা শুনে) বললো (মুসা) তুমি কি আমাদের সাথে তামাশা করছো?[১০৫] মুসা বললো, আমি কামনা করি, ঠাট্টা বিদ্রুপ করার মতো এই অযথা মুর্খতার কাজ থেকে আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন![১০৬]

৯৯. অর্থাৎ কোন বিশেষ জিনিসের ওপর নির্ভরশীল নয় বরং ঈমান আনা হচ্ছে শর্ত, আর তার সাথে সৎ কাজ করতে হবে। এটা যাদের ভাগ্যে জুটবে তারা সাওয়াব পাবে। এটা বলা হয়েছে এ জন্য যে পয়গম্বরের বংশধর বলে বনী ইসরাইল গর্ব বোধ করতো। এরা বলত যে, আমরা সব দিক দিয়ে আল্লাহর কাছে উত্তম।

ইহুদী বলা হয় হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মতকে, আর নাছারা— খৃষ্টান বলা হয় হযরত ঈসা (আঃ) এর উম্মতকে। 'সাবেঈন' একটি ফের্কার নাম, যারা প্রত্যেক দ্বীন থেকে ভালো মনে করে কিছু কিছু গ্রহণ করেছে। এরা হযরত ইব্রাহীম(আঃ) কে মানে এবং ফেরেশতাদেরও পূজা করে এবং যবুরও পাঠ করে, কাবার দিকে মুখ করে নামাযও পড়ে।

১০০. কথিত আছে যে, তাওরাত নাযিল হলে বনী ইসরাইলরা দুষ্টামী করে বলে যে, তাওরাতের বিধানতো বড় মুশকিল এবং খুব ভারী। এটা মেনে চলা আমাদের সাধ্যের অতীত। তখন আল্লাহ তায়ালা একটি পাহাড়কে নির্দেশ করলেন, পাহাড় তাদের মাথার ওপর এসে দাঁড়ালো আর তাদের সম্মুখে আগুন জ্বলে উঠল। সুতরাং অবাধ্যতার অবকাশ বাকী থাকলোনা। তাই বাধ্য হয়ে তাওরাতের বিধান তাদের মেনে নিতে হলো। মাথার ওপর পাহাড় ঠেকায়ে তাওরাত মানতে বাধ্য করা, এটাতো সুস্পষ্ট পীড়াপিড়ি এবং জবরদস্তী এবং বিধান মেনে চলার নিয়মের পরিপন্থী। কারণ, বিধান মেনে চলার মূল হচ্ছে, ইচ্ছা ও স্বাধীনতা। আর এটাতো স্বাধীনতার পরিপন্থী। এ আপত্তির জবাব এ যে, দ্বীন মেনে নেয়ার জন্য এদের কখনো জবরদস্তী ছিলনা। দ্বীন তো বনী ইসরাইলরা আগেই কবুল করেছিল। আর হযরত মূসা (আঃ) এর কাছে বারবার দাবী জানাতো যে, বিধান সম্বলিত কোন কিতাব আমাদেরকে এনে দাও, আমরা তদনুযায়ী আমল করব। আর এ মর্মে এরা চুক্তিও করেছিল। কিন্তু তাদেরকে তাওরাত দেয়া হলে চুক্তি ভঙ্গের জন্যে তারা উঠে পড়ে লাগে। তাই মাথার ওপর পাহাড় দাঁড় করানো হয়েছিল চুক্তি ভঙ্গ রোধ করার জন্য— দ্বীন কবুল করার জন্য নয়।

১০১. অর্থাৎ চুক্তি আর প্রতিজ্ঞা করার পর তারা ফিরে গেলে। আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে একেবারে তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে অর্থাৎ তখনই ধ্বংস হয়ে যেতে। অথবা এর অর্থ এ যে, তাওবা-ইস্তিগপার করলেও এবং শেষ নবীর আনুগত্য করলেও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করা হতোনা?

১০২. বনী ইসরাইলকে তাওরাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে, শনিবার দিনটি বিশেষ করে এবাদাতের জন্য নির্ধারিত। এ দিন মাছ শিকার করবেনা। এরা প্রতারণা আর ছল-চাতুরীর দ্বারা এ দিন মাছ শিকার শুরু করলে আল্লাহ তায়ালা এদের আকৃতি পরিবর্তন করে বানরের আকৃতি করে দেন। আকৃতি পরিবর্তন হলেও এদের মধ্যে মানুষের শোধ-বোধ বর্তমান ছিল। একে অপরকে দেখে কাঁদতো। কিন্তু কথা বলতে পারতো না। তিন দিন পরে সকলে মরে যায়। ঘটনাটি ঘটেছিল হযরত দাউদ (আঃ) এর যমানায়। পরে সূরা আ'রাফে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১০৩. অর্থাৎ এ ঘটনা এবং এ শাস্তিকে আমি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের জন্য ভয়-ভীতি এবং শিক্ষণীয় বিষয় করেছিলাম। অর্থাৎ যারা এ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে ছিল এবং যারা পরবর্তীতে আসবে, সকলের জন্য একে শিক্ষণীয় বিষয় করে দিলাম। অথবা যে সব জনপদ শহরের আগে-পাছে বর্তমান ছিল— সকলের জন্য শিক্ষণীয় হল।

১০৪. অর্থাৎ সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন বনী ইসরাইলের মধ্যে 'আমীল' নামে জনৈক ব্যক্তিকে খুন করা হল এবং তার হত্যাকারীকে জানা যায়নি, তখন হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আল্লাহর নির্দেশ এ যে, তোমরা একটা গাভী জবাই করে এর একটা অংশ মৃত ব্যক্তির ওপর নিক্ষেপ কর দেখবে সে গাভীই হত্যাকারী সম্পর্কে বলে দেবে। এমনিভাবে আল্লাহ তা'য়ালা সে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেন এবং সে হত্যাকারী সম্পর্কে বলে দেয় যে, এর ওয়ারিসরাই অর্থের লোভে তাকে হত্যা করেছে।

১০৫. কারণ, এটা কখনো দেখেনি, শুনেনি যে, গাভীর একাংশ অপরাংশের ওপর নিক্ষেপ করলে মৃত ব্যক্তি জীবিত হতে পারে।

১০৬. অর্থাৎ ঠাট্টাবিদ্রূপ করা আহমক জাহেলের কাজ। আর তাও আবার শরীয়তের বিধানের ব্যাপারে। পয়গম্বরের পক্ষে এটা কিছুতেই সম্ভব নয়।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ

إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۖ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ

فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا

مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا

تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ

إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۖ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ

وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْـٰٔنَ

جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

৬৮. অতঃপর তারা (মুসাকে) বললো, তুমি আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের জন্যে বিস্তারিত জেনে নাও; (যে গাভী কোরবাণীর কথা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন), তা কেমন হতে হবে? মুসা বললো, আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে কোরবাণীর গাভীটি বৃদ্ধাও হবে না, আবার একেবারে বাচ্চাও হবে না। তাকে হতে হবে মধ্যম বয়সের। (আর বিতর্কে সময় নষ্ট না করে) আল্লাহ পাক যা নির্দেশ দিয়েছেন তাই এখন পালন করো।

৬৯. তারা (সোজা রাস্তায় এলো না) মুসাকে বললো, তুমি তোমার খোদাকে জিজ্ঞাসা করে নাও, সে গাভীটির রং কেমন হবে? মুসা বললো, (আল্লাহর আদেশ হচ্ছে) কোরবাণীর গাভীটি অবশ্যই হবে আকর্ষণীয় হলুদ রংয়ের, তাও আবার এমন হতে হবে যেন মানুষ তার দিকে তাকিয়ে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারে।

৭০. (এই ব্যাখার পরও তারা সন্তুষ্ট হলো না) আবার বললো– মুসা, তোমার খোদাকে (বিস্তারিত) জিজ্ঞাসা করে নাও যে, আসলে কি ধরনের গাভীর কোরবাণী তিনি চান।[১০৯] (আমরা সঠিক গাভী বাছাই করতে রীতিমতো সংকটে পড়ে গেছি, কারণ) আমাদের কাছে সব গাভী দেখতে একই ধরনের মনে হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় এবার আমরা (তার ইপ্সীত গাভীর সন্ধান করে) সঠিক পথে চলতে পারবো।

৭১. মুসা বললো (তাহলে শুনো) আল্লাহর (ইপ্সীত কোরবাণীর) গাভীটি হবে এমন যাকে দিয়ে কোনো কাজ করানো হয় না, চাষাবাদের কাজেও তাকে ব্যাবহার করা হয় না, যমিনে পানি সেচের কাজেও তাকে লাগানো হয় না। (অর্থাৎ তা হবে) সম্পূর্ণ নিখুঁত ও ত্রুটি মুক্ত।[১১০] (একথা শুনে) তারা বললো, (এতোক্ষণে) তুমি আমাদের সত্য কথাটা বললে। অতঃপর তারা (এই ধরনের একটি গাভী খুঁজে বার করে) কোরবাণী করলো, যদিও ইতিপূর্বে মনেই হয়নি যে, তারা এই কোরবাণী[১১১] করবে।

---

১০৭. অর্থাৎ এর বয়স কত, এর অবস্থা কি, জোয়ান-তাগড়া, না বৃদ্ধ?

১০৮. অর্থাৎ সে গাভীটি জবাই কর।

১০৯. অর্থাৎ স্পষ্ট করে বলে দাও যে, সেই গাভীটি কি ধরনের এবং কোন্ কাজের।

১১০. অর্থাৎ এর অঙ্গে কোন খুঁত নেই আর এর রঙ্গে অন্য কোন রঙ্গের মিশ্রণ নেই, বরং তা হবে একেবারেই হলুদ রঙ্গের।

১১১. সে গাভী ছিল এক ব্যক্তির, যে তাকে মায়ের অধিক স্নেহমত করতো এবং অত্যন্ত ভাগ্যবান ছিল। এর কাছে থেকে গাভীটি ক্রয় করা হয় এত বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে যে, এর চামড়ায় যত পরিমাণ স্বর্ণ ধরতো এজন্য তত মূল্য তাদের দিতে হয়েছে, অতঃপর গাভীটি জবাই করা হয়। এত বিরাট অংকের বিনিময়ে গাভী ক্রয় করে জবাই করবে, এটা ছিল অচিন্তনীয়।

وَإِذْ

قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ

تَكْتُمُونَ (৭২) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ

الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (৭৩) ثُمَّ قَسَتْ

قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ

قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا

لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (৭৪)

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ

يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ج
وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ
بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ط
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

রুকু ৯

৭২. (তোমাদের সেই ঘটনাও স্মরণ থাকার কথা) যখন তোমরা একজন লোককে হত্যা করেছিলে। (এবং পরে যখন হত্যাকারীকে পাওয়া গেলোনা তখন) তোমরা একে অপরের ওপর হত্যার অভিযোগ আরোপ করতে শুরু করলে। (অথচ তোমরা জানো যে) আল্লাহ্ তায়ালা সেই বিষয়কে মানুষের সামনে এনে উপস্থাপিত করেন যাকে তোমরা লুকাবার চেষ্টা করো।[১১২]

৭৩. সেই মৃত ব্যক্তির হত্যাকারীকে খুঁজে বার করার জন্যে (আমি আদেশ দিলাম যে, কোরবাণী করা গাভীর) শরীরের একাংশ[১১৩] দিয়ে তোমরা এই দেহে আঘাত করো। এভাবেই আল্লাহ্ তায়ালা মৃত্য ব্যক্তিকে জীবন দান করবেন। এবং (এই মৃত ব্যক্তিকে পূনরায় জীবন দান করে তার মুখ দিয়ে তার হত্যাকারীর নাম ধাম শুনিয়ে) তিনি তোমাদের কাছে তার (সর্বজ্ঞানের) নিদর্শন সমূহ তুলে ধরেন। আল্লাহ্ তায়ালা আশা করেন যে, তোমরা (এর মাধ্যমে) সব কিছু সঠিক ভাবে অনুধাবন করবে।[১১৪]

৭৪. (কিন্তু এতা বড়ো একটি নিদর্শন দেখানোর পরও) তোমাদের মন পূনরায় কঠিন হয়ে গেলো।[১১৫] এ যেন শক্ত পাথর, (মাঝে মাঝে মনে হয়) পাথরের চাইতেও (বুঝি) বেশী কঠিন। কঠিন পাথর থেকেও মাঝে মাঝে পানির ধারা প্রবাহিত হয়ে নদীতে রূপান্তরিত হয়, আবার কোনো কোনো পাথর বিদীর্ণ হয়ে ফেটে যায় এবং তা থেকে পানির ফোয়ারা নেমে আসে। তাছাড়া এই কঠিন পাথরও (সময় সময়) খোদার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। (প্রকাশ্য দিবালোকে মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করে তার মুখ থেকে তার হত্যাকারীর নাম বলানোর পরও

তোমাদের কঠিন অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগেনি, তোমাদের কার্যকলাপেও কোনো পরিবর্তন আসেনি)। অথচ তোমরা জানো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে মোটেই অনবহিত নন।[১১৬]

৭৫. (হে ঈমানদাররা) এর পরও কি তোমরা মনে মনে এই আশা পোষণ করো যে, (প্রতিবেশী এই ইহুদী খৃষ্টান সহ) এরা তোমাদের নবীর ওপর ঈমান আনবে? অথচ এদের একাংশ (যুগ যুগ ধরে) আল্লাহর কিতাব শুনে আসছে এবং জেনে বুঝেই তারা তাকে বিকৃত করছে। এরা ভালো করেই একথা গুলো জানে[১১৭] (যে, খোদার কিতাবের কোন্ কোন্ অংশকে এরা নিজেদের স্বার্থে বিকৃত করেছে)।

৭৬. (এ সব লোকের অবস্থা হচ্ছে) এরা যখন মুসলমানদের পাশে আসে তখন বলে, আমরাও (এসব কথা) মানি, কিন্তু এরাই আবার যখন গোপনে নিজেরা নিজেদের সাথে কথা বলে, তখন বলে– তোমরা কি মুসলমানদের কাছে সে সব কথা প্রকাশ করে দাও, যা আল্লাহ তায়ালা (মোহাম্মদের আগমন ও তার নবুয়ত সম্পর্কে) আগেই আমাদের কাছে বলে রেখেছেন। (খবরদার তোমরা এমনটি কখনো করো না) তাহলে মুসলমানরা একদিন খোদার দরবারে এটাকেই তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে। তোমরা কি এটুকু কথাও বুঝতে পারনা?[১১৮]

---

১১২. অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব পুরুষরা আমীলকে হত্যা করেছিল, অতঃপর একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিল। আর তোমরা যে জিনিষটি গোপন করছিলে অর্থাৎ নিজেদের ঈমানের দুর্বলতা এবং হত্যাকারীর নাম আল্লাহ তা'য়ালা তা প্রকাশ করতে চান।

১১৩. অর্থাৎ গাভীর এক টুকরা নিক্ষেপ করলে খোদার হুকুমে সে জীবিত হয় হত্যাকারীর নাম বলে দেয়। সে ছিল মৃত ব্যক্তির ভ্রাতুস্পুত্র। অর্থের লোভে বাচ্চাকে জঙ্গলে নিয়ে খুন করে। এর নাম বলেই সে পুনরায় মরে যায়।

১১৪. অর্থাৎ এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা এর অসীম শক্তি বলে কেয়ামতের দিন মৃত ব্যক্তিদেরকে জীবিত করবেন এবং তাঁর অসীম শক্তির নিদর্শন দেখাবেন, যতে তোমরা চিন্তা করতে এবং বুঝতে পার যে, আল্লাহ তা'য়ালা মৃতদেরকে জীবিত করতে পারেন।

১১৫. অর্থাৎ 'আমীল'-এর জীবিত হয়ে উঠার পর, এ কথার তাৎপর্য এই যে, এহেন অসীম নিদর্শন দেখাবার পরও তোমাদের অন্তর নরম হয়নি।

১১৬. কোন কোন পাথর দ্বারা বিরাট কল্যাণ সাধিত হয় যেমন, তা থেকে নহর এবং প্রচুর পরিমাণে পানি প্রবাহিত হয়। আর কোন কোন পাথর থেকে অল্প পানি প্রবাহিত হয়। আর প্রথম প্রকার পাথর দ্বারা কম কল্যাণ সাধিত হয়। আর কোন কোন পাথর দ্বারা কোন উপকার সাধিত না হলেও তাতে কিছু ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়াতো বর্তমান থাকে। কিংবা

তাদের অন্তর এ তিন ধরনের পাথর থেকে আরও কঠোর আরও কঠিন যে, তাতে কারো কোন কল্যাণ থাকে না, তাতে থাকেনা কোন ভালো বিষয়। হে ইয়াহুদী জাতি, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের আসল বিষয় সম্পর্কে বে-খবর নন।

১১৭. 'ফারীকুন'-অর্থ হচ্ছে সেই দল যারা মূসা (আঃ) এর সঙ্গে আল্লাহর কালাম শুনার জন্য তূর পাহাড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে তারা এ পরিবর্তন করেছে যে, বনী ইসরাইলকে বলেছিল, কালামের শেষে আমরা এ কথাও শুনেছি যে, সম্ভব হলে এসব বিধান মেনে চলবে, আর না পারলে তা ত্যাগ করার ইখতিয়ারও তোমাদের রয়েছে।' আর কারো কারো মতে কালামে ইলাহীর অর্থ-তাওরাত। আর তাতে পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে। শব্দ এবং অর্থের পরিবর্তন করা। কখনো এরা রসূলের পরিচয় পরিবর্তন করেছে আর এখনো 'রজম' বা পাথর নিক্ষেপে হত্যার আয়াত পরিবর্তন করেছে ইত্যাদি।

১১৮. ইহুদীদের মধ্যে যারা মোনাফেক ছিল, এরা খোশামদ হিসাবে কোন নবীর কথা মুসলমানদের কাছে বলতো আর অন্যরা তাদেরকে এ জন্য তিরস্কার করতো যে, তোমাদের নিজেদের কিতাবের সনদ তাদের হাতে কেন দাও। তোমরা কি জাননা যে, মুসলমানরা তোমাদের পরওয়ার দেগারের সম্মুখে তোমাদের বলে দেয়া এই বিনয় দ্বারা স্বয়ং তোমাদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের করবে যে, এরা শেষ নবীকে সত্য জেনেও এর প্রতি ঈমান আনেনি। তখন তোমাদেরকে লা-জবাব হতে হবে।

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ

وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتٰبَ

إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ

يَكْتُبُونَ الْكِتٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ

عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ط فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا

كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُوا

لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ۭ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ

عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ

عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٠﴾ بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً

وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـــَٔتُهٗ فَاُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨٢﴾

৭৭. এরা কি একথাটা জানে না যে, (খোদার কিতাবের যা কিছু) এরা গোপন করে রাখে (আবার নিজেদের স্বার্থে তারা) সে সব কথা প্রকাশ করে তা সবই আল্লাহ পাকের জানা।[১১৯]

৭৮. (বাকী থাকে) এদের আরেকটি দল– যারা একান্ত মুর্খ, অশিক্ষিত। এরা খোদার কিতাব, খোদার হেদায়াত ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই জানে না। (কিতাব যেন এদের কাছে) একটি নিছক ধ্যান ধারনা পুস্তক মাত্র।এরা কখনো (সঠিক পথের সন্ধান পায় না। কারণ) এরা সব সময়ই অমূলক ও মিথ্যা (ধ্যান ধারণা) দিয়ে পরিচালিত হয়।[১২০]

৭৯. সে সব লোক চূড়ান্ত ধ্বংসের কবলে নিমজ্জিত- যারা নিজেরা নিজেদের হাত দিয়ে কতিপয় বিধি লেখে নেয়, (তারপর দুনিয়ার সামনে তা পেশ করে) বলে এগুলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ (শরীয়তের বিধান।) পার্থিব দুনিয়ার সামান্য কিছু স্বার্থ কেনার জন্যেই তারা এ হীন কাজে নিয়োজিত হয়। (তাদের জানা উচিৎ একদিন যেমন তাদের হাতের) এই মিথ্যা লিখন তাদের ধংসের কারণ হবে তেমনি এ লেখনি দিয়ে যা কিছু (তারা পার্থিব স্বার্থ) হাসিল করেছে তাও তাদের ধংসের কারণ হবে।[১২১]

৮০. এ সব (নির্বোধ) লোকেরা বলে, জাহান্নামের আগুন কখনোই আমাদের স্পর্শ করবে না। যদি করেও, তাহলে তা হবে সীমিত কয়েকটা দিনের জন্যে

মাত্র।[১২২] তুমি (হে মোহাম্মদ) তাদের জিজ্ঞাসা করো যে, তোমাদের এ দাবীর সমর্থনে তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছো? (যদি তিনি এ ধরনের কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়েই থাকেন তাহলে আমরা সবাই জানি যে) আল্লাহ তায়ালা কখনো কোন প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না, নাকি তোমরা জেনে বুঝেই আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন সব দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বলে বেড়াচ্ছো?

৮১. (কেন আল্লাহর আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে না?[১২৩] ন্যায় ও ইনসাফের দাবী হচ্ছে) যে কোনো ব্যক্তিই অপরাধ করবে, সেই ব্যক্তিকেই তার অপরাধ[১২৪], পরিণামে (সে ব্যক্তি যেই হোক না কেন) জাহান্নামের বাসিন্দা তাদের হতেই হবে এবং সেটাই হবে তার চির দিনের ঠিকানা।

৮২. আবার যারাই আল্লাহ ও তার রাসূলের ওপর) ঈমান আনবে এবং (সেই ঈমানের ব্যবহারিক দাবী অনুযায়ী) নিজেদের জীবনে ভালো কাজ করবে, তারা বেহেশতবাসী হবে, সেটাই হবে তাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা।

---

১১৯. অর্থাৎ তাদের প্রকাশ্য অ-প্রকাশ্য সব বিষয়তো আল্লাহর জানা আছে। তাদের কিতাবের সকল দলীল-প্রমাণের খবর মুসলমানদেরকে তিনি স্থানে স্থানে অবহিতও করেছেন। এরা আয়াতের রজম গোপন করেছিল কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তা প্রকাশ করে তাদেরকে অপদস্ত করেছেন। এটা হচ্ছে তাদের আলেমদের অবস্থা, যার জ্ঞান বুদ্ধি এবং খোদায়ী কিতাবের দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল।

১২০. আর যা হালাল সে ব্যাপারে, তাদের তো কোন খবর নাই যে, তাওরাতে কি লিখিত আছে। কিন্তু তাদের কাছে থেকে মিথ্যা কথা শুনে শুনে কিছু আকাংখ্যা করে বসেছে যেমন, ইহুদীরা ছাড়া অন্য কেউ বেহেশতে যাবে না, আমাদের পূর্ব পুরুষরা আমাদেরকে অবশ্যই মাফ করিয়ে নেবেন। এটা তাদের ভিত্তিহীন চিন্তাধারা, যার কোন দলীল তাদের কাছে নেই।

১২১. এরা হচ্ছে সেই সব লোক, যারা সে সব অজ্ঞ জাহেলদের অনুরূপ কথাবার্তা লিখে তা খোদার বলে চালিয়ে দেয়, যেমন তাওরাতে লেখা ছিল যে, কোন নবী হবেন সুন্দর, ঘন চুল, কালো চোখ, মধ্যম আকৃতির এবং তাঁর গায়েব রং হবে গন্ধমের মতো। কিন্তু এরা এটা পরিবর্তন করে লিখেছিল— দীর্ঘাকৃতির নীল চক্ষু এবং এর চুল হবে সোজা। উদ্দেশ্য ছিল এ যে, যাতে সাধারন লোক তাকে বিশ্বাস না করে এবং তাদের পার্থিব স্বার্থে ব্যাঘাত না ঘটে।

১২২. কেউ বলেন সাত দিন, আর কেউ বলেন ৪০ দিন, এ পরিমান সময় বাছুরের পূজা করেছিল। আর কেউ বলেন, চল্লিশ বছর, যত দিন তীহ ময়দানে উদভ্রান্তের মতো এরা ঘুরপাক খাচ্ছিল। আর কারো মতে প্রত্যেক ব্যক্তি যতদিন দুনিয়ায় জীবিত ছিল।

১২৩. অর্থাৎ এটা ঠিক নয় যে, ইহুদীরা চিরতরে দোযখে থাকবেনা, অর্থাৎ জান্নাত জাহান্নামে চিরকাল বাস করার যে মূলনীতি পরে বর্ণিত হয়েছে, তদনুযায়ী সকলের সঙ্গে একই আচরণ করা হবে। ইহুদীরা এর ব্যতিক্রম হবেনা।

১২৪. পাপ কাউকে আচ্ছন্ন করে নেয়-এর অর্থ এ যে, পাপও কারো ওপর এমনভাবে জেঁকে বসে যে, কোন দিনই সে এর প্রভাব মুক্ত হতে পারেনা, এমনকি অন্তরে ঈমান অবশিষ্ট থাকলেও উল্লেখিত পরিবেষ্টন বিঘ্নিত হবেনা। এখন এ অবস্থা কেবল কাফেরদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য হতে পারে।

وَإِذْ

أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيْ إِسْرَاءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللّٰهَ قف

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى

وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ

مُّعْرِضُوْنَ ﴿٨٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَاءَكُمْ

وَلَا تُخْرِجُوْنَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ

وَأَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تَقْتُلُوْنَ أَنْفُسَكُمْ

وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز تَظٰهَرُوْنَ

عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَإِنْ يَّأْتُوْكُمْ

أُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ

فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ

فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى

اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۸۵﴾

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ز

فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿۸۶﴾

রুকু ১০

৮৩. যখন আমি বনী ইসরাইলদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, (সে কথা স্মরণ করো। তাদের আমি বলেছি) তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কারো এবাদাত করবে না, মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম মিসকিনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। মানুষদের সাথে (যখন কথা বলবে তখন বিনয়ের সাথে) সুন্দর ভাবে কথা বলবে। (ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে) নামায প্রতিষ্ঠা করবে। যাকাত প্রদান করবে। (তোমাদের কি মনে নেই যে) অতপর তোমাদের মধ্যে সামান্য কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া অধিকাংশরাই (সেদিন আমার সাথে কৃত এই প্রতিশ্রুতি থেকে) ফিরে এসেছো। এবং এই প্রতিশ্রুতি থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো[১২৫]

৮৪. তোমাদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতিও নিয়েছিলাম, তোমরা একে অপরকে হত্যা করবে না এবং নিজেদের লোকদেরকে নিজেরাই ঘর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করবে না। এই কথাগুলো স্বীকার করেই তোমরা অতপর আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। (একথা প্রমাণের জন্যে অন্য কোথাও যাবার দরকার নেই), তোমরা নিজেরাই এর সাক্ষী।[১২৬]

৮৫. (অথচ তোমাদের পরবর্তী কার্যকলাপ কেমন ধরনের ছিলো তাও তোমাদের জানা। আমাকে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে) তারপর এই তোমরাই সমাজে রক্তপাত, খুন খারাবী শুরু করছো। আপন জনদের এক দলকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত করে দিচ্ছো অন্যায় এবং যুলুমের কাজে[১২৭] যালেমদের প্রতিরোধ করার বদলে তোমরা তাদের সহযোগিতা করছো। (ব্যাপক হানাহানি যুদ্ধ বিগ্রহের সময়) তোমাদের আপন কোনো লোক যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এলে তোমরা তাদের কাছ থেকে মুক্তিপন আদায় করছো। (অথচ এ যুদ্ধের মূল কারণ এই) আপন লোকদের তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করাই ছিলো (তোমাদের প্রথম অন্যায় এবং খোদাকে দেয়া প্রতিশ্রুতির মারাত্মক লংঘন, এবং) সম্পূর্ণতঃ অন্যায় কাজ। তাহলে তোমরা কি তোমাদের ওপর নাযিল করা আল্লাহর কিতাবের একাংশকে বিশ্বাস করো এবং আরেক অংশকে করো অবিশ্বাস?[১২৮] (সাবধান) কখনো যদি কোনো (জাতি কিংবা ব্যক্তি খোদার কিতাবের একাশংকে অবহেলা করার) এই আচরণ করে (তাদের ভাগ্যলিখন বড়োই মন্দ)। তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কি হবে যে, পার্থিব জীবনে তারা অগণিত লাঞ্চনা ও অপমানের শিকারে পরিণত হবে। (দুনিয়ার এই শাস্তিই শেষ কথা নয়, খোদার কিতাবের এই অবমাননার জন্যে) তাদেরকে পরকালেও কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। (আল্লাহকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করো না) তোমরা প্রতিনিয়ত যা করছো, আল্লাহ তায়ালা এর সব কিছুই জানেন।[১২৯]

৮৬. (বস্তুতঃপক্ষে) এ জাতীয় লোকেরাই আখেরাতের চিরন্তন জীবনের পাওনার বিনিময়ে দুনিয়ার এ অস্থায়ী জীবনের স্বার্থকে খরিদ করে নিয়েছে। (এরা যেহেতু পরকালের আযাবকে বিশ্বাস করেনি) তাই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের আযাবকে কিঞ্চিৎ পরিমানও হালকা করা হবে না। কোনো দিক থেকে তাদের জন্যে সেদিন কোনো সাহায্যও পাওয়া যাবে না।[১৩০]

---

১২৫. অর্থাৎ খোদার বিধান এড়িয়ে চলা তো তোমাদের অভ্যাসে বরং প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে।

১২৬. অর্থাৎ নিজের জাতিকে হত্যা করবেনা, তাদেরকে দেশান্তরিতও করবে না।

১২৭. মদীনায় ইহুদীদের দুটি দল ছিল, এক বনু কোরায়যা দ্বিতীয় যনু নযীর। এরা পরস্পরে সংঘাতে লিপ্ত হতো। আর মদীনায় মোশরেকদেরও দুইটি দল ছিল। এক আওস, দ্বিতীয় খাযরাজ। এরাও ছিল পরস্পরে শত্রু। বনু কোরায়যা ছিল আওস এর অনুকূল, আর বনু নযীরের বন্ধুত্ব ছিল খায়রাজ এর সঙ্গে। যুদ্ধে প্রতিটি দল নিজেদের অনুকূল এবং বন্ধুদের সাহায্য-সহায়তা করতো। এক দল অপর দলের ওপর বিজয় লাভ করলে দূর্বলকে

দেশান্তরিত করতো। তাদের বাড়ী ঘর ধ্বংস করতো। আর কেউ গ্রেফতার হয়ে এলে সকলে মিলে টাকা কড়ি দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করতো। পরবর্তী আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে।

১২৮. অর্থাৎ নিজেদের লোক অন্যদের হাতে আটকা পড়লে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য প্রস্তুত এবং নিজেরা স্বয়ং তাদেরকে অতীষ্ট করতে এমনকি গলা কাটতেও উদ্যত। খোদার হুকুম মেনে চললে উভয় ক্ষেত্রেই তা মানবে।

১২৯. এমন করে অর্থাৎ কোন বিধান মানে আর কোন বিধান অস্বীকার করে। কারণ, ঈমানকে খন্ড বিখন্ড করা সম্ভব নয়। সুতরাং কোন বিধান অস্বীকারকারী হবে নিরেট কাফের। কেবল কোন বিধান মেনে চললেও কোন ঈমান নছীব হবেনা, ভাগ্যে জুটবে না। এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট জানা যায় যে, কোন ব্যক্তি শরীয়তের কোন বিধান মেনে চললেও এর স্বভাব প্রকৃতি বা স্বার্থের পরিপন্থী বিধানসমূহ মানতে ত্রুটি করলে কোন কল্যাণই সাধিত হবেনা।

১৩০. অর্থাৎ আখেরাতের মোকাবিলায় দুনিয়ার স্বার্থ গ্রহণ করেছে কারণ, যাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল, পার্থিব বিষয় চিন্তা করে তা মেনে চলেছে কিন্তু আল্লাহর বিধানের কোন পরোওয়া করেনি এমন লোকদের জন্য আল্লাহর কাছে কে সুপারিশ-সাহায্য করতে পারে?

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ
بِالرُّسُلِ ز وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ
بِرُوحِ الْقُدُسِ ط أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا
لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ز
وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ط بَلْ لَعَنَهُمُ
اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَٰبٌ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ لا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ

يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا
كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِئْسَمَا
اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا
أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ
فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾

রুকু ১১

৮৭. আমি মুসার কাছে কিতাব পাঠিয়েছি, অতঃপর একে একে আরো অনেক নবীই পাঠিয়েছি। পরিশেষে (বাপ ছাড়া মায়ের গর্ভে সন্তান পয়দা হওয়ার মতো অস্বাভাবিক ও) সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে আমি মরিয়ম পুত্র ইসাকেও তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি। (এবং আমার পাঠানো বাণী সমূহ ও তার বাহক জিব্রাইলের) পবিত্র আত্মার[১৩১] মাধ্যমে তাকে আমি সাহায্য করেছি। (এ সব নবীর সাথে তোমাদের আচরণ তো ছিলো এই যে) যখনি আল্লাহর কোনো নবী নতুন কোনো হেদায়াত নিয়ে আসতো তা তোমাদের মনোপুত না হলে (কিংবা তোমাদের ইচ্ছা ও প্রবণতার বিরোধী হলে সাথে সাথেই তোমরা অহংকারের বশবর্তী হয়ে) তাদের অস্বীকার করেছো। (শুধু অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হওনি) এদের কাউকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছো[১৩২], আবার এদের একদলকে তোমরা (বিনা কারণে) হত্যাও করেছো।[১৩৩]

৮৮. তারা বলে, আমাদের মন (ও এর যাবতীয় দরজা) বন্ধ হয়ে আছে। আসল কথা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করার কারণে তাদের ওপর তার পক্ষ থেকে গজব নাযিল হয়েছে। এ জন্যে তাদের সামান্য পরিমান লোকই আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকে।[১৩৪]

৮৯. অতঃপর সত্যিই একদিন তাদের কাছে আল্লাহর এই কিতাব নাযিল হলো। (সে দিন তারা এই কিতাবের সাথে কি ধরনের আচরণ করলো তাও ভেবে দেখার বিষয়। (অথচ) এই কিতাব তাদের কাছে মজুত সব পুরাতন কিতাবের সত্যতাও স্বীকার করে। তাছাড়া এই কিতাব নাযিল হওয়ার পূর্বে তারাই (তদানিন্তন সমাজে) অন্যান্য কাফেরদের ওপর বিজয়ী হওয়ার আশায় (এই কিতাব ও তার বাহকের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ও) প্রার্থনা করেছে। কিন্তু আজ যখন সত্যিই এই কিতাব তাদের কাছে এসে হাযির হলো তখন সাথে সাথেই তা তারা চিনতে পারলো। (কারণ এর বিবরণ সমূহ তাদের কিতাবে মজুত ছিলো)। এই কিতাবকে তারা (আজ আল্লাহর কিতাব বলে মেনে নিতে) অস্বীকার করলো। জেনে বুঝে যারা আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করে তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত নাযিল হবে[১৩৫] (এটাই স্বাভাবিক)।

৯০. কতো নিকৃষ্টতম একটি বস্তুর বিনিময়ে তারা তাদের নিজেদের মন প্রাণকে বিক্রয় করে দিয়েছে (তা কি তারা ভেবে দেখেছে?) শুধু এই জিদ ও গোড়ামীর বশবর্তী হয়ে তারা আমার নাযিল করা বিধান অস্বীকার করেছে যে, আমি আমার বান্দাহদের যাকে চাই তাকেই (আমার বিধান গ্রহণে জন্যে আমারই অনুগ্রহে নবী হিসেবে) মনোনীত করি।[১৩৬] (ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে নতুন নবীর জন্ম না হওয়ায় তারা আল্লাহর নবী ও তার হেদায়াতকে জেনে শুনে অস্বীকার করলো)। ফলে তাদের ওপর আল্লাহর গজব এবার দ্বিগুণ হারে পতিত হলো।[১৩৭] আর (খোদার নবী ও তার কিতাবকে) যারা অস্বীকার করে তাদের জন্যে কঠিন অপমানজনক শাস্তি অপেক্ষা করছে। [১৩৮]

---

১৩১. মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা, জন্মান্ধী এবং কুষ্ঠ রুগী ইত্যাদিকে ভালো করা, গায়েবের কথা বলা— এসব ছিল হযরত ঈসা (আঃ) এর স্পষ্ট মু'জেযা আর 'রুহুল কুদুস' বলা হয় হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে, যিনি সব সময় এর সাথে থাকতেন। অথবা 'রুহুল কুদুস' বলতে 'ইসমে আযম' বা মহান নামকে বুঝানো হয়— যার বরকতে তিনি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন?

১৩২. যেমন হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

১৩৩. যেমন হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) কে হত্যা করেছে।

১৩৪. ইহুদীরা নিজেদের প্রশংসায় বলতো যে, আমাদের অন্তর 'গিলাফের' মধ্যে হেফাযতে আছে। আমাদের দ্বীন ব্যতিতও অন্য কিছুই আমাদেরকে প্রভাবিত করে না। কারো চাটুকারিতা, বাকচবাতুর্থ, ধমক দেয়া বা প্রতারণায় আমরা কারো আনুগত্য

করিনা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, এরা একেবারেই মিথ্যাবাদী বরং তাদের মিথ্যার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে অভিশপ্ত এবং এর রহমত থেকে বিতাড়িত করেছেন। এ কারণে, যে এরা কিছুতেই সত্য দ্বীন মানেনা। তাদের মধ্যে খুব কম লোকই ঈমানের দৌলতে ধন্য হয়।

১৩৫. তাদের কাছে যে কিতাব এসেছে তা ফোরকানের আগে যে কিতাব ছিল তা, আর তা হচ্ছে তাওরাত। কোরআন নাযিলের আগে ইহুদীরা কাফেরদের কাছে পরাজিত হলে দোয়া করতো। শেষ নবী এবং তার ওপর নাযিল হওয়া কিতাবের বরকতে আমাদেরকে কাফেরদের ওপর বিজয় দান কর। কিন্তু হযরত মোহাম্মদের জন্ম হলে এবং সকল নিদর্শন দেখেও অস্বীকার করে। এভাবেই লানত অভিশাপের ভাগী হয়।

১৩৬. অথাৎ যে জিনিসের পরিবর্তে এরা নিজেদের বিক্রয় করেছে, তা হচ্ছে কুফর অমান্য ও অস্বীকার। কোরআন মজিদকে অস্বীকার। আর এটা করছে তারা নিছক হঠকারিতা ও ঈর্ষার কারণে।

১৩৭. এক গযব তো এই যে কোরআন ও তাদের নিজেদের কিতাবকে অস্বীকার করে কাফের হয়েছে। দ্বিতীয়ত নিছক ঈর্ষা ও হঠকারিতার কারণে যুগের নবীরও বিরোধিতা করেছে।

১৩৮. এ থেকে জানা যায় যে অপদস্ত করার জন্য সব সময়ই শাস্তি দেয়া হয়না বরং মুসলমানদেরকে তাদের গুনাহ খাতার জন্য যে শাস্তি দেয়া হবে, তা দেয়া হবে তাদের গুনাহ থেকে মাফ করার জন্য, লাঞ্ছিত করার জন্যই নয়। অবশ্য কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য শাস্তি দেয়া হবে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا

وَرَاءَهُ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ

فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم

مُّؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ

اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَاِذْ
اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ
اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَ
اُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا
يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٣﴾ قُلْ اِنْ
كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ
دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯১. যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তার ওপর ঈমান আনো, তারা বলে, আমরা তো শুধূ সে সব কিছুর ওপরই শুধু ঈমান আনি, যা আমাদের (বনী ইসরাইল জাতির) ওপর নাযিল করা হয়েছে। এই (বংশ ও জাতির) সীমার বাইরে আল্লাহ তায়ালা আর যা কিছু নাযিল করেছেন তা সবই তারা অস্বীকার করে। (অথচ যে হেদায়াতকে তারা অস্বীকার করে) তা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে এবং তা তাদের (বনী ইসরাইলদের) কাছে নাযিল করা আল্লাহর কথাগুলোকে পূর্ণ সমর্থন ও সত্য বলে স্বীকার করে।[১৩৯] (এর পর তো তা অস্বীকার করার আর যুক্তিসংগত কারণ থাকার কথা নয়। আসলে এটা হচ্ছে তাদের মিথ্যা অজুহাত। এবার) তাদের জিজ্ঞাসা করো, তোমরা যদি আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাসের দাবীই করো তাহলে (এই কিতাব নিয়ে যারা তোমাদের জাতির মধ্যে এসেছিলো) সে সব আল্লাহর নবীদের তোমরা কেন হত্যা করেছিলে?[১৪০]

৯২. (আবস্থা তো ছিলো এই যে) তোমাদের কাছে কতিপয় সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে মুসা (নবী হয়ে) এসেছিলো (তার সামান্য কয়দিনের অনুপস্থিতিতে) তোমরা একটি বাছুর পূজা শুরু করে দিলে। (একবারও ভেবে দেখেছো যে) কতো বড়ো যুলুম তোমরা (আল্লাহর সাথে) করেছো?[১৪১]

৯৩. (সে কথাও স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদের ওপর তুর পাহাড় তুলে ধরে তোমাদের কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলাম। সেদিন আমি তোমাদের বলেছিলামঃ আমার প্রদত্ত এই হেদায়াতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং ভালোভাবে আমার কথাগুলো শুনো। (আমার এই আদেশের জবাবে তোমরা (মুখে) বললে– হাঁ, আমরা তোমার কথা শুনে নিয়েছি, (অথচ বাস্তব জীবনে তা অবজ্ঞা করে বললে) আমরা তা মানতে পারবো না। আসলে সেই বাছুর পূজা তখনো তাদের মনোপ্রাণকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করে রেখেছিলো- যাকে খোদার জায়গায় বসিয়ে তারা প্রকাশ্যে তার সাথে কুফরী করেছে।[১৪২] (তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো, তোমাদের দাবী অনুযায়ী) যদি তোমরা সত্যিই মুমীন হও তাহলে বলতে পারো এটা কোন্ ধরনের ঈমান– যা একজন ব্যক্তিকে এ ধরনের (খারাপ) কাজের আদেশ দেয়?

৯৪. যদি তোমরা মনে করো যে, পরকালের যাবতীয় আরাম আয়েশ, সুখ শান্তি শুধু তোমাদের জন্যেই নির্দৃষ্ট, পৃথিবীর আর কোনো মানুষের এতে কোনো পাওনা নেই, তাহলে তো (পরকালের সেই পাওনা পাবার জন্যে) তোমরা খুব তাড়াতাড়িই মৃত্যু কামনা করো। অবশ্য তোমরা যদি নিজেদের দাবীতে সত্যিকার ভাবে সত্যবাদী হও![১৪৩]

---

১৩৯. যা আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করেছেন অর্থাৎ ইঞ্জীল ও কোরআন, আর যা নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি তা হচ্ছে তাওরাত। অর্থ এ দাঁড়িয়েছে যে, তাওরাত ব্যতীত অন্যান্য কিতাব অস্বীকার করে এবং ইঞ্জীল ও কোরআনকে মানে না। অথচঃ সে কিতাবগুলোও সত্য এবং তাওরাতের সত্যতা স্বীকার করে।

১৪০. তাদেরকে বল যে, তোমরা তাওরাতের প্রতি ঈমান রাখলে নবীদেরকে কেন হত্যা করেছিলে? কারণ, তাওরাতে তো এ বিধান ছিল যে, তাওরাতের সত্যতা প্রতিপন্নকারী যে নবী আসবেন, তাঁর সাহায্য সহযোগিতা করবে এবং তাঁর প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে। আর হত্যা করেছে এমন সব নবীকে যারা অতীতে অতিক্রান্ত হয়েছেন যেমন হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)। যারা তাওরাতের বিধান মেনে চলতেন এবং তা প্রবর্তনের জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন। এরা যে তাওরাতকে মানতেন তাতো বোকারাও অস্বীকার করতে পারে না। কারণ 'আগে' শব্দ থেকেই এটা জানা যায়।

১৪১. অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) যাঁর শরীয়তের ওপর তোমরা প্রতিষ্ঠিত আর এ শরীয়তের জন্য তোমরা অন্যান্য সত্য শরীয়তকে অস্বীকার করছ। যিনি নিজে তোমাদেরকে সুস্পষ্ট মুজেযা দেখিয়েছিলেন (যেমন; লাঠি, উজ্জ্বল হাত এবং নদী বিদীর্ন করা ইত্যাদি) কিন্তু তিনি যখন কয়েক দিনের জন্য তূর পাহাড়ে গমন করলেন, এ অল্প সময়ের মধ্যে তোমরা বাছুরকে খোদা বানায়ে নিলে। অথচঃ মূসা (আঃ) নবী হিসাবে

তখনো জীবিত ছিলেন। তখন মূসা (আঃ) এবং তাঁর শরীয়তের প্রতি তোমাদের ঈমান কোথায় ছিল? আর শেষ নবীর প্রতি হিংষা বিদ্বেষ এবং ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে আজ হযরত মূসার (আঃ) শরীয়তকে এমনভাবে আঁকড়ে রয়েছ যে, তার সামনে খোদার হুকুমও মানছ না। সন্দেহ নেই যে, তোমরা যালেম এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও যালেম। হযরত মূসার (আঃ) প্রতি বনী ইসরাইলের এ ছিল আচরণ। তাওরাত সম্পর্কে তাদের ঈমানের যে অবস্থা ছিল, পরে সে সম্পর্কেই বলা হচ্ছে।

১৪২. অর্থাৎ তাওরাতের বিধান মেনে চলার যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল, পরিপূর্ণ সাহস আর দৃঢ়তার সঙ্গে কঠোর ভাবে তা পালন কর। যেহেতু মাথার ওপর পাহাড় ঝুলানো ছিল, প্রাণের ভয়ে মুখে উচ্চারণ করেছিলে 'তাওরাতের বিধান আমরা শুনে নিয়েছি কিন্তু মনে মনে বা পরে বলেছিল আমরা বিধান মানিনা। আর এর কারণ ছিল এই যে, প্রতিমা পূজা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল, তাদের কুফরীর কারণে সে কালীমা তাদের অন্তর থেকে সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়নি, বরং ধীরে ধীরে তা বেড়েছে।

১৪৩. ইহুদীরা বলতো যে, আমরা ব্যতীত অন্য কেউ জান্নাতে যাবে না, আর আমাদেরকে আযাব, দেয়া হবেনা। আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, তোমরা নিশ্চিত জান্নাতী হলে মৃত্যুকে কেন ভয় পাও?

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ

عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝٩٥ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى

حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ

اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ

يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝٩٦ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا

لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا

بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٩٧ مَنْ كَانَ

عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ

فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ

بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿٩٩﴾ اَوَكُلَّمَا

عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ

لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾

৯৫. (তুমি অবশ্যই জেনে রাখো হে মোহাম্মদ) এরা কখনোই নিজেদের মৃত্যু কামনা করবে না, (যুগ যুগ ধরে আল্লাহর কালামের সাথে যে আচরণ এরা করেছে) এবং নিজেদের হাত দিয়ে নিজেদের (পরবর্তী জীবনের জন্যে) এরা যা (পাপ) অর্জন করেছে (তার ফলাফল জানার পর) সে জীবনের কামনা এরা কিছুতেই করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা এই যালেমদের (মনের অবস্থাসহ) এদের সার্বিক অবস্থা ভালো করেই জানেন।

৯৬. (সত্যি কথা হচ্ছে এই যে) এদেরকেই তুমি দেখতে পাবে বেঁচে থাকার ব্যাপারে এরা সব চাইতে বেশী লোভী। আল্লাহ তায়ালার সাথে যারা শেরক করে ক্ষেত্র বিশেষে এই (বনী ইসরাইলের) লোকেরা তাদের চাইতেও এক কদম অগ্রসর। এদের প্রত্যেক ব্যক্তিই কোনো রকমে হাজার বছর ধরে জীবিত থাকতে চায়। কিন্তু যতো দীর্ঘ জীবনই এরা বেঁচে থাকনা কেন তা কখনো এসব লোককে আল্লাহর অবশ্যম্ভাবী আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা এ জাতীয় লোকদের যাবতীয় কাজকর্মের পুংখানুপুংখু পর্যবেক্ষণ করেন।[১৪৪]

রুকু ১২

৯৭. (হে মোহাম্মদ) তাদের তুমি বলো কে সে ব্যক্তি যে জিব্রাইলের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে পারে? অথচ জিব্রাইল আল্লাহর মহান অনুগ্রহে তার কাছ থেকে আল্লাহর কিতাব ও তার বাণী সমূহ তোমাদের (নবীর) অন্তঃকরণে নাযিল করে দেয়, তা এমন এক কালাম যা (আগের নবীদের ওপর) নাযিল হওয়া কিতাব সমূহের সত্যতা স্বীকার করে (সর্বোপরি) এ হচ্ছে (দুনিয়ার জীবন যাপন করার)

এক সুপষ্ট পথনির্দেশ (যারা তা মেনে চলে তাদের জন্যে সর্বদিক থেকে) মুক্তির সুসংবাদ বহনকারী।

৯৮. যারাই আল্লাহর সাথে শত্রুতা করে, শত্রুতা করে (তার বাণী বাহক) ফেরেশতা ও নবী রাসুলের সাথে, (তারা একদিন অবশ্যই এটা জানতে পারবে যে, আল্লাহকে অস্বীকারকারী এই ব্যক্তিরাই হচ্ছে স্বযং আল্লাহ তায়ালার (সব চাইতে বড়ো) দুশমন।[১৪৫]

৯৯. অবশ্যই আমি তোমার কাছে এমন সব নিদর্শন পাঠিয়েছি যা (সব ধরনের তথ্য ও তত্বের) সঠিক বর্ণনাকারী বটে। স্বার্থাণেষী কতিপয় পাপী ব্যক্তি ছাড়া এসব নিদর্শন সমূহকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না।

১০০. (তাদের গোটা ইতিহাসে এমন ঘটনা কি বহুবার ঘটেনি যে) তারা যখনি আল্লাহর সাথে কোনো ওয়াদা করেছে তখনই তা ভংগ করেছে। (আসলে) এদের এক বিরাট অংশ কোনো দিনই (সত্যিকার অর্থে) ঈমান আনেনি।[১৪৬]

---

১৪৪. অর্থাৎ ইহুদীরা এমন সব খারাপ কাজ করেছে যে, তারা মৃত্যুকে অত্যন্ত ভয় পায়। তাদের আশংকা যে, মরলে তো কোন কল্যাণ দেখা যাচ্ছে না। এমন কি বেঁচে থাকার জন্য মোশরেকদের চাইতেও এরা বেশী আকাংখী। এতে তাদের দাবীর অসারতা ভালোভাবে প্রতিপন্ন হয়।

১৪৫. ইহুদীরা বলত, জিবরাইল ফেরেস্তা যে নবীর কাছে ওহী বহন করে আনে সে হচ্ছে আমাদের দুশমন। আমাদের মহান পূর্ব পুরুষরা এর হাতে অনেক কষ্ট পেয়েছে। জিবরাইলের পরিবর্তে অন্য কোন ফেরেস্তা ওহী বহন করে আনলে আমরা মোহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি ঈমান আনবে। এর জবাবে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, ফেরেশতারা যা কিছু করেন, আল্লাহর হুকুমেই করেন। নিজেদের পক্ষ থেকে কিছুই করেন না। যারা ফেরেশতাদের দুশমন, আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাদের দুশমন।

১৪৬. আল্লাহ রাসূল বা অন্য কারো সঙ্গে কোন অঙ্গীকার করলে তাদেরই একদল তা লংঘন করে এটা তাদের পুরাতন অভ্যাস। বরং অনেক ইহুদী এমনও আছে যাদের যাদের তাওরাতের প্রতি ঈমান নেই। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে এমন লোকদের ভয় কিসের?

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ

مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ ق كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ

لَا يَعْلَمُونَ (১০১) وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ

سُلَيْمَانَ ج وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا

يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ق وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ

بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ط وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ

يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ط فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا

مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ط وَمَا هُم بِضَارِّينَ

بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ

وَلَا يَنفَعُهُمْ ط وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي

الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ قف وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ط

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (১০২) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ

عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ ط لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (১০৩)

১০১. যখনি তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নবী এসে তাদের কাছে মজুত আগের কিতাবের (ও তার মধ্যে বর্ণিত পরবর্তী নবীর আগমনের ব্যাপারে যে সব ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে তার) সত্যতা স্বীকার ও সমর্থন করে, তখনি সেই আগের কিতাবের ধারকদের একটি দল সেই (পূর্ববর্তী কিতাবের) কথাগুলোর প্রতি এমন ভাবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা শুরু করে যে, মনে হয় তারা এ ব্যাপারে (কোনো দিনই বুঝি) কিছু জানতো না।[১৪৭]

১০২. (আল্লাহর কিতাবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেই এরা ক্ষান্ত হয়নি) যাদুমন্ত্রের এমন কিছু জিনিসও এরা মানতে শুরু করলো যা শয়তান সোলায়মান (নবীর) রাজত্বের সময় সমাজে চালু করলো[১৪৮] (সত্যি কথা হচ্ছে) সোলায়মান (তা কখনো আল্লাহ বিরোধী কাজে ব্যবহার করে) আল্লাহকে অস্বীকার করেনি। আল্লাহকে অস্বীকার করেছে সে সব অভিশপ্ত শয়তান যারা (আল্লাহর হেদায়াতের বদলে) মানুষকে যাদুমন্ত্র শিক্ষা দিয়েছে। (যাদু-পাগল মানুষদের পরীক্ষার জন্য ও তাদের এ বিদ্যার কুফল বর্ণনার উদ্দেশ্যে) আল্লাহ্ যে দু'জন ফেরেশতাকে বাবেল শহরে পাঠিয়েছেন) সেই দুই ফেরেশতা যখন এই বিষয়ের শিক্ষা দিতো (প্রথমেই) তারা একথা বলে দিতো যে তাদের এ কাজ নিছক (এক বিশেষ উদ্দেশের জন্যে) আল্লাহর দেয়া পরীক্ষা মাত্র। কোনো অবস্থায়ই যেন কেউ (এ বিদ্যা দিয়ে) আল্লাহ এবং তার কিতাবকে অস্বীকার না করে। (ফেরেশতাদের এই কড়া সতর্কবাণী সত্ত্বেও) শয়তানরা তাদের কাছ থেকে এমন কিছু বিদ্যা শিখে নিয়েছিলো যা দিয়ে (সমাজ কাঠামোর মূল ভিত্তি পারিবারিক জীবনকে ভেংগে দেয়ার জন্যে) এরা স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে দিতো। যদিও আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো দিনই শয়তান ও তার অনুসারীরা কারো সামান্যতম ক্ষতিও সাধন করতে পারবে না। এতে তাদের কোনো উপকার হয়নি। এরা ভালো করে জানতো যে, (শ্রম ও অর্থ দিয়ে) যে বিদ্যা তারা কিনে নিয়েছে তা পরকালের (আসল বাজারে) কোনো কাজেই আসবে না। যদি তারা এ কথাটা জানতে পারতো যে, (যাদু) বিদ্যার বিনিময়ে তারা নিজেদের জীবনকে (ও তার সব ভবিষ্যতর সম্ভাবনাকে) বিক্রয় করে দিয়েছে, তা কতো নিকৃষ্ট! (পরকালীন স্থায়ী জীবনের তুলনায় তা কতো হীন!)

১০৩. (বরং এসব অহেতুক কাজের পরিবর্তে) তারা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান আনতো এবং ঈমানের (দাবী মোতাবেক সর্বত্র) তাকে ভয় করে জীবন যাপন করতো তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা উৎকৃষ্টতম পুরস্কার পেতে পারতো। (কতো ভালো হতো), যদি তারা এই কথায় সত্যতা অনুধাবন করতে পারতো![১৪৯]

১৪৭. রাসূল এর অর্থ হযরত মোহাম্মদ (সঃ)। এবং কিতাবুল্লাহর অর্থ তাওরাত অর্থাৎ যখন হযরত মোহাম্মদের আগমন ঘটেছে অথচ তিনি তাওরাতসহ আগের কিতাব সমূহ মানতেন। এখন ইহুদীদেরই একটি দল তাওরাতকে এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে, যেন এরা জানেই না যে, এটা কি কিতাব, কী বিধান এটাতে রয়েছে। সুতরাং নিজেদের কিতাবের প্রতি যখন তাদের ঈমান নেই এখন অন্য কিতাব সম্পর্কে তাদের কাছে থেকে কি আশা করা যেতে পারে।

১৪৮. অর্থাৎ এ আহাম্মকরা তো আল্লাহর কিতাবকে পেছনে নিক্ষেপ করেছে এবং শয়তানের কাছে থেকে যাদু শিক্ষা করে আর এরই পেছনে পড়েছে।

১৪৯. সার কথা এই যে, ইহুদীরা নিজেদের দ্বীন এবং কিতাবের জ্ঞান ত্যাগ করে যাদু বিদ্যার পেছনে পড়ে যায়। আর যাদু বিদ্যা দু'ভাবে মানুষের মধে বিস্তার লাভ করে। এক, হযরত সুলাইমান (আঃ) এর সময়ে যেহেতু জ্বিন এবং মানুষ এক সঙ্গে মিলে মিশে বসবাস করতো। তখন মানুষ জ্বিনের কাছে থেকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা করে। এরা বলে যে, আমরা হযরত সুলাইমান (আঃ) এর কাছে থেকে এ বিদ্যা শিখেছি। এ বিদ্যার জোরেই তিনি মানুষ এবং জ্বিনের ওপর কর্তৃত্ব করতেন। আলাহ তায়ালা বলেন যে, এটা কুফরীর কাজ-সুলাইমান (আঃ) এর কাজ নয়। দুই, হারুত মারুত-এর মাধ্যমে এটা বিস্তার লাভ করে। এরা ছিলেন দুজন ফেরেস্তা। মানুষের ছবি ধরে এরা 'বাবেল' শহরে বসবাস করতেন। এরা যাদু বিদ্যা জানতেন। এ বিদ্যা শেখার জন্য তাদের কাছে কেউ এলে প্রথমে বারণ করতেন এ বলে যে, এতে ঈমান নষ্ট হবে। এর পরও বিরত না হলে তারা তা শিখাতেন। এদের মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করাই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা বললেন যে, এমন বিদ্যা দ্বারা পরকালের কোন উপকার হবে না। বরং আগাগোড়া ক্ষতিই হবে। আর দুনিয়াতেও এটা দ্বারা অকল্যাণ হবে। খোদার হুকুম ছাড়া কিছুই হয় না। দ্বীনের এলেম আর কিতাবের জ্ঞান শিখলে আল্লাহর কাছে সাওয়াব লাভ করবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ

وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝١٠٥ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١٠٦

রুকু ১৩

১০৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা (নবীর সামনে ধৃষ্টতাপূর্ণ অজুহাত হিসেবে ইহুদী ও মোনাফিকদের মতো) কখনো একথা বলোনা যে, এবার 'আমাদের কথা শুনো' বরং (যদি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই চাও তাহলে) বলো 'আমাদের দিকে লক্ষ্য করো'। তোমরা গভীর মনোযোগের সাথে তার কথা শুনো, এবং (মনে রাখবে) যারা (আমার কিতাব আমার নবীর কথা) অমান্য করে (এবং তার সামনে ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করে) তাদের জন্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।[১৫০]

১০৫. (আসলে) এই আহলে কিতাব-ইহুদী খৃষ্টান কিংবা যারা খোদার সাথে প্রকাশ্য শেরক করে এরা কেউই এটা পছন্দ করে না যে, তোমার কাছে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে কোনো রকম ভালো কিছু আসুক। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ যাকেই চান তাকেই তার এই মহান কাজের জন্যে বিশেষভাবে বেছে নেন। (এটা তার মেহেরবাণী) তার দয়া অসীম ও অনন্ত।[১৫১]

১০৬. আমি যখনই (আগে নাযিল করা) কোনো আয়াত কিংবা তার বিধি বাতিল করে দেই বা বিশেষ কোনো কারণে তা ভুলিয়ে দেই, তখন তার জায়গায় তার চাইতে উৎকৃষ্ট ও উন্নত মানের কোনো আয়াত এনে হাযির করি, কিংবা (ক্ষেত্র বিশেষে) তার মতো একই ধরনের আয়াতই উপস্থাপন করি। তোমরা কি জানোনা যে, (কোন্ সময় কোন্ প্রকার আদেশ নিষেধ উপস্থাপন করতে হবে এ ব্যাপারে) আমার জ্ঞানের ক্ষমতা সবার চাইতে বেশী।[১৫২]

---

১৫০. ইহুদীরা এসে রাসুলের মজলিসে বসতো। তাঁর কথা শুনতো। কোন কথা ভালোভাবে না শুনলে আবার শুনার জন্য বলতো, 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন' যে আল্লাহ তা'য়ালা নিষেধ করে বলেন যে, তোমরা এটা উচ্চারণ করবেনা। এমন যদি বলতেই হয় তবে বলবে 'আমাদের প্রতি নযর দিন।' শুরু থেকেই মনোযোগ দিয়ে শুনলে বারবার জিজ্ঞাসা করারই দরকার পড়েনা। ইহুদীরা কুমতলবে শব্দটি উচ্চারণ করতো। একটু

চেপে শব্দটি উচ্চারণ করলে অন্য কিছু হয়ে যায়, আর তখন এর অর্থ হয় 'আমাদের রাখাল'। ইহুদীদের জবানে আহাম্মককেও এভাবে ডাকা হতো।

১৫১. অর্থাৎ কাফের, তাছাড়া ইহুদী হোক বা মক্কার মোশারেক, এরা তোমার ওপর কোরআন নাযিলকে কিছুতেই পছন্দ করে না, বরং এরা আকাংখ্যা করেছিল, শেষ নবীর আবির্ভাব হোক বনী ইসরাইলের মধ্যে। আর মক্কার মোশারেকরা চায় যে, তাদের মধ্যেই কোন নবীর আগমন ঘটুক। কিন্তু এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে, অক্ষর জ্ঞান শূন্য লোকদের মধ্যে শেষ নবীকে তিনি প্রেরণ করেছেন।

১৫২. ইহুদীরা এ দোষও আরোপ করতো যে, তোমাদের কিতাবে কোন কোন আয়াত রহিত হয়। এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকলে সেটা কোন দোষের কারণে এখন রহিত হয়েছে। পূর্ব থেকে সে দোষ সম্পর্কে আল্লাহ কি খবর রাখতেন না? এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, আগের কথায়ও দোষ ছিলনা, পরের কথায়ও দোষ নেই। কিন্তু হাকিম সময়োপযোগী মনে করে-যা ইচ্ছা হুকুম করেন। তখন তাই উপযোগী ছিল, আর এখন একেই উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا

لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾ أَمْ تُرِيدُونَ

أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ

يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ

إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ

مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ

اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَأَقِيمُوا

الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۭ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٠﴾

১০৭. তোমরা কি জানোনা যে, আসমান জমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব ও এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নির্দিষ্ট। (অতএব) তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনে বন্ধু ও (বিপদ আপদে) সাহায্য করার কেউই নেই।[১৫৩]

১০৮. তোমরাও কি তোমাদের নবীর কাছে সেই ধরনের (উদ্ভট) দাবী (অবান্তর) প্রশ্ন করতে চাও—যেমনি করেছিলো তোমাদের আগে বনী ইসরাইলের লোকেরা তাদের নবী মুসার কাছে। (কোনো জাতি কিংবা কোনো ব্যক্তি যদি নবীদের সাথে এসব আচরণ করে) ঈমানকে কুফরীর সাথে বদল করে নেয়, অবশ্যই সে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায় পথ থেকে গোমরাহ হয়ে যাবে।[১৫৪]

১০৯. আহলে কিতাবদের অনেকেই তাদের নিজেদের স্বার্থপরতা হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে চেষ্টা করবে যেভাবেই হোক তোমাদেরকে ঈমানের (আলোর) বদলে আবার সেই কুফরীর (অন্ধকারে) ঠেলে দিতে। অথচ সত্য ও ন্যায়ের বাণী (যেমনি তোমাদের কাছে পরিস্কার করে বলা হয়েছে তেমনি তাদের কাছেও তা (দিবালোকের ন্যায়) পরিস্কার করে তুলে ধরা হয়েছে।[১৫৫] তাদের এ (হীন) আচরণের সামনে তোমরা উত্তেজিত না হয়ে) ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো এবং (তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত তাদের সাথে তোমরা ভালো ব্যবহার করো।[১৫৬] (তোমরা তো ভালো করেই জানো যে) আল্লাহ সব কিছুর ওপরই ক্ষমতাশালী।[১৫৭]

১১০. (ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত আদায় করো। (এসব এবাদাতের মাধ্যমে) যে সব নেকী তোমরা আল্লাহর কাছে (আজ) অগ্রিম পাঠিয়ে দিচ্ছ, (সেখানে গিয়ে সেদিন) তার কাছে এর সবই মজুত পাবে। (কারণ) এখানে তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহর তায়ালা এর সব কিছু অবশ্যই দেখতে পান।[১৫৮]

১৫৩. অর্থাৎ এক দিকে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সকলকে ব্যাপৃত করে আছে, আর অপর দিকে এর বান্দাদের প্রতি রয়েছে তার সর্বোচ্চ অনুগ্রহ। এখন বান্দাদের সুযোগ-সুবিধা, তাদের সম্পর্কে অবগতি-অবহিত এবং তাদের সম্পর্কে সব চেয়ে বেশী ক্ষমতা কার থাকতে পারে, আর তাঁর মতো বান্দাদের কল্যাণ কামনা আর কার থাকতে পারে?

১৫৪. অর্থাৎ ইহুদীদের কথায় কখনো বিশ্বাস করবে না। ইহুদীদের সন্দেহ সৃষ্টির ফলে যারা সন্দেহে নিপতিত হয় তারা কাফের হয়েছে। এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে। ইহুদীদের কথায় পড়ে তোমরা নিজেদের নবীদের কাছে সন্দেহ নিয়ে হাজির হবে না। যেমন এরা নিজেদের নবী সম্পর্কে করতো।

১৫৫. অর্থাৎ অনেক ইহুদী আকাংখা করে তোমাদের আগের মত কাফের করতে। অথচঃ তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, মুসলমানদের দ্বীন-কিতাব-নবী সবই সত্য।

১৫৬. অর্থাৎ আমাদের কোন নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ইহুদীদের কথায় ধৈর্য ধারণ করবে। অবশেষে নির্দেশ এসেছে যে, ইহুদীদেরকে মদীনার আশ পাশ থেকে বের করে দাও।

১৫৭. অর্থাৎ নিজেদের দুর্বলতায় ইতস্ততঃ করবেনা। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অসীম ক্ষমতা বলে তোমাদেরকে সম্মানিত আর ইহুদীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ

نَصٰرٰى ط تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ

كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾ بَلٰى ق مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ

مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ص وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى

عَلٰى شَيْءٍ ص وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى

شَيْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۭ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ

لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ

الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ

مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ

خَرَابِهَا ۭ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا

خَآئِفِيْنَ ۥ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ

عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾

১১১. (এদের আরেকটা বদ অভ্যাস হচ্ছে) এরা (সব সময়ই) একথা বলে বেড়ায় একমাত্র এরা (ইহুদী ও খৃষ্টান) ছাড়া আর কেউই বেহেশতে যাবেনা।[১৫৯] আসলে এটা হচ্ছে তাদের নিছক কল্পনা মাত্র। তুমি (হে মোহাম্মদ) বরং তাদের বলো তারা তাদের দাবীতে সত্যবাদী হলে এর সপক্ষে (আল্লাহর কিতাব থেকে) কোনো প্রমাণ পেশ করুক।

১১২. হাঁ (আসল কথা হচ্ছে) যে কোনো ব্যক্তিই (জীবনের সর্ব পর্যায়ে) একান্ত ভাবে আল্লাহর আনুগত্য মেনে নেয় এবং (আনুগত্যের বাস্তব প্রমাণ) হিসেবে সদা সত্য ও ন্যায় কাজ করে আল্লাহ তায়ালা তাকে অবশ্যই তার বিনিময় দেবেন। এমন লোকদের (খোদার আযাব নিয়ে) ভয়ের কোনো কারণ নেই। এদের দুশ্চিন্তার কোনো প্রয়োজন হবেনা।[১৫৯]

রুকু ১৪

১১৩. ইহুদীরা বলে, খৃষ্টানদের কাছে (দাবী করার মতো কোনো সত্য মজুত নেই, খৃষ্টানরা বলে এই ইহুদীর কাছে তো কিছুই নেই। অথচ এদের অবস্থা হচ্ছে এরা উভয়েই (স্বীয় দাবী মোতাবেক) আল্লাহর পাঠানো কিতাব পাঠ করে।[১৬০] (অপর দিকে মক্কার সে সব মুর্তিপূজারীরা) যাদের কাছে আদৌ আল্লাহর কিতাবের

কোনো অস্তিত্বও নেই (তারা আবার এদের উভয়ের সম্পর্কে) একই কথা বলে। এদের (এই অভ্যন্তরীণ) মত বিরোধ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই শেষ বিচারের দিনে চূড়ান্ত ভাবে মিমাংশা করে দেবেন।[১৬১] (তখন সবাই জানতে পারবে কে কতোটুকু সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো)।

১১৪. সেই ব্যক্তির চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে, যে ব্যক্তি (ইহুদীদের মতো) আল্লাহর ঘর মসজিদের ধ্বংস সাধন করতে চায়[১৬২] এবং (মক্কার মূর্তি পূজকদের মতো) আল্লাহর ঘরে আল্লাহর নাম নেয়া থেকে মানুষকে প্রতিহত করতে চায়। এ ধরণের লোকদের বস্তুতঃ আল্লাহর ঘরে ঢোকার কোনো অধিকারই নেই। (কোনো বিশেষ কারণে তাদের সেখানে ঢুকতে হলেও) তারা ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে তথায় প্রবেশ করবে।[১৬২] (সত্যিকার কথা হচ্ছে) এ জঘন্য আচরণের লোকদের জন্যে যেমন পৃথিবীর অপমান লাঞ্চনা রয়েছে[১৬৩] তেমনি রয়েছে পরকালের কঠিনতম শাস্তি।

---

১৫৮. অর্থাৎ তাদের পীড়া দানে ধৈর্য ধারণ কর এবং এবাদাতে নিয়োজিত থাক। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের কাজ সম্পর্কে কখনো অমনোযোগী নন। তোমাদের কোন নেক কাজ বিফল যেতে পারে না।

১৫৯. অর্থাৎ ইহুদীরা তো বলে যে, এরা ছাড়া আর কেউ জান্নাতে যাবেনা। আর খৃষ্টানরাও বলতো যে, আমরা ছাড়া আর কেউ বেহেশতে যাবে না।

১৬০. অর্থাৎ যারা আল্লাহর বিধান মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য করেছে-সে বিধান যে কোন নবীর মাধ্যমেই আসুক না কেন এবং নিজেদের জাতীয়তা এবং আইনের ওপর হটকারিতা করেনা-যেমন ইহুদীরা করে থাকে, তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণামও নেক বিনিময়। তাদের জন্য এমন কোন কারণ নেই, যে জন্য তাদেরকে ভীত ও চিন্তিত হতে হবে।

১৬১. ইহুদীরা তাওরাত পাঠ করে বুঝতে পেরেছিল যে, খৃষ্টানরা হযরত ঈসাকে খোদার পুত্র বলে নিঃসন্দেহে কাফের হয়ে গেছে। আর খৃষ্টানরা ইঞ্জীলে স্পষ্ট দেখেছিল যে, ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ) এর নবুওত অস্বীকার করে কাফের হয়ে গেছে।

১৬২. এসব জাহেল দ্বারা আরবের মোশরেক এবং মূর্তী পূজারীদের বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেমনি ভাবে ইহুদী খৃস্টানরা একে অপরকে গোমরাহ মনে করে, তেমনিভাবে মূর্তি পূজারীরাও নিজেদের ব্যতীত অন্য সব দলকেই গোমরাহ এবং বে-দ্বীন মনে করে। দুনিয়ায় এরা যা খুশী বলুক, কেয়ামতের দিন আসল ফয়সালা হবে। এখন কারো মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, এসব বলার কি প্রয়োজন ছিল? তাফসীর কাবকরা বিভিন্ন মত দিয়েছেন। কারো কারো মতে দুটি স্বতন্ত্র সাদৃশ্য বুঝানোর জন্য দুটি পৃথক শব্দ

ব্যবহার করা হয়েছে। এক সাদৃশ্যের উদ্দেশ্য এ যে, এদের উভয়ের উক্তি একটা অন্যটার মতো। অর্থাৎ যেমনি ওরা অন্যদেরকে গোমরাহ বলে, তেমনি এরাও বলে। অপর সাদৃশ্য জ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, নিজেদের মনোস্কামনা এবং শত্রুতার বশবর্তী হয়ে যেমনি আহলে কিতাবরা এ ভিত্তিহীন দাবী করে থাকেতেমনি মূর্তি পূজারীরাও দলীল বিহীন এ দাবী উত্থাপন করে থাকে-নিছক নিজেদের মনোস্কামনার বশতবর্তী হয়ে।

১৬৩. এ আয়াতের শানে নুযুল। খৃষ্টানরা ইহুদীদের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হলে এরা একসময় তাওরাত জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং বায়তুল মাকদাসের ধ্বংস সাধন করেছিল। অথবা মক্কার মোশরেকদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এরা নিছব হঠকারিতা এবং শত্রুতার বশবর্তী হয়ে হোদাইবিয়ায় মুসলমানদেরকে মসজিদে হারাম বা আল্লাহর ঘরে যেতে বারণ করেছিল। যে কেউ কোন মসজিদ ধ্বংস বা তাঁর ক্ষতি সাধন করে, সেই এ নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত হবে।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৫. (কেবলা বদলের ব্যাপারে নিয়ে এরা অযথা মতবিরোধে লিপ্ত হয়। এরা কি জানে না যে) পূর্ব পশ্চিম সবই তো আল্লাহ তায়ালার। তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাবে আল্লাহ তায়ালাকে সেদিকেই দেখতে পাবে।[১৬৪] (কারণ আল্লাহ কোনো একটি বিশেষ দিকে সীমাবদ্ধ নন)। আল্লাহ অনেক বিশাল এবং তিনি সব কিছুই জানেন।[১৬৫]

১১৬. এই (খৃষ্টান) লোকেরা এও বলে যে, আল্লাহ তায়ালা (অমুককে) নিজের সন্তান রূপে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালার জন্যে সব ধরনের প্রশংসা, (তিনি এসব মানবিক বিষয়ের অনেক উর্ধে)। আসমান যমিনের সব কিছুই তো তার জন্য, এর প্রতিটি ক্ষুদ্রকণাও তার আনুগত্য মেনে চলে।

১১৭. এই আসমান যমিন তো তিনিই সৃষ্টি করেছেন। (তিনি এতোই পরাক্রমশালী) যখনি তিনি কোনো একটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেন, শুধু একুটুই বলেন 'হও' আর সাথে সাথেই তা (বাস্তবে পরিণত) হয়ে যায়।[১৬৬]

১১৮. (যারা সঠিক কথা জানে না তারা হামেশাই বলে) আল্লাহ তায়ালা (নবীর মাধ্যম বাদ দিয়ে সরাসরি) নিজে আমাদের সাথে কথা বলেননা কেন অথবা এমন কোনো নিদর্শন আমাদের কাছে কেন পাঠাননা।[১৬৭] (আসলে হেদায়াতকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করার অজুহাত হিসেবে) এদের আগের লোকেরাও এ ধরনের কথা বলতো, এদের সবার মানসিকতা ছিলো একই ধরনের। আল্লাহকে যারা বিশ্বাস করে (যুগে যুগে) আমি তাদের জন্যে আমার নিদর্শন সমূহকে সুস্পষ্ট করে পেশ করেছি।[১৬৮]

---

১৬৪. অর্থাৎ সে কাফেরদের উচিৎ ছিল বিনয়-নম্রতা এবং আদব ও তাযীমের সঙ্গে আল্লাহর ঘর মসজিদে প্রবেশ করা। কাফেররা এর যে অবমাননা করেছে তা সুস্পষ্ট যুলুম। অথবা এর অর্থ এই যে, এরা এ দেশে শাসন-কর্তৃত্ব এবং মান-মর্যাদা নিয়ে বসবাস করার যোগ্য নয়। আর হয়েছেও তাই। শ্যামদেশ (বর্তমানে সিরিয়া) এবং মক্কা আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকেই ফেরৎ দিয়েছেন।

১৬৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে পরাভূত হয়েছে, বন্দী হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে কর দিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে।

১৬৬. ইহুদী খৃষ্টানদের মধ্যে এ নিয়েও বিরোধ ছিল যে, তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কেবলাকে উত্তম বলে মনে করতো। এর জবাবে আল্লাহ বলেন, আল্লাহ কোন বিশেষ দিকেই নির্দিষ্ট নন। সকল দিক-স্থানের সীমাবদ্ধতা থেকে তিনি মুক্ত-পবিত্র। অবশ্য তার নির্দেশে যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকেই তাকে পাবে। তিনি তোমাদের এবাদত কবুল করবেন। কেউ কেউ বলেন, সফরে সওয়ারীর ওপর নামায পড়া সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হয়েছে অথবা সফরের কেবলা নির্ণয় দুষ্কর হয়ে পড়লে আয়াতটি নাযিল হয়।

১৬৭. অর্থাৎ তাঁর রহমত সর্বত্র সমান, সব স্থানে ব্যাপৃত হয়ে আছে- কোন এক বিশেষ স্থানে নির্দিষ্ট নয়। বান্দাহদের ভালো মন্দ, তাদের নিয়ত এবং আমল সব কিছু সম্পর্কে তিনি ভালো করেই জানেন। তিনি জানেন, বান্দাহদের জন্য কি ভালো আর কি মন্দ, কোন্‌টি উপকারী, আর কোন্‌টি ক্ষতিকর, সে অনুযায়ী তিনি নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ মেনে চললে তিনি শুভ বিনিময় দেবেন, তাঁর বিরোধিতা করলে তিনি শাস্তি দেবেন।

১৬৮. ইহুদীরা হযরত উযাইরকে এবং খৃস্টানরা হযরত ঈসাকে খোদার পুত্র বলতো। জবাবে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তিনি এসব থেকে মুক্তও পবিত্র। বরং সকলেই তাঁর মালিকানাধীন, অনুগত এবং সকলেই তাঁর সৃষ্ট।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۙ

وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾ وَلَنْ تَرْضَىٰ

عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ

هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ

بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ

مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ

حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا

نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى

الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾

১১৯. আমি অবশ্যই (মোহাম্মদ) তোমাকে সঠিক পথ দিয়ে (নবী হিসেবে তাদের কাছে) পাঠিয়েছি, তুমি হবে (নেককারদের জন্যে) সুসংবাদ দানকারী ও (যালেমদের জন্যে) ভীতি প্রদর্শনকারী। (মনে রাখবে) যারা জাহান্নামের বাসিন্দাদের ব্যাপারে কোনোদিনই তোমাকে প্রশ্ন করা হবেনা।[১৬৯]

১২০. এই ইহুদী ও খৃষ্টানদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, এরা কখনো তোমার ওপর খুশী হবেনা। হ্যাঁ, তুমি যদি এই সঠিক পথ ছেড়ে তাদের দলের কখনো অনুসরণ করতে শুরু করো[১৭০] (তখন দেখবে এরা ভারী খুশী। (এদের খুশী না খুশীর তোয়াক্কা না করে তুমি স্পষ্টত) তাদের বলে দাও, আল্লাহ্ তায়ালা মানব জীবনের যে পথ নির্দেশ আমার কাছে পাঠিয়েছেন তাই হচ্ছে একমাত্র পথ।[১৭১] (সাবধান) তোমার কাছে সঠিক জ্ঞান আসার পরও যদি তাদের ইচ্ছানুসারে চলতে থাকো তাহলে খোদার (ক্রোধ) থেকে বাঁচাবার জন্যে তুমি কোনো বন্ধু পাবেনা- পাবেনা কোনো সাহায্যকারীও।[১৭২]

১২১. এই আহলে কিতাবদের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে যারা তাদের কাছে মজুত আল্লাহর কিতাবকে যে ভাবে (আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে) পড়া দরকার সেভাবেই পড়ে। (সহজেই তাকে কোরআনের পাশাপাশি রেখে বুঝতে পারে যে, এটাই সঠিক) এবং তার ওপর তারা ঈমানও আনে। (আবার কতিপয় ব্যক্তি এমনও আছে যারা এটাকে অস্বীকার করে, মূলতঃ) এই অস্বীকারকারীরাই হচ্ছে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ।[১৭৩]

রুকু ১৫

১২২. হে বনী ইসরাইলরা, তোমাদের জন্যে দেয়া আমার নেয়ামত ও অনুগ্রহগুলোকে স্মরণ করো (এবং এই পর্যায়ে) আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার অন্যান্য জাতি সমুহের ওপর যে প্রাধান্য দান করেছিলাম (তাও স্মরণ করে) দোখো।

---

১৬৯. অর্থাৎ আহলে কিতাব এবং মূর্তি পজকদের মধ্যে যারা জাহেল, তারা বলে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেনা কেন? অথবা এমন কোন নিদর্শন কেন দেখাননা, যাতে আমরা 'নবুওয়াতকে' সত্য বলে মেনে নিতে পারি?

১৭০. আল্লাহ তায়ালা বলেন, এটা কোন নূতন কথা নন, আগের লোকেরাও এমন জাহেলের মতো কথা বলেছিল। আর যারা বিশ্বাস করার লোক, তাদের জন্য আমরা নবীর সত্যতা জ্ঞাপক নিদর্শন বর্ণনা করে দিয়েছি। হঠকারিতা এবং শত্রুতার বশবর্তী হয়েই এরা বিরোধিতা করছে এবং অবিশ্বাসও অমান্য করলে এটাতো তাদের নিছক হটধর্মীতা ছাড়া কিছুই হবেনা।

১৭১. অর্থাৎ তাদেরকে কেন মুসলমান করনি- এ বলে তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

১৭২. অর্থাৎ সত্য বাণীর সঙ্গে ইহুদী-খৃষ্টানদের কোন সম্পর্ক নেই। এরা নিজেদের হঠকারিতায় অটল, কখনো তোমাদের দ্বীন কবুল করবেনা। বরং তোমরা তাদের অনুগত হলে এরা আনন্দিত হবে। এটা সম্ভব নয়। সুতরাং এখন তাদের পক্ষ থেকে অনুকূল্য আশা করা ঠিক নয়।

১৭৩. অর্থাৎ যুগের নবী যে হেদায়াত উপস্থাপন করেন, সে যমানায় তাই গ্রহণযোগ্য। বর্তমান সময়ে তা হচ্ছে ইসলামী নীতি-ইহুদী-নাছারার নীতি নয়।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا

وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ

يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ط

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ط قَالَ وَمِن

ذُرِّيَّتِي ط قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا

الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ط وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ

إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ط وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ

السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا

آمِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا

ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۲۶﴾

১২৩. (আমার এ বহুমূখী নেয়ামতের তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করোনি। তাই আমি তোমাদের সাবধান করে বলছি) তোমরা (বিচারের) সেই কঠিন দিনটির ভয় করো। যেদিন একজন মানুষ (কিংবা তার নেকী) আরেকজনের কোনো কাজে আসবেনা। সেদিন কোনো রকম বিনিময় (বিংবা মুক্তিপন) নিয়েও কাউকে ছেড়ে দেয়া হবেনা। আবার (একের বিপদে অন্যের) সুপারিশও সেদিন কোনো উপকারে আসবেনা। কোনো অবস্থায় সেদিন (আল্লাহকে অস্বীকারকারী) এসব লোকদের কোনো সাহায্য করা হবেনা।[১৭৪]

১২৪. (তোমরা সেদিনের কথাও স্মরণ করো) যখন ইব্রাহীমকে তার 'রব' কতিপয় বিষয়ে (তার আনুগত্যের) পরীক্ষা নিতে চাইলেন।[১৭৫] এসব পরীক্ষায় (একে একে) সে কামিয়ার হলে আল্লাহ তায়ালা (তার ওপর খুশী হয়ে) বললেন, এবার আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা বানাতে চাই।[১৭৬] ইব্রাহীম বললো, আমার ভবিষ্যত বংশধররাও (কি মানুষের নেতা হিসেবে বিবেচিত হবে?)। আল্লাহ বললেন, (আমার পক্ষ থেকে মানব জাতির নেতা হওয়ার গুণাবলী যদি তোমার সন্তানরা অর্জন করতে না পারে তাহলে জেনে রেখো, তোমাকে দেয়া) আমার এ প্রতিশ্রুতি যালেমদের জন্যে প্রযোজ্য নয়।[১৭৭]

১২৫. (তোমরা সেই কথাও স্মরণ করো) আমি যখন দুনিয়ার মানুষদের শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্র হিসেবে (এই কা'বা) ঘরটি নির্মাণ করেছিলাম।[১৭৮] (নির্মান কাজ শেষ হওয়ার পর আমি মানুষের আদেশ দিয়েছিলাম) ইব্রাহীম যে স্থানটিকে এবাদাতের জন্যে নিদৃষ্ট করে নিয়েছিলো সে জায়গাকে তোমরাও নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো।[১৭৯] আমি ইব্রাহীম ও ইসমাইলের ওপর এই দায়িত্ব অর্পন করেছিলাম, যেন তারা আল্লাহর ঘর কাবাকে (হজ্জ ও ওমরার সময়) তাওয়াফ কারীদের জন্যে, আল্লাহ এবাদাতে আত্মনিয়োগকারীদের জন্যে, সর্বোপরি তার নামে রুকু সেজদাকারীদের জন্যে পবিত্র করে রাখে।[১৮০]

১২৬. (তোমরা সেই দোয়ার কথাও স্মরণ করো), ইব্রাহীম যখন বলেছিলো- হে আল্লাহ, এই জনপদকে তুমি শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও[১৮১] এবং এখানকার যে সব মানুষ তোমাকে এবং (তোমার প্রতিশ্রুত) পরকালকে বিশ্বাস করে, তুমি সর্বপ্রকার ফল মূল দিয়ে তাদের জন্যে আহারের যোগান দাও।[১৮২] আল্লাহ তায়ালা বললেন, (হ্যাঁ, বিশ্বাসীদের আমি রিজিক দান করবোই তবে আমাকে এবং আমার বিধি বিধানকে) যারা অস্বীকার করবে তাদেরও এ কয়েকদিনের জীবনের উপায় উপকরণ আমি সরবরাহ করতে থাকবো। (একদিন তারা দেখতে পাবে এ স্বল্পকালীন সময়ের অনুগ্রহ শেষ হয়ে যাবে) এবং অচিরেই আমি তাদের জাহান্নামের কঠোর আযাবের দিকে নিক্ষেপ করবো। (এই হতভাগ্য মানুষরা যদি বুঝতে পারতো যে) জাহান্নাম কতো নিকৃষ্টতম স্থান।[১৮৩]

১৭৪. এটা বলা হয়েছে যুক্তির জন্য অর্থাৎ তুমি এমনটি করলে আল্লাহর ক্রোধ থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবেনা। অথবা এটা বলা হয়েছে সাবধান-সতর্ক করার জন্য। উম্মতকে সতর্ক করাই এর উদ্দেশ্য। কেউ মুসলমান হয়ে কোরআন বুঝে যদি দ্বীন থেকে বিমুখ হয়, কেউই তাকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

১৭৫. ইহুদীদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক লোক ন্যায়পরায়ন ছিল। এরা বুঝে-শুনে নিজেদের কিতাব পাঠ করতো। ফলে এরা কোরআনের প্রতি ঈমান আনল, যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তার সাথীরা, এদের প্রসঙ্গেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ এরা মনোযোগের সঙ্গে তাওরাত পাঠ করেছে। ঈমান এদেরই ভাগ্যে জুটেছে। আর যারা কিতাব অস্বীকার করেছে অর্থাৎ তাতে পরিবর্তন সাধন করেছে, এরা ব্যর্থকাম, নিষ্ফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

১৭৬. শুরুতে বনী ইসরাইলকে যে সব কথা স্মরণ করায়ে দেয়া হয়েছিল, তাদের পূর্ণ বৃত্তান্ত আলোচনার পর এখন পুনরায় সতর্ক করার উদ্দেশ্যে আবার সে সব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে তাদের মনে ভালোভাবে বদ্ধমূল হতে পারে। হেদায়াত কবুল করতে পারে এবং জানতে পারে যে, এ কাহিনীর আসল উদ্দেশ্য কি।

১৭৭. যেমন হজ্বের অনুষ্ঠানাদী, খাতনা, ক্ষৌরকর্ম, মেসওয়াক ইত্যাদি। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এসব বিধান নিষ্ঠা-আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী পালন করেন। তিনি এসব পালন করেন পূর্ণভাবে। ফলে তাঁকে মানুষের নেতা করা হয়।

১৭৮. অর্থাৎ সকল নবী তোমার আনুগত মেনে চলবে।

১৭৯. আমরা ইবরাহীম (আঃ) এর উত্তরাধিকারী, এ বলে বনী ইসরাইল গর্বিত ছিল। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে, নবওয়াত ও বুযুর্গী তোমার সন্তানদের মধ্যে থকবে। আমরাই তো হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের ওপরে আছি। সকলেই তাঁর দ্বীন স্বীকার করে। এসব ছিল তাদের গর্বের কারণ। এখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বুঝায়ে বলছেন যে, আল্লাহ এসব ওয়াদা ছিল তাদের জন্য, যারা সৎপথে চলে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দুই পুত্র ছিলেন। দীর্ঘ দিন ধরে হযরত ইসহাক (আঃ) এর সন্তানদের মধ্যে বুযুর্গী ও পয়গম্বরী চলে আসছিল। এখন হযরত ইসমাইল (আঃ) এর সন্তানদের মধ্যে পয়গম্বরী ও বুযুর্গী পৌছেছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার উভয় পুত্রের জন্য দোয়া করেছেন। আল্লাহ বলেন, দ্বীন ইসলাম সব সময় এক ছিল। ইসলাম অনুযায়ী সকল পয়গম্বর এবং সকল উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছেন। আর ইসলামের অর্থ হচ্ছে পয়গম্বরদের মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়া। বর্তমানে এ বুযুর্গী মুসলমানদের হাতে এসেছে আর তোমরা ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে রয়েছ। প্রথম আয়াতগুলোতে নিজের অনুগহের কথা বলা হয়েছিল, আর এখন তাদের এ সন্দেহ নিরসন করা হচ্ছে যে,

বনী ইসরাইল নিজেদেরকে গোটা বিশ্বের ইমাম ও কর্তা এবং সকলের চেয়ে উত্তম মনে করে কারো আনুগত্য করতনা। বনী ইসরাইলের ঘটনায় হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং এর গুণ বৈশিষ্টের উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এর আলোচনা প্রসঙ্গে খানায়ে কা'বার গুরুত্ব বর্ণিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ইহুদী খৃষ্টানদের অভিযোগের জবাবও দেয়া হয়েছে।

১৮০. অর্থাৎ প্রতি বৎসর হজ্বের উদ্দেশ্য মানুষ সেখানে সমবেত হতো। যারা সেখানে পৌছে হজ্বের নিয়মনীতি পালন করে, এরা দোযখের আযাব থেকে নিরাপদ হয়, অথবা সেখানে কেউ কারো ওপর বাড়াবাড়ি করে না।

১৮১. মাকামে ইবরাহীম সে পাথর, যার ওপর দাঁড়ায়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কাবা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। এ পাথরে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর পায়ের ছাপ রয়েছে। এ পাথরের ওপর দাঁড়ায়ে তিনি হজ্বের দাওয়াত দিয়েছিলেন। 'হাজারে আস' 'ওয়াদের' মতো এ পাথরটিও জান্নাত থেকে আনা হয়েছে। এখন এ পাথরের কাছে নামায পড়ার হুকুম হয়েছে। এ হুকুম পালন করা মুস্তাহাব।

১৮২. অর্থাৎ সেখানে খারাপ কাজ করবেনা, না-পাক অবস্থায় তাওয়াফ করবে না এবং তাকে সকল কলুষ কালিমা থেকে মুক্ত রাখবে।

১৮৩. হযরত ইবরাহীম (আঃ) কাবা শরীফ নির্মাণের সময় এ দোয়া করেছিলেন যে, এ ময়দানে একটা নিরাপদ শহর গড়ে উঠুক। তাই শেষ পর্যন্ত হয়েছে।

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيْلُ ط

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا

وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص

وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ج إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ

الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ

اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط إِنَّكَ

أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِمَ
إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَٰهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ
فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ
قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَٰهِمُ
بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ۚ يَٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ
فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ
إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ۖ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ
مِن بَعْدِي ۚ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ
إِبْرَٰهِمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

১২৭. ইব্রাহীম ও ইসমাইল যখন কা'বা ঘর নির্মাণ করলো তখন তারা এই বলে আল্লাহর কাছে দোয়া করলোঃ হে আমাদের মালিক, (এই মহান ঘরকে যে উদ্দেশ্যে আমরা বানিয়েছি) তুমি আমাদের সেই একনিষ্ঠ কাজটাকে কবুল করো। একমাত্র তুমিই (মানুষের ভেতর বাইরের) সব কিছু জানো এবং (যে সব কথা মানুষ বলতে চেয়েও বলতে পারেনা) একমাত্র তুমিই তা শুনো।[১৮৪]

১২৮. (তারা আরো বললোঃ) হে আমাদের মালিক, আমাদের উভয়কেই তুমি তোমার জীবন বিধানের অনুগত মুসলিম বান্দা বানিয়ে দাও। আমাদের পরবর্তী বংশধরদের মাঝ থেকেও তুমি এমন জাতির উথ্যন করো, যারা (এই জীবনের সর্বক্ষেত্রে তোমারই পথের) আনুগত্য করবে। (হে মালিক) তুমি আমাদের দেখিয়ে

দাও, কোন পদ্ধতিতে আমরা তোমার এবাদাতের আনুষ্ঠানিকতা পালন করবো। (অতঃপর তোমার বাতলে দেয়া পন্থা অনুসরণে যদি আমরা কোনো ভুলত্রুটি করি, তা হলে) তুমি আমাদের তা মাফ করে দাও। কারণ তুমিই অপরাধ ক্ষমা এবং তুমিই পরম দয়ালু।

১২৯. হে আমাদের মালিক; (আমাদের পরবর্তী) এই বংশের মধ্যে এদের নিজেদের মাঝ থেকেই তুমি এমন একজন রাসূল পাঠাও—যে মানুষদের (পুনরায়) তোমার 'আয়াত' (কিতাবের বাণী) সমূহ পড়ে শোনাবে। তাদেরকে তোমার কিতাব ও (তার ইহকাল ও পরকালের) যাবতীয় জ্ঞান শিক্ষা দেবে। যা তাদের জীবন (চিন্তাধারা, চরিত্র ও কর্মপদ্ধতি) পরিশুদ্ধ পরিচ্ছন্ন করে দেবে। (আমাদের এই দোয়া তুমি কবুল করো)। কারণ তুমিই একমাত্র শক্তিশালী ও (সর্ব জ্ঞানে) বিজ্ঞ।[১৮৫]

রুকু ১৬

১৩০. (জেনে বুঝে) যে নিজেকে অজ্ঞতা ও মুর্খতায় ডুবিয়ে রেখেছে সে ব্যক্তি ছাড়া আর কে এমন হবে যে, ইব্রাহীমের (আনীত) জীবন বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? ইব্রাহীম (তো সে নবী) যাকে আমি দুনিয়ায় আমার (দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার) কাজের জন্যে বাছাই করে নিয়েছি। (তার এই মহান কাজের পুরস্কার হিসেবে) শেষ বিচারের দিনেও সে অবশ্যই আমার নেক লোকদের মধ্যে গণ্য হবে।

১৩১. (ইব্রাহীমের অবস্থা ছিলো এই যে) যখনি আমি তাকে বললাম, (আমার দেয়া এই বিধানের আনুগত্য স্বীকার করে এবং) আমারই অনুগত মুসলিম হয়ে যাও, সে বললো, আমি (দো'জাহানের মালিক) আল্লাহ্ তায়ালার সামনে অবনত হয়ে তার পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে নিলাম।

১৩২. (যে পথ ইব্রাহীম নিজের জন্যে বেছে নিলো) সেই পথে চলার জন্যেই সে তার পরবর্তী বংশধর– সন্তান সন্ততির জন্য 'অসিয়ত' করে গেলো। (তার পদাংক অনুসরণ করে) ইয়াকুব ও তার সন্তানাদির জন্যে একই নির্দেশ রেখে গেলো। (এ নির্দেশ ছিলো) হে আমার সন্তান, আল্লাহ তায়ালা এই ইসলামকে তোমাদের (জীবন বিধান) হিসেবে মনোনীত করে দিয়েছেন। কোনো অবস্থায়ই এ জীবন বিধানের আনুগত্য স্বীকার ব্যতিরেকে মৃত্যু বরণ করো না।[১৮৬]

১৩৩. তোমরা কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের সামনে তার মৃত্যু এসে হাযির হলো? ইয়াকুব তার ছেলে মেয়েদের (কাছ থেকে শেষ বারের মতো প্রতিশ্রুতি নিতে চাইল এবং) বললো, (আমি জীবিত থাকতে তো তোমরা আমার কথা মতো এক আল্লাহর আনুগত ছিলে), আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার আনুগত্য করবে? তারা জবাব দিলো, আমরা (অবশ্যই) আপনার সৃষ্টিকর্তা, (আপনার পূর্ব পুরুষ) ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক আল্লাহরই অনুগত্য করে চলবো। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আমরা সর্বদা (তার নির্দেশিত পথে) তার অনুগত বান্দাহ (মুসলিম) হয়েই থাকবো।[১৮৭]

১৮৪. অর্থাৎ সেখানে অবস্থানকারী ঈমানদারদেরকে ফল-মূলের জীবিকা দাও। কাফেরদের জন্য তিনি দোয়া করেননি। যাতে সে স্থানটি কুফরীর কলুষতা মুক্ত থাকে।

১৮৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, দুনিয়ায় কাফেরকেও জীবিকা দেয়া হবে।রিযিক ইমামত নেতৃত্বের কোন বিষয় নয় যে, ঈমানদার ছাড়া অন্য কাউকেই তা দেয়া হবেনা, অপর কেউ তা পাবেইনা।

১৮৬. আমাদের কাছ থেকে এ কাজটি কবুল কর অর্থাৎ খানায়ে কা'বার নির্মাণ কাজ। তুমি সকলের দোয়া শুন এবং সকলের নিয়াত সম্পর্কে জান।

১৮৭. হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং তার পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) এ দোয়া করেছিলেন যে, 'আমাদের মধ্যে তোমার অনুগত একটা দল সৃষ্টি কর। আর তাদের মধ্যে এমন একজন রাসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন।' তাদের উভয়ের সন্তানদের মধ্যে এখন নবী শেষ নবী, ব্যতীত আর কেউ আসেননি। এর মাধ্যমে ইহুদীদের প্রাচীন চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কিতাবের ইলম-অর্থ হচ্ছে, এর জরুরী বিষয়. যা মূল আয়াত থেকে জানা যায়। আর হেকমত এর অর্থ হচ্ছে গোপন রহস্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ

مَّا كَسَبْتُمْ ج وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٤) وَقَالُوا كُونُوا

هُودًا أَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوا ط قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرٰهٖمَ حَنِيفًا ط

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٣٥) قُولُوٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ

إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ إِلٰٓى إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ

وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَمَا

أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ ج لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ز

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (১৩৬) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ

فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (১৩৭) صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (১৩৮) قُلْ

أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَا أَعْمَالُنَا

وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (১৩৯) أَمْ تَقُولُونَ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ

كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ

أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

عَمَّا تَعْمَلُونَ (১৪০) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ

وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (১৪১)

১৩৪. এরাও ছিলো এক ধরনের জাতি, যারা আজ আর (আমাদের মাঝে) নেই। তারা যা করে গেছে তার ফলাফল তারা নিজেরাই ভোগ করবে। আবার তোমরা যা করবে তাও হবে তোমাদের একান্ত নিজস্ব। তাদের কোনো কাজের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।[১৮৮]

১৩৫. এরা বলে, তোমরা ইহুদী কিংবা খৃষ্টানদের মতাদর্শ গ্রহণ করো, (একমাত্র এ উপায়েই) তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হবে।[১৮৯] (হে মোহাম্মদ)

তুমি (এদের সবাইকে) বলে দাও, (সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার জন্যে চলো) আমরা সবাই (সব বিতর্কের উর্ধে যিনি সেই) ইব্রাহীমের মতাদার্শ গ্রহণ করি, যা একমাত্র সত্য ন্যায়ের পথ। ইব্রাহীম মোশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না।১৯০

১৩৬. (হে মোহাম্মদ) তুমি তাদের (সুস্পষ্ট ভাষায় একথা) বলে দাও যে, আমরা তো আল্লাহ্র ওপর ঈমান এনেছি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে যে বিধান নাযিল করেছেন তাকেই (একমাত্র সঠিক পন্থা বলে) বিশ্বাস করেছি। আমাদের আগে আল্লাহ্ তায়ালা (তার নবী) ইব্রাহীম ইসমাইল ইসহাক ইয়াকুব ও তাদের পরবর্তী সন্তানদের ওপর যে সব কিতাব নাযিল করেছেন, তাও আমরা মানি। (তাছাড়া) মুসা ইসা সহ সব নবীদের ওপর (যুগে যুগে) যে হেদায়াত ও কিতাব আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন তার ওপর আমরা ঈমান এনেছি। আমরা (মূল হেদায়াতের ব্যাপারে) কোনো নবীর মধ্যেই কোনো ধরণের তারতম্য করিনা। আমরা তো আল্লাহর কাছে চির অনুগত (মুসলিম বান্দাহ) হয়ে নিজেদেরকে তার কাছেই সমর্পন করে রেখেছি।১৯১

১৩৭. আর এই (ইহুদী খৃষ্টানদের) লোকেরা যদি তোমাদের মতোই (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে তাহলে তারাও সঠিক পথে পরিচালিত হবে। আর তারা যদি (দ্বীন ঈমানের পথকে) প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তারা অবশ্যই নিজেদের (সত্য পন্থীদের থেকে আলাদা করে) ভিন্ন একটি দলে পরিণত করে নেবে। (এতে তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই)। এদের প্রতিরোধের সামনে আল্লাহ-ই তোমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি সবার সব কথা (যেমনি) শোনেন (তেমনি) সবার সব (ভেতর বাইরের) কথাও তিনি জানেন।১৯২

১৩৮. (তাদের তুমি বলে দাও যে) আমরা তো (আমাদের গোটা জীবনকে) আল্লাহর রঙে রাঙিয়ে নিয়েছি। এমন কে আছে যার রঙ তার রঙের চাইতে উৎকৃষ্ট হতে পারে? (এই সত্য জেনে নিয়েই আমরা ঘোষণা করছি যে) আমরা তারই এবাদাত করি, তারই আনুগত্য করি।১৯৩

১৩৯. তুমি (হে মোহাম্মদ) তাদের বলো, তোমরা কি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারেও আমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? অথচ (এটা জানা কথা যে) তিনি যেমন আমাদের মালিক (তেমনি) তিনি তোমাদেরও মালিক। কর্মফল (ও তার পরিনাম) তোমাদের জন্যে আর আমাদের কর্মফল (ও তার পরিনাম) আমাদের জন্য। (কারণ) আমরা একান্ত নিষ্ঠার সাথেই তার আনুগত্য করি।১৯৪

১৪০. অথবা তোমরা কি একথা বলতে চাও যে ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের পরবর্তী (বংশের) নবী রাসূলরা সবাই ছিলো ইহুদী কিংবা খৃষ্টান? (হে মোহাম্মদ) তুমি বলে দাও যে, ঐতিহাসিক সত্য সম্পর্কে) তোমরা বেশী জানো, না আল্লাহ তায়ালা বেশী জানেন? (আল্লাহর এ সতর্কবাণী যে,) যদি কোনো ব্যক্তি (কিংবা সম্প্রদায় জেনে বুঝে) তাদের কাছে বর্তমান আল্লাহর দ্বীনের সাক্ষ্য গোপন করে তাহলে তাদের চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে? আল্লাহ

তায়ালা তোমাদের সব কাজ কর্মের ব্যাপারে সম্যক ওয়াকেবহাল।[১৯৫]

১৪১. এরাও ছিলো এক ধরনের সম্প্রদায়, এরা আজ আর (তোমাদের মাঝে) নেই। তারা যা করে গেছে তাদের ফলাফল তারা নিজেরাই ভোগ করবে আজ তোমরা যা কিছু করবে, তাও হবে একান্ত ভাবে তোমাদের নিজস্ব। তাদের (ভালো মন্দের) জন্যে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করবেননা।[১৯৬]

---

১৮৮. যে মযহাব-মিল্লাতের মর্যাদা উল্লেখিত হয়েছে, সেই মিল্লাতকেই ওছিয়ত করেছিলেন হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইয়াকূব (আঃ) এর সন্তানদেরকে। সুতরাং যে ব্যক্তি এটা মানবেনা সে তাদেরও বিরোধী। ইহুদীরা বলতো যে, হযরত ইয়াকূব (আঃ) তার সন্তানদেরকে খৃষ্টানদের ওছিয়ত করেছিলেন-তাদের এ দাবী মিথ্যা। পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হচ্ছে।

১৮৯. অর্থাৎ তোমরাতো হযরত ইয়াকূব (আঃ) এর ওছিয়তের সময় বর্তমান ছিলে। তিনি তো উপরোক্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের মিল্লাতের ওছিয়ত করেছিলেন। তোমরা তো এ কথা বললে যে, ইহুদীরা নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য সকলকে আর খৃষ্টানরাও নিজেদের ছাড়া অন্য সকলকে বে-দ্বীন বলতে শুরু করলো। আর সত্য ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের বিরোধী হয়ে বসলো-তাদের উভয়েই। এটাতো তোমাদের মনগড়া কথা।

১৯০. ইহুদী খৃষ্টানরা বিশ্বাস করতো যে, পিতা-মাতার পাপের জন্য সন্তানকে ভূগতে হবে। আর তাদের পূণ্যেও পুত্র শরীক হবে। তাদের এ ধারনা ভুল। নিজের কর্মফল-তা ভালো মন্দ যাই হোক নিজেকেই ভোগ করতে হবে- অন্যকে নয়।

১৯১. অর্থ এ যে, ইহুদীরা মুসলমানদেরকে বলত, ইহুদী হয়ে যাও, আর খৃষ্টানরা বলতো, খৃষ্টান হয়ে যাও, তবেই তোমরা হেদায়াত পাবে।

১৯২. অর্থাৎ হে মোহাম্মদ! তুমি বলে দাও যে, তোমাদের কথা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং আমরা হযরত ইবরাহীমের (আঃ) মিল্লাতের অনুসারী, এই হচ্ছে সকল বড় ধর্মের মধ্যে স্বতন্ত্র। তিনি মোশরেকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না-এ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা উভয় দলই তর্কে লিপ্ত রয়েছ। মক্কার মুশরেকরাও তো হযরত ইবরাহীম (আঃ) ধর্মের দাবীদার ছিল। তিনি মোশরেক হয়ে থাকলে এতেই তো তাদের প্রতিবাদ হয়ে যায়। এখন এ দলগুলোর মধ্যে ইনছাফের দৃষ্টিতে আসলে কেউই হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) মিল্লাতের ওপর নেই। কেবল ইসলামের অনুসারীরাই এখন এর মিল্লাতের ওপর বর্তমান আছে। প্রত্যেক শরীয়ত তথা জীবন যাত্রা প্রনালীতে তিনটি বিষয় থাকে। এক, আকায়েদ বা বিশ্বাসের বস্তু যেমন-তাওহীদ নবুওয়্যাত ইত্যাদি। এ ব্যাপারে তো সকল দ্বীনের ধারক বাহকরা একমত। মতভেদ এখানে সম্ভবই নয়। দুই, শরীয়তের মূলনীতি যা থেকে খুঁটি নাটি বিষয় নির্নয় করা হয় এবং সকল খুটিনাটি বিষয়েই এর মূলনীতি পরিলক্ষিত হয়। মূলত মিল্লাত বলা হয় এসব মূলনীতিকেই। মিল্লাতে মোহাম্মদী এবং

মিল্লাতে ইবরাহীমীর মধ্যে ঐক্য ও সাদৃশ্য রয়েছে এসব মূলনীতির ক্ষেত্রে। তিন, মূলনীতি এবং খুটিনাটি বিষয়ের সমষ্টিকে শরীয়ত বলা হয়। সার কথা এ যে, রাসূলে খোদা এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর মিল্লাত এক কিন্তু শরীয়ত ভিন্ন।

১৯৩. অর্থাৎ আমরা সকল রাসূল এবং সব কিতাবের প্রতি ঈমান আনি। সকলকেই সত্য বলে মনে করি। নিজ নিজ যুগে সকলেরই আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য। আমরা আল্লাহর অনুগত। যে সময় যে নবী হবেন এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর যে বিধান আসবে, তা মেনে চলা জরুরী। আহলে কিতাবরা এর পরিপন্থী। এরা নিজেদের দ্বীন ছাড়া অন্য সব দ্বীনকে অস্বীকার করে, এমনকি তাদের দ্বীন রহিত হয়ে গেলেও। নবীদের নির্দেশ মূলতঃ যা খোদারই নির্দেশ, এরা এ নির্দেশকেও অমান্য করে।

১৯৪. অর্থাৎ তাদের শত্রুতা এবং হঠকারীতায় ভীত হয়োনা। তাদের অনিষ্ট থেকে খোদা তোমাদের হেফাযত করবেন। এরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সকলের কথা শুনেন, সকলের অবস্থা এবং উদ্দেশ্য জানেন।

১৯৫. ইহুদীরা এসব আয়াত থেকে মুখ ফিরায়ে নিয়েছে, ইসলাম কবুল করেনি। আর খৃষ্টানরাও অস্বীকার করেছে এবং দুষ্টামী করে বলেঃ আমাদের এখানে তো একই রং, যা মুসলমানদের কাছে নেই। খৃষ্টানরা একটা হলুদ রং তৈরী করে রেখেছিল। তাদের নিয়ম ছিল শিশু পয়দা হলে বা কেউ তাদের দ্বীন গ্রহণ করলে তাকে সে রঙ্গে ডুবায়ে বলতো যে, একেবারে খাঁটি খৃষ্টান হয়ে গেছে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, হে মুসলমানরা। তোমরা বল যে, আমরাতো আল্লাহর রং অর্থাৎ সত্য দ্বীন কবুল করেছি। কারণ, এ দ্বীন গ্রহণ করে সকল প্রকার না-পাকী অপবিত্রতা থেকে পাক হওয়া যায়।

১৯৬. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তোমাদের ঝগড়া করা এবং তোমাদের এটা মনে করা যে, আমরা ব্যতিত তাঁর দান-অনুগ্রহ লাভ করার যোগ্য আর কেউই নেই, এমন কথা তোমাদের জন্যে ভাবা অর্থহীন। তিনি যেমন তোমাদের রব, আমাদেরও রব। আমরা যা কিছু কাজ করি, খালেছ ভাবে তারই জন্য করি। তোমাদের মতো পূর্ব পুরুষের ধারণায় এবং হঠকারিতা ও মনের কামনা অনুযায়ী করিনা। অতঃপর তিনি তোমাদের আমল কবুল করবেন, আমাদের আমল কবুল করবেন না- এর কি কারণ থাকতে পারে?

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ
الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (১৪২) وَكَذَٰلِكَ
جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا
الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ
الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ
لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ
اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ
رَحِيمٌ (১৪৩) قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (১৪৪)

—১৩

রুকু ১৭

১৪২. (মসজিদে আকসার বদলে কাবার দিকে ফিরে নামায পড়তে শুরু করলে) মানুষদের ভেতর থেকে এই অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা অচিরেই বলতে শুরু করবে (মুসলমানদের এ কি হলো?) এতোদিন যে কেবলার ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত ছিলো আজ কিসে তাদের সে দিক থেকে ফিরিয়ে দিলো?[১৯৭] হে (মোহাম্মদ) তুমি তাদের বলে দাও, পূর্ব পশ্চিম (উভয়টাই তো) আল্লাহর। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই সঠিক পথে পরিচালিত করেন।[১৯৮]

১৪৩. এবং এভাবেই আমি তোমাদের এক উৎকৃষ্ট (অথচ) মধ্যমপন্থী মানব দলে পরিণত করেছি- যেন তোমরা দুনিয়ার অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে (আমার হেদায়াতের) সাক্ষীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারো। (একই ভাবে) নবী রাসূলরা (তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারেও) তোমাদের জন্যে এক একজন সাক্ষী[১৯৯] হিসাবে পরিগনিত হতে পারেন। এর আগে যে কেবলার ওপর তোমরা প্রতিষ্ঠিত ছিলে আমি তা এ উদ্দেশ্যেই নির্ধারণ করেছিলাম, যেন আমি জানতে পারি যে তোমাদের মধ্যে কে কে রসূলের অনুসরন করে, আর কে হেদায়াতের পথকে অবজ্ঞা করে 'জীবনকে পরিচালিত করে।'[২০০] (যুগ যুগান্তরের অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসা ছিলো) তাদের জন্যে বড়োই কঠিন পরীক্ষা।

অবশ্য আল্লাহ যাদেরকে সঠিক পথের আলো দেখিয়েছেন (তাদের জন্যে এই পরীক্ষা মোটেই কঠিন বলে প্রমাণিত হয়নি)।[২০১] আর যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেননা। (একে নিষ্ফলও হতে দেবেন না)। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু ও একান্ত মেহেরবান।[২০২]

১৪৪. (কেবলা পরিবর্তনের জন্য যেভাবে বার বার) তুমি যে, আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার আদেশের অপেক্ষা করতে তা আমি অবশ্যই দেখতে পেয়েছি। আমি তোমার পছন্দ মতো দিককে অবশ্যই এখন কেবলা বানিয়ে দিয়েছি।[২০৩] (আজ থেকে তোমার ওপর আদেশ হলো) পৃথিবীর যেখানেই তুমি থাকো না কেন এই মর্যাদা সম্পন্ন মসজিদের দিকে ফিরে (নামায প্রতিষ্ঠা করতে) থাকবে।[২০৫]

অতঃপর তোমরা যেখানে থাকোনা কেন সে (মাসজিদের) দিকেই ফিরবে (তোমাদের সমাজের) এসব লোক যাদের কাছে আমি আগেই কিতাব নাযিল করেছি, তারা ভালো করেই জানে (এই কেবলা বদলের ব্যাপারটা) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে আসা সম্পূর্ণ সত্য একটি ঘটনা। এরা এ সব কথা জানার পরও আল্লাহর সাথে যে আচরণ করে যাচ্ছে (আল্লাহ) তায়ালা তা থেকে মোটেই অনবহিত নন।[২০৬]

---

১৯৭. হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসমাইল ও অন্যান্য আম্বিয়াকে কেরাম সম্পর্কে ইহুদী খৃষ্টানদের এ দাবী যে, এরা ইহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন- সুস্পষ্ট মিথ্যা, এটা ছাড়াও আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ইবরাহীম ইহুদী ছিলনা, খৃষ্টান ছিলনা' এখন তোমরাই বল যে, তোমাদের জ্ঞান বেশী, না আল্লাহ তায়ালার?'

১৯৮. একটু আগেই আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নিজেদেরকে বুযুর্গদের সন্তান কল্পনা করতঃ আহলে কিতাবরা মনে করতো যে, আমাদের কর্মকান্ড যতই খারাপ হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের পিতৃকূল অবশ্যই আমাদেরকে মাফ করায়ে নেবেন- তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য তাকীদ স্বরূপে আয়াতটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা এমনও বলা যায় যে, প্রথম আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছিল আহলে কিতাবকে, আর এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে রাসূলের উম্মতকে। উদ্দেশ্য এ যে, এমন বাজে কথায় তাদের অনুসরণ করবেনা। কারণ, বুযুর্গদের সম্পর্কে এমন আশা যে কারো মনে সৃষ্টি হতে পারে, এটা নিছক বোকামী। অতঃপর ইহুদী সহ অন্যান্যদের অন্য এক বোকামী সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে। কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কিত এ বিষয়টি অদূর ভবিষ্যতে আসবে।

১৯৯. হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মদীনা শরীফ পৌঁছে ১৬/১৭ মাস বায়তুল মাকদেসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। এর পর কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়ার হুকুম হলে ইহুদী মোনাফেক মোশরেক এবং এদের প্ররোচনায় কিছু মুসলমানও সন্দেহ করতে শুরু করে যে, এ ব্যক্তি তো সাবেক নবীদের কেবলা-বায়তুল মাকদেসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন; এখন তার কি হয়েছে যে, তা ত্যাগ করে কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ছে? কেউ বলে, ইহুদীদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ বশত সে এমন করেছ। আবার কেউ বলে, সে তো তার নিজের ব্যাপারেই সন্দিহান। সে যে আল্লাহর নবী নয়, এর থেকে তাই তো প্রকাশ পায়। বিরোধীদের এ অভিযোগের জবাবে আল্লাহ তায়ালা জানান যে, এ ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়।

২০০. অর্থাৎ হে মোহাম্মদ (সাঃ), তুমি বলে দাও যে, ইহুদীদের প্রতি শত্রুতা বা মনের সংকীর্ণতা তথা নিজের রায় অনুসরণ করে আমরা কেবলা পরিবর্তন করিনি। বরং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা এটা করেছি। তার নির্দেশ মেনে চলাইতো সত্যিকার দ্বীন। প্রথমে বায়তুল মাকদেসের দিকে মুখ করার হুকুম ছিল, আমরা তা মেনে নিয়েছি। এখন কা'বার দিকে মুখ করার হুকুম হয়েছে, এটাও মনে প্রাণে কবুল করেছি। আমাদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা না করা এবং এ সম্পর্কে আপত্তি করা চরম বোকামী। তুমি আগে ওই কাজ করতে, এখন কেন এ কাজ করছে, কোন অনুগত ভৃত্য সম্পর্কে এমন প্রশ্ন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আর যদি ভিন্ন ভিন্ন বিধানের রহস্য জানতে চাও তবে এর সমস্ত রহস্য কে বুঝতে পারে আর তোমাদের মতো বোকাদেরকে কে এটা বুঝাবে? অবশ্য এটুকু কথা সকলেই বুঝতে পারে এবং সকলকেই বুঝানো যায় যে, এবাদাতের পন্থা বলে দেয়ার জন্যই কেবলা নির্দিষ্ট করা হয়, তা আসল ইবাদাত কখনো নয়। আর এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কর্মধারা এক নয়। নিজ হেকমত ও রহমত অনুযায়ী কাউকে এক পথ দেখান, কাউকে দেখান ভিন্ন পথ। তিনি তো সব কিছুরই মালিক, যাকে যখন খুশী এমন পথ দেখান, যা অতি সোজা সরল এবং সব পথ থেকে সংক্ষিপ্ত ও কাছের। সুতরাং বর্তমানে আমাদেরকে যে কেবলার পথ দেখিয়েছেন, যা সব কেবলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

২০১. যেমনি তোমাদের কেবলা-কা'বা যা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কেবলা ছিল এবং এটা সকল কেবলার চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ, তেমনিভাবে আমি তোমাদেরকে সব উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ এবং তোমাদের পয়গম্বরকে সব পয়গম্বর এর চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ করেছি পরিপূর্ণ এবং নির্বাচিত করেছি যাতে এ মর্যাদা ও পূর্ণতার কারণে তোমরা সমস্ত উম্মতের মোকাবিলায় গ্রহণ যোগ্য সাক্ষী হতে পার। আর মোহাম্মদ (সঃ) তোমাদের ন্যায় পরায়নতা ও সততার সাক্ষী হতে পারে।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী উম্মতের কাফেররা যখন তাদের পয়গম্বরদের দাবী অস্বীকার করে বলবে যে, দুনিয়াতে কেউই আমাদেরকে হেদায়াত করেনি তখন রসূলের উম্মত নবীদের দাবীর সত্যতা স্বীকার করে সাক্ষ্য দেবে, আর রাসূলে খোদা যিনি উম্মতের মধ্যে সকলের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, তিনি তাদের সততা, ন্যায় পরায়ণতার স্বাক্ষ্য দেবেন। তখন অন্যান্য উম্মতরা বলবে, তিনি তো আমাদের সময়ে ছিলেন না, আমাদেরকে দেখেননি, সুতরাং তার সাক্ষ্য কিভাবে গ্রহণীয় হবে? তখন তার উম্মত জবাব দেবে যে, আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের কথায় এ ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত জ্ঞান জন্মেছিল। এ জন্য আমরা সাক্ষী দিচ্ছি। 'ওয়াসাত' অর্থ মধ্য পন্থা। এর তাৎপর্য এ যে, এ উম্মত যথার্থ সোজা পথে আছে, যাতে বক্রতার কোন নাম গন্ধও নেই এবং কম বেশী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

২০২. অর্থাৎ তোমাদের আসল কেবলা তো ছিল কা'বা, যা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর যমানা থেকে চলে আসছে। কিছু দিনের জন্য বায়তুল মাকদেসকে কেবলা করা হয়েছিল নিছক পরীক্ষার জন্য, কে আনুগত্যে অটল থাকে, আর কে দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়, তা যাছাই করার জন্য। এ ক্ষেত্রে যারা ঈমানের ওপর অবিচল থাকে, তাদের মর্যাদা অনেক বড় হবে।

এ আয়াতে ব্যবহৃত আরবী শব্দটি 'ভবিষ্যৎ জ্ঞাপক' শব্দও হয়েছে অন্যান্য আয়াতে এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ সব শব্দ থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, এসব বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান পরে হয়েছে 'নাউযু বিল্লাহ' এসব বিষয়ের অস্তিত্বের আগে বুঝি তার এ জ্ঞান ছিলনা। অথচ সব বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞান তো আদীকাল থেকেই। ওলামারা কয়েকভাবে এর জবাব দিয়েছেন। কেউ ইলম-এর অর্থ করেছেন পরখ করা, পৃথক পৃথক করা। কেউ এর অর্থ করেছেন পরীক্ষা করা, কেউ ইলম এর অর্থ করেছেন দেখা। কারো মতে ভবিষ্যতের অর্থ এখানে অতীত। কেউ জ্ঞান অর্জনকে নবী এবং মোমেনদের কাজ বলেছেন। কোন কোন বড় বড় বিশেষজ্ঞ এটার অর্থ করেছেন বর্তমান অবস্থার জ্ঞান, যা জ্ঞাত এবং প্রতিভাত হয় অস্তিত্ব লাভের পর, এটার জন্য পুরস্কার বা শাস্তি এবং প্রশংসা ও দুর্নাম আরোপ করা হয়। এরা এই মতকেই পছন্দ করেছেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞ এ সম্পর্কে অতি সুক্ষ্ম দুটি কথা বলেছেন। প্রথমটির সংক্ষিপ্ত সার এ যে, আল্লাহ তায়ালার বাণী 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা জ্ঞানের দিক থেকে সব বিষয়কে পরিবেষ্টন করে আছেন, এ

বাণী অনুযায়ী আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ সব কিছুই আল্লাহর সামনে বর্তমান রয়েছে, একই সঙ্গে এর সব কিছুরই জ্ঞান আছে। তাঁর জ্ঞানে আগে---পরে বলতে কিছুই নেই, থাকতেও পারে না-কস্মিন কালেও নয়। অবশ্য এ সবের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন্‌টাকে আগে আর কোন্‌টাকে পরে বলে গননা করা হয়। খোদার জ্ঞানের হিসাবে তো সব কিছুই একই মর্যাদায় বর্তমান। এ কারণে সেখানে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ খুজে বেড়ানো হবে একেবারেই অর্থহীন। অবশ্য পূর্বাপর ঘটনার কারণে এ তিনটি কাল বাহ্যত পৃথক পৃথক প্রকাশ পাবে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তো কখনো পরিবেশ এবং রহস্য অনুযায়ী এর জানা থাকার বিবেচনায় কথা বলেন। আর কখনো এসব ঘটনার পূর্বাপরের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। প্রথম অবস্থায় তো একটা সূক্ষ্ম পার্থকের বিষয় বিবেচনা করে সব সময় অতীত বা বর্তমান কালের শব্দ ব্যবহার করা হয়- ভবিষ্যৎ কালের শব্দ ব্যবহার করা হয় না, হতে পারেনা। আর দ্বিতীয় অবস্থায় অতীত উপলক্ষে অতীতের, বর্তমান উপলক্ষে বর্তমানের এবং ভবিষ্যৎ উপলক্ষ্যে ভবিষ্যতের শব্দ ব্যবহার করা হয়। সুতরাং যেখানে ভবিষ্যতের ঘটনাকে অতীতের শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন 'বেহেস্তের অধিবাসীরা ডাকলো' ইত্যাদি, সেখানে এ দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালার সামনে সব কিছুই উপস্থিত রয়েছে। আর যেখানে অতীত বিষয়কে ভবিষ্যৎ জ্ঞাপক শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন আগের আয়াতটি, সেখানে লক্ষ্য রাখা হয়েছে এ দিকে যে, পূর্ববর্তীর ঘটনার তুলনায় এটা ভবিষ্যৎ, খোদার জ্ঞানের বিবেচনায় ভবিষ্যৎ নয়। সুতরাং নূতন করে তার এটা জানার কথা ধারনা করার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

দ্বিতীয় গবেষণার সার কথা এ যে, বস্তু সম্পর্কে আমরা দুটি উপায়ে জ্ঞান লাভ করে থাকি। এক, কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়া সরাসরি। দুই, কোন মাধ্যমের সহযোগিতায়। যেমন আগুন। আমরা কখনো সরাসরি আমাদের স্বচক্ষে আগুন প্রত্যক্ষ করি। আর কখনো আগুন আড়ালে থাকে, কিন্তু ধোঁয়া দেখে আমরা আগুনের কথা বিশ্বাস করি। আর কখনো এ দু প্রকার জ্ঞান একই সঙ্গে একই স্থানে বর্তমান থাকে, যেমন কাছে থেকে আগুন দেখলে এর সঙ্গে ধোঁয়াও দেখা যায়। এ অবস্থায় উভয় পন্থায় আগুন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। এক, বিনা মাধ্যমে; কারণ, আমরা সরাসরি চক্ষু দিয়েই তো আগুন দেখছি। দুই, মাধ্যমে অর্থাৎ ধোঁয়ার মাধ্যমে আগুন সম্পর্কে জ্ঞান। এ দুটি জ্ঞান একই সঙ্গে হলেও একটা অন্যটার আগে বা পরে হলেও-অন্য মাধ্যমের সাহায্যে অর্জিত জ্ঞান সরাসরি লাভ করা জ্ঞানের মধ্যে- এমনভাবে বিলীন যে, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহই আরোপ করা হয় না।

এমনিভাবে কখনো কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি দু'টি বিষয়ের জ্ঞান একই সময়ে এবং একই সঙ্গে অর্জিত হয়, যেমন আগুন এবং ধোঁয়াকে একই সঙ্গে দেখুন। এমনিভাবে কখনো একটা বস্তুর জ্ঞান বিনা মাধ্যমে এবং অপর বস্তুর জ্ঞান প্রথম বস্তুর মাধ্যমে একই সঙ্গে অর্জিত হয়। যেমন ধোঁয়া সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান এবং আগুন সমপর্কে ধোঁয়ার মাধ্যমে জ্ঞান। বা আগুন সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান এবং ধোঁয়া সম্পর্কে আগুনের

মাধ্যমে জ্ঞান-উভয়ই কিন্তু এক সঙ্গে অর্জিত হয়। কিন্তু যেমন হাতে কলম নিয়ে লিখলে হাত এবং কলম একই সঙ্গে আন্দোলিত হয় কিন্তু এর পরও বলা হয় যে, আগে হাত আন্দোলিত হয়েছে পরে কলম। এমনিভাবে এক সঙ্গে হওয়া সত্ত্বেও সুস্থ জ্ঞান বুদ্ধি একটা বস্তু সম্পর্কে সরাসরি অর্জিত জ্ঞানকে অপর বস্তুর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের ওপর অবশ্যই আগে অর্জিত বলে মনে করে।

এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভের পর এখন শুনুন যে, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ ও সব বিষয় সম্পর্কে তার উভয় প্রকারে জ্ঞানই জানেন। তাঁর সরাসরি জ্ঞানও আছে, আবার অন্য বস্তুর মাধ্যমের জ্ঞানও আছে। অনাদি কাল থেকে উভয় প্রকার জ্ঞান একই সঙ্গে চলে আসছে। যদিও কোন বিষয়ের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান সরাসরী অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে বিলীন। তেমনিভাবে একটা বিষয়ের সরাসরি এবং অন্য মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান সব সময় একই সঙ্গে অর্জিত হয়। উভয় প্রকার জ্ঞান-অনাদি কাল থেকে চলে আসছে। যদিও উপরোক্ত পন্থায় সরাসরি জ্ঞানকে কোন মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের ওপর আগে অর্জিত এবং মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে পরে অর্জিত বলা হয়। সুতরাং খোদার জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় যেখানে ভবিষ্যৎ কালের শব্দ বা এর অর্থ পাওয়া যায়, যেখানে মাধ্যমের জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়-কালের প্রতি নয়। কালের বিচারে সেখানে কোন পার্থক্য সূচিত হয়না। আর সেখানে অতীত বা বর্তমানের শব্দ ব্যবহার হয়েছে। সেখানে তার অর্থ সরাসরি জ্ঞান। কোন মাধ্যমে কথা বলার রহস্য এ যে, খোদার কালামে সম্বোধন করা হয়েছে মানুষকে, আর মানুষ অধিকাংশ বিষয় সম্পর্কেই জ্ঞান লাভ করে কোন মাধ্যমে। আর আল্লাহ্ তায়ালা যেখানে তার জ্ঞান সম্পর্কে ভবিষ্যৎ জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা হচ্ছে এমন সব বিষয়, মানুষ যা কোন মাধ্যম ছাড়া জানতে পারে না। এমন সব স্থানে মানুষের সঙ্গে সরাসরি জ্ঞান সম্পর্কে কথা বলা হলে তাদের ওপর ইসলাম পূর্ণ থাকেনা। আর সেখানে এটা উদ্দেশ্য নয়ও সেখানে সরাসরি জ্ঞানের কথা বিবেচনা করে অতীত বা বর্তমান জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মানুষ যেহেতু এসব বিষয় সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান লাভ করতে পারে না, আর এসব মাধ্যম সম্পর্কে এদের অস্তিত্বের আগে মানুষের সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়, তাই এরা সর্বদা এর জ্ঞান লাভ করতে পারে না। এরা খোদাকে নিজেদের ওপর ধারণা করে ভবিষ্যৎ জ্ঞাপক শব্দ দ্বারা নিজেদের মতো মনে করে বিস্মিত হয় বলে যে, এর জ্ঞানও যে নূতন করে অর্জিত হয় একথা প্রমানিত হয়েছে। কিন্তু উপরে উল্লেখিত সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে যারা জানেন, এরা বিষয়টি ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম।

২০৩. রসূলের জন্য পূর্ব থেকেই কা'বা শরীফ কেবলা হিসেবে নির্ধারিত ছিল। মাঝখানে কিছু সময়ের জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে বায়তুল মাকদেসকে কেবলা করা হয়েছিল। আর সকলেরই জানা কথা যে, মনের ওপর যা কঠিন, সে ক্ষেত্রেই পরীক্ষা করা হয়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, কাবা শরীফের পরিবর্তে বায়তুল মাকদেসকে

কেবলা করা লোকদের কাছে কঠিন ঠেকেছে। মুসলমানদের কাছে কঠিন ঠেকেছে এ জন্য যে, তারা ছিল সাধারনতঃ আরব এবং কোরাইশের লোক। কাবার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল। তাদেরকে নিজেদের চিন্তা, অভ্যাস এবং প্রথার বিপরীত কাজ করতে হয়েছে। আর বিশিষ্ট লোকদের ঘাবড়াবার কারন ছিল এই যে, এটা ছিল মিল্লাতে ইবরাহীমীর বিপরীত কাজ। মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসরনের জন্যই তারা আদিষ্ট। আর সব চেয়ে বেশী বৈশিষ্ট মন্ডিত ব্যক্তিরা সুস্থ রুচিবোধ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা যাদেরকে দেয়া হয়েছে। এরা কা'বা শরীফের পরিবর্তে বায়তুল মাকদেসের দিকে মুখ করাকে উল্টা কাজ মনে করত। কিন্তু তত্ত্ব রহস্য সম্পর্কে যাদের অবগতি ছিল আর যারা অন্তরের আলো যারা কাবা শরীফ এবং বায়তুল মাকদেসের গুরুত্ব তাৎপর্য স্ব-স্ব স্থানে রেখে যথারীতি উপলব্ধি করতে সক্ষম তারা জানত যে, রাসূল (সাঃ)-এর মধ্যে সকল পূর্ণতার সমাবেশ ঘটেছিল। তার রেসালাত গোটা বিশ্ব এবং সকল জাতির জন্য, তাই বায়তুল মাকদেসের দিকে মুখ করে নামায আদায়ের সুযোগ আসাও ছিল জরুরী। এ কারণেই শবে মে'রাজে সকল পূর্ববর্তী নবীর সাথে তার সাক্ষাৎও হয়েছে এবং এর পর বায়তুল মাকদেসের দিকে মুখ করার নির্দেশও দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ভালো জানেন।

২০৪. ইহুদীরা বলে, কা'বাই যদি আসল কেবলা হবে, তবে এত দিন যে বায়তুল মাকদেসের দিকে মুখ করে নামায পড়েছে, তাতো নষ্ট হয়ে গেছে। কোন কোন মুসলমান সন্দেহে পড়ে যে, বায়তুল মোকাদেস আসল কেবলা না হলে সে সব স্থানে যারা মারা গেছে, তাদের সাওয়াব কম হয়েছে। আর যারা বেঁচে আছে তারা তো ভবিষ্যতে এ ক্ষতি পুশে নিতে পারবে। তাদের এ সন্দেহের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেহেতু ইমানের দাবী এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বায়তুল মোকাদেসের দিকে মুখ করে নামায পড়েছ। তাই তোমাদের সাওয়াবও বিনিময়ে কোন প্রকার হ্রাস করা হবে না।

২০৫. যেহেতু কাবা শরীফ ছিল এর আসল কেবলা, এটা ছিল এর সকল পূর্ণতার উপযোগী এবং সকল কেবলার চেয়ে উৎকৃষ্ট। এটা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এরও কেবলা ছিল। এদিকে তারা অপবাদ দিতো যে, এ নবী শরীয়তে আমাদের বিরোধী এবং মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারী হয়ে আমাদের কেবলা কেন গ্রহণ করে? এসব কারণে সে সময় তিনি বায়তুল মাকদেসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন, তখন তার মন চাইতে যে, কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ার হুকুম আসুক। আর এ আগ্রহে আসমানের দিকে মুখ তুলে চারিদিকে দেখতেন, যেন ফেরেশতা বুঝি হুকুম নিয়ে আসছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয় এবং কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়ার হুকুম হয়।

২০৬. অর্থাৎ কা'বার দিকে। আর এটাকে মসজিদে হারাম বলা হয় এজন্য যে, সেখানে যুদ্ধ বিগ্রহ করা, জন্তু-জানোয়ার শিকার করা এবং গাছ-ঘাঁস ইত্যাদি কাটা

ইত্যাকার সমস্ত কাজ হারাম। মসজিদুল হারামের মতো ইজ্জত হুরমত অন্য কোন মসজিদের নেই। কেবলা পরিবর্তনের এ হুকুম যখন নাযিল হয়, তখন রসূল (সাঃ) মসজিদে বনী মাসলামায় জামাআতের সাথে যোহরের নামায পড়ছিলেন; বায়তুল মাকদাসের দিকে মুখ করে দু'রাকাত পড়ছিলেন। নামাযের মধ্যেই তিনি এবং সকল মোক্তাদী কা'বা শরীফের দিকে মুখ করেন এবং অবশিষ্ট রাকাত পূরা করেন। এ মসজিদের নাম হয়েছে মসজিদুল কেবলাতাইন বা 'মসজিদে যু কেবলাতাইন' অর্থাৎ দু'কেবলার মসজিদ।

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ
مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا
بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ
أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

---

১৪৫. যাদের আমি ইতিপূর্বে কিতাব দান করেছি তাদের সামনে যদি তুমি দুনিয়ার (সব ধরনের) প্রমাণাদিও এনে হাযির করো (তারপরও) এরা তোমার কেবলার অনুসরণ করবে না। (আর আল্লাহর পক্ষ থেকে একবার আদেশ আসার পর) তুমিও তাদের কেবলা অনুসরণ করতে পারোনা।২০৭

এদের এক দল আরেক দলের কেবলার অনুসরণ করেনা। আর একবার আমার পক্ষ থেকে এ জ্ঞান পৌঁছার পর তুমি যদি (আমার আদেশের মোকাবিলায়) বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করো, তাহলে অবশ্যই তুমি তাদের দলে শামিল হয়ে যাবে, যারা (শরীয়তের ব্যাপারে) মারাত্মক বাড়াবাড়ি করে থাকে।২০৮

১৪৬. ইতিপূর্বে যাদের আমি কেতাব দান করেছি এরা (মোহাম্মদকে) এতো ভালো করে চেনে, যেমনি এরা আপন ছেলেদের পরিচয় (সম্পর্কে) নিশ্চিত। এদের একদল লোক ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য গোপন করার চেষ্টা করে। অথচ এরা সব কিছুই জানে।

১৪৭. (এই বাণী আর কোথায়ও থেকে আসেনি)– এ সত্য এসেছে স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে। সুতরাং কোনো অবস্থায়ই এতে দ্বিধা সন্দেহ পোষণ করোনা।[২০৯]

---

২০৭. অর্থাৎ সফরে-প্রবাসে থাক কি নিবাসে, মদীনায় থাক কি অন্য কেন শহরে, পৃথিবীর স্থলভাগে থাক কি জলভাগে বা স্বয়ং বায়তুল মাকদেস যেখানেই তোমরা থাকনা কেন, তোমরা কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়বে।

২০৮. অর্থাৎ আহলে কিতাবরা কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে যে আপত্তি করে, তোমরা কিছুতে এর কোন পরোওয়া করবেনা। কারণ, তারা নিজেদের কিতাব থেকে জেনেছে যে, শেষ নবী কিছু দিন বায়তুল মাকদাসের দিকে মুখ করে নামায পড়বেন। আর শেষে কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়বেন। তারা এটাও জানে যে, তার শেষ এবং চিরন্তন কেবলা হবে মিল্লাতে ইবরাহীম অনুযায়ী। তাই এ কেবলা পরিবর্তনকে এরা সত্য এবং যথার্থ মনে করে। নিছক হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা যা খুশী বলুক। আল্লাহ তায়ালা তাদের কথা ভালোভাবেই জানেন। তারা একদিন এর পরিনতি জানতে পারবে।

২০৯. অর্থাৎ যখন কথা এ যে, আহলি কিতাবরা কাবার দিকে মুখ করাকে সত্য মনে করেও নিছক হিংসার বশবর্তী হয়ে সত্য গোপন করছে তখন তারা কেবলার অনুসারী হবে। এমন আশা কখনো করবে না। তারাতো এমন গোড়া যে, সম্ভাব্য সমস্ত নিদর্শন তাদেরকে দেখালেও এরা তোমাদের কেবলা মানবেনা। তারাতো কোনভাবে তোমাদেরকে তাদের অনুসারী করার আশায় রয়েছে। এ কারণে তারা বলে, আমাদের কেবলার ওপর কায়েম থাকলে আমরা মনে করতাম যে, তুমি সে নবী যার ওয়াদা করা হয়েছে। এতে আশা করা যায়, কখনো তুমি আমাদের কেবলায় ফিরে আসবে। এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা আর অলীক আশা মাত্র। তুমি কোন অবস্থায় এবং কোন সময়েই তাদের কেবলার অনুস্মরণ করতে পারনা। কেবলার দিকে মুখ করার হুকুম এখন আর কেয়ামত পর্যন্ত রহিত করা হবে না। অন্যদেরকে অনুসারী করার চিন্তা পরে করুক, আগে আহলে কিতাবরা নিজেরাই কেবলার ব্যাপারে একমত হোক। ইহুদীদের কেবলা হচ্ছে বায়তুল মোকাদেসের ছাপরা, আর খৃষ্টানদের কেবলা বায়তুল মোকাদেস পূর্ব দিক যেখানে হযরত ঈসা (আঃ) এর মধ্যে রূহ ফুঁকা হয়েছে। তারা নিজেরাই যখন একমত হতে পারে না, তখন মুসলমানদের কাছে থেকে, দু পরস্পর বিরোধী বিষয়ে একমত হওয়ার আশা করা নিছক বোকামী মাত্র।

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا ؕ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿১৪৮﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ؕ

وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿১৪৯﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا

كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۙ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ

عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۗ فَلَا

تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۗ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ

وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿১৫০﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا

مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ

الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا

تَعْلَمُونَ ﴿১৫১﴾ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي

وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿১৫২﴾ ع

রুকু ১৮

১৪৮. প্রত্যেকের জন্য (নামায ও অন্যান্য ইবাদাতের ক্ষেত্রে) কোনো না কোনো একটা দিক থাকে, যে দিকে তাকে ফিরতে হয়। (আসলে কে কোন্ দিকে ফিরে দাঁড়ালো এটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে, সার্বিক কল্যাণ লাভ করা।

তাই সেই) মূল কল্যাণের দিকে তোমরা অগ্রসর হবার কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো। তোমরা যে যেখানেই থাকোনা কেন (চূড়ান্ত বিচারের দিন) তিনি তোমাদের সবাইকে একই স্থানে এনে হাযির করবেন। এই কাজের সর্বময় ক্ষমতা অবশ্যই তার রয়েছে।[২১০]

১৪৯. তুমি যে কোন স্থান থেকে বেরিয়ে আসো না কেন (নামাযের জন্যে) সেখান থেকেই মাসজিদে হারাম– কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও। কারণ এটাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের কাছ থেকে (কেবলা নির্ধারণের ব্যাপারে) চূড়ান্ত সত্য ও সিদ্ধান্ত। আর (ফায়সালা তোমরা মেনে চলছো কিনা সে ব্যাপারে) তিনি তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে উদাসীন নন, সব খবরই তিনি রাখেন।

১৫০. (আবার শুনে রাখো) যে দিক থেকেই তুমি বেরিয়ে আসবে, (নামাযের সময় উপস্থিত হলে) সেখান থেকেই মাসজিদে হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যেও। (পৃথিবীর) যেখানেই তুমি থাকোনা কেন– কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।[২১১] তাহলে (তোমাদের প্রতিপক্ষের) লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে (ব্যবহার করার মতো) কোনো যুক্তি আর খুঁজে পাবে না।

অবশ্য তাদের কথা আলাদা, যারা জেনে বুঝেও সত্যকে গোপন করে রাখে। বাড়াবাড়ির কাজে লিপ্ত এসব ব্যক্তির ব্যাপারে তুমি ভয় করো না। তুমি বরং ভয় করো আমাকে[২১২], (নির্দেশ অমান্য করার পরিণামকে) যাতে করে আমিও তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সেই) নেয়ামত পূর্ণ করে দিতে পারি এবং যাতে করে তোমরাও একদিন সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারো।[২১৩]

১৫১. (তোমাদের সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্যেই মূলতঃ) এভাবে আমি তোমাদের কাছে তোমাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছি। যার দায়িত্ব হচ্ছে, সে (প্রথমতঃ) তোমাদের কাছে আমার 'আয়াত' (কেতাব) পড়ে শুনাবে।

(দ্বিতীয়তঃ সেই কেতাবের হেদায়াত মোতাবেক) সে তোমাদের জীবনকে (যাবতীয় অনাচার থেকে) পরিশুদ্ধ করে দেবে এবং এই পরিচ্ছন্ন জীবনের জন্যে সে তোমাদের আমার কেতাব ও তার অন্তর্নিহিত জ্ঞান (ও নিয়ম পদ্ধতি) শিক্ষা দেবে। (সর্বোপরি) সে তোমাদের এমন সব বিষয় সমূহের জ্ঞান দান করবে যা তোমাদের (কোন কোনো মানুষের) জানা নেই। ২১৪

১৫২. সুতরাং (এসব অনুগ্রহের জন্যে) তোমরা (প্রতিনিয়ত) আমাকেই স্মরণ করো। (তাহলে) আমিও তোমাদের (এই কাজের যথার্থ বিনিময় দিয়ে) স্মরণ করবো। তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো এবং কখনো অকৃতজ্ঞ হয়ো না। ২১৫

২১০. অর্থাৎ এসব যুক্তি প্রমাণ থেকে চোখ ফেরায়ে ক্ষণিকের জন্য যদি এটা মেনে নেয়া হয় যে, তুমি নাউযু বিল্লাহ ওহী ওর নিশ্চিত জ্ঞানের বিরুদ্ধে আহলে কিতাবের কেবলার অনুসরণ করবেন, এ অবাস্তব কথা মেনে নিলেও নিঃসন্দেহে না-ইনছাফদের অন্তর্ভূক্ত হবে। আর নবীর দ্বারা এ গর্হিত কাজ কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং জানা গেলো যে, তোমার দ্বারা আহলে কিতাবদের কেবলার অনুস্মরন কিছুতেই সম্ভব নয়। এটাতো জ্ঞানের সরাসরি বিরোধী অর্থাৎ জাহেলী ও গোমরাহী।

২১১. অর্থাৎ তোমার যদি এ ধারণা হয় যে, কা'বাকে মুসলমানদের কেবলা বলে যদি আহলে কিতাবরাও কোনভাবে মেনে নেয় এবং অন্য লোকদেরকে সন্দেহে নিস্পতিত না করে, তা হলে আমার প্রতিশ্রুত নবী হওয়াতে কোন সন্দেহ-সংশয় অবশিষ্ট থাকে না। তবে জেনে নাও যে, আইলে কিতাবরা তোমার সম্পর্কে ভাল করেই জানে। তোমার বংশ গোত্র, জন্মস্থান-বাসস্থান, আকার-আকৃতি, গুণ-অবস্থা সবই তাদের ভালোভাবে জানা আছে। এর ফলে তোমার সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং তোমার প্রতিশ্রুত নবী হওয়া সম্পর্কে তাদের এমন নিশ্চিত বিশ্বাস আছে। যেমন অনেক সন্তানের মধ্যে কোন প্রকার ইতস্ততঃ আর দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়াই নিজের সন্তানকে চিনে নেয়া যায়। কিন্তু কেউ এ বিষয়টি প্রকাশ করে, আর কেউ জেনে শুনে সত্যি বিষয়কে গোপন করে। কিন্তু তাদের গোপন করলে কি হবে, সত্য তো তা, যা আল্লাহর কাছ থেকে আসে। আহলে কিতাবরা মানুক আর না মানুক, তাদের বিরোধিতায় কোন প্রকার ইতস্তত করবে না।

২১২. অর্থাৎ আল্লাহ প্রত্যেক উম্মতের জন্য এক একটি কেবলার হুকুম করেছেন, এবাদাতের সময় যার দিকে মুখ করবে। বা মুসলমানদের প্রত্যেকটি কাওম কা'বা থেকে পৃথক পৃথক দিকে অবস্থিত। কেউ পূর্ব দিকে আর কেউ পশ্চিম দিকে। সুতরাং এ নিয়ে ঝগড়া করা এবং নিজেদের কেবলা বা দিক নিয়ে হটকারিতা করা অর্থহীন কাজ। নেকী বা ভালো কাজই হচ্ছে ঈপ্সিত ও প্রত্যাশিত বস্তু। এসব আলোচনা ত্যাগ করতঃ সে দিকে ধাবিত হও। তোমরা যে কেবলা বা সে দিকেই থাকনা কেন, আল্লাহ তোমাদেরকে হাশরে একত্রিত করবেন। তোমাদের নামাযকে এমন মনে করা হবে, যেন একই দিকে মুখ করে তা আদায় করা হয়েছে। সুতরাং এমন বিষয়ে কেন ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হচ্ছ?

২১৩. কেবলা পরিবর্তনের হুকুম বারবার উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, এর কারন ছিল বিভিন্ন। তাই প্রতিটি কারণ বলার জন্য এ হুকুম বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। একটা থেকে জানা যায় যে, রাসূলের সন্তুষ্টি এবং সম্মানের জন্য আল্লাহ তায়ালা এটা করেছেন, আরেকটা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর নিয়মই এ যে, প্রত্যেক মিল্লাত এবং প্রত্যেক স্বতন্ত্র শরীয়ত ধারী রাসূলের জন্য এর উপযোগী একটা কেবলা নির্দিষ্ট থাকা দরকার। আবার আরেকটা থেকে জানা যায় যে, উপরোক্ত বিধানের কারণ হচ্ছে এই যে, যাতে বিরোধীদের অভিযোগ উত্থাপিত হতে না পারে। অথবা বারবার উল্লেখের কারন এ যে, প্রথমত কেবলা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, দ্বিতীয়ত খোদায়ী বিধান রহিত হওয়া আহাম্মকদের

বোধগম্য বহির্ভূত। অতঃপর প্রথম কেবলার পরিবর্তন রহিত হয়েছে আর একথা প্রকাশিত হয়েছে শরীয়তে মোহাম্মদীতে। তাই বারবার তাকীদ দিয়ে এর উল্লেখ করা মূল তত্ব ও অলংকার শাস্ত্রের আদৌ পরিপন্থী নয়। অথবা এর কারণ এই যে, প্রথম আয়াতে সাধারন অবস্থা বর্ণীত হয়েছে, দ্বিতীয় আয়াতে সাধারণ স্থান আর তৃতীয় আয়াতে সাধারন কালের বর্ণনা রয়েছে।

২১৪. অর্থাৎ কা'বার দিকে মুখ করার হুকুম এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) কেবলা ছিল কা'বা শরীফ। শেষ নবীকেও সেদিকে মুখ করার হুকুম দেয়া হবে। সুতরাং তোমাকে কা'বার দিকে মুখ করার হুকুম না দেয়া হলে ইহুদীরা অবশ্যই দোষারোপ করতো, আর মক্কার মোশরেকরা বলত যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর কেবলা তো ছিল কাবা শরীফ; এ নবী মিল্লাতে ইব্রাহীমের দাবী করেও কেবলার ব্যাপারে বিরোধিতা কেন করছে? সুতরাং এখন আর উভয়ের তর্ক করার কোন অধিকার নেই। কিন্তু বে-ইনছাফরা এখনও কিছু না কিছু দোষারোপ করবে। যেমন কোরাইশরা বলবে, আমাদের কেবলা যে সত্য তা বুঝতে পেরেই এখন তিনি তা অবলম্বন করেছেন। এমনিভাবে ধীরে ধীরে আমাদের অন্যান্য বিধানও মেনে নেবে। আর ইহুদীরা বলবে যে, আমাদের কেবলার সত্যতা প্রকাশিত হওয়ার এবং মেনে নেয়ার পর এখন নিছক হিংসা ও আত্ম স্বার্থের বশবর্তী হয়ে নিজের মত তা ছেড়ে দিয়েছেন। এমন বে-ইনছাফদের অভিযোগের কোন পরোওয়া করবেনা; বরং আমার হুকুম মেনে চলবে।

২১৫. অর্থাৎ এ কেবলা আমি তোমার জন্য এ জন্য নির্ধারণ করেছি যাতে তোমরা দুশমনের দোষারোপ হতে রক্ষা পাও আর এর ফলে আমার পুরস্কার প্রতিদান, বরকত, এবং হেদায়াতের পরিপূর্ণ ভাগী হতে পার।

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا

بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّـٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا

تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَٰتٌ ۚ بَلْ

أَحْيَآءٌ وَلَـٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ

الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَٰلِ وَالْأَنفُسِ

وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ
مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۱۵۶﴾ اُولٰٓئِكَ
عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۫ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۷﴾ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ
بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۵۸﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى
مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ
يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ﴿۱۵۹﴾

রুকু ১৯

১৫৩. হে মানুষ, তোমরা যারা (আমার বিধানকেই সঠিক বলে) ঈমান এনেছো- তোমরা (পরম) ধৈর্য ও (একনিষ্ঠ) নামাযের মাধ্যমে আমার কাছ থেকে (প্রয়োজনীয়) সাহায্য প্রার্থনা করো। (মনে রেখো) আল্লাহ তায়ালা (সর্বাবস্থায়) ধৈর্যশীল মানুষদের সাথেই আছেন।[২১৬]

১৫৪. (এই বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে) যারা আমারই পথে মৃত্যু বরণ করেছে তাদের (কখনো) মৃত বলোনা, বরং তারাই হচ্ছে জীবিত। এ ব্যাপারে তোমাদের কিছুই জানা নেই।[২১৭]

১৫৫. (এই বিধান মেনে চলার ব্যাপারে) অবশ্যই আমি তোমাদেরকে (বারবার) পরীক্ষা করবো (এই পরীক্ষা একেক সময় একেক ধরণের হবে)। কখনো

ভয়-ভীতি, কখনো ক্ষুধা-অনাহার আকারে এই পরীক্ষা আসবে। আবার কখনো তোমাদের জান মাল ও ফসলাদির ক্ষতি সাধন করে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে।[২১৮] (এসব পরীক্ষার সময়) কঠোর ধৈর্যের সাথে যারা এর মোকাবেলা করে তুমি তাদের (আমার অফুরন্ত নেয়ামত ও বেহেস্তের) সুসংবাদ দান করো।

১৫৬. (এদের অবস্থা হচ্ছে এই যে) যখনি তাদের সামনে আমার এসব পরীক্ষা এসে হাযীর হয় তখনি তারা বলে, আমরা (এবং আমাদের জীবনতো) আল্লাহর জন্যেই, (এ অস্থায়ী জীবনের শেষে) আমাদের তো আল্লাহর কাছেই (শেষ ফায়সালার জন্যে) ফিরে যেতে হবে।

১৫৭. বস্তুতঃ এরাই হচ্ছে সে সব, ব্যক্তি যাদের ওপর রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অগণিত রহমত ও অপার করুণা। এবং (জেনে রেখো) এরাই হচ্ছে সঠিক পথের অনুসারী।[২১৯]

১৫৮. অবশ্যই 'সাফা' এবং 'মারওয়া' (পাহাড় দুটো) আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন সমূহের অন্যতম।[২২০] যদি তোমাদের মধ্যে কোনো লোক হজ্জ কিংবা ওমরা আদায় করে তাদের জন্যে এই উভয় পাহাড়ের মাঝে দৌড়ানো কোনো দোষের কাজ নয়, যদি কোনো ব্যক্তি অন্তরের নিষ্ঠার সাথে কোনে ভালো কাজ করে তাহলে আল্লাহ পাক অবশ্যই তার খবর রাখেন এবং সর্বাবস্থায় তিনি তার বিনিময় প্রদান করেন।[২২১]

১৫৯. যারা আমার নাযিল করা সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ ও পরিস্কার পথ নির্দেশকে গোপন করে, মানুষের হেদায়াতের জন্যে যা আমি ইতিপূর্বে বিস্তারিত ভাবে আমার কেতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি[২২২]– যারা এসব কিছু গোপন করে এদের ওপর শুধু আল্লাহ তায়ালাই অভিশম্পাত করেননা, (আসমান জমিনের) অন্যান্য অভিশাপ কারীরাও এদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে।[২২৩]

---

২১৬. অর্থাৎ কিয়ামত ও হেদায়াতের পরিপূর্ণতা তোমাদের প্রতি এমনভাবে হয়েছে, যেমনি শুরুতে তোমাদেরকে পরিপূর্ণ নেয়ামত ও হেদায়াত দেয়া হয়েছিল। এভাবে যে, তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তোমাদেরকে খোদার বিধান হৃদয়ঙ্গম করান এবং তোমাদেরকে মন্দ কাজ থেকে পাক-পবিত্র করেন অর্থাৎ জ্ঞানে এবং কাজে তোমাদেরকে পরিপূর্ণ করেন।

২১৭. যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি বারবার নেয়ামত পরিপূর্ণ করা হয়েছে তখন তোমাদের উচিৎ হচ্ছে মুখে অন্তরে, যিকিরে-ফিকিরে সর্ব উপায়ে আমাকে স্মরণ করা এবং আমার আনুগত্য করা। আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব অর্থাৎ তোমাদের প্রতি নূতন নূতন রহমত ও দান হতে থাকবে। তোমরা বেশী বেশী করে আমার শোকর আদায় করবে এবং আমাদের না-ফরমানী থেকে বিরত থাকবে।

২১৮. যিকির শোকর আদায় করা এবং না-ফরমানী থেকে বিরত থাকার কথা আগে বলা হয়েছে, শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এটা পালন করা কঠিন কাজ। এ কঠিন কাজকে সহজ করার পন্থা বলে দেয়া হয়েছে যে, ছবর ও নামায দ্বারা সাহায্য গ্রহণ কর। এ দু'টি বিষয় নিয়মিত পালন করলে সবকিছুই তোমাদের জন্য সহজ করে দেয়া হবে। এ আয়াতে জেহাদের কষ্ট স্বীকার করার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। কারণ জেহাদে ধৈর্য্য ধারণ করা উন্নত স্তরের ছবর।

২১৯. অর্থাৎ যারা আল্লাহর জন্য জীবন দেয়, তারা সে জগতে জীবন যাপন করে, কিন্তু তাদের খবর তোমরা রাখনা, তার ধরনও তোমাদের জানা নেই। আর এ সবই হচ্ছে ছবরের ফল।

২২০. যারা উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে অর্থাৎ শহীদ, প্রথমে তাদের কথা বলা হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে যে, সাধারণতঃ সামান্য কষ্ট- মুছিবত দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের ছবরকে পরখ করা হবে। ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া তেমন সহজ নয়। এ কারণে পূর্ব থেকেই সতর্ক করা হয়েছে।

২২১. অর্থাৎ যারা এসব বিপদ মুছীবতে ধৈর্য ধারণ করেছে এবং নেয়ামতের না-শোকরী করেনি, বরং এ সব বিপদাপদকে যিকির শোকর এর মাধ্যম করেছে, হে পয়গম্বর, তাদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে সুশংবাদ শুনিয়ে দাও।

২২২. কা'বার দিকে মুখ করা এবং কা'বাকে সব কেবলা থেকে উত্তম তা আগে বলা হয়েছে। আর এ কা'বাই হজ্ব ও ওমরা আদায়ের স্থান, এখন মোটকথা বলা হচ্ছে, যাতে এই উক্তির সমর্থন ও সমাপ্তি ভালো ভাবে পেতে পারে। অথবা এমনও বলা যেতে পারে যে, আগের ছবরের ফযীলত বয়ান করা হয়েছে; আর এখন বলা হচ্ছে যে, ছাফা-মারওয়া, পাহাড় দু'টোকে শা'আয়েরুল্লাহর আল্লাহর নির্বাচিত নিয়ম নীতির অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। হজ্ব ও ওমরায় সেখানে সা'ই বা ছুটাছুটি করা জরুরী। এর কারণতো এই যে, এটা ধেয্যশীলদের কাজ। অর্থাৎ হযরত হাজেরা ও তার পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) এর কাজ। এর নিদর্শন হাদীস তাফসীর এবং ইতিহাস গ্রন্থে এ কাহিনী সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এসব কাহিনী পাঠ করলে 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য ধারণকারীদের মাঝে আছেন' এর সত্যতা প্রতিপন্ন হবে।

২২৩. ছাফা মারওয়া মক্কার দু'টি পাহাড়। আরব বাসীরা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সময় থেকে সব সময় হজ্ব করে আসছে। হজ্ব করার সময় তারা এ পাহাড় দু'টিরও তারা তাওয়াক করতো। কুফরীর যমানায় কাফেররা পাহাড় দু'টিতে দু'টি মূর্তি স্থাপন করে। এরা মূর্তিদ্বয়ের সম্মান করতো এবং মনে করতো যে, মূর্তিদ্বয়ের তাযীমের জন্যই এ তাওয়াফের ব্যবস্থা। লোকেরা যখন মুসলমান হয়ে মূর্তি পূজা ত্যাগ করে তখন এরা মনে

করে যে, মূর্তির সম্মানের জন্যই তো এ পাহাড় দু'টির তাওয়াক করা। মূর্তি পূজা যখন হারাম হয়েছে তখন ছাফা মারওয়ার তাওয়াফও তো হারাম হওয়া উচিৎ। আসলে এ তাওয়াফ যে হজ্বের জন্য ছিল তা তারা জানতোনা। মক্কার কাফেররা অজ্ঞতা বশতঃ সেখানে মূর্তি স্থাপন করে। মক্কার আনছাররা সেহেতু কুফরীর যমানায়ও ছাফা মারওয়ার তাওয়াফকে খারাব মনে করতো। ইসলামের পরও এরা এ তাওয়াফ সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। এরা রসূলের কাছে এ মর্মে আরয করে যে, আমরা আগে এটাকে ঘৃণিত জানতাম। এ উপলক্ষ্যেই আয়াতটি নাযিল হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় দলকেই জানিয়ে দেয়া হয় যে, ছাফা-মারওয়ার তাওয়াফে কোন গুনাহ এবং অকল্যান নেই। এটাতো মূলতঃ আল্লাহর নিদর্শন, এর তাওয়াফ করা চাই।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ

كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ

أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ

وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٦٢﴾ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا

هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

---

১৬০. অবশ্য যারা (এ গর্হিত কাজ থেকে) ফিরে আসার সিদ্ধান্ত করবে এবং (সে মোতাবেক) নিজেদের (পরবর্তী) জীবনের সংশোধন করে নেবে, (এ কাজের বাস্তব প্রমাণ হিসেবে) খোলাখুলি ভাবে (সে সব) সত্য কথা প্রকাশ করবে (যা এতোদিন তারা গোপন করে আসছিলো) তাদের আমি মাফ করে দেবো।[২২৪] (কারণ) আমি ক্ষমাকারী ও বড়ো দয়ালু।

১৬১. (মানুষদের মাঝে) যারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং (এই অস্বীকার করার) অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে (তাদের তো ক্ষমা করার প্রশ্নই আসেনা)।

তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, (হেদায়াত বহনকারী) ফেরেস্তাদের অভিশাপ, সর্বোপরি অভিশাপ সমগ্র মানব কুলের।২২৫

১৬২. (এই অভিশপ্ত অবস্থা নিয়েই) এরা আমার আযাবে চির নিমজ্জিত থাকবে। (আমার সাথে কুফরীর) সেই ভয়াবহ শাস্তির মাত্রা এদের জন্যে বিন্দুমাত্রও কম করা হবেনা। (আমার দন্ডাজ্ঞা বাস্তবায়নে) তাদের ওপর কোনো রকম বিলম্ব করা হবে না।২২৬

১৬৩. তোমার আল্লাহ তো এক ও একক সত্তা। এই আসমান জমিন ও বিশ্বভুবনে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো 'মাবুদ' নেই। তিনি দায়ালু, তিনি অনেক মেহেরবান।২২৭

---

২২৪. এর অর্থ ইহুদী, যারা তাওরাতে মহানবীর স্বীকৃতি এবং কেবলা পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় গোপন করতো। দুনিয়ার গরজে যারা আল্লাহর হুকুম গোপন করে এরাও এর অন্তর্ভূক্ত।

২২৫. লানতকারী অর্থ জিন-মানুষ- ফেরেস্তা এবং অন্যান্য প্রাণীকূল। কারণ, এাদের সত্য গোপনের ফলে দুনিয়ায় যখন দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং নানা প্রকার বালা মুছিবত বিস্তার লাভ করে, তখন প্রাণীকূল এমনকি জড় পদার্থকে পর্যন্ত কষ্ট পেতে হয় আর সকলেই তখন এদের প্রতি লানত করে।

২২৬. অর্থাৎ যদিও এদের সত্য গোপনের কারণে কিছু লোক গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়েছে কিন্তু তারা যখন সত্য গোপন থেকে তাওবা করে পরিপূর্ণভাবে সত্য প্রকাশ করেছে। তখন লানতের পরিবর্তে আমি তাদের ওপর রহমত নাযিল করি। কারন, আমি তওবা কবুলকারী ও দয়ালু।

২২৭. অর্থাৎ যারা নিজেরা সত্য গোপন করেছে এবং অন্যদের সত্য গোপনের কারণে গোমরাহ হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কাফেরই রয়ে গেছে। তাওবা তাদের ভাগ্যে জুটেনি, তারা চিরতরে অভিশাপ্ত এবং জাহান্নামী হয়েছে। মরার পর তওবা কবুল হয়না। পূর্বে উল্লেখিত প্রথম দল এর ব্যতিক্রম। তওবা তাদের লানতকে বাতিল করে দিয়েছে, যেন এরা তওবা করেছে।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ

وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي

تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ص وَّتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ

لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُونَ (১৬৪) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ

اللّٰهِ أَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

أَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ط وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا إِذْ يَرَوْنَ

الْعَذَابَ لا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا لا وَّأَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

الْعَذَابِ (১৬৫)

রুকু ২০

১৬৪. (এই নিখিল জাহানের একক সম্রাট যে আল্লাহ তায়ালা, তার নিদর্শন সমূহ বিদ্যমান রয়েছে) এই আসমান জমিনের সৃষ্টির রহস্যের মাঝে। (চেয়ে দেখো) রাত দিনের এই আবর্তনের নিয়মনীতি, মহাসাগরে ভাসমান জাহাজ সমূহ- যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। (লক্ষ্য করো) আল্লাহ

তায়ালার বর্ষণ করা বৃষ্টির পানির মাঝে, (কিভাবে) নির্জীব ভূমিকে তিনি এ পানি দ্বারা নতুন জীবন দান করেন।

অতঃপর (সেই নব জীবন প্রাপ্ত) এই ভূখন্ডে হাজারো ধরনের প্রাণীর আবির্ভাবের ঘটান। (এই প্রাণী কুলের জীবন ধারণের জন্যে আসমান জমিনের মাঝে) নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় মেঘমালার প্রবাহ সৃষ্টি করেন। (মূলতঃ এই বিশ্বনিখিলের বিশাল কারখানাতে এবং এর প্রতি পদে রয়েছে) সুস্থ বিবেক বান মানুষের জন্যে জীবন্ত নিদর্শন।[২২৮] যারা (সত্যিকার ভাবে সব কিছুর মমার্থ্য) অনুধাবন করার চেষ্টা করে।

১৬৫. মানুষদের মাঝে কিছু সংখ্যক আবার এমনও রয়েছে যারা আল্লাহর বদলে অন্য কিছুকে তার সমকক্ষ মনে করে[২২৯] (তার আনুগত্য করা শুরু করে)। সে সব কিছুর প্রতি অতোটুকু আনুগত্য ও ভালোবাসাই প্রদান করে যতোটুকু সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তায়ালাকেই দেখানো তাদের উচিৎ ছিলো।[২৩০] যারা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে তারা তাকেই সর্বাধিক পরিমানে ভালোবাসে।[২৩১]

(আজ) যারা আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে (মারাত্মক ধরণের) বাড়াবাড়ির কাজে লিপ্ত তারা (নিজেদের এ যুলুমের ভয়াবহ পরিণাম) কঠোর আযাবকে সচক্ষে দেখতে পাবে, যদি তারা আজই তা অবলোকন করতে পারতো (তাহলে এরা অবশ্যই বুঝতে পারতো যে), আসমান জমিনের সমুদয় শক্তি ও কর্তৃত্ব একমাত্র মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর জন্যেই। (অতএব এই মহান সত্তাকে অস্বীকারকারীদের) শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তিনি কত কঠিন(তাও তারা সঠিকভাবে জানতে পারতো। ২৩২

---

২২৮. অর্থাৎ তাদের ওপর একই রকম এবং পর্যায়ক্রমে আযাব হবে। কোন সময় আযাব হ্রাস করা হবে না এবং তা থেকে অব্যাহতিও পাবেনা।

২২৯. অর্থাৎ তোমাদের সকলের সত্যিকার মাবুদতো এক জনই। এতে বহুত্বের কোন প্রকার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি এখন তাঁর না-ফরমানী করবে, সে একেবারেই ধ্বংস হবে। অন্য কোন মাবুদ থাকলে এর কাছে কল্যাণের আশা করা যেতো। এটাতো কোন প্রভূত্ব বাদশাহী বা পীরী ওস্তাদী নয় যে, এক স্থানে বনিবনা না হলে অন্যত্র চলে যাবে। এটা তো হচ্ছে খোদায়ী ক্ষমতা, তাকে ছাড়া অন্য কাকেও মাবুদ বামাতে পারনা, পারনা অন্য কারো কাছে কল্যাণের আশা করতে। এ আয়াত নাযিল হলে কাফেররা অবাক হয়ে বলে যে, গোটা দুনিয়ার মাবুদ এবং
সকলের কার্য উদ্ধারকারী একজন কি করে হতে পারে। এর প্রমাণইবা কি? জবাবে এই আয়াতটি নাযিল হয়। আল্লাহ তায়ালা এতে তার কুদরত তথা অসীম ক্ষমতার নিদর্শন বর্ণনা করেছেন।

২৩০. অর্থাৎ এত বিশাল-বিস্তৃত সুউচ্চ এবং খাম্বা বিহীন আসমান সৃষ্টিতে, এত বিশাল-বিস্তৃত ও সুদৃঢ় যমীন সৃষ্টিতে এবং পানির ওপর তা বিস্তৃত রাখায়, রাত-দিনের আবর্তন-বিবর্তন এবং হ্রাস বৃদ্ধিতে, জ্ঞানবানদেরকে নিদর্শন করেছে। আবার নদীতে জাহাজ চলাচলে, আসমান থেকে বারি বর্ষনে এবং তা দ্বারা যমীনকে শষ্য -শ্যামল, সবুজ-সতেজ করায় এবং তা থেকে সমস্ত প্রাণীর বংশ বিস্তার ও লালন পালনে, বিভিন্ন দিক থেকে বায়ুর প্রবাহে এবং আসমান-যমীনের মধ্যস্থলে মেঘ মালাকে ঝুলন্ত, রাখায় আল্লাহ তায়ালার একত্ব, তাঁর অসীম শক্তি কুশল ও অপার দয়ার মহান নিদর্শনরাজী বর্তমান রয়েছে, এগুলো তাদের জন্য, যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক এবং চিন্তা-চেতনা আছে। এতে আল্লাহর মূল সত্ত্বার একত্ব এবং তাঁর ছিফাত বা গুণাবলীর প্রমাণ রয়েছে, আল্লাহর কর্মকান্ডের একত্বের প্রমাণও এতে পেশ করা হয়েছে। এর ফলে মোশরেকদের সকল সন্দেহ সংশয় সম্পূণ রূপে দূরীভূত হয়েছে।

২৩১. অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধি -বিবেক অনুভূতি সম্পন্ন সৃষ্টিকূলের সেরা মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা স্পষ্ট দলীল- প্রমাণ দেখেও 'গায়রুল্লাহকে' আল্লাহর শরীক এবং সমান মনে করে।

২৩২. অর্থাৎ কেবল খুঁটিনাটি বাণী-কর্মেই তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার সমান মনে করে না, বরং সকল কর্মধারার মূল যে অন্তরের ভালোবাসা, সেখানেও শেভ-সামঞ্জস্য বিধান করে। এটাই হচ্ছে শেরকের নিকৃষ্টতম স্থান। বাস্তব কাজে শেবক ইচ্ছার খাদেম ও অনুগত মাত্র।

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا

وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ

الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا

مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ

وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا

مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ
وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ
مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ
شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ
الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ
عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٧١﴾

১৬৬. (সেদিন আল্লাহ তায়ালার) ভয়াবহ শাস্তি দেখে (দুনিয়ার বহু হতভাগ্য) লোকেরা যাদের মেনে চলতো, তাদের অনুসারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলবে। (বরং বলবে আমরা এদের চিনিই না) এদের উভয়ের মধ্যকার ভংগুর সব সম্পর্ক সেদিন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।[২৩৩]

১৬৭. (হতাশাগ্রস্থ) এই অনুসারীরা সেদিন বলবে, আবার যদি একবার আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ পেতাম! তাহলে আজ যেমনি করে (আমাদের নেতারা) আমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ (করে দায়িত্ব মুক্ত হবার চেষ্টা) করছে আমরাও তাদের সাথে যাবতীয় সম্পর্কেচ্ছেদ করে আসতাম।

এভাবেই আল্লাহ পাক তাদের সমগ্র জীবনের কর্মকান্ড গুলোকে তাদের সামনে একরাশ লজ্জা ও দুঃখের প্রতীক হিসেবেই তুলে ধরবেন। (এর অনিবার্য পরিণাম হিসেবে তাদের জন্যে জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে আছে, কোনো অবস্থায়ই) এরা (আর সেই স্থায়ী নিবাস) জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।[২৩৫]

রুকু ২১

১৬৮. হে মানব সম্প্রদায়, (আমার এ পৃথিবীতে যে সব জিনিসের উপভোগকে আমি তোমাদের জন্য আইন সম্মত করে দিয়েছি সে সব) হালাল ও পবিত্র

জিনিসগুলো তোমরা খাও। এবং (কোনো অবস্থায়ই আমার প্রদশির্ত হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বলে গন্য করে) শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা।[২৩৬] কেননা শয়তান তো তোমাদের খোলাখুলি দুশমন।

১৬৯. (শয়তানের কাজ হচ্ছে) সে তোমাদের সব সময় পাপ ও অশ্লীল কাজের আদেশ দেয় এবং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার নামে এমন সব কথা বলে যার সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা নেই।[২৩৭]

১৭০. (এদের অবস্থা হচ্ছে এই যে) যখনি তাদের বলা হয় যে, (হালাল হারামের বিধিনিষেধ সম্পর্কে) আল্লাহ যে সব বিধান নাযিল করেছেন তোমরা তা মেনে চলো। তারা (সাথে সাথেই) বলে (উঠে), আমরা তো শুধু সেই পথের অনুসরণ করবো যে পথের অনুসারী হিসেবে আমরা আমাদের বাপ দাদাদের পেয়েছি। তাদের বাপ-দাদারা যদি (এপর্যায়ে) সঠিক পথের অনুসরণ নাও করে থাকে এবং তারা যদি পথ বাছাই করণের সময় কোনো জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় নাও দিয়ে থাকে[২৩৮] (তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)?

১৭১. এ ভাবে অন্ধের মতো নিজ বাপ-দাদাদের অসুসরণ করে, যারা (আল্লাহ ও তার রসূলের হেদায়াতকে) অস্বীকার (ও অবজ্ঞা) করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে সেই (জ্ঞানহীন) পশুটির মতো- (তার পালের আরেকটি জন্তুকে) যখন ডাক দেয়-হয় তখন (পেছনের সেই পশুটি তার অর্থহীন) চীৎকার ও কান্নার আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায়না।[২৩৯]

মূলতঃ এরা কানেও শুনেনা, কথাও বলতে পারেনা, চোখেও দেখেনা। একই কারণে (হেদায়াতের কথাবার্তা) এরা কিছুই বুঝেনা।[২৪০]

---

২৩৩. অর্থাৎ নিজেদের মাবূদের প্রতি মোশরেকদের যে ভালোবাসা রয়েছে; আল্লাহর সঙ্গে মোমেনদের ভালোবাসা তার চেয়েও বেশি এবং সুদৃঢ়। কারণ, দুনিয়ার বিপদ-মুছিবতে মোশরেকদের ভালোবাসা অনেক সময় দূর হয়ে যায়। আর পরকালের আযাব দেখে তো সম্পূর্ণ নির্দোষিতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, যেমন পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। মোমেনদের ভালোবাসা এর চেয়ে ভিন্ন। সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক, দুনিয়া-আখেরাত, সর্বত্র আল্লাহর সঙ্গে তাদের ভালোবাসা সব সময় বর্তমান থাকবে। উপরন্তু আল্লাহর সাথে ঈমানদারদের যে ভালোবাসা রয়েছে ,তা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মানুষ যেমন আম্বিয়া-আওলিয়া-ফেরেস্তা-আবেদ আলেম, বাপদাদা সন্তান সন্ততি ধন-সম্পদ ইত্যাদির প্রতি ভালোবাসার চেয়েও গভীর এবং তীব্র। কারণ, আল্লাহর মহাত্ব এবং শান অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে ভালোবাসা হচ্ছে মৌলিক ও স্বতন্ত্র। আর অন্যদের সাথে ভালোবাসা রাখে অন্য কিছুর মাধ্যমে-আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেকের মান অনুযায়ী। একারণেই বলা হয়েছে মর্যাদা পর্যায়ে পার্থক্য না করলে তুমিতো -অবিশ্বাসী। খোদা আর অ-খোদার ভালোবাসাকে একাকার করে দেয়া-তা যে কেউই হোকনা কেন- মোশরেকদের কাজ।

২৩৪. অর্থাৎ যে সব যালেমরা আল্লাহর সাথে শরীক করে রেখেছে, অনাগত দিনে তারা যখন খোদার আযাব প্রত্যক্ষ করবে, যে দিন সর্ব শক্তি হবে আল্লাহর জন্য, খোদার আযাব থেকে যেদিন কেউই তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহর আযাব হবে কঠোর, এটা জানলে তারা আল্লাহর এবাদাত ত্যাগ করে কখনো অন্যের কাছে যেতোনা, তাদের কাছে কল্যাণের আশাও পোষণ করতোনা কখনো।

২৩৫. অর্থাৎ সে সময়টি এমন হবে যে, যাদের আনুগত্য করা হয়েছিল, তারা অনুগতদের কাছ থেকে মুখ ফেরায়ে নেবে, মূর্তি এবং মূর্তী পূজারীদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকবেনা। খোদায়ী আযাব দেখে একে অন্যের দুশমন হয়ে যাবে।

২৩৬. আর তখন মোশরেকেরা বলবে যে, কোনভাবে দুনিয়ায় ফিরে যাওয়া যদি আমার ভাগ্যে জুটতো, তবে আমরাও তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতাম, আজ তারা যেমন আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে, আমরাও তাদেরকে জবাব দিয়ে তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতাম; কিন্তু অসম্ভব এই আশা দ্বারা আফসোস ছাড়া আর কিছুই কল্যাণ হবে না।

২৩৭. অর্থাৎ খোদায়ী আযাব এবং মাবূদদের অসন্তুষ্টি দেখে মোশরেকেরা যেমন অত্যন্ত অবাক হবে, অনুতাপকারীকে তেমনি ভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদের সমস্ত কর্মকে অনুতাপের কারণ করে দেবেন। কারণ, হজ্ব ওমরা ছদকা-খায়রাত ভালো যা কিছু করেছিল, শেরকের ফলে তা সবই তো বাতিল হয়ে যাবে। যে পরিমাণ শেরক-গুনাহ করেছিল, তার পরিবর্তে আযাব পাবে। সুতরাং তাদের ভালোমন্দ সমস্ত কাজই অনুতাপের কারণ হবে। কোন আমল দ্বারাই উপকার হবে না। সব সময় তারা জাহান্নামেই থাকবে। ঈমানদার তাওহীদবাদীরা এদের বিপরীত। কিছু গুনাহের কারণে তারা জাহান্নামে গেলেও শেষ পর্যন্ত মুক্তি লাভ করবে।

২৩৮. আরববাসীরা মূর্তি পূজা করতো এবং মূর্তির নামে ষাড় ছাড়তো এবং এসব জন্তু-জানোয়ার কাজে লাগানো হারাম মনে করতো। এটাও এক প্রকার শেরক। কারণ, হারাম বা হালাল করার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নাই। এ ব্যাপারে কারো কথা মেনে নেয়া যেন তাকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা। এ কারণে প্রথম আয়াতে শেরকের অপকারিতা বর্ণনা করে এখন হালালকে হারাম করা থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হচ্ছে। এর সারকথা এই যে, যমীন থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়, তা খাও, অবশ্য শর্ত এই যে, শরীয়তে তা যেন হালাল এবং পবিত্র হয়, তা যেন হারাম না হয়, যেমন মৃত জন্তু-জানোয়ার এবং শুকর যেসব জানোয়ারের ওপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে এবং তার নৈকট্য কামনা করা হয়, সেসব জানোয়ার জবাই করলেও হালাল হয় না এবং বাইরের কোন কারণে যাতে হারাম আরোপিত না হয়, যেমন চুরি-ছিনতাই-সূদ-খুন, এ সব থেকে বিরত থাকা জরুরী। কখনো শয়তানের অনুসরন করবেনা, যা খুশী তাকেই হারাম করবেনা। যেমন মূর্তির নামের ষাঁড় ইত্যাদি। আবার যাকে খুশী তাকেই হালাল করেও নেবেনা।

২৩৯. অর্থাৎ মাসআলা এবং শরীয়তের বিধান নিজেদের পক্ষ থেকে রচনা করবে। যেমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, খুটি নাটি বিষয় তো দূরের কথা, বিশ্বাসের বিষয় পর্যন্ত শরীয়তের দলীল প্রমাণ বাদ দিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে বিধান জারী করা হয় এবং অকাট্য দলীল-প্রমাণ এবং অতীত মনীষীদের উক্তি পরিবর্তন করে তাকে ভুল আখ্যায়িত করা হয়।

২৪০. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বিধানের মোকাবিলায় বাপ দাদার অনুসরণ করে। এটাও শেরক। কোন কোন জাহেল মুসলমান বিধবা বিয়ে ইত্যাদি কালে রসম-রেওয়াজের ব্যাপারে এমন সব কথাবার্তা বলে আর অনেকে মুখে কিছু না বললেও তাদের আমল দ্বারা এটাই প্রতিভাত হয়। এসব কথা ও কাজ ইসলামের পরিপন্থী।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ

طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ

تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ

وَمَاۤ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَاۤ

اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٧٣﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ

مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ

اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا

يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ

اَلِيْمٌ ﴿١٧٤﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى

وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَاۤ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذٰلِكَ

بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿١٧٦﴾

১৭২. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো (খাওয়া দাওয়া ও পানাহারের ব্যাপারে) আমি সব পাক পবিত্র জিনিস তোমাদের দান করেছি তা তোমরা (নিঃশঙ্কচে ও নির্দিধায়) খাও, এবং (আমার দান সমূহ ভোগ করার সময়) আমারই শোকর আদায় করো। যদি তোমরা (নিজেদের বাপ দাদাদের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করে) একান্ত ভাবে আল্লাহকেই নিজেদের সর্বময় মাবুদ বলে বিশ্বাস করো।[২৪১]

১৭৩. তিনি অবশ্যই মৃত জন্তুর গোস্ত[২৪২], সব ধরনের রক্ত[২৪৩] ও শুকরের গোস্তকে[২৪৪] হারাম ঘোষনা করেছেন। এবং এমন সব জন্তুর গোস্তকেও হারাম করা হয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই কিংবা উৎসর্গ করা হয়েছে।[২৪৫] (তবে সে ব্যক্তির কথা আলাদা) যে নেহায়েত বিপদগ্রস্ত। যদি সে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আল্লাহর আইন ভংগ করার (ধৃষ্টতা কিংবা) সাহস না করে, অথবা (যে কতোটুকু হলে বিপদ ও ঠেকা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় তার চাইতে) বেশী ভোগ না করে, তাহলে (এই অপারগতার সময়ে 'হারাম' খেলে) তার কোনো গুনাহ হবে না।[২৪৬] বস্তুতঃ আল্লাহ পাক বড়োই ক্ষমাশীল। (মানুষ কষ্টের জীবন যাপন করুক এটা তার কাম্য নয়। কারণ তিনি) অনেক মেহেরবান।[২৪৭]

১৭৪. (হালাল হারাম সম্পর্কিত এসব বিধান মজুদ থাকা সত্বেও) যে সব ব্যক্তি আল্লাহর নাযিল করা- তার কেতাবের অংশ বিশেষকে গোপন করে রাখে[২৪৮] এবং (ক্ষেত্র বিশেষে) সামান্য (বৈষয়িক স্বার্থের) মূল্যে আল্লাহর এসব আদেশ নিষেধকে বিসর্জন দেয়।[২৪৯] (আল্লাহর বিধানের বিনিময়ে তারা যে বৈষয়িক ফায়দা হাসিল করে)। এ হচ্ছে জলন্ত আগুনের ফুলকি, যা দিয়ে তারা নিজেদের পেট ভর্তি করে রাখে।[২৫০] শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ পাক তাদের সাথে কথা বলবেন না।[২৫১] তিনি তাদের (পাপের পংকীলতা থেকে উদ্ধার করে) পবিত্রও করে দেবেননা।[২৫২] ভয়াবহ আযাব এদের জন্যেই নিদৃষ্ট করে রাখা হয়েছে।[২৫৩]

১৭৫. এদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, এরা হেদায়াতের (আলোকবর্তিকার) বদলে গোমরাহীর (অন্ধকার) পথ কিনে নিয়েছে। (এবং সঠিক পথে চললে আল্লাহর যে অনুগ্রহ পাওয়ার কথা সে) ক্ষমার বদলে (খোদাদ্রোহীতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম) কঠোর আযাবের পথ বেছে নিয়েছে।[২৫৪] (অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে), এরা ধৈর্য ও সবরের সাথে (ধীর ধীরে) ধৃষ্টতা ও অহংকার নিয়ে জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাবিত হচ্ছে।[২৫৫]

১৭৬. আল্লাহ পাক তো মানব জাতির জন্য এই নির্ভুল হেদায়াত সহকারে তার কেতাব নাযিল করেছেন। অতঃপর তার কেতাবে প্রদত্ত হেদায়াতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক পর্যায়ে যারা মতবিরোধে লিপ্ত হলো, তারা সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে অনেক দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো।[২৫৬]

---

২৪১. অর্থাৎ এসব কাফেরকে হেদায়াতের পথে ডাকা আর বন-জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারকে ডাকা এক কথা। তারা তো আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারে না। যাদের নিজেদের কোন জ্ঞান নাই আর এরা জ্ঞানীদের কথাও মানেনা, তাদের অবস্থাও অনুরূপ।

২৪২. অর্থাৎ এসব কাফেররা যেন বধির যে হক কথা শুনেনা, অন্ধ যে সোজা পথ দেখেনা, সুতরাং এরা কিছুই বুঝে না। কারণ, তাদের উপরোক্ত তিনটি শক্তিই যখন বিফলে গেছে তখন জ্ঞান-বুদ্ধি লাভ করার কি উপায়ই আর থাকতে পারে।

২৪৩. উপরে পাক-পবিত্র জিনিষ খাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছিল। কিন্তু মোশরেকরা যেহেতু শয়তানের আনুগত্য থেকে নিবৃত্ত হয়না এবং নিজেদের পক্ষ থেকে বিধান রচনা করে আল্লাহর ওপর তরোপ করে, বাপ -দাদার বাতেল রসম-রেওয়াজ ত্যাগ করে না এবং সত্য কথা অনুধাবন করার আর কোন অবকাশই তাদের নাই। সুতরাং এখন তাদেরকে বাদ দিয়ে বিশেষ করে মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে পাপ-পবিত্র বস্তু খাওয়ার জন্য। তাদের প্রতি প্রদত্ত এনাম-অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে শোকর আদায় করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঈমানদাররা যে অনুগত আর মোশরেকরা যে বাতেল-শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ও নাফরমান-আয়াতে সেদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২৪৪. এর অর্থ হচ্ছে যা আপনাপানি মরে গেছে, যাকে জবাই করার সুযোগ হয় নাই বা শরীয়তের নিয়মের বিরুদ্ধে জবাই বা শিকার করা হয়েছে, যেমন গলা টিপে মারা হয়েছে বা জীবন্ত পশুর কোন অংশ কেটে নেয়া হয়েছে বা কাঠ পাথর বা বন্দুক দ্বারা মারা হয়েছে বা ওপর থেকে পড়ে বা কোন জন্তুর স্রিঙ্গের আঘাতে মারা গেছে বা হিংস্র জন্তু যাকে চিরে ফেলেছে বা জবাই করার সময় ইচ্ছাপূর্বক আল্লাহর নাম বাদ দেয়া হয়েছে। এসব হচ্ছে মৃত এবং হারাম। অবশ্য হাদীস শরীফের নির্দেশ অনুযায়ী দুটি মৃত জানোয়ার আমাদের জন্য হালাল-মাছ এবং ফড়িং।

২৪৫. রক্তের অর্থ সে রক্ত, যা রগ থেকে নির্গত হয় এবং জবাইয়ের সময় প্রবাহিত হয়। দোশাতের সঙ্গে যে রক্ত মিশে থাকে, তা হালাল এবং পাক। গোস্ত না ধুঁয়ে পাকানো হলেও এ রক্ত খাওয়া হালাল, তবে পরিচ্ছন্নতার পরিপন্থী। অবশ্য কলিজা এবং তিল্লীর জমাট রক্ত হাদীস শরীফের হুকুম অনুযায়ী হালাল।

২৪৬. আর খিনযীর বা শূকর, তা জ্যান্ত হোক বা মৃত, বা শরীয়তের নিয়ম অনুযায় জবাই করা হোক সর্বাবস্থায়ই তা হারাম। তার গোস্ত-চামড়া-চর্বি-নখ-হাড্ডি,সব কিছুই

হারাম ও নাপাক। এসব দ্বারা কোন উপকার সাধন করা এবং কাজে লাগানো হারাম। এখানে যেহেতু খাওয়ার জিনিষের কথা বলা হচ্ছে, তাই শুধু গোশতের উল্লেখ করা হয়েছে ।

কিন্তু এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, নির্লজ্জতা-লোভ-লালসা এবং নাপাক অপবিত্র জিনিষের প্রতি শুকরের আকর্ষণ সব জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে বেশি আর এজন্যই আল্লাহ তা'লা তার সম্পর্কে বলেছেন, তাতো নিঃসন্দেহে নাপাক , তার অস্তিত্বই নাপাক তার কোন অংশই পাক নয়। তা দ্বারা কোন প্রকার ফায়েদা হাসিল করা জায়েয নেই। যারা বেশী করে তা খায় এবং তার অংশ দ্বারা ফায়েদা হাছিল করে, তাদের মধ্যেও উপরোক্ত খাসলাত প্রত্যক্ষ করা যায়।

২৪৭. আয়াতের এক অংশের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এ সব জানোয়ারের ওপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মূর্তি ইত্যাদির নাম নেয়া হয়। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মূর্তি জিন বা কোন পাপাত্মা বা কোন পীর-পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা এসব জন্তুর প্রাণ তাদের নামে উৎসর্গ করে তাদের নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে জবাই করা হয়, কেবল এদের সন্তুষ্টি লাভের জন্যই জন্তুটির প্রাণ বের করা উদ্দেশ্য হয়, এ সব জন্তু খাওয়া হারাম। এগুলো জবাইর সময় তাকবীর পড়লে এবং আল্লাহর নাম নিলেও হারাম। কারণ, এই প্রাণের যিনি শ্রষ্টা তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো নামে প্রান উৎসর্গ করা কিছুতেই দুরস্ত নাই। যে জন্তুর প্রাণ 'গাইরুল্লাহর' নামে উৎসর্গ করা হয়, তার অপবিত্রতা মৃত জন্তুর অপবিত্রতার চেয়ে বেড়ে যায়। কারণ, মৃত জন্তুর মধ্যে ত্রুটিতো ছিল এই যে, আল্লাহর নামে তার প্রাণ বহির্গত হয় নাই। আর এর প্রাণতো উৎসর্গ করা হয়েছে 'গায়রুল্লাহর' নামে, যা নিরেট শেরক। সুতরাং শূয়র-কুত্তা জবাই করার সময় যেমন আল্লাহর নাম নিলে তা হালাল হয় না, মৃত জন্তুর ওপর আল্লাহর নাম নিলেই কোন ফায়েদা হয় না, তেমনিভাবে কোন জন্তুকে 'গাইরুল্লাহর' নামে উৎসর্গ করে তাকে আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করলেই তা কখনো হালাল যেতে পারে না, তাতে কোন কল্যাণ, সাধিত থেকে পারেন। অবশ্য 'গাইরুল্লাহর' নাম নেয়ার পর তা থেকে তাওবা করে তা জবাই করলে পুনরায় তার হালাল হওয়ায় কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আলেমরা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, কোন বাদশাহের আগমনে তার সম্মানের নিয়তে কোন জন্তু জবাই করলে বা কোন জ্বিন এর অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য তার নামে কোন জন্তু-জানোয়ার জবাই করলে বা কামান-গোলা চালাবার জন্য বা ইটের পাঁজা ভালোভাবে পাকাবার জন্য উপঢৌকন হিসাবে কোন জন্তু জবাই করলে, তা হবে একেবারেই মৃত জানোয়ার এবং হারাম। আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে হবে মোশরেফ, যদিও জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি 'গায়রুল্লাহর' নৈকট্য এবং সম্মানের নিয়তে জানোয়ার জবাই করে, তার ওপর আল্লাহর লা'নত হোক। জবাইর সময় আল্লাহর পাক নাম উচ্চারণ করুক বা না করুক। অবশ্য আল্লাহর নামে জানোয়ার জবাই করে ফকীর-মিসকীনকে খাওয়াবে আর তার সাওয়াব পৌছাবে কোন

নিকটাত্মীয় বা পীর-বুযুর্গকে বা কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানী করে তার সাওয়াব তাকে দিলে তাতে কোন দোষ নাই। কারণ, এটা কিছুতেই 'গায়রুল্লাহর' জন্য জবাই নয়। অনেকে বাঁকা পথ অবলম্বন করে এসব উপলক্ষে কৌশল অবলম্বন করে বলে যে, পীরের নেয়ায ইত্যাদিতে আমাদের উদ্দেশ্য তো এই থাকে যে, খাবার তৈরী করে মৃত ব্যক্তির নামেই তা সদকা করে দেখা হবে। প্রথমে তো ভালো ভাবে বুঝে নেয়া উচিত যে, আল্লাহর সামনে মিথ্যা কৌশল দ্বারা ক্ষতি ছাড়া কোন উপকার সাধিক হতে পারেন। দ্বিতীয়ত. তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিৎ যে, তোমরা 'গায়রুল্লাহর' জন্য যে জানোয়ার নযর করেছ, সে জানোয়ারের পরিবর্তে সে পরিমাণ গোস্ত ক্রয় করত, রান্না পাক ফকীর, মিসকীনকে খাওয়ালে তোমাদের মতে বিনা দ্বিধায় সে নযর আদায় হয় কিনা? যদি বিনা দ্বিধায় তোমরা এটা করতে পার এবং তোমাদের মনে কোন রকম খুঁত খুঁতি থাকে না, তা হলে তোমরা সত্যবাদী, অন্যথায় তোমরা মিথ্যাবাদী এবং তোমাদের এ কাজ শেরক আর সে জানোয়ার মৃত এবং হারাম।

এখানে একটা সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, এ আয়াতে উপরোক্ত বিষয় গুলোর মধ্যে হারাম হবার হুকুমকে সীমাবদ্ধ করে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ এ বলেই মনে হয় যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়া অন্য কোন জানোয়ার বুঝি হারাম নয়। অথচঃ সমস্ত হিংস্র জন্তু গাধা-কুত্তা ইত্যাদি খাওয়া হারাম। এর এক জবাব তো এই যে, এর অর্থ এ নয় যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়া আর কিছুই হারাম নয়, যাতে কারো আপত্তির সুযোগ থাকতে পারে। বরং হারাম হবার হুকুমকে বিশুদ্ধতা-সত্যতার সঙ্গে বিশেষিত করে এ হুকুমের বিপরীত দিককে বাতিল করাও এর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কথা এ যে, আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য এ জিনিষগুলো হারাম করে দিয়েছেন, এতে অন্য কোন সন্দেহের অবকাশ নেই অর্থাৎ এগুলোকে হালাল মনে করা একেবারেই ভুল ও বাতিল। দ্বিতীয় জবাব এই যে, হারাম হবার হুকুমকে উপরোক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ বলেই ধরে নেয়া হবে। কিন্তু এ সীমাবদ্ধতাকে বিশেষ ও জিনিষগুলোর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ বলে স্বীকার করে নেয়া হবে, মোশরেকরা নিজেদের পক্ষ থেকে সেসব জিনিষকে হারাম করে নিয়ে ছিল। যেমন 'বাহীরা' 'সায়েবা' ইত্যাদি যে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। অর্থ এ দাঁড়ায় যে, আমি তো তোমাদের ওপর কেবল মৃত জন্তু শূকর ইত্যাদি হারাম করেছিলাম, তোমরা সে ষাঁড় ইত্যাদিকেও সম্মানের বলে মনে কর, এটা নিছক তোমাদেরই মনগড়া ব্যাপার। অবশিষ্ট রয়েছে হিংস্র জন্তু ও খবীস জানোয়ার। এগুলো হারাম, সে ব্যাপারে মোশরেকদেরও কোন বিরোধ বিতর্ক ছিলনা। সুতরাং এ সীমাবদ্ধতা সেসব জানোয়ারের ক্ষেত্রে মুশারেকরা সেগুলোকে আল্লাহর হুকুমের বিপরীত নিজেদের পক্ষ থেকে হারাম করে নিয়েছিল। সারা দুনিয়ার সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক, যাতে এই আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ হবে।

২৪৮. অর্থাৎ উপরে উল্লেখিত জিনিষগুলো হারাম। কিন্তু কারো যদি ক্ষুধায় মরার দশা হয়, তবে নিরুপায়-অবস্থায় তার জন্য তো খাওয়ার অনুমতি আছে। অবশ্য শর্ত এই

যে, না-ফরমানী এবং অতিরঞ্জিত করবেনা। না-ফরমানী এই যে, নিরুপায় না হয়েও খেতে শুরু করবে, আর অতিরঞ্জিত এই যে, প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে বেশী খাবে, পেট ভরে খাবে। ঠিক এমন পরিমাণ খাবে, যাতে সে না মরে।

২৪৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তো বড় ক্ষমাশীল, বান্দাহদের সব রকম গুনাহ তিনি ক্ষমা করেন। সুতরাং এমন নিরুপায়-অপারগ ব্যক্তির গুনাহ কেন ক্ষমা করবেন না। তিনি তার বান্দাহদের প্রতি বড়ই মেহেরবান যে, নিরুপায় অবস্থায় সাফসাফ অনুমতি দিয়েছেন যে, সেভাবেই হয়, নিজেদের জীবন বাঁচাও। নিষিদ্ধ হবার মূল হুকুম তোমাদের ওপর থেকে তুলে নেয়া হয়েছে। অন্যথায় রাজা ধিরাজের এ অধিকার ছিল যে, তিনি বলে দিতে পারতেন, তোমাদের জান যায় যাক, কিন্তু কোন অবস্থায়ই আমাদের হুকুমের খেলাফ করবেনা। এখানে মনে একটা খুঁতখুঁতি দেখা দিতে পারে যে, এক গ্রাস খেলে প্রাণ বাঁচবে আর এর চেয়ে বেশী খাবে না ক্ষুধায় কাতর ব্যক্তির পক্ষে এটা ঠিক করা অসম্ভব না হলেও দুষ্কর অবশ্যই। আয়াতের শেষ কথাটি বলে বিষয়টি অনেকটা সহজ করে দিয়েছেন।

২৫০. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আসমানী কিতাবে হালাল হারামের যে বিধান দিয়েছেন, ইহুদীরা তা গোপন করে তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করেছে। যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনি ভাবে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর যেসব গুণাবলী তাতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদীরা তাও গোপন এবং পরিবর্তন করতো। এ দুটি বড় গুনাহের কাজ। তাদের মত এই যে, হেদায়াত ও সত্য পথ কেউ লাভ না করুক, সকলেই গোমরাহ থাকুক। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা তো মানুষের হেদায়াতের জন্য কিতাব এবং রাসূল প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তারা তো খোদারও খেলাফ করেছে। আর মানুষকেও গোমরাহ করতে চেয়েছে।

২৫১. অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানী এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে গোমরাহ করেই এরা ক্ষান্ত থাকেনি বরং সত্য গোপনের বিনিময়ে যাদেরকে গোমরাহ করতো, তাদের কাছ থেকে ঘুষও গ্রহণ করতো। তারা এই ঘুসের নাম দিয়েছিল 'হাদিয়া' নযর আর শুকরানা বখশিশ। অথচ এ হারাম খাওয়া মৃত জন্তু এবং শূকর খাওয়ার চেয়েও নিকৃষ্ট। এখন এটা স্পষ্ট যে, এমন জঘন্য কাজের শাস্তিও হবে কঠোর, পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

২৫২. অর্থাৎ যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে সে মাল তাদের কাছ সুস্বাদু এবং পরিচ্ছন্ন বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে তা তো হচ্ছে আগুন, নিজেরা খুশী হয়ে তা পেটে ভরছে। যেমন সুস্বাদু খাদ্যে বিনাশী বিষ মিশ্রিত রয়েছে। খেতে খুব স্বাদুই মনে হয়, কিন্তু পেটে গিয়ে তা আগুন জ্বালায়ে দেয়।

২৫৩. এখানে কারো সন্দেহ থেকে পারে যে, অন্যান্য আয়াত থেকে তো জানা যায় যে, আল্লাহ তা'য়ালা কেয়ামতের দিন তাদেরকে সম্বোধন করবেন। সুতরাং এখানে কথা না বলার অর্থ এই যে, দয়া রহমতের সাথে যাদের সঙ্গে কথা বলবেননা। ভয় দেখানো, লাঞ্ছিত করা হুমকী ধমকী এবং শাস্তি স্বরূপ তাদের সঙ্গে সেদিন আল্লাহ তা'য়ালা কথা

বলবেন। এর ফলে তারা ভীষণ আঘাত পাবে, দুঃখ ভোগ করবে। অথবা এমনও বলা যায় যে, সরাসরি তাদের সঙ্গে কথা বলা অবশ্যই হবে না। কথা বলার যে উল্লেখ রয়েছে যা শাস্তির ফেরেশতাদের মাধ্যমে করা হবে।

এই হুমকী থেকে জানা যায় যে, সকলের অন্তরের গভীরে আল্লাহর ভালোবাসা প্রোথিত, যদিও তৎক্ষণাৎ অনুভূত হয় না। এটাকে ছাইয়ের নীচে চাপা আগুন বলা যেতে পারে। কেয়ামতের দিন যখন প্রতিবন্ধক দূর হবে, তখন এটা ভালোভাবে প্রকাশ পাবে। কারণ, এটা না হলে কাফেরদের জন্য এ হুমকী হবে দুশমনকে অসন্তুষ্টি আর অবাধ্যতা সম্পর্কে ভয় দেখানোর মতো নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। প্রিয়জনের এড়িয়ে চলাকে প্রেমিকরা প্রাণ সংহারক ব্যথা বলে মনে করে থাকে। তারা এটাকে শত্রুতা বলে মনে করে না। সুতরাং জানা যায় যে, কেয়ামতের দিন প্রতিটি অন্তর আল্লাহর ভালোবাসায় এমন পরিপূর্ণ থাকবে যে, এ অমনোযোগিতা তাদের কাছ দোযখের আযাব থেকেও বেশী পীড়াদায়ক বলে মনে হবে।

২৫৪. অর্থাৎ ঈমানদাররা যতই গুনাহগার হোকনা কেন, একটা নির্দিষ্ট সময় দোযখে কাটালে গুনাহ থেকে পাক করে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর কাফেররা এর বিপরীত, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। সেখান থেকে কোনদিনই তারা জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হবে না। শেরেকী কাজ কারবার তাদেরকে মূলতই নাপাক করে ফেলেছে। তাদের এ নাপাকী কখনো দূর হওয়ার নয়। পাপী মুসলমানের অবস্থা এমন হবে। যেমন পাক জিনিসের ওপর নাপাকী লেগেছে। নাপাকী দূর করে তাকে পাক করা যায়।

২৫৫. মূলতঃ এর চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক আযাব আর কি হতে পারে যে, বাহ্য দেহ অতিক্রম করে তাদের বাতেনেও আগুন ধরিয়ে দেবে। আসল স্রষ্টাই তাদের ওপর নাখোশ হবেন। অতঃপর এ প্রাণান্তকর মুসিবত থেকে তারা কখনো নাজাত লাভ করবেনা। নাউযু বিল্লাহ!

২৫৬. অর্থাৎ তারা নিঃসন্দেহে এর যোগ্য। কারণ, তারা নিজেরাই নাজাতের পুঁজি নষ্ট করেছে। হেদায়াতের মোকাবিলায় গোমরাহীকেই পছন্দ ও অবলম্বন করেছে। মাগফেরাতের কারণ ত্যাগ করে আযাবের কারণ কে মনযুর করে নিয়েছে।

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ ج وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ لا وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ ج وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ج
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ج وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ط أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا ط وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

রুকু ২২

১৭৭. তোমরা পূর্ব দিকে মুখ করলে, না পশ্চিম দিকে মুখ করলে- এতে (কিংবা এই বাহ্যিক অনুষ্ঠানিকতার মাঝে) সত্যিকার অর্থে কোনোই কল্যাণ নিহিত নেই।২৫৭

(এটা আসলে তেমন কোনো বিষয়ও নয়, আসল নেকীর ব্যাপার হচ্ছে (যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতার উর্ধে উঠে) একজন মানুষ আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, পরকালের ওপর ঈমান আনবে, ঈমান আনবে আল্লাহর ফেরেশতাদের ওপর, আল্লাহর কেতাবের ওপর (যাদের ওপর এই কেতাব নাযিল করা হয়েছে সেই পুন্যাত্মা) নবী রাসূলদের ওপর এবং আল্লাহর দেয়া মাল সম্পদ তারই ভালোবাসা পাবার মানসে (অকাতরে) আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম মিসকিন ও পথিক মুসাফিরের জন্যে ব্যয়

করবে, সাহায্য প্রার্থী দুঃস্থ মানুষ সর্বোপরি মানুষদের (সব ধরনের কয়েদ ও দাসত্বের) বন্দী দশা থেকে মুক্ত করার কাজে অর্থ ব্যয় করবে, আবার (ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে) নামায প্রতিষ্ঠা করবে।

(দারিদ্র মুক্ত করার জন্যে) যাকাত আদায় করবে, (তাছাড়া রয়েছে) এই পুণ্যবান মানুষ যারা প্রতিশ্রুতি দিলে তা (অক্ষরে অক্ষরে) পালন করে, ক্ষুধা দারিদ্রের সময় ও (হক ও বাতিলে দ্বন্ধের) দুর্দিন ও দুঃসময়ে কঠোর ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে[২৫৮] (মূলতঃ এরাই হচ্ছে প্রকৃত 'নেক' লোক)। এরাই হচ্ছে (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী এবং এরাই হচ্ছে প্রকৃত আল্লাহ ভীরু ব্যক্তি।[২৫৯]

---

২৫৭. অর্থাৎ নিজেদের খুশীতে জাহান্নামে যাওয়ার পথ অবলম্বন করেছে। যেন আগুন তাদের অতি প্রিয় কাংখীত বস্তু। নিজেদের জান-মালের বিনিময়ে তারা তা ক্রয় করছে। তা না হলে সকলেইতো জানে যে, আগুনের আযাবের সময় ছবর করা কেমন।

২৫৮. অর্থাৎ হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী এবং মাগফেরাতের পরিবর্তে আযাব ক্রয় করার দলীল বা তাদের প্রতি পূর্বে উল্লেখিত নানা প্রকার আযাব হবার কারণ এই যে, আল্লাহ যে সত্য কিতাব নাযিল করেছেন তারা তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তাতে নানা ধরণের মতভেদ করেছে এবং বিরোধিতা ও শত্রুতায় দূরে সরে গেছে। অর্থাৎ তারা বিরাট বিরুদ্ধাচরন করেছে বা সত্য পথ থেকে দূরে সরে গেছে। একটা সূরত এও হতে পারে যে, আগুনের ওপর তাদের ধৈর্য্য-ধারণকারী হওয়া যেহেতু বাহ্যতঃই বাতিল বলে প্রতিভাত হয়, তাই এখান থেকে শেষ পর্যন্ত কথাগুলো দ্বারা এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একথাটা ভাল করে বুঝে নিতে হবে।

২৫৯ পূর্বের আয়াতে নিজেদের খারাপ পরিণামের কথা শুনে ইহুদী-খৃষ্টানরা বলে উঠযে, হিদায়াত ও মাগফেরাতের অনেক কারণ, লক্ষণ তো আমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছে। একটা স্পষ্ট বিষয় তো এই যে, যে কেবলার দিকে মুখ করার জন্য আমাদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে। তারই প্রতি মুখ করে আমরা সর্বোত্তম এবাদাত নামায আদায় করি, আর তা করি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী। এরপরও এসব খারাবী এবং আযাবের যোগ্য আমরা কি করে হতে পারি। তাদের এ ধারণার প্রতিবাদ করে বলা হচ্ছে যে, মাগফেরাত ও হেদায়েতের জন্য সেই নেকীটি যথেষ্ট, তা কেবল এটিই নয় যে, তোমরা নামাযে পূর্ব বা পশ্চিমে মুখ করবে। আকায়েদ এবং জরুরী আমলের কোন পরোওয়া-ই করবেনা।

অর্থাৎ যে নেকী এবং কল্যাণ হেদায়াতের চিহ্ন ও মাগফেরাতের কারণ হতে পারে, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ, রোয কেয়ামত, সমস্ত ফেরেস্তা, আসমানী কিতাব এবং নবীদের প্রতি অন্তরে ঈমান এনে বিশ্বাস স্থাপন করা। ধন সম্পদের আকাংখ্যা আর ভালোবাসা ছাড়াও তা নিকটাত্মীয়, এতীম, গরীব-মুসাফির এবং অভাবী ভিখারীকে দান

করা, দান মুক্ত করা অর্থাৎ কাফেররা যুলুম করে সেসব মুসলমানকে বন্দি করেছে, তাদের, মুক্ত করার কাজে ব্যয় করা, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ থেকে মুক্ত করা, দাস মুক্ত করা, সে দাসকে টাকার বিনিময়ে মুক্ত করে দিতে মুনীব প্রস্তুত, তাকে টাকা দিয়ে মুক্ত করা, বিশুদ্ধভাবে নামায আদায় করা, স্বর্ণ রৌপ্য এবং সমস্ত বাণিজ্য পণ্যের যাকাত আদায় করা, ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করা, অভাব-দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধী কষ্ট এবং ভয়-ভীতিতে ধৈর্য ধারণ করা। ইহুদী খৃষ্টানরা যেহেতু এসব আকীদা-বিশ্বাস এবং আমল আখলাকে ক্রটিপূর্ণ ছিলো এবং অবহেলা করতো, তারা এসবের ক্ষেত্রে নানা প্রকার ভিন্ন ঘটাতো, কুরআনের আয়াতেই এর উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এখন ইহুদী-খৃষ্টানদের নিজেদের কেবলার দিকে মুখ করার জন্য গর্ব কর এবং নিজেদেরকে হেদায়াতের পথে অবিচল মনে করে মাগফেরাতের যোগ্য বিবেচনা করা নিছক ভ্রান্ত ধারনা। এ আয়াতে উল্লেখিত বিশ্বাস এবং আমল ও আখলাক বাস্তবায়ন না করে কেবল 'কেবলা মুখী' হলে হেদায়াত তাদের ভাগ্যে জুটবেনা, খোদায়ী আযাব থেকেও তারা নাজাত পাবেনা।

অর্থাৎ যারা উপরোক্ত বিশ্বাস এবং আমল আখলাকে ভূষিত, তারাই ঐশ্বর্য এবং দ্বীন ও ঈমানের ব্যাপারে সত্যবাদী বা তারা সত্যবাদী নিজেদের কথা আর অঙ্গীকারে। আর তারাই নিজেদের আখলাক আর আমলের ব্যাপারেও পরেহজগার মোত্তাকী। গুনাহ, খারাপ কাজ এবং খোদার আযাব থেকে এরাই মুক্ত থাকবে। আহলে কিতাবের মধ্যে তো এসব গুণের একটি লোকও বর্ত্তমান নেই, নিজেদের জন্য এমন ধারণা করা তাদের জন্য কি করে ঠিক হতে পারে।

يَـٰٓأَيُّهَا

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ط

اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ط

فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ

وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

وَرَحْمَةٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ

أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ
بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا
أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

১৭৮. হে মানুষ, যারা আমার ওপর ঈমান এনেছো– তোমাদের সমাজে নরহত্যার 'কেসাস' প্রতিশোধ (কি ভাবে নিতে হবে সে আইন) নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।[২৬৬] এবং তা এই যে, মৃত্ত স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি দন্ডাজ্ঞা পাবে। 'দাসের' বদলে পাবে দাস। নারীর বদলে নারীর (ওপর বিধান প্রযোজ্য) হবে।

অবশ্য কোনো হত্যাকারীকে যদি (যাকে হত্যা করা হয়েছে তার পরিবারের লোকেরা কিংবা) তার ভাই (কিছু দন্ড মওকুফ করে) ক্ষমা করে দিতে চায়; তাহলে কোনো ন্যায়ানুগ পন্থা অনুসরণ করে তার বিচার করতে হবে। এবং একান্ত নিষ্ঠার সাথে তখন হত্যার বিনিময় আদায় করা অপরিহার্য হবে।[২৬৭]

এটা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর তায়ালার পক্ষ থেকে দন্ড হ্রাস (করার উপায়) ও একটি অনুগ্রহ মাত্র।[২৬৮] যদি কেউ এরপরও বাড়াবাড়ি করে, তাহলে (জেনে রাখা উচিৎ) তার জন্যে অপেক্ষা করছে কঠোর শাস্তি।[২৬৯]

১৭৯. হে (পৃথিবীর) বিবেকবান লোকেরা! আল্লাহর নির্ধারিত এই 'কেসাসে'র মাঝেই (সত্যিকার অর্থে) তোমাদের (সমাজ ও জাতির) 'জীবন' নিহিত আছে।২৭০ আশা করা যায় অতপর তোমরা সতর্ক হয়ে চলবে।

১৮০. আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের জন্যে এই আদেশ জারী করা হয়েছে যে, যদি তোমাদের মাঝে কোনো লোকের মৃত্যুর সময় এসে হাযীর হয় এবং সে যদি কিছু সম্পদ রেখে যায়, তাহলে যেন সম্মানজনক ও ন্যায়ানুগ পন্থায় (বন্টনের জন্যে) তার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের নামে সে 'অসিয়ত' করে যায়। এটা তাদের জন্যে করণীয়– যারা আল্লাহকে ভয় করে।২৭১

১৮১. (অতপর সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে গেলে) যারা তার অসীয়াত শুনে নেয়ার পর (নিজেদের স্বার্থে) তা পাল্টে নিলো- (তাদের জানা উচিৎ অসীয়াত বদলানোর এ জঘন্য অপরাধের দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তাবে (মৃত ব্যক্তির ওপর নয়) কারণ, আল্লাহ তায়ালা তো (এ ব্যাপারে সবার) সব কিছুই শুনেন এবং (সবার ভেতর বাইরের) সকল কিছুই তার জানা।২৭২

১৮২. অবশ্য কারো যদি এ ধরনের আশংকা থাকে যে, মৃত ব্যক্তি (অসীয়ত করার সময় জেনে কিংবা না জেনে-পক্ষপাতিত্ব করে) কারো প্রতি অবিচার করে গেছে, কিংবা কারো সাথে এর ফলে (মারাত্মক ধরনের) না-ইনসাফী করা হয়েছে এ মতাবস্থায় সে যদি (সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসে এবং) সবার মধ্যে মূল বিষয়টির সংশোধন করে দেয়- এতে তার কোনো দোষ হবে না২৭৩, আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল- তিনি অনেক মেহেরবান২৭৪।১

---

২৬২. জাহেলী যুগে ইহুদী এবং আরবরা নিয়ম করে রেখেছিলো যে, শরীফ বংশের গোলামের বদলে নিম্ন বংশের আযাদ লোককে, নারীর বদলে নরকে এবং একজন আযাদের বদলে দু'জনকে কেসাসে হত্যা করা থেকো। আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে নির্দেশ দেন যে, ঈমানদাররা! নিহতদের ব্যাপারে আমি তোমাদের ওপর সমতা ফরয করেছি। অভিধানে কেসাস অর্থ হচ্ছে সমান সমান-বরাবর, সমতা। তোমারা নিয়ম করে নিয়েছ যে, শরীফ আর সাধারণের মধ্যে পার্থক্য কর, এটা ভুল, সকলের জীবন এক সমান; সে গরীব হোক কি আমীর, শরীফ হোক, কি সাধারণ আলেম-কামেল হোক কি জাহেল, জওয়ান হোক, কি বৃদ্ধ, সুস্থ শিশু হোক কি অসুস্থ মৃতপ্রায়, জ্বালা-নোড়া হোক কি সর্বাঙ্গ সুস্থ। সবাই এর সমান।

আগের আয়াতে নেকী ও ভালো কাজের মূলনীতি উল্লেখিত হয়েছে, হিজরত এবং মাগফেরাত যার ওপর নির্ভর করে। এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আহলে কিতাবরা এসব গুণাবলী থেকে মুক্ত। স্পষ্ট করে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, এসব গুণাবলী ছাড়া দ্বীনের ব্যাপারে কেউ সত্য এবং মুত্তাকী হতে পারেনা। মুসলমানরা ছাড়া আহলে কিতাব এবং আরবের জাহেলরা এ মানদন্ডে উত্তীর্ণ হতে পারে না। তাই সকলের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে

এখন ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে। নেকী এবং কল্যাণের ভিন্ন শাখা, দৈহিক এবং আর্থিক এবাদাত এবং নানাবিধ মোয়ামোলাত তাদেরকে বলে দেয়া হচ্ছে। কারণ, উপরে উল্লেখিত নীতিতে যারা অটল অবিচল কেবল তারাই এসব শাখা প্রশাখায় উত্তীর্ণ হতে পারে। অন্যদেরকে তো এ ব্যাপারে সম্বোধনের যোগ্যই মনে করা হয়নি। তাদের জন্য এটা বড় লজ্জার বিষয় হওয়া উচিৎ। এখন যেসব খুঁটিনাটি বিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে মূলতঃ ঈমানদারদের হেদায়াত এবং শিক্ষা দান করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে কোথাও স্পষ্ট করে আবার কোথাও ইশারা-ইঙ্গিতে অন্যদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কেও সর্তক করে দেয়া হবে। যেমন এ আয়াতে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইহুদী এবং অন্যরা কেসাসে যে নিয়ম করে নিয়েছে, তা তাদের ভিত্তিহীন আবিষ্কার, খোদায়ী হুকুমের পরিপন্থী। এ থেকে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, উপরে উল্লেখিত মূলনীতিতে তাদের সত্যিকার ঈমান নেই। নবীদের সম্পর্কেও নেই তাদের সত্যিকার ঈমান। তাছাড়া খোদার ওয়াদা-অঙ্গিকারও তারা পূর্ণ করেনি। কঠোরতা আর বিপদপথে তারা ধৈর্যও ধারণ করেনি। অন্যথায় নিজেদের কোন বন্ধু বা নিকটাত্মীয়ের হত্যায় এতটা অধৈর্য এবং স্বার্থপরতা দেখাতো যে, খোদার ফরমান, নবীদের ইরশাদ এবং কিতাবের নির্দেশ সব কিছু উপেক্ষা করে নিরপরাধীকে হত্যার নির্দেশ দিতো।

যে সমতার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা তার ব্যাখ্যা। অর্থ এই যে, একজন আযাদ পুরুষের কেসাসে কেবল একজন আযাদ পুরুষকেই হত্যা করা যাবে, যে তাকে হত্যা করেছে। এ নয় যে, হত্যাকারীর বংশের যাকেই পাওয়া যায়, যত জনকে সম্ভব-হত্যা করবে।

অর্থাৎ প্রত্যেক গোলাম-দাসের বদলে সে গোলাম- দাসকেই হত্যা করা হবে, যে হত্যা করেছে। কোন শরীফ ব্যক্তির গোলামের কেসাসে হত্যাকারী গোলামকে বাদ দিয়ে সাধারণ লোকদের মধ্য থেকে যাদের গোলাম হত্যা করেছে, কোন আযাদকে হত্যা করবে-এমনটি হতে পারবেনা।

অর্থাৎ প্রত্যেক নারীর কেসাসে কোন হত্যাকারী নারীকেই হত্যা করা হবে। এটা হতে পারবেনা যে, শরীফ বংশের নারীর কেসাসে হত্যাকারিণী সেই মর্যদার নারীকে বাদ দিয়ে তাদের কোন পুরুষকে হত্যা করতে শুরু করবে। সার কথা এই যে, আযাদ আযাদের এবং গোলাম গোলামের বরাবর। সুতরাং কেসাসের বিধানে সমতা বজায় রাখতে হবে। আহলে কিতাব এবং আরবের জাহেলরা যে বাড়াবাড়ী ও সীমা লংঘন করতো, তা নিষিদ্ধ।

আযাদ ব্যক্তি কোন গোলামকে বা পুরুষ কোন নারীকে হত্যা করলে কেসাস নেয়া হবে কিনা? আলোচ্য আয়াতে করীমায় এ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। এ ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) 'প্রাণের বদলে প্রাণ' এ আয়াতে এবং 'মুসলমানদের রক্ত এক সমান' এ হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করে বলেন

যে, এ ক্ষেত্রেও কেসাস গ্রহণ করতে হবে। সবল আর দুর্বল, সুস্থ আর অসুস্থ, সক্ষম আর অক্ষম যেমন কেসাসের বিধানে এক সমান, তেমনি আযাদ আর গোলাম এবং নারী আর পুরুষও কেসাসে ইমাম আবু হানীফার মতে এক সমান। অবশ্য এ জন্য শর্ত এই যে, নিহত গোলাম তার হত্যাকারীর গোলাম হতে পারবেনা। তাঁর মতে কেসাস বিধানে এটা ব্যতিক্রম। কোন মুসলমান যদি কোন যিম্মী কাফেরকে হত্যা করে, তা হলেও কেসাস হবে। অবশ্য তিনি মুসলমান এবং কাফের মধ্যে হরবীর কেসাস স্বীকার করেন না।

অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে কোন একজনও যদি রক্ত মাফ করে দেয়, তখন আর কেসাসে হত্যাকারীকে হত্যা করা যায়না। বরং দেখতে হবে, ওয়ারিসরা কিভাবে মাফ করেছে, কোন অর্থ বিনিময় ছাড়া নিছক সওয়ারের উদ্দেশ্যে মাফ করেছে, না শরীয়ত সম্মত (রক্তপণ) দিয়ে বা সমঝোতা হিসাবে কিছু পরিমাণ অর্থ গ্রহণে সম্মত হয়ে কেবল কেসাস থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। প্রথম অবস্থায় হত্যাকারী ওয়ারিসদের দাবী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় হত্যাকারীর উচিৎ ভালো ভাবে স্বানন্দ চিত্তে বিনিময় পরিশোধ করা।

২৬৭. ইচ্ছাপূর্বক হত্যার ক্ষেত্রে ইচ্ছা করলে কেসাস গ্রহণ করবে, ইচ্ছা করলে দিয়াত বা রক্তপণ গ্রহণ করবে বা মাফ করে দেবে- এ অনুমতি আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস উভয়ের জন্য সুযোগ এবং মেহেরবানী। পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি এ মেহেরবানী করা হয়নি। ইহুদীদের ওপর বিশেষ কেসাস ছিলো। আর খৃষ্টানদের ওপর দিয়াত অর্থাৎ রক্তপণ বা ক্ষমা নির্দিষ্ট ছিলো।

২৬৮. অর্থাৎ এ লঘুকরণ এবং রহমতের পরও কেউ যদি বিরুদ্ধাচরণ করে, জাহেলি নিয়ম-নীতি মেনে চলে বা ক্ষমা এবং দিয়াতের পরও যদি হত্যাকারীকে হত্যা করে, তবে তার জন্য রয়েছে আখেরাতে কঠোর আযাব বা এখনি তাকে হত্যা করা হবে।

২৬৯. অর্থাৎ কেসাসের বিধান বাহ্য দৃষ্টিতে কঠোর মনে হলেও জ্ঞানবান ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, এই বিধান মহা জীবনের কারণ। কেননা, কেসাসের ভয়ে একে অপরকে খুন করা থেকে বিরত থাকলে উভয়ের প্রাণ-ই রক্ষা পাবে। আর কেসাসের কারণে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ের দলও হত্যা থেকে নিশ্চিত ও নিরাপদ থাকবে। আরবে এমনটি ঘটতো যে, হত্যাকারী কিনা, তা বিচার-বিবেচনা না করেই নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসরা যাকেই সামনে পেতো নির্বিবাদে হত্যা করতো। আর এর ফলে একটা প্রাণের বিনিময়ে উভয় পক্ষের হাজার হাজার জীবন নষ্ট হতো। নির্দিষ্ট হত্যাকারীর কাছ থেকে কেসাস নেয়ার ফলে এসব জীবন রক্ষা পেয়েছে। এর এ অর্থও হতে পারে যে, কেসাস-হত্যাকারীর জন্য পরকালের জীবনের কারণ।

২৭০. অর্থাৎ বিরত থাক কেসাসের ভয়ে কাকেও হত্যা থেকে, বা কেসাসের ভয়ে আযাবে আখেরাত থেকে বেঁচে থাক বা এজন্য যে, কেসাসের তাৎপর্য তোমরা জানতে পেরেছ। সুতরাং এর বিরোধিতা অর্থাৎ কেসাস ত্যাগ থেকে বিরত থাক।

২৭১. প্রথম বিধান ছিলো কেসাস অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে। এখন এ দ্বিতীয় বিধান তার মাল সম্পর্কে। উপরে উল্লেখিত মূলনীতিতে (অর্থ সম্মানের প্রতি ভালোবাসা স্বত্বেও নিকটাত্মীয়কে তা দান করে।) একে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, এখানে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতীতে এ নিয়ম ছিলো যে, মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি তার স্ত্রী-পুত্র বিশেষ করে সন্তানদেরকে দেয়া হত। মাতা-পিতা এবং অন্যান্য কাছাআত্মীয়রা বঞ্চিত হতো। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মাতা পিতা এবং সমস্ত নিকটাত্মীয়কে ইনসাফ অনুযায়ী দিতে হবে। মৃত ব্যক্তির জন্য এই অনুপাতেই ওসিয়ত ফরয হয়েছে। আর এ ওসিয়ত ফরয ছিলো তখন, যখন পর্যন্ত মীরাসের আয়াত নাযিল হয়েছে। আর ওসিয়ত করায় ছিলো তখন, যখন পর্যন্ত মীরাসের আয়াত নাযিল হয়নি। সূরা নিসায় মীরাসের বিধান নাযিল হলে আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই সকলের হিশ্যা নির্ধারণ করে দেন। তখন আর মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ওসিয়ত করা নিয়ম বাকী থাকেনি। এর প্রয়োজনই ছিলনা। অবশ্য এখন ওসিয়ত করা মুস্তাহাব। কিন্তু ওয়ারিসের জন্য ওসিয়ত করা জায়েয নাই। এক তৃতীয়ংশ সম্পদের বেশী সম্পর্কে ওসিয়ত করা যাবেনা। হাঁ অবশ্য কোন ব্যক্তির ঋণ-আমানত ইত্যাদি সম্পর্কে বিরোধ থাকলে সেক্ষেত্রে এখনো ওসিয়ত ফরয।

২৭২. অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি তো ইনসাফের সঙ্গে ওসিয়ত করে মারা গেছে, কিন্তু যাদের দেয়ার কথা, তারা তা কার্যকর করেনি। তখন মৃত ব্যক্তির কোন গুনাহ হবেনা। সে-তো তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। তারাই গুনাহগার হবে। যারা এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে নিশ্চয়ই আল্লাহ-সকলের কথা শুনেন এবং সকলের নিয়ত সম্পর্কে জানেন।

২৭৩. অর্থাৎ কারো যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে এ আশংকা বা জ্ঞান হয় যে, সে কোন ভাবে ভুল করেছে, অন্যায়ভাবে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছে বা জেনে শুনে আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ওসিয়তের হকদার এবং ওয়ারিসদের মধ্যে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করে দিয়েছে। তাতে কোন গুনাহ হবেনা। ওসিয়তে এই পরিবর্তন জায়েয এবং উত্তম।

২৭৪. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তো গুনাহগারদেরকে মাফও করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি সংশোধনের উদ্দেশ্যে একট খারাপ কাজ থেকে সকলকে রক্ষা করেছে, তাকে অবশ্যই মাফ করা হবে। অথবা এভাবে বলা যায় যে, যে ব্যক্তি নাজায়েয ওসিয়ত করেছিলঃ কিন্তু তা বুঝতে পেরে জীবদ্দশায়ই তা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে, আল্লাহ এমন ওসিয়তকারীকে ক্ষমা করবেন।

تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم
مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ
وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ
مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

রুকু ২৩

১৮৩. হে মানুষ তোমরা যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছো তাদের ওপর রোযা ফরজ করে দেয়া হয়েছে- যেমনি করে ফরজ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তি (নবীর অনুসারী) লোকদের ওপর[২৭৬], যেন এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলতে পারো।[২৭৭] (তোমাদের মনে এই রোযা আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করতে পারে)।

১৮৪. (তাও আবার সারা বছরের জন্যে নয়- রোযা ফরজ করা হয়েছে) হাতে গনা কয়েকটি দিনের জন্যে।[২৭৮] (তারপরও তোমাদের) কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায় কিংবা কেউ যদি সফরে থাকে- সে ব্যক্তি সমপরিমাণ দিনের রোযা (সুস্থ হয়ে গেলে অথবা সফর থেকে ফিরে এলে) পরে আদায় করে নেবে।[২৭৯] এরপরও যাদের জন্যে রোযা রাখা একান্ত কষ্টকর ব্যাপার বলে মনে হবে তাদের জন্যে এর বিনিময় (ফিদিয়া) হচ্ছে একজন গরীব ব্যক্তিকে (তৃপ্তি ভরে) খাবার দেয়া।[২৮০]

যদি কোনো ব্যক্তি (এর চাইতে বেশী পরিমাণ লোকদের খাবার দিয়ে ভালো কাজ করতে চায় তাহলে (তার এই অতিরিক্ত কাজ বিফলে যাবে না, তার জন্যে) তাকে অবশ্যই পুরস্কৃত করা হবে।[২৮১] তবে একথা ঠিক যে, তোমরা যদি রোযা রাখো তা তোমাদের জন্যেই ভালো, হাঁ তেমরা যদি রোযার উপকারীতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হও![২৮২] (তাহলে জানা কথাই তোমরা রোযার হক আদায় করবে!)

১৮৫. রোযার মাস হচ্ছে এমন একটি মাস যাতে কোরআন নাযিল করা হয়েছে। আর এই কোরআন হচ্ছে মানব জাতির জন্যে পথের দিশা- (সত্য পথ অনুসরণকারী মানুষের জন্যে সুস্পষ্ট প্রমাণ সম্বলিত পথ নির্দেশ- এই পুস্তক) মানুষদের (সঠিক পথ বাতলে দেয় এবং জীবনের সামনে) হক বাতিলের সীমারেখা বলে (চিহ্নিত করে) দেয়।[২৮৩] অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাসটি পাবে, সেই এই মাসে রোযা রাখবে[২৮৪], তবে হাঁ যে অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিংবা সফরে বেরিয়ে গেছে সে, সেই পরিমাণ দিন গুণে গুণে পরবর্তী কোনো সময়ে তা আদায় করে নেবে।[২৮৫]

(সত্যি কথা হলো এই যে, এই বিশেষ সুযোগ দিয়ে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (জীবনও তার কার্যাবলীকে) আসান করে দিতে চেয়েছেন। আল্লাহ পাক কখনো চান না তোমাদের (জীবন) জটিল হয়ে উঠুক। (মূলতঃ এই সব সুযোগ সুবিধের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য একটাই এবং তা হচ্ছে) তোমরা যেন গুনে গুনে রোযার সংখ্যাগুলো পূরণ করতে পারো- (এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে এই মাসে আল কোরআন নাযিল করে যে জীবন যাপনের পদ্ধতি শিখিয়েছেন তার জনে) তার মাহাত্ম বর্ণনা করো এবং (পরিশেষে অন্তর দিয়ে এ জন্যে) তারই কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো।[২৮৬]

---

২৭৫. এ বিধান ইসলামের অন্যতম রোকন-রোযা সম্পর্কে। নফসের বান্দা ও নফসের দাসদের জন্য রোযা অত্যন্ত কঠিন ঠেকে। তাই গুরুত্ব ও তাকীদ দিয়ে বলা হয়েছে। আর এ বিধান হযরত আদম (আঃ)-এর যমানা থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। যদিও স্থান-কাল নির্ধারণে পার্থক্য রয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত মূলনীতিতে ধৈর্যের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, রোযা আর এক বিরাট রোকন। হাদীস শরীফে রোযাকে ছবরের অর্ধেক বলা হয়েছে।

অর্থাৎ রোযা দ্বারা নফসকে তার কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখার অভ্যাস গড়ে উঠবে। তখন যেসব কামনা-বাসনা শরীয়তে হারাম, তা থেকে নফসকে দমন করতে সে সক্ষম হবে। আর রোযা দ্বারা নফসের এ দ্বারা শক্তি ও লালসা দুর্বল হবে। তখন তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে। রোযার মধ্যে সবচেয়ে বড় হেকমত এই যে, বেয়াড়া নফসকে সংশোধন করা যায়, শরীয়তের যেসব বিধান নফসের কাছে কঠিন- কঠোর ঠেকায়, তা মেনে চলা সহজ হয় এবং তোমরা মুত্তাকী হতে পার। জেনে রাখা দরকার যে, ইহুদী-খৃষ্টানদের ওপরও রোযা-ফরয ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের খাহেশ অনুযায়ী তাতে পরিবর্তন করেছে নিজেদের মতো। এখানে ইঙ্গিতে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মুসলমানরা! তোমরা নাফরমানী থেকে বিরত থাকবে। অর্থাৎ ইহুদী-নাসারাদের মতো এই নির্দেশে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করবেনা।

২৭৭. অর্থাৎ গননা করা যায় এমন কয়টা দিনতো বেশী নয়। এ কয়টা দিন রোযা রাখবে। এ দ্বারা রমযানের রোযা বুঝানো হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২৭৮. এ সামান্য মুদ্দতের মধ্যেও এতটা সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, যে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা কঠিন বা মুসাফিরের জন্য রোযা না রাখার ইখতিয়ার রয়েছে। যত রোযা ভাঙ্গা হয়েছে, রমযান ছাড়া অন্য সময়ে তা আদায় করবে। এক সঙ্গে বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যে ভাবেই হোক।

২৭৯. অর্থ এই যে, যাদের রোযা রাখার ক্ষমতা আছে কিন্তু একেবারেই অভ্যাস না থাকার কারণে শুরুতে একটানা একমাস রোযা রাখা তাদের জন্য বেশ কঠিন ছিল, তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে রোযা রাখবে, ইচ্ছা করলে রোযার বিনিময় দেবে। একটা রোযার বিনিময়ে একজন মিসকীনকে দুই বেলা পেট ভরে খাওয়াবে। সে যখন একজন মিসকীনকে দুই বেলার খাবার দিয়েছে, তখন সে যেন নিজেকে একদিনের খাবার থেকে বিরত রেখেছে। মোটামুটি এটা রোযার সাদৃশ্য। তারা যখন রোযার অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে,তখন আর এ অনুমতি ছিলনা। পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। কোন কোন মনীষী 'তাআমে মিসকীন' এর অর্থ করেছেন 'ছাদাকাতুল ফিতর'। তখন এর অর্থ হবে যারা ফিকিয়া দেয়ার সামর্থের অধিকারী, তারা একজন মিসকীনের খাদ্যের পরিমাণ দান করবে। শরীয়তে এর পরিমাণ আধা ছা', গম বা এক ছা'. যব। আয়াতের এ অর্থ করলে বুঝতে হবে আয়াতটি এখনো 'মনসুখ', রহিত নয়। যারা এখনো একথা বলে যে, যার মন চাইবে রমযানে রোযা রাখবে, আর যার মন চাইবে, ফিদয়া দিয়েই শেষ করবে। ঠিক রোযা-ই রাখতে হবে এমন কথা নাই, তারা হয় জাহেল, না হয় বে-দ্বীন।

২৮০. অর্থাৎ যদি একজন মিসকীনকে একদিনের খাবারের চেয়ে বেশী দেয় বা কয়েক জন মিসকীনকে পেট ভরে খাওয়ায়, সুবহানাল্লাহ! তা তো উত্তম।

২৮১. অর্থাৎ রোযার ফসীলত, হেকমত এবং উপকারিতা উপলব্ধি করলে তোমরা জানতে পারবে যে, রোযা রাখা ফিদিয়া দেয়ার চেয়ে উত্তম। তোমরা রোযা রাখায় আলস্য করবেনা।

২৮২. হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ছহীফা এবং তাওরাত ইনজীল সবই রমযান মাসে নাযিল হয়েছে। আর কোরআন শরীফও নাযিল হয়েছে রমযানের ২৪ তারিখ রাত্রে 'লওহে মাহফুয' প্রথম আসমানে থেকে একই সঙ্গে। অতপর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটু একটু করে রাসূলের ওপর নাযিল হয়। প্রত্যেক রমযান মাসে হযরত জিবরাইল (আঃ) কোরআন শরীফ নাযিল করে রসূলকে শুনাতেন। এসব থেকে রমযান মাসের ফজীলত এবং কোরআন মজীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও বৈশিষ্ট্য ভালো ভাবে প্রকাশ পায়। এ জন্যই এ মাস তারাবীহ্ নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং এ মাসে অতীব গুরুত্বের সঙ্গে কোরআন মজীদের খেদমত করতে হবে। কারণ এ মাস এজন্যই নির্দিষ্ট।

২৮৩. অর্থাৎ যখন এ মাসের বড় বিশেষ ফযীলত সম্পর্কে তোমরা জানতে পারলে, তখন এই মাস পেলে তোমাদের অবশ্যই রোযা রাখবে। সহজ করার উদ্দেশ্যে শুরুতে কিছু সময়ের জন্য ফিদিয়ার যে অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তা রহিত করা হলো।

২৮৪. এ সাধারণ বিধান থেকে মনে করা হতো যে, রুগী এবং মুসাফিরের জন্যও বুঝি রোজা না রাখা এবং কাযা করার অনুমতি নেই। রোযা রাখতে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্যও যেমন এখন রোযা ভাঙ্গা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তেমনি অসুস্থ এবং মুসাফিরের জন্যও বুঝি নিষিদ্ধ হয়েছে যে, তাদের জন্য রোজা না রেখে অন্য সময় কাযা করার অনুমতি পূর্বের মতই বহাল আছে।

২৮৫. অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা যিনি প্রথমে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন অতঃপর ওযরের কারণে অসুস্থ এবং মুসাফিরের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি দিয়েছেন এবং সে সময়ের গননা অনুযায়ী অন্য সময়ে রোযা রাখা তোমাদের জন্য ওয়াজেব করেছেন। এক সঙ্গে বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। এজন্য যে, তা তোমাদের জন্য সহজ হয় কঠিন না হয়। তোমরা রোযার গননা পুরা করবে, এটাও তাঁর ইচ্ছা। সওয়াবে যাতে কমতি না হয়। এটাও লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, এভাবে তোমরা সরাসরি কল্যাণের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা করবে। তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করবে। এও কাংখিত যে, এসব নেয়ামতের জন্য তোমরা আল্লাহর শোকর করবে এবং শোকরকারীদের দলভূক্ত হবে। সুবহানাল্লাহ! রোযার মত কল্যাণকর এবাদত আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের ওপর ওয়াজেব করেছেন। কষ্ট এবং অসুবিধার সময় তাকে আবার সহজও করে দিয়েছেন। অসুবিধা দূর হয়ে গেলে এ ত্রুটি দূর করার পন্থাও বলে দিয়েছেন।

২৮৬. শুরুতে রমযানে রাত্রির প্রথম দিকে পানাহার এবং স্ত্রীদের সঙ্গে থাকার অনুমতি ছিল। কিন্তু শোয়ার পর এসব নিষিদ্ধ ছিল। কিছু লোক এর বিপরীত কাজকর্ম

এবং শোয়ার পর নারীদের সংস্পর্শে যায়। অতঃপর রাসূলের কাছে গিয়ে আরজ করে, নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করে এবং এ জন্য অনুতাপ করে তাওবা করা সম্পর্কে রাসূলকে জিজ্ঞাসা করলে আয়াতটি নাযিল হয়। এতে বলা হয় যে, তোমাদের তাওবা কবুল করা হয়েছে। খোদার নির্দেশ মেনে নেয়ার তাকীদ করা হয়। পূর্ববর্তী নির্দেশ রহিত করে ভবিষ্যতের জন্য অনুমতি দেয়া হয় যে, রমযানের সারারাত সুবহে ছাদেকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ইত্যাদি তোমাদের জন্য হালাল। পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে বান্দাদের প্রতি সহজ করা এবং অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে। এ নৈকট্য, এবং অনুমতি দ্বারা এরও তীব্র তাকীদ করা হয়েছে। সম্পর্কের অপর এক কারণ এই যে, প্রথম আয়াতে তাকবীর ও আল্লাহর মহত্ব ঘোষণার নির্দেশ ছিল। এতে কেউ কেউ রসূলকে জিজ্ঞাসা করে, আমাদের রব দূরে থাকলে আমরা তাঁকে ডাকব, আর কাছে থাকলে ছোট করে কথা বলব? এর জবাবে আয়াতটি নাযিল হয়। অর্থাৎ তিনি কাছে, তিনি সকলের কথা শুনেন। তা ছোট হোক বা বড়। যে সব ক্ষেত্রে বড় করে তাকবীর বলার নির্দেশ হয়েছে, তা অন্য কারণে। এজন্য নয় যে, তিনি আস্তে আস্তে চুপে চুপে কথা বললে তিনি শুনেননা।

وَاِذَا سَاَلَكَ

عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ

الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا

بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٦﴾ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ

الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ

لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ

اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ

بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَكُلُوْا

وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۠ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ
اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ
فِي الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾

১৮৬. (হে নবী) আমার কোনো বান্দা যখন কখনো তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে (তাকে তুমি বলে দিয়ো যে,) আমি তার একান্ত কাছেই আছি। যখন তারা আমাকে ডাকে (এবং আমার কাছে কিছু চায়) আমি সাথে সাথেই তাদের ডাকে সাড়া দেই। (তার ডাকের জবাবও আমি দিয়ে থাকি) অতএব তাদেরও উচিৎ আমার আহবানে সাড়া দেয়া। (সম্পূর্ণ ভাবে) আমার ওপরই ঈমান আনা। (একমাত্র) এই উপায়েই তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে।[২৮৭]

১৮৭. রোযার মাসের রাতের বেলায় তোমাদের স্ত্রীদের কাছে যৌন কাজের জন্যে যাওয়াকে তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে,[২৮৮] (কারণ) তোমাদের নারীরা যেমনি তোমাদের জন্যে পোশাক স্বরূপ- ঠিক তোমরাও তাদের জন্যে- পোশাক সমতুল্য।[২৮৯] আল্লাহ তায়ালা এটা জানেন যে, (রোযার মাসের রাতের বেলায় স্ত্রী সহবাসের ব্যাপারে) তোমরা নানা ধরনের ধোকা ও আত্ম প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছিলে[২৯০], তাই আল্লাহ পাক এ ব্যাপারে তোমাদের (ওপর থেকে কড়াকড়ি শিথিল করে দিলেন এবং অতীতের আত্ম প্রতারণা মূলক কাজের জন্যে) মাফ করে দিলেন এবং তিনি তোমাদের ক্ষমাও করে দিলেন, এখন তোমরা চাইলে তাদের সাথে সহবাস করতে পারো- এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে যে সুযোগ সুবিধে দিয়েছেন তা উপভোগ করতে পারো।[২৯১]

এই সময় পানাহারের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে) তোমরা পানাহার অব্যাহত রাখতে পারো যতোক্ষন পর্যন্ত রাতের অন্ধকার রেখার ভেতর থেকে ভোরের শুভ্র আলোক রেখা পরিষ্কার হয়ে না আসে[২৯২]- অতপর (এ সব নিয়ম নীতি মেনে চলে অর্থাৎ যাবতীয় যৌন কাজ ও পানাহার পরিত্যাগ করে) তোমরা রাতের আগমন পর্যন্ত রোযাকে পূর্ণ করে নাও।[২৯৩] (তবে) মাসজিদে যখন

তোমরা এতেকাফের অবস্থায় থাকবে তখন নারী সংভোগ থেকে বিরত থেকো।[২৯৪] এই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নিধারিত সীমারেখা- কখনো এর কাছে যেয়ো না, (মূলত) এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তার যাবতীয় আদেশ নিষেধ মানুষদের কাছে (খুলে খুলে) বলে দিয়েছেন যাতে করে তারা (সব ধরনের অনাচার থেকে) বেঁচে থাকতে পারে।[২৯৫]

---

২৮৭. রমযানে রাত্রি বেলা ঘুমের পর পানাহার এবং স্ত্রী সংগম হারাম ছিল তাও সহজ করা হয়েছে। এখন রাত্রি বেলা যখন খুশী তোমরা নারীর সঙ্গে মিলিত হতে পার।

২৮৮. লেবাস-পোশাকের উদ্দেশ্য হচ্ছে লেগে থাকা, মিলে থাকা। অর্থাৎ যেভাবে দেহের সঙ্গে কাপড় লেগে থাকে, তেমনি নারী পুরুষও একে অপরের সাথে পরস্পর মিলে থাকে।

২৮৯. নফসের সঙ্গে খেয়ানত করার অর্থ এই যে, ঘুমাবার পর নারীর কাছে গমন করে খোদার নির্দেশের বিরোধিতার কারণে তোমরা নিজেদেরকে গুনাহগার কর। এর ফলে তোমাদের নফস শাস্তি লাভের যোগ্য হয়ে পড়ে এবং তাতে সওয়াব হ্রাস পায়। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা আপন অনুগ্রহে তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতের অনুমতি দিয়েছেন।

২৯০. অর্থাৎ 'লওহে মাহফুযে' পূর্ব থেকে আল্লাহ তোমাদের জন্য যা নির্ধারিণ করে রেখেছেন, স্ত্রী সহবাস দ্বারা তাই তোমাদের কাম্য হওয়া উচিৎ। নিছক যৌন সংভোগই নয়। 'আযল' (ইচ্ছাকৃত সন্তান ধারন না করা) যে মাকরূহ এবং পুরুষে পুরুষে সঙ্গম যে হারাম, এতে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২৯১. অর্থাৎ যেমনি সারা রাত্রি স্ত্রী সঙ্গমের অনুমতি দেয়া হয়েছে, তেমনি রমযানের রাত্রিতে 'সুবহে সাদেক' পর্যন্ত তোমাদের জন্য পানাহারের অনুমতিও রয়েছে।

২৯২. অর্থাৎ সুবহে সাদেকের উদয় থেকে রাত্রি পর্যন্ত রোযা পূরন কর। এ থেকে জানা যায় যে, রাত্রে ইফতার না করে একাধারে কয়েকদিন রোযা রাখা মাকরূহ।

২৯৩. রমযানে রাত্রি বেলা স্ত্রী সঙ্গমের অনুমতি আছে। কিন্তু এতেকাফে রাত্রি-দিনের কোন সময়েই স্ত্রীর কাছে গমন করবেনা।

২৯৪. রোযা এবং এতেকাফ হালাল-হারাম প্রসঙ্গে যে নির্দেশ উল্লেখিত হয়েছে, তা আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম। কখনো এ নিয়মের বাইরে যাবেনা। বরং বাইরে যাওয়ার কাছেও পৌছবেনা। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা এবং হঠকারিতার কারণে এতে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করবেনা।

২৯৫. রোযার লক্ষ্য হচ্ছে নফসের পরিশুদ্ধি। এখন বলা হচ্ছে সম্পদের পরিশুদ্ধি সম্পর্কে। জানা গেলো যে, রমযানে হালাল মালও খাওয়া নিষেধ। আর হারাম মাল থেকে

রোযা রাখতে হবে (দূরে থাকতে হবে) সারা জীবন। এর কোন সীমা নাই। যেমন চুরি, খেয়ানত, দাগাবাজী, ঘুষ, জুয়া, সূদ এবং নাজায়েয ব্যবস্থা- এসব উপায়ে অর্থ সম্পদ উপার্জন করা সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয।

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا

بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ

ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ يَسْـَٔلُونَكَ

عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ

وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا

وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۚ وَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ

أَبْوَٰبِهَا ۖ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾ وَقَٰتِلُوا

فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا ۗ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ

ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ

وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ

ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِن

قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۭ كَذٰلِكَ جَزَاۗءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩١﴾

১৮৮. তোমরা একে অন্যের অর্থসম্পদ অন্যায় ও অবৈধভাবে আত্মসাত করো না[২৯৬] আবার জেনে বুঝে অন্যায় ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করার জন্যে এর একাংশকে বিচারকদের সামনেও পেশ করো না।

১৮৯. (হে নবী) তারা তোমাকে নতুন চাঁদ (ও তার বাড়া কমা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে[২৯৭], তুমি তাদের বলে দাও, চাঁদ হচ্ছে মানব জাতির জন্যে (স্থায়ী) সময় নির্ঘন্ট (যার মাধ্যমে সর্বকালে সকল দেশের সকল মানুষ বছরের দিন তারিখ তথা পুঞ্জিকা সম্পর্কে জানতে পারে) তাছাড়া (এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লোকেরা) হজ্জের সময় সূচীও (জেনে নিতে পারে।[২৯৮] তাদের তুমি একথা বলে দাও যে, জাহেলিয়াতের ধারণা মোতাবেক ইহরাম বাঁধার পর) এই ভাবে ঘরের পেছন দরজা দিয়ে প্রবেশ করার মাঝে কোনো সওয়াব নাই। আসল নেকী ও পুণ্যের কাজ হচ্ছে (সমস্ত রসম রেওয়াজের উর্ধে উঠে) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা ও তার অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো। (এসব অন্ধ অনাচার পরিহার করে চিরাচরিত পন্থায় হামেশাই) ঘরে ঢোকার সময় সামনের দুয়ার দিয়েই আসা যাওয়া করো। (এবং সব কিছুর মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলবে, (একমাত্র) এ উপায়েই তোমরা কামিয়াব হতে পারবে।[২৯৯]

১৯০. তোমরা (আল্লাহর পথে) আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যেই তাদের সাথে লড়াই করো- যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, (কিন্তু এ যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপারে) কখনো কারো সাথে বাড়াবাড়ি করো না , আক্রমণকারী (হিসেবে অবতীর্ণ) হয়ো না, কারণ আল্লাহ তায়ালা কখনো আক্রমণকারী (সীমালংঘনকারী)দের পছন্দ করেন না।

১৯১. যেখানেই তাদের সাথে তোমাদের মুকাবেলা হয়, সেখানেই তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, যে সব স্থান থেকে তারা তোমাদের বহিস্কার করে দিয়েছে তোমরাও তাদের সে সব স্থান থেকে বের করে দাও,[৩০০] (জেনে রেখো) ফেৎনা ফাসাদ (দাঙ্গা হাঙ্গামা) নরহত্যার চাইতেও জঘন্য অপরাধ।[৩০১] (লড়াই করার ব্যাপারে আরেকটি কথা মনে রাখবে) কাবা ঘরের আশেপাশে কখনো তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না, অবশ্য তারা নিজেরাই যদি সেখানে তোমাদের আক্রমণ করে তাহলে (তা ভিন্ন কথা, সে অবস্থায় আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে) তোমরাও লড়াই করতে থাকো। এটাই হচ্ছে কাফেরদের যথাযথ শাস্তি।[৩০২]

২৯৬.শাসক-বিচারকের কাছে নিয়ে-যাবেনা অর্থাৎ যালেম শাসক-বিচারককে কারো মালের খবর দেবেনা তাদের অনুকূল করে কারো মাল খাওয়ার জন্য তোমাদের মাল ঘুষ হিসাবে তাদের কাছে নিয়ে যাবেনা বা মিথ্যা সাক্ষী দিয়া, মিথ্যা কসম খেয়ে বা মিথ্যা দাবী করে কারো সম্পদ আত্নসাৎ করবেনা। অথচ তোমরা যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নও, তা ভালো করেই জান।

২৯৭. সূর্য সব সময় একটা আকৃতি এবং একই অবস্থায় থাকে আর চাঁদের আকৃতি এবং পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। এজন্য লোকেরা চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে রাসূলকে জিজ্ঞাসা করলে এই আয়াতটি নাযিল হয়। আগের কয়েকটি আয়াতে রময়ানের মাস এবং রোযা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াতে নতুন চাদ-এর উল্লেখ করা হয়েছে। চাঁদ দেখা এবং রোযার মধ্যে সর্ম্পক স্পষ্ট। একটা আর একটার ওপর নির্ভর করে। সামনে অগ্রসর হয়ে হজ্ব এবং তার বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। চাঁদের উল্লেখের সঙ্গে এরও সম্পর্ক রয়েছে।

২৯৮. অর্থাৎ তাদেরকে বলে দাও যে, চাঁদের এভাবে উদয়ের ফলে মানুষের লেন দেন এবং এবাদত যেমন এবাদাত-ইজারা, গর্ভধারণ এবং দুগ্ধ পান করানোর মুদ্দত, রোয়া-যাকাত ইত্যাদির সময় সকলে নির্বিঘ্নে জানতে পারে। বিশেষ করে হজ্ব। কারণ, রোযা ইত্যাদির কাযা তো অন্য সময়েও হতে পারে। হজ্বের কাযা তো হজ্বের জন্য নির্ধারিত সময় ছাড়া অন্য সময় করা যায় না। বিশেষ করে হজ্বের উল্লেখ করার কারণ এই যে, যিলকদ-যিলহজ্ব-মহররম এবং রজব- এ চারটি মাস হচ্ছে হারাম।সম্মানিত মাস। এ মাসগুলোতে যুদ্ধ করা কাউকে হত্যা করা হারাম। আরববাসীদের সামনে এ মাস গুলোতে যুদ্ধ উপস্থিত হলে তারা মাস গুলোকে আগে-পিছে করে যুদ্ধ করতো। যেমন যিলহজ্ব বা মুহররম মাসে যুদ্ধ বাঁধলে তাকে ছফর মাস বানায়ে নিতো। আর ছফর মাস আসলে তাকে যিলহজ্ব বা মুহররম মাস করে নিতো। তাদের এ ধারণা বাতিল করার উদ্দেশ্যে এখানে হজ্ব সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা হজ্বের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাকে আগে আনা বা পরে নেয়া কিছুতেই জায়েয নয়। এখন এখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত হজ্ব প্রসঙ্গ এবং তার বিধান বর্ণিত হবে।

২৯৯. জাহেলী যুগে নিয়ম ছিলো যে, ঘর থেকে বের হয়ে হজ্বের এহরাম বাঁধার পর ঘরে আসার কোন প্রয়োজন দেখা দিলে দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতোনা, ছাদের ওপর দিয়ে ঘরে ঢুকতো বা পেছনের দরজায় কড়া নেড়ে ঘরে প্রবেশ করতো আর এটাকে নেকী মনে করতো। আল্লাহ তা'য়ালা এটাকে অন্যায় বলে অভিহিত করেছেন।

প্রথম বাক্যে হজ্বের উল্লেখ রয়েছে। আর এ নির্দেশও হজ্ব সম্পর্কে। এ সম্পর্কের কারণে এখানে এ বিধানের উল্লেখ করা হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেন, আয়াতে হজ্বের মাস অর্থাৎ শাওয়াল যিল'কদ এবং যিল হজ্বের দশ দিন। স্পষ্ট যে, এ সময়েই হজ্বের এহরাম বাঁধতে হবে। লোকেরা রসূলকে জিজ্ঞাসা করে, এগুলোই কি হজ্বের দিন, না অন্য

সময়েও হজ্ব হতে পারে? আল্লাহ জবাব দেন যে, হজ্বের জন্য হজ্বের মাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এহরাম অবস্থায় ঘরে যাওয়ার বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, নিজের পক্ষ থেকে কোন জায়েস এবং মোবাহ্ কাজকে নেকী সাব্যস্ত করা এবং দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত করা নিন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ। এটাও জানা যায় যে,এধরনের অনেক কাজই বেদআত ও নিন্দনীয়।

৩০০. হযরত ইবরাহীম (আঃ) সময় থেকে মক্কা ছিলো 'দারুল আমান'-শান্তির শহর। কেউ দুশমনকেও মক্কায় পেলে কিছু বলতোনা। হারাম মাস অর্থাৎ যিলক'দ-যিলহজ্ব-মুহররম এবং রজব এ চারটি মাসও ছিলো শান্তির মাস। এ সময়ে গোটা আরব দেশে যুদ্ধ বন্ধ থাকতো। কেউ কাকেও কিছু বলতোনা। ৬ষ্ট হিজরীর যিলকদ মাসে রাসূল (সাঃ) একদল সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন। তিনি মক্কায় কাছে পৌছেলে মোশরেকরা দলবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। তারা মুসলমানদেরকে বাধা দেয়। অবশেষে এ মর্মে সন্ধি হয় যে, এবার ওমরা না করে মুসলমানরা ফিরে যাবে। আগামী বৎসর ওমরা করবে। মক্কায় শান্তিতে তিন দিন অবস্থান করবে। পরবর্তী বছর ৭ম হিজরীর যিলক'দ মাসে রাসূল মক্কায় গমনের জন্য প্রস্তুত হলে তাঁর সাহাবীদের আশংকা হয় যে, এবারও যদি মক্কাবাসীরা ওয়াদা খেলাফী করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন আমরা কি করবো। হারাম মাস এবং মক্কার হেরেম কিভাবে যুদ্ধ করবো, আর যুদ্ধ না করলে ওমরা করবো কি করে। এ অবস্থায় খোদার নির্দেশ আসে যে, তারা যদি তোমাদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এ হারাম মাসে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও কোন ইতস্তত না করে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। অবশ্য তোমরা যুদ্ধের সূচনা করবেনা। হজ্বের প্রসঙ্গে হোদায়বিদায় ওমরার কথা বলতে গিয়ে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্থান অনুপাতে জেহাদের বিধান ও আদাব বর্নীত হচ্ছে। এরপর পুনরায় হজ্বের বিধান বর্নিত হবে।

৩০১. বাড়াবাড়ি করবেনা-এর অর্থ হচ্ছে যুদ্ধে শিশু-বৃদ্ধ এবং নারীকে ইচ্ছা করে হত্যা না করা এবং হেরেম শরীফে নিজেদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু না করা।

৩০২. যেখানে পাও অর্থাৎ হেরেম হোক, কি হেরেমের বাইরে। যেখান থেকে তোমাদেরকে বের করা হয়েছে অর্থাৎ মক্কা থেকে।

অর্থাৎ দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাওয়া বা অন্যকে বের করা হারাম মাসে নর হত্যার চেয়েও বড় গুনাহ। এর তাৎপর্য এই যে, মক্কার হেরেম কাফেরদের স্পর্শ করা এবং করানো হেরেমে যুদ্ধের চেয়েও মারাত্মক। সুতরাং মুসলমানরা! তোমরা এখন আর কোন চিন্তা না করে সমানে সমান জবাব দাও।

فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿১৯২﴾ وَقٰتِلُوْهُمْ
حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط فَإِنِ
انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿১৯৩﴾ اَلشَّهْرُ
الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ط فَمَنِ
اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى
عَلَيْكُمْ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ
الْمُتَّقِيْنَ ﴿১৯৪﴾ وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا
بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ صلے وَأَحْسِنُوْا ج إِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿১৯৫﴾ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ط
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ج وَلَا تَحْلِقُوْا
رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ط فَمَنْ
كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ بِهٖ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ
مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ج فَإِذَا أَمِنْتُمْ وقفه

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذٰلِكَ
لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

১৯২. তবে তারা যদি (যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে) ফিরে আসে (এবং সঠিক পথে চলতে শুরু করে) তাহলে (মনে রেখো) আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও দয়ার আধার।

১৯৩. তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাকে- যতোক্ষণ না (খোদহীনতার যাবতীয়) ফেৎনার (চূড়ান্ত) অবসান হয়ে যায়- এবং আল্লাহর (জমীনে আল্লাহর দেয়া) জীবন ব্যবস্থাই পূর্ণাংগভাবে ক্ষমতাসীন হয়। যদি তারা (এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে) ফিরে আসে তাদের সাথে আর কোনো বাড়াবাড়ি নয়- জোর জবরদস্তিও করা যাবে না, (তবে হাঁ) যারা নিজেরাই যালেম তাদের কথা আলাদা।[৩০৪]

১৯৪. একটি সম্মানিত মাসের বদলেই একটি সম্মানিত মাস (আশা করা যাবে। এই মাসের সম্মানকে অবজ্ঞা করে কেউ যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে) এই সম্মানিত মাস সমূহেও প্রতিশোধ গ্রহণ করার ব্যবস্থা থাকবে, (এই সময়) যদি কেউ (নীতিমালার সীমা রেখা অতিক্রম করে) তোমাদের উপর হস্ত প্রসারিত করে তাহলে তোমরাও তাদের ওপর তেমনি হস্ত প্রসারিত করো (তাদের আক্রমণের জবাব দাও, তবে কখনো সীমালংঘন কারী হয়ো না, বরং সর্বদাই) আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, মনে রেখো যারা (সীমা লংঘন জনিত) অপরাধ থেকে বেঁচে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথেই রয়েছেন।[৩০৭]

১৯৫. আর আল্লাহর পথে অর্থসম্পদ ব্যয় করো অকাতরে। (অর্থ সম্পদ আকঁড়ে ধরে) নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করো না এবং অন্য মানুষদের সাথে দয়া ও দানশীলতার আচরণ করো, আল্লাহ তায়ালা সর্বদাই অনুগ্রহকারী ও দানশীল ব্যক্তিদের ভালবাসেন।

১৯৬. কেবল মাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই হজ্জ ও ওমরা সম্পন্ন করো। (আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌছার আগেই) যদি তোমরা কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পড়ো (যার কারণে সে স্থান পর্যন্ত যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে) তাহলে সে স্থানেই কোরবানীর জন্যে যা কিছু হাতের কাছে পাওয়া যায় তা দিয়েই কোরবাণী আদায় করে নাও, (তবে) কোরবানী তার নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থলে পৌছার আগ পর্যন্ত তোমরা মাথা মুন্ডন করো না,[৩০৮] যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা যদি কারো মাথায় রোগ থাকে (যে কারণে তার মাথা মুন্ডন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে- তেমন অবস্থায় সে যেন অবশই) এর বিনিময় (ফিদিয়া) আদায় করে।

(আর এই) বিনিময় হচ্ছে রোযা রাখা, অথবা অর্থ দান করা কিংবা কোরবানী আদায় করা,[৩০৯] (অতপর যে কারণে তোমরা বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলে তা যদি দূরীভূত হয়ে যায়, তেমন) শান্তির সময়ে তোমাদের কেউ যদি এক সাথেই হজ্জ ও ওমরা আদায় করতে চায় তার উচিৎ তার ক্ষমতা ও সাধ্য অনুযায়ী কোরবানী আদায় করা[৩১০] যদি (কোরবানী আদায় করার মতো তার আর্থিক) সংগতি না থাকে (অথবা কোরবানী করার মতো কোনো পশু সে না পায় তাহলে) সে যেন হজ্জের সময়কালীন সময়ে তিনটি এবং বাড়ি ফিরে সাতটি (সর্বমোট) এই পূর্নাঙ্গ দশটি রোযা রাখে[৩১১]- এই ব্যবস্থা (বিশেষ সুবিধেটুকু) শুধু তাদের জন্যে যাদের পরিবার পরিজন আল্লাহর ঘরের আশে পাশে বর্তমান নেই।[৩১২] তোমরা এসব ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো (এবং এর বিরোধীতা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখো) জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা কঠোর আযাব প্রদানকারী বটে!

---

৩০৪. অর্থাৎ মক্কা অবশ্যই শান্তির স্থান। কিন্তু তারাই যখন অশান্তির সূচনা করেছে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করেছে এবং ঈমান আনার কারণে তোমাদের সাথে দুশমনী শুরু করেছে। যা হত্যার চেয়েও মারাত্মক, সুতরাং এখন আর তাদের নিরাপত্তা নেই। যেখানে পাবে, মারবে। অবশেষে মক্কা বিজয়ের পর রসূল (সাঃ) একথাই বলেছেন যে, যে কেউ অস্ত্র ধারণ করে, তাকেই মারবে, অন্য সকলকে তিনি নিরাপত্তা দিয়েছেন।

অর্থাৎ এতসব সত্ত্বেও এখনো যদি ইসলাম গ্রহণ করে শিরক থেকে তওবা করে, তবে তাদের তওবা কবুল হবে।

অর্থাৎ কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ এজন্য যাতে যুলুম রহিত হয়। কাকেও যেন তারা দ্বীন থেকে গোমরাহ করতে না পারে এবং একমাত্র আল্লাহর হুকুমই দুনিয়ায় জারী থাকে। সুতরাং শেরক থেকে বিরত হলে যালেম ছাড়া কারো প্রতি বাড়াবাড়ি চলবেনা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি খারাপ থেকে নিবৃত্ত হয়েছে, সে এখন যালেম নয়। কাজেই আর তার ওপর বাড়াবাড়ি করবেনা। অবশ্য যারা বিপর্যয় থেকে নিবৃত্ত না হয়, তাদেরকে হত্যা কর।

৩০৭. সম্মানের মাস অর্থ যুলক'দ মাস। যে মাসে তোমরা ওমরার কাযা আদায় করার জন্য গমন করছে। এ মাস গত বৎসরের যুল ক'দ মাসের বিনিময়। এ মাসে কাফেররা তোমাদেরকে ওমরা থেকে ফিরে রেখেছিলো, মক্কায় যেতে দেয়নি, অর্থাৎ এখন তোমরা মন ভরে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ কর। কারণ, আদব এবং হুরমত রক্ষায়ও সমান সমান করবে। অর্থাৎ কোন কাফের যদি হারাম মাসের সম্মান করে এবং এ মাসে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, তবে তোমরাও অনুরূপ করবে। মক্কাবাসীরা বিগত বৎসর তোমাদের প্রতি যুলুম করেছে, হারাম মাসের কোন সম্মান করেনি, হেরেমে মক্কারও কোন মর্যাদা দেয়নি, তোমাদের সম্মানের প্রতিও কোন লক্ষ্য রাখেনি, এরপরও তোমরা ছবর করেছিলে, তারা যদি এবারও সব হুরমত ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হয়, তবে তোমরাও কোন হুরমতের তোয়াক্কা না করে পূর্বাপরের সমস্ত অপূর্ণতা পূর্ণ কর। কিন্তু যা কিছু করবে, খোদাকে ভয় করে করবে। তাঁরা অনুমতির বিপরীত কখনো করবেনা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা পরহেজগারদের সাহায্যকারী।

অর্থ এই যে, আল্লাহর আনুগত্যে অর্থাৎ জিহাদ ইত্যাদিতে নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে এবং নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবেনা অর্থাৎ জেহাদ ত্যাগ করবেনা এবং জেহাদে অর্থ ব্যয় করা ত্যাগ করবেনা। কারণ, এর ফলে তোমরা দুর্বল এবং দুশমন সবল হয়ে পড়বে।

৩০৯. হজ্বের প্রসঙ্গে জেহাদের আলোচনা সঙ্গত ছিলো। তার পর এখন হজ্ব ও ওমরার বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে।

৩১০. অর্থ এই যে, কেউ যখন হজ্ব বা ওমরা শুরু করে অর্থাৎ এজন্য এহরাম বাঁধে, তা পূর্ণ করা তার কর্তব্য। মধ্যখানে ছেড়ে দেবে না, এহরাম থেকে বেরিয়ে যাবে যা এমনটি হতে পারবেনা। কিন্তু কোন দুশমন বা ব্যাধির কারণে মধ্যখানে ছেড়ে দিলে, হজ্ব ওমরা না করতে পারলে তার জিম্মায় কোরবানী বর্তায়, যা তার পক্ষে সম্ভব। এর সর্ব নিম্ন পরিমাণ হচ্ছে একট বকরী। এ কোরবানী কারো মাধ্যমে মক্কায় প্রেরণ করবে এবং ঠিক করে দেবে যে, অমুক দিন মক্কা হেরেম পৌছে গেছে, তা জবাই করে দেবে। আর যখন নিশ্চিত হবে যে, এখন তা যথাস্থানে অর্থাৎ হেরেম পৌছে, তা জবাই করে দিবে। আর যখন নিশ্চিত হবে যে, এখন তা যথাস্থানে অর্থাৎ হেরেম পৌছে কোরবানী হয়েছে, তখন মাথার চুল মুন্ডন করবে। এর আগে কিছুই করবেনা। এটাকে দমে এহ্ছার বলা হয়, হজ্ব বা ওমরা থেকে বিরত হবার কারণে যা আদায় করা অবশ্য কর্তব্য।

৩১১. অর্থাৎ কেউ যদি এহরাম অবস্থায় অসুস্থ হয় বা তার মাথায় কোন ব্যথা বা যখম হয়, তার জন্য প্রয়োজনে এহরাম অবস্থায় মাথার চুল কাটা কিংবা কমানো জায়েয আছে, কিন্তু এজন্য বিনিময় দিতে হবে। তিনটা রোয়া রাখা, বা ৬জন অভাবীকে খাবার দেয়া বা একটা দুম্বা বা বকরী কোরবানী দেয়া। এটা 'দমে জেনায়াত'। এহরাম অবস্থায় অসুস্থতার কারনে লাচার হয়ে এহরামের পরিপন্থী কাজ করার জন্য এ দম দিতে হয়।

৩১২. অর্থাৎ যে এহরাম কারী দুশমনের পক্ষ থেকে বা রোগ-ব্যধী থেকে নিরাপদ হয়েছে, তার জন্য কোন প্রকার শংকা উপস্থিত না হলেও বা দুশমনের ভয় ও রোগের শংকা তো দেখা দিয়াছে কিন্তু শীঘ্রই তা দূর হয়ে গেছে। সে হজ্ব ওমরা উভয়ই আদায় করেছে কি-না অর্থাৎ কেরান বা তামাত্তু করেছে॥এফরাদ করেনি। একটা বকরী অথবা উট বা গাভীর সাত ভাগের একভাগ কোরবানী তাকে দিতে হবে। এটাকে দমে কেরান বা দমে তামাত্তু বলা হয়। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এটাকে 'দমে শোকর' বলেন। তাঁর মতে এ কোরবানীর গোস্ত সে খেতে পারবে। ইমাম শাফেয়ী এটাকে বলেন 'দমে জব্‌র'। তাঁর মতে কোরবানী দাতার জন্য এর গোস্ত খাওয়ার অনুমতি নেই।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেরান বা তামাত্তু করেছে, কোরবানীর সুযোগ যার হয়নি, তাকে হজ্বের দিনগুলোতে তিনটি রোযা রাখতে হবে। 'ইয়াওমে আরাফা' অর্থাৎ যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখে হজ্বের দিন শেষ হয়। আর রোয়া রাখবে হজ্বের কাজ শেষ করে। মোট দশটি রোযা রাখতে হবে।

অর্থাৎ কেরাম বা তামাত্তু তার জন্য, যে মক্কায় হেরেম বা তার কাছে থাকেনা। বরং সে মীকাতের বাইরে থাকে। যে ব্যক্তি হেরেমে মক্কায় মধ্যে বাস করে, সে কেবল 'এফরাদ' করবে।

الحج اشهر معلومت ج فمن فرض فيهن الحج
فلا رفث ولا فسوق لا ولا جدال في الحج ط وما
تفعلوا من خير يعلمه الله ط وتزودوا فان خير
الزاد التقوى ز واتقون يأولي الالباب ﴿١٩٧﴾
ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم ط
فاذا افضتم من عرفت فاذكروا الله عند
المشعر الحرام ص واذكروه كما هدىكم ج وان

كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ اَفِيْضُوْا

مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ

اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٩﴾ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ

ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى

الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُمْ

مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ

حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ

مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

রুকু ২৪

রুকু ২৫

১৯৭. হজ্জের মাস সমূহের কথা সবারই জানা আছে। এই নির্দষ্ট মাস সমূহে যে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করার মনস্থ করবে, (তাকে জেনে রাখতে হবে যে) হজ্জের এই সময়গুলোতে যাবতীয় যৌন সংভোগ অশ্লীল গালিগালাজ ও অশালীন ও আশোভন উক্তি ঝগড়া ঝাটি চলবেনা। আর যতোরকম ভালো কাজই তোমরা করো আল্লাহ তায়ালা (অবশ্যই) তা জানেন। (হজ্জের নিয়ত করলে) এর জন্যে সব ধরনের পাথেয় সাথে নিয়ে যাবে, যদিও (এটা জানা কথা, যে এই সময়ে) আল্লাহর ভয়'ই হচ্ছে (মানুষের) সর্বোৎকৃষ্ট সম্বল। অতএব হে বুদ্ধিমান মানুষরা, তোমরা আমাকেই ভয় করো।৩১৫

১৯৮. (হজ্জের এ সময়গুলোতে) যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করতে গিয়ে কোনো অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চাও তাতে কোনোই দোষ নেই, অতপর তোমরা যখন আরাফাতের ময়দান থেকে ফিরে আসবে তখন মাশয়ারে হারামের (মোযদালাফার) কাছে এসে আল্লাহকে স্মরণ করবে (আর স্মরণ করার সময় কোনো জাহেলী পন্থায় নয়) যেমনি করে আল্লাহ পাক তোমাদের ডাকতে বলেছেন তেমনি করেই তাকে স্মরণ করবে। বস্তুতঃ ইতিপূর্বে তেমরা সবাই ছিলে মূর্খ- অজ্ঞ!

১৯৯. তারপর সে স্থান থেকে তোমরা ফিরে আসো যেখান থেকে অন্যান্য (হজ্জ পালনকারী) ব্যক্তিরা ফিরে আসে, (এরপর নিজেদের কাজকর্মের জন্যে) আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (মানুষের ভূল ভ্রান্তি ও গুনাহ খাতা) মাফ করে দেন, তিনি বড়োই দয়ালু!

২০০. (এই ভাবে একে একে) যখন তোমরা হজ্জের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে নেবে তখন (এই খানে বসে আগের দিনে) যেভাবে তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদের (গৌরব) স্মরণ করতে তেমনি করে- বরং তার চাইতে অনেক বেশী পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করো , এই আল্লাহকে স্মরণকারী মানুষদের ভেতর থেকেই একদল লোক বলে, হে আমার মালিক আমার (সব) ভালো জিনিস তুমি আমায় এই দুনিয়াতেই দিয়ে দাও, বস্তুতঃ (যারা এ ধরনের কথা বলে) তাদের জন্যে পরকালে আর কোনো পাওনাই (বাকী) থাকলো না।

২০১. আবার এই মানুষেরই আরেক দল বলে হে আমার প্রতিপালক এই দুনিয়ায় ও তুমি আমাদের কল্যাণ দান করো, পরকালেও আমাদের কল্যাণ দাও। (তবে সব কিছুর চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে) তুমি আমাদের আগুনের আজাব থেকে নিস্কৃতি দাও।

২০২. এ ধরনের লোকদের তাদের নিজ নিজ উপার্জন মোতাবেক সর্বত্রই তাদের যথার্থ হিস্যা রয়েছে[৩২১] (মূলতঃ এই উপার্জনের দেনা মিটাতে আল্লাহ তায়ালার সময়ের মোটেই প্রয়োজন হবে না) আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসাব নিকাশ গ্রহণকারী।[৩২২]

---

৩১৫. শাওয়ালের দ্বিতীয় রাত্রি থেকে বকরে ঈদের সুবেহ পর্যন্ত অর্থাৎ যিল হজ্ব এর দশম রাত্রি পর্যন্ত সময়ের নাম আশহুরে হজ্ব- হজ্বের মাস বা সময়। কারণ এ সময়ে হজ্বের এহরাম বাঁধতে হয়। এ সময়ের আগে কেউ হজ্বের এহরাম বাঁধলে তা না জায়েয ও মাকরূহ হবে। অর্থাৎ হজ্বের জন্য কয়েকটি মাস নির্দিষ্ট রয়েছে। এটা সকলেরই জানা আছে। আরবের মোশরেকরা এতে যে পরিবর্তন করতো অন্য আয়াতে যাকে বলা হয়েছে, তা একেবারেই ভিত্তিহীন ও বাতিল।

হজ্ব লাযেম করেছে অর্থাৎ হজ্বের এহরাম বেঁধেছে এভাবে যে, অন্তরে নিয়ত করে মুখে তালবিয়া (লোব্বাইকা লাব্বাইকা) পাঠ করেছে।

কুফরী যুগে একটা অন্যায় নিয়ম ছিলো যে, পথের সম্বল ছাড়া খালি হাতে হজ্বে যাওয়াকে সাওয়াবের কাজ মনে করতো এবং এটাকে 'তাওয়াক্কুল' বলতো। সেখানে গিয়ে সকলের কাছে ভিক্ষা করে ফিরতো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যাদের সামর্থ রয়েছে তারা পথ খরচা সঙ্গে নিয়ে যাবে। যাতে নিজেরা ভিক্ষা থেকে বাঁচতে পারে এবং অন্যদেরকেও বিরক্ত না করে।

হজ্বের সফরে কেনা-বেচা করলে গুনাহ হবেনা, বরং তা মোবাহ্ হবে। এ ব্যাপারে লোকদের সন্দেহ ছিলো। হয়তো ব্যবসায় করলে হজ্বের ক্ষতি হবে। হজ্ব যার আসল লক্ষকে সামনে রেখে সে যদি পথিমধ্যে তেজারতও করে, তার তাতে সাওয়াবে কমতি হবেনা।

'মাশ আরুল হারাম' মুযদালেফায় অবস্থিত একটা পাহাড়ের নাম। এখানে হাজীরা রাতে অবস্থান করেন। এ পাহাড়ে অবস্থান করা উত্তম। মুযদালেফার যে কোন স্থানে অবস্থান করা জায়েয। অবশ্য ওয়াদিয়ে মুহাসসার (সেখানে আবরাহার সৈন্যদের ওপর আল্লাহর গযব পড়েছিলো) এ অবস্থান জায়েয নয়।

অর্থাৎ কাফেররাও আল্লাহর যিকির করতো কিন্তু শেরকের সঙ্গে। সে যিকির চাইনা। বরং তাঁর যিকির করবে তাওহীদের সঙ্গে। তোমাদেরকে যার হেদায়াত করা হয়েছে।

৩২১. কুফরী যমানায় একটা অন্যায় করা হতো যে, মক্কার লোকেরা আরাফাত পর্যন্ত গমন করতোনা। কারণ, এটা হেরেমের বাইরে। বরং হেরেমের সীমা অর্থাৎ মুযদালেফায় অবস্থান করতো। মক্কায় কোরাইশরা ছাড়া অন্য সকলেই আরাফাত পর্যন্ত গমন করতো এবং সেখান থেকে তাওয়াফের জন্য মক্কায় গমন করতো। সুতরাং বলে দেয়া হয়েছে যে, সকলে যেখান থেকে তাওয়াফের জন্য আসে, তোমরাও সেখানে গিয়ে ফিরে আসবে অর্থাৎ আরাফাত থেকে এবং পূর্বের ক্রটির জন্য লজ্জিত হবে।

অর্থাৎ যিল হজ্বের দশ তারিখে হজ্বের কাজ যেমন, কংকর নিক্ষেপ, কোরবানীর পশু জবাই, মস্তক মুন্ডন, তাওয়াফে কা'বা এবং সাফা-মারওয়ার সাঈ থেকে অবসর হবার পর মিনায় অবস্থান কালে আল্লাহর যিকির করবে, যেমন কুফরীর যমানায় তোমরা তোমাদের বাপ দাদার যিকির করতে, এখন বরং এর চেয়েও বেশী যিকির করবে। তাদের প্রাচীন নিয়ম ছিলো যে, হজ্ব থেকে অবসর হয়ে মিনায় তিনদিন অবস্থান করতো, সেখানে বাজার জমাতো এবং নিজেদের পূর্ব পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব-কৃতীত্ব বর্ণনা করতো। আল্লাহ তায়ালা এটা বারণ করে বলেছেন যে, এ সময় আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করবে।

প্রথমে বলা হয়েছিল যে, অন্যদের নয়- আল্লাহ তায়ালার যিকির করবে। এখন বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালার যিকির কারী এবং তার কাছে দোয়াকারীও দু রকমের আছে। এক ধরণের লোক আছে, কেবল দুনিয়াই যাদের কাম্য। তাদের দোয়া হচ্ছে আমাদেরকে ইজ্জত যা কিছু দেয়া হোক, কেবল এ দুনিয়ায়ই দেয়া হোক। এরা পরকালের

নেয়ামত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। দ্বিতীয় প্রকারের লোক হচ্ছে যারা পরকালের সন্ধানী। তারা দুনিয়ার কল্যাণ অর্থাৎ বন্দেগী ইত্যাদির তাওফীক এবং পরকালের কল্যাণ অর্থাৎ তাওয়াব-রহমত এবং জান্নাত উভয়ই কামনা করে। এমন লোকের, পরকালে তাদের হজ্ব দোয়া সকল ভালো কাজের পূর্ণ হিস্যা লাভ করবে।

৩২২. অর্থাৎ পরকালের সকলের কাছ থেকে এক নিঃশ্বাসে হিসাব গ্রহণ করবেন। অথবা এমনও বলতে পার, পরকালকে দূরে মনে করবেন। বরং পরকাল অতি সত্ত্বর আসবে তা থেকে কিছুতেই রেহাই পাবেনা।

وَاذْكُرُوا

اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ

فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ

اتَّقٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ

الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

---

২০৩. হজ্জ পালনকালীন হাতে গনা এ কয়টি দিনকে (বেশী পরিমাণে) আল্লাহর স্মরণ দিয়েই কাটিয়ে দাও। (হজ্জের পর) যদি কেউ (সময়ের স্বল্পতার কারণে) তাড়াহুড়ো করে দু'দিনেই যাবতীয় কাজ শেষ করে (মক্কায় ফিরে আসে তাতে যেমন) কোনো দোষ নেই (তেমনি) যদি কোনো ব্যক্তি আরো অপেক্ষা করতে চায় তাতেও কোনো দোষ নাই। (কে কয়দিন কাটালো সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো বিষয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়) সব কল্যাণ তার জন্যে যে আল্লাহকে ভয় করেছে।

তোমরা (দিন ক্ষণের আনুষ্ঠানিকতার উর্ধে উঠে) আমাকেই ভয় করো, এবং (ভালো করেই) তোমরা একথাটা জেনে রাখো যে, একদিন (সব কিছুর শেষে) তোমাদের আল্লাহর সামনেই এসে হাযীর হতে হবে।৩২৫

২০৪. মানুষদের সমাজে এমন লোকও আছে যাদের এই দুনিয়া সম্পর্কিত কথাবার্তা তোমার খুবই ভালো লাগবে। এমন ব্যক্তি নিজেদের মনের অভিসন্ধির ব্যাপারে সবসময়ই আল্লাহ তায়ালাকে স্বাক্ষী বানাতে চেষ্টা করে, কিন্তু (এর প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে) সে সত্য ও ন্যায়ের যেমন কঠিন শত্রু (তোমারও মারাত্মক দুশমন)।

২০৫. আবার এই মানুষটিই যখন আল্লাহর জমীনের কোথায়ও ক্ষমতার আসনে বসতে পারে তখন সে নানা প্রকারের অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে শুরু করে, (যুদ্ধ বিগ্রহ করে জমীনের) শস্য ক্ষেত্র বিনাশ করে, জীবজন্তুর বংশ নির্মূল করার ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত হয়ে যায়- মূলতঃ আল্লাহ তায়ালা কখনো অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মানুষদের পছন্দ করেন না।

---

৩২৫. আইয়ামে মা'দূদাতে -- এর অর্থ যিলহজ্ব এর এগার বার এবং তের তারীখ। সে সময়ে হজ্ব থেকে অবসর হয়ে মিনা অবস্থানের নির্দেশ রয়েছে। এ সময়ে 'রমইয়ে জেমার' কংকর নিক্ষেপ কালে এবং প্রত্যেক নামাযের পর তাকবীর যিকির করতে হবে।

অর্থাৎ গুনাহ তো হচ্ছে শরীয়তের নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত না থাকা যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে হজ্বের সময়ে পরহেজগারী করবে, তার জন্য মিনায় দু'দিন অবস্থান করলো, কি তিন দিন, এতে কোন গুনাহ নাই। কারণ, দু'টাই আল্লাহ তায়ালা জায়েয করেছেন। অবশ্য উত্তম হচ্ছে তিনদিন অবস্থান করা।

অর্থাৎ কেবল হজ্বেই নয়, বরং সকল কাজে সকল সময়ে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলবে। কারণ, তোমাদের সকলকে কবর থেকে উঠে হিসাব দেয়ার জন্য তারই হুকুমে হাজির থেকে হবে। হজ্ব সম্পর্কে আলোচনা এখানেই শেষ করা হয়েছে। হজ্ব প্রসঙ্গে দু ধরনের লোকের উল্লেখ করা হয়েছিল এবং কাফের এবং মোমেন। সে প্রসঙ্গে এখন আর এক ধরনের লোক অর্থাৎ মোনাফেকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ

فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (২০৬) وَمِنَ النَّاسِ

مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ

رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ (২০৭) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا

فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۠ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ

اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (২০৮) فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا

جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (২০৯)

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ

الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ

الْاُمُوْرُ (২১০)

২০৬. যখন তাকে বলা হয় এসব ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টি না করে তুমি আল্লাহকে ভয় করো, তখন তার মগজে মিথ্যা অহংকারের দম্ভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, যা তাকে আরো কঠিন পাপে নিমজ্জিত করে দেয়, মূলতঃ এই চরিত্রের লোকের জন্যে জাহান্নামের আগুনই যথেষ্ট, আর জাহান্নাম হচ্ছে নিকৃষ্টতম ঠিকানা!

২০৭. এই মানুষদের ভেতর (আবার) এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা আল্লাহ তায়ালার এতোটুকু সন্তুষ্টি লাভের জন্যে নিজের জীবন পর্যন্ত বিক্রি করে দেয় এ ধরনের লোকদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা সর্বদাই অনুগ্রহশীল!

২০৮. হে ঈমানদার লোকেরা তোমরা (যখন একবার ইসলাম স্বীকার করে নিয়েছো তখন এই সব মানুষদের মতো না চলে বরং) পুরো পুরিই ইসলামের

ছায়াতলে এসে যাও। এবং কোনো অবস্থায়ই (অভিশপ্ত) শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না- কেননা শয়তান হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্যতম দুশমন।৩৩০

২০৯. আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এসব সুস্পষ্ট নির্দেশ সমূহ তোমাদের কাছে এসে যাওয়ার পরও যদি তোমরা আন্যায়ের দিকে ঝুকে পড়ে তোমাদের পদস্খলন হয় তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখো যে, (আল্লাহর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানোর উপায় নাই) আল্লাহ মহা বিজ্ঞ ও পরাক্রমশালী।৩৩১

২১০. (এতো সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দেখার পর তারা আর কী চায়) তারা কি সেদিনের অপেক্ষা করছে? যখন আল্লাহ স্বয়ং তার ফেরেস্তাদের নিয়ে মেঘের ছায়া দিয়ে এই মর্তে নেমে আসবেন এবং চূড়ান্তভাবে তাদের ভাগ্যের ফায়সালা শুনিয়ে দেবেন। (এ নির্বোধ লোকগুলো কি জানে না যে, চূড়ান্ত ফায়সালার) সব কয়টি ব্যাপারই (বিচারের জন্যে) সেদিন তার কাছে উপনীত হবে।৩৩২

---

৩২৬. এটা মোনাফেকদের অবস্থা। তারা প্রকাশ্য তোশামদ করে আল্লাহকে সাক্ষী করে বলে যে, আমরা সত্য বলছি, আমাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। কিন্তু ঝগড়ার সময় ক্রটি করেনা। সুযোগ পেলে লুট-তরাজ করে। নিষেধ করলে তাদের হঠকারিতা বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি পায় পাপ। কথিত আছে যে, আখনাস ইবনে শুরাইক নামে একজন মোনাফেক ছিলো। সে ছিলো মিষ্টভাষী। রসূলের দরবারে হাজির হলে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা আর ভালোবাসা সহকারে ইসলাম যাহির করতো। কিন্তু ফিরে গিয়ে কারো ফসল জ্বালিয়ে দিতো, কারো পশুর পা কেটে দিতো। এ ধরণের মোনাফেকদের নিন্দায় আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

৩৩০, প্রথম আয়াতে যে মোনাফেকের কথা বলা হয়েছে- যে দ্বীনের পরিবর্তে দুনিয়া গ্রহণ করতো। তার বিপরীতে এখন নিষ্ঠাবান পূর্ণ ঈমানদার সম্পর্কে বলা হচ্ছে। যে দ্বীনের অন্বেষায় দুনিয়া এবং জান-মাল সবই ব্যয় করে। কথিত আছে যে, হযরত সোহাইব রুমী (রাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে রসূলের কাছে আসছিলেন। পথিমধ্যে মোশরেকরা তাকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। হযরত সোহাইব (রাঃ) বললেন যে, আমি আমার ঘর-বাড়ী অর্থ-সম্পদ সব কিছু তোমাদেরকে এ শর্তে দান করবো যে, তোমরা আমাকে মদীনা যেতে দেবে, হিজরত থেকে বারণ করবে না। তারা এই শর্তে রাজী হয়। হযরত সোহাইব (রাঃ) রসূলের খেদমতে হাজির হলে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের প্রশংসায় আয়াতটি নাযিল হয়।

তাঁর কত বড় রহমত যে, তিনি তাঁর বন্দাদেরকে তাওফীক দিয়েছেন যে, তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে নিজেদের জান-মাল হাযির করে। সকলের জান-মালের মালিক তো আল্লাহই। এরপরও জান্নাতের বিনিময়ে তা ক্রয় করা নিছক আল্লাহর অনুগ্রহ।

৩৩১. প্রথম আয়াতে নিষ্ঠাবান মোমেনের প্রশংসা করা হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিলো মোনাফেকী বাতিল করা। এখন বলা হচ্ছে, পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে গ্রহণ করো। অর্থাৎ

যাহেরে, বাতেনে, প্রকাশ্যে, গোপনে আকীদা এবং আমলে কেবল ইসলামের বিধান মেনে চলবে। এমন নয় যে, নিজের বুদ্ধি বা কারো বলায় কোন বিধান মেনে নেবে বা কোন আমল করতে শুরু করবে। বেদআতের মূল্যোৎপাটনই এর লক্ষ্য। কারণ, বেদআতের মূল কথাই হচ্ছে কোন আকীদা বা আল্লাহকে ভালো মনে করে নিজের বলা থেকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া। যেমন নামায, রোযা সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদাত। শরীয়াতের নির্দেশ ব্যতীত কেউ যদি নিজের পথ থেকে এটা নির্ধারণ করে নেয়, যেমন ঈদগাহে নফল নামায পড়তে শুরু করা বা হাজার রোযা রাখা, এটা হবে বেদাত। আয়াতের সার কথা হচ্ছে এখলাস ও নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনে বেদআত থেকে দূরে থাকবে। একবার কয়েকজন ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তারা ইসলামের বিধানের সঙ্গে তাওরাতের বিধানও মানতে চায়, যেমন শনিবারকে বড় দিল মনে করা, উটের দুধ গোস্তকে হারাম মনে করা এবং তাওরাত তেলাওয়াত করা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে, আয়াতটি নাযিল হয়। এ দ্বারা বেদাতকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা হয়।

৩৩২. অর্থাৎ শরীয়তে মোহাম্মদীর স্পষ্ট বিধান থাকার পরও কেউ যদি তাতে অটল-অবিচল না থেকে অন্য দিকেও দৃষ্টি দেয়, তা হলে জেনে নেবে যে, আল্লাহ সকলের ওপর শক্তিশালী। তিনি যাকে খুশী শাস্তি দেন, কেউ তাঁকে আযাব থেকে বারণ করতে পারে না। তিনি অতি ক্ষমাময়। যা করেন, সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতেই করেন। তাই আযাব দেন, বা কিছুটা ঢিল দেন। অর্থাৎ তিনি তাড়াহুড়া করেন না। কিছুই ভুলেন না, ইনসাফের পরিপন্থী অসমীচনী কিছুই তিনি করেন না।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট নির্দেশের পরও যারা-বাকা চলা থেকে বিরত না হয়, রাসূল এবং কোরআনের প্রতি তো তাদের ঈমান নেই। এখন কেবল এইটুকুই বাকী রয়েছে যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এবং তার ফেরেশতা তাদের কাছে এসে কেয়ামতের দিনের পুরস্কার তিরস্কারের ফয়সালা করে দেবেন। শেষ পর্যন্ত হিসাব-কিতাব আযাব সব কিছুই তার কাছে ফিরে যাবে। তাঁর কাছ থেকেই সকল হুকুম আসবে এতে ইতস্ততঃ এবং তাড়াহুড়া করার কিছুই নেই। ঘাবড়াচ্ছে কেন?

سَلْ بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ

ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ ط وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ

فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟

ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ م

وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ط وَٱللَّهُ يَرْزُقُ

مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً

وَٰحِدَةً تف فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّۦنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ص

وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ

فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ط وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ

مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ج فَهَدَى

ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ

بِإِذْنِهِۦ ط وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

রুকু ২৬

২১১. তুমি বনী ইসরাইলী (লোকজনদের ডেকে) জিজ্ঞেস করো- কি পরিমান সুস্পষ্ট নিদর্শন আমি তাদের দান করেছি (তুমিই বলো যে জাতির হাতে আল্লাহ্ তায়ালার) হেদায়াতের নেয়ামত আসার পর তাকে তারা নিজ খেয়াল খুশী মতো বদলে ফেলে আল্লাহ তায়ালা এ জন্যে তাদের কতো কঠোর আযাব দেবেন?

২১২. যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে- (পরীক্ষার উদ্দেশ্যে) আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে তাদের এ পার্থিব জীবনটাকে খুব লোভনীয় করে (সাজিয়ে) রাখা হয়েছে। (নিজেদের এ পার্থিব আরাম আয়েশ দেখে) এরা ঈমানদার ব্যক্তিদের বিদ্রুপ করে বেড়ায় (অথচ এরা জানে না যে,) এই ঈমানদার ব্যক্তি যারা (যাবতীয় পার্থিব লোভ লালসার উর্ধে উঠে) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করেছে শেষ বিচারের দিন তাদের মর্যাদা (এই অবিশ্বাসীদের তুলনায়) হবে অনেক বেশী। (অবশ্য এ বৈষয়িক দুনিয়ার কথা আলাদা- এখানে) আল্লাহ পাক যাকে চান তাকেই অপরিমিত রিজিক দান করেন।[৩৩৫]

২১৩. এক সময় দুনিয়ার সব মানুষ ছিলো একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। (পরে যখন এরা পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে মূল স্রষ্টাকে ভুলে গেলো) তখন আল্লাহ্ তায়ালা নবী পাঠালেন– (যারা সঠিক পথের অনুসারী নবীরা তাদের পরকালীন নেয়ামত ও সুখের) সুসংবাদ দিলেন, (আর যারা অসৎপথেই অটল থাকতে চাইলো তাদের পরকালের কঠোর আযাবের ব্যাপারে) তাদের সাবধানও করে দিলেন। (আল্লাহ শুধু নবীই পাঠাননি) তিনি তার সাথে সত্য গ্রন্থও নাযিল করলেন- যেন এই পুস্তক মানুষদের পারস্পরিক বিরোধ সমূহের চূড়ান্ত ফায়সালা করতে পারে। প্রধানতঃ আল্লাহর নাযিল করা কেতাব নিয়ে বেশী লোক মতবিরোধ করেনি। (তবে হাঁ,) কিছু লোক উজ্জ্বল নিদর্শন ও সুস্পষ্ট হেদায়াত পাঠানো সত্ত্বেও এ ব্যাপারে মতবিরোধের সৃষ্টি করে। এরা পরস্পর বিদ্রোহেরও সিদ্ধান্ত করে।

অতঃপর (এই মানুষদের যে অংশ আল্লাহর নবী ও তার আনিত পুস্তকের ওপর ঈমান আনলো) আল্লাহ্ তাদের সবাইকে স্বীয় ইচ্ছায় সেই সঠিক ও সহজ পথ দেখালেন, যার ব্যাপারে ইতিপূর্বে তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো। (সত্যিকার কথা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন তাকেই তিনি সঠিক পথ দেখান।[৩৩৬]

৩৩৫, ইতিপূর্বে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলার স্পষ্ট নির্দেশের পরও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ এই আযাবের কারণ। এর সমর্থনে বলা হচ্ছে যে, স্বয়ং বনী ইসরাইলকেই জিজ্ঞাসা কর, আমি তাদেরকে কত স্পষ্ট নিদর্শন আর দ্ব্যর্থহীন বিধান দিয়েছিলাম। তারা যখন এর বিরুদ্ধে গিয়েছে, তখন আযাবের ভাগী হয়েছে। এ নয় যে, আমি শুরুতেই তাদেরকে আযাব দিয়েছি।

অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এই যে, যে কেউ আল্লাহর হেদায়াত পূর্ণ বিধানের পরিবর্তন সাধন করে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে, তার দান-অনুগ্রহের না শুকরী করবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর কঠোর আযাব। আল্লাহর আয়াত পরিবর্তনকারীর জন্য রয়েছে কঠোর দন্ড। দুনিয়াতে সে মার খাবে, বা জিযিয়া দিয়ে লাঞ্ছিত হবে আর কেয়ামতে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে চিরদিনের জন্য। নেয়ামত আসার অর্থ হচ্ছে নেয়ামত সম্পর্কে জানা, তার জ্ঞান লাভ করা অথবা অনায়াসে তা অর্জন করা।

অর্থাৎ কাফেররা যে আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশ এবং তাঁর পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণ করে, উপরে যে কথার উল্লেখ রয়েছে, তার কারণ হচ্ছে এই যে, তাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার সৌন্দর্য ও তার ভালোবাসা এতটা জেঁকে বসেছে যে, তার তুলনায় আখেরাতের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তাই করেনা। বরং মুসলমানরা যে আখেরাতের চিন্তায় মত্ত এবং তাঁর নির্দেশ পালনে ব্যস্ত, উল্টা তাদের প্রতি এরা বিদ্রুপ করে, তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে। সুতরাং নাফসের বান্দা এমন আহম্মকরা কি করে আল্লাহর হুকুম তা'মীল করবে। মোশরেক রইসরা-হযরত বেলাল (রাঃ) হযরত আম্মার (রাঃ) হযরত সোহাইব এবং নিঃস্ব মুহাযিরদেরকে দেখে উপহাস করে বলতো যে, এ নাদানরা পরকালের চিন্তা করে দুনিয়ার বিপদাপদ মাথায় তুলে নিচ্ছে। আর মোহাম্মদ (সঃ) কে দেখ, এসব ফকীর মিসকীনদের সহযোগিতায় আরবের সর্দারদের ওপর বিজয় লাভ করতে চায়, চায় গোটা দুনিয়ার সংস্কার সাধন করতে।

আল্লাহ তায়ালা এর জবাবে এরশাদ করেন যে, এরা অবজ্ঞা আর ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে দুনিয়ার প্রতি এতটা মত্ত হয়েছে। তারা জানেনা যে, এসব গরীব-মিসকীনরা কেয়ামতের দিন তাদের চেয়ে অনেক ওপরে থাকবে। দুনিয়া-আখেরাতে যাকে ইচ্ছা আল্লাহ বে-শুমার জীবিকা দান করেন। তাই দেখা যায়, যেসব গরীবদের প্রতি কাফেররা বিদ্রূপ করতো, আল্লাহ তাদেরকে বনু ক্বুরায়যা-বনু নযীর এবং পারস্য সাম্রাজ্যের অর্থ-সম্পদ দান করেছেন।

৩৩৬. হযরত আদম (আঃ) সময় থেকে দীর্ঘদিন একই সত্য দ্বীন ছিলো। অতঃপর দ্বীনের ব্যাপারে লোকেরা মতভেদ সৃষ্টি করলে আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসুলদের প্রেরণ করেন, যারা ঈমানদার আনুগত্য পরায়নদেরকে সাওয়াবের সুসংবাদ দান করেন আর অবাধ্য বে-ঈমানদেরকে আযাবের ভয় দেখান। নবী-রাসূলদেরকে সত্য কিতাব দেয়া হয়েছে। যাতে সত্য দ্বীন তাদের মতভেদ থেকে হেফাযতে থাকতে পারে, পারে টিকে থাকতে। আর আল্লাহর বিধানে ইখতিলাফ তারাই সৃষ্টি করেছে, যারা কিতাব লাভ করেছিল, যেমন ইহুদী-খৃষ্টানরা তাওরাত-ইনজীলে ইখতিলাফ ও রদবদল করেছিল। তারা না বুঝে শুনে এটা করেনি, দুনিয়ার লোভ, হিংসা আর হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে ভালোভাবে বুঝে শুনেই এটা করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা আপন অনুগ্রহে ঈমানদারদেরকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন। বিভ্রান্ত আর পথ ভ্রষ্টদের ইখতিলাফ থেকে তাদেরকে রক্ষা

করেছেন। যেমন রসূলের উম্মতকে প্রতিটি আকীদা-আমলে সত্য বিষয়ের শিক্ষা দিয়েছেন। ইহুদী-খৃষ্টানদের ইখতিলাফ ও বাড়াবাড়ি থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছেন।

এই আয়াত থেকে দুটি বিষয় জানা যায়। এক আল্লাহ তায়ালা যে অনেক নবী-রসূল এবং কিতাব প্রেরণ করেছেন, তা প্রতিটি দল ও গোষ্ঠীকে পৃথক পৃথক পথ দেখাবার জন্য নয়, মূলতঃ আল্লাহ্ তায়ালা সকলের জন্য একই পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তারা এই পথ থেকে বিচ্যুত হলে তিনি নবী-রসূল প্রেরণ করেন, তাদের কিতাব পাঠান, যেন তারা তদনুযায়ী চলে। অতঃপর তারা পূণরায় বিভ্রান্ত হলে তিনি আবার কিতাব ও নবী প্রেরণ করেন একই পথে কায়েম করার জন্য। একটা উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে, সুস্থতা একটি আর অসুস্থতা অনেক। একটা অসুস্থতা দেখা দিলে তদনুযায়ী ঔষধ ও পথ্য নির্দেশ করেন। অপর একটা অসুস্থতা দেখা দিলে সে অনুযায়ী ঔষধ ও পথ্য বলে দেন। সবশেষে এমন এক পথ-পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা সকল রোগ-ব্যাধী আর অসুস্থতা থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট। সেই পন্থা হচ্ছে ইসলাম। এজন্য শেষ নবী এবং কোরআন প্রেরণ করা হয়েছে। দুই, অসৎ লোকেরা প্রেরিত নবীর বিরোধীতা এবং খোদার কিতাবে বিভেদ-বিচ্ছেদ করতো। জানা যায় যে, আল্লাহ্র এই নীতিই কার্যকর রয়েছে। তাছাড়া সবসময় তারা এ চেষ্টাই করে আসছে। সুতরাং কাফেরদের অসদাচরণ আর বিপর্যয়ে ঈমানদারদেরকে এখন মনক্ষুণ্ন হয়ে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

২১৪. তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা (এমনি এমনিই) বেহেস্তে চলে যাবে? আজো পূর্ববর্তি নবীদের অনুসারীদের মুসীবতের কিছুই তোমাদের ওপর নাযিল হয়নি। তাদের ওপর (বহু ধরনের) বিপর্যয় ও সংকট এসেছে কঠোর নির্যাতনে তারা নির্যাতিত হয়েছে- (কঠিন) নিপীড়নে তারা শিহরিত হয়ে উঠেছে (বহুবার), এমন কি স্বয়ং আল্লাহর নবী ও তার সংগী সাথীরা (অত্যাচারে অতীষ্ট হয়ে) এই বলে আর্তনাদ করে উঠেছেন যে, আল্লাহ! (কোথায়) তোমার সাহায্য কবে (তা) আসবে? (আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয়জনদের সান্তনা দিলেন- হাঁ আমার সাহায্য অতি নিকটে।৩৪০

২১৫. লোকেরা তাদের খরচের ধরন ও (খাত) সম্পর্কে তোমার কাছে জানতে চাইবে৩৪১, তুমি তাদের বলে দাও যাই তোমরা ভালো কাজে খরচ করবে, (তাই আল্লাহ গ্রহণ করবেন। অবশ্য তোমাদের দানের খাত হবে) তোমাদের পিতামাতার জন্যে আত্মীয় স্বজনদের জন্যে ইয়াতীম অসহায় মিসকীনদের জন্যে এবং মুসাফীরদের জন্যে- (এর বাইরেও) যা ভালো কাজ তোমরা করবে, আল্লাহ পাক তা অবশ্যই জানতে পারবেন।৩৪২

২১৬. (সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অসত্যের নির্মূল সাধনের জনে) আল্লাহ তায়ালার আদেশে যুদ্ধ তোমাদের ওপর ফরজ করে দেয়া হয়েছে৩৪৩- আর এইটাই তোমাদের ভালো লাগে না!৩৪৪ কিন্তু (তোমাদের জেনে রাখা উচিৎ) এমন কোনো জিনিস তো থাকতে পারে যা, তোমাদের অপছন্দনীয়- অথচ তাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আবার একই ভাবে এমন কোনো জিনিস, যা দেখে তোমাদের খুবই ভালো লাগবে (বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হবে তাই বুঝি কল্যাণকর- ফলাফলের দৃষ্টিতে) কিন্তু তা হবে তোমাদের জন্যে খুবই ক্ষতিকর।

(আসল কথা হচ্ছে ভালো-মন্দের কথা) আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। তোমাদের তো এর কিছুই জানা নেই।৩৪৫

৩৪০. আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী এবং তাদের উম্মত সব সময় দুশমনদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন। আর এখন মুসলমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা কি আশা করযে, জান্নাতে প্রবেশ করবে। অথচ পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে যেসব কষ্ট আর নির্যাতন সইতে হয়েছে, তোমাদেরকে এখনো তা সইতে হয়নি। অভাব-অনটন, রোগ-ব্যাধী আর কাফেরদের ভয়-ভীতি তাদেরকে এতটা আচ্ছন্ন করেছিল যে, লাচার এবং বাধ্য হয়ে নবী এবং তাদের উম্মত বলে উঠেছিল যে, আল্লাহ যে সাহায্যের ওয়াদা তুমি করেছো তা কবে আসবে? অর্থাৎ মনুষ্যত্বের দূবলতা হেতু অস্থিরতার সময় তাদের মুখ থেকে নৈরাশ্যজনক কথাবার্তা নিসৃত হয়ে থাকে। আম্বিয়া এবং মোমেনরা সন্দেহের কারণে এসব কথা বলেননি। হযরত মওলানা রুমী এ প্রসঙ্গে মসনবীতে একই কথা বলেছেন ঃ

'বরং অপারগ অবস্থায় মনুষ্যত্বের দাবী অনুযায়ী এটাই ঘটেছে। এতে তাদের ওপর কোন দোষ আরোপ করা যায় না।' এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে খোদার রহমত প্রসারিত হয় এবং বলা হয় যে, জেনে রাখবে, আল্লাহর সাহায্য উপস্থিত হয়েছে। তোমরা ঘাবড়াবেনা। হে মুসলমানরা, পার্থিব কষ্ট আর দুশমনের বিজয়ে তোমরা হতাশ হবেনা। ধৈর্য ধারণ কর এবং দৃঢ় থাক।

৩৪১. পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে একথা বলা হয়েছে যে, কুফরী মোনাফেকী ত্যাগ করে তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে ক্ষতি হও আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে কারো কথা শুনবেনা। আল্লাহর সন্তুষ্টিতে জান-মাল ব্যয় কর এবং সব রকম কষ্টে ধৈর্য ধারণ কর। এখন এ মূলনীতির খুটিনাটি দিক বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে। জান-মাল এবং অন্যান্য বিষয় যেমন বিয়ে-তালাক ইত্যাদি প্রসঙ্গে এসব খুটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, যাতে এর মূলনীতিটি মনে ভালোভাবে বদ্ধমূল হতে পারে।

৩৪২. কিছু বিত্তবান লোক রসূল (দঃ) এর কাছে জানতে চাচ্ছে যে, অর্থ-সম্পদের কি পরিমাণ ব্যয় করবো এবং কার জন্য ব্যয় করবো? এর জবাবে-নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, কম হোক কি বেশী, খোদার পথে যা কিছু ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, এতীম-অভাবী এবং মুসাফিরের জন্য। অর্থাৎ সাওয়াব লাভের জন্য ব্যয় করতে চাইলে যত খুশী কর, এর কোন সীমা সরহদ নেই। অবশ্য এটুকু অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে, আমি যেসব খাত এর নির্দেশ দিয়েছি, সেসব খাতে ব্যয় করবে।

৩৪৩. অর্থাৎ দ্বীনের দুশমনদের সঙ্গে লড়াই করা ফরয। রাসূল (দঃ) যতদিন মক্কায় ছিলেন, তাকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি। মদীনায় হিজরত করার পর যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু এ অনুমতি সকলের সঙ্গে যুদ্ধের নয়, বরং যারা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য এ অনুমতি দেয়া হয়েছে। এরপর কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধের সাধারণ অনুমতি দেয়া হয়। জেহাদ ফরয হয়। দ্বীনের দুশমনরা যদি মুসলমানদের ওপর হামলা চালায়, তবে জেহাদ করযে আইন, অন্যথায় ফরযে কেফায়াহ। (এখানে

অবশ্য ময়দানে সম্মুখ সমরের অর্থেই কথাটা বোঝানো হয়েছে, নতুবা জেহাদ তো সব সময়ই ফরজে আইন) অবশ্য এজন্য শর্ত এই যে, ফিকহ্ এর কিতাবে উল্লেখিত সমস্ত শর্ত পাওয়া যেতে হবে। যাদের সঙ্গে মুসলমানরা সন্ধি-সমঝোতা করেছে। বা যারা মুসলমানদের হিফাযত-নিরাপত্তায় আশ্রয় নেয়, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বা তাদের বিরোধিতায় তাদের কোন বিরুদ্ধ পক্ষকে সাহায্য করা মুসরমানদের জন্য কিছুতেই জায়েয নেই।

৩৪৪. খারাব লাগার অর্থ নফসের কাছে কঠিন এবং ভারী মনে হয়। এটা নয় যে, অমান্য ও অস্বীকারযোগ্য এবং প্রজ্ঞা ও যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়না, বরং অসন্তুষ্টি ও বিতৃষ্ণার কারণ মনে হয়। সুতরাং এতটুকুতে কোন দোষ নেই। যখন স্বভাবতঃই মানুষের কাছে জীবনের চেয়ে প্রিয় কোন বস্তু নেই, তখন অবশ্যই যুদ্ধের চেয়ে কঠিন কোন কাজ হওয়া উচিৎ নয়।

৩৪৫. অর্থাৎ এটা জরুরী নয় যে, তোমরা যে বস্তুকে নিজেদের জন্য উপকারী বা অপকারী মনে করবে, বাস্তবেও তা তোমাদের জন্য এমনই হবে। বরং হতে পারে যে, তোমরা একটা জিনিষকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে কর, অথচ তা তোমাদের জন্য উপকারী , আর কোন জিনিষকে তোমরা উপকারী মনে কর, অথচঃ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। তোমরা তো মনে করেছ যে, জেহাদে জান-মাল উভয়েরই ক্ষতি, আর জেহাদ ত্যাগ করায় উভয়ই রক্ষা পাবে। কিন্তু তোমরা এটা জানলে না যে, জেহাদে দুনিয়া এবং আখেরাতের কি কি কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর তা ত্যাগ করায় কি কি ক্ষতি আাছে। তোমাদের ভালো-মন্দ আল্লাহই ভালো জানেন, তোমরা তা জাননা। সুতরাং তিনি যে নির্দেশ দেন, তাকেই সত্য মনে করবে, তোমরা তা জাননা। সুতরাং তিনি যে নির্দেশ দেন, তাকেই সত্য মনে করবে এবং নিজেদের এ ধারণা ত্যাগ করবে।

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ط

قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ط وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ

بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ق وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ

عِنْدَ اللَّهِ ج وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ط وَلَا يَزَالُونَ

يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ

اسْتَطَاعُوْا ۭ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ

وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰۗىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا

خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا

وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰۗىِٕكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ

اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾ يَسْــَٔـلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ

وَالْمَيْسِرِ ۭ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۡ

وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۭ وَيَسْــَٔـلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ڛ

قُلِ الْعَفْوَ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ

تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۭ وَيَسْــَٔـلُوْنَكَ عَنِ

الْيَتٰمٰى ۭ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۭ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ

فَاِخْوَانُكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۭ وَلَوْ

شَاۗءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾

রুকু ২৭

২১৭. সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে মানুষরা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে[৩৪৬], তুমি এদের বলে দাও- এই মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ কাটাকাটি করা অনেক বড়ো ধরনের গুনাহ[৩৪৭]- (কিন্তু মনে রেখো) আল্লাহর দৃষ্টিতে এর চাইতেও জঘন্য রকমের গুনাহ হচ্ছে, আল্লাহর পথ থেকে মানুষদের ফিরিয়ে রাখা- (মালিক ও প্রভূ হিসেবে) আল্লাহকে অস্বীকার করা- (আল্লাহ তায়ালার এবাদাতের কেন্দ্র বিন্দু) খানায়ে কাবার দিকে যাওয়ার পথ রোধ করা ও যেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে বের করে দেয়া[৩৪৮], (আর খোদাদ্রোহীতার ফেৎনা ফাসাদ, হত্যা কান্ডের চাইতে অনেক বেশী অন্যায়[৩৪৯], (তাই সম্মানিত মাসের অজুহাত দিয়ে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করার সুযোগ নেই) এই (আল্লাহ বিদ্রোহী) ব্যক্তিরা (কিন্তু) তোমাদের সাথে (এ সব) লড়াই ও সংঘর্ষ বন্ধ করে দেবে বলে (তুমি) ভেবো না, তারা তো পারলে (বরং) তোমাদের সবাইকে তোমাদের ইসলামী জীবন বিধান থেকেও ফিরিয়ে নিতে চাইবে।[৩৫০]

(তবে একথাও তোমরা জেনে রেখো- যে) যদি তোমাদের কোনো ব্যক্তি নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যায় এবং এ অবস্থায়ই যদি সে মৃত্যু মুখে পতিত হয় তাহলে সে সুস্পষ্টত কাফের অবস্থায় ইহলীলা সাংগ করবে, তার যাবতীয় কর্মকান্ড দুনিয়া আখেরাতে বিফলে যাবে, আর যাদের কর্মকান্ড বিফলে যাবে তারা সবাই হবে (এক একজন) জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তাদের নিবাস হবে চিরস্থায়ী।[৩৫১]

২১৮. (অপরদিকে) যারা (এসব কোনো অন্যায় অনাচারে লিপ্ত না হয়ে) ইসলামী জীবন বিধানের ওপর ঈমান এনেছে (সে দ্বীনের খাতিরে নিজেদের ভিটে মাটি ছেড়ে) অন্য দেশে হিজরত করেছে– (সর্বোপরি এই দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে) আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে- তারা আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে অনুগ্রহ পাবার আশা করতে পারে, আল্লাহ তায়ালা (তার এসব বান্দার) ভুলত্রুটি মাফ করে দেবেন- তিনি অত্যন্ত দয়ালু![৩৫২]

২১৯. লোকেরা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে (আল্লাহর নির্দেশ) জিজ্ঞেস করবে[৩৫৩] তুমি (তাদের) বলে দাও এই দুটো জিনিসের মধ্যেই রয়েছে অনেক বড়ো ধরনের পাপ (যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে) এর কিছু কিছু উপকারী তা রয়েছে- কিন্তু মদ ও জুয়ার (ধ্বংসকারী) গুনাহ তার এই (বাহ্যিক) উপকারীতার চাইতে অনেক বেশী।[৩৫৪]

লোকেরা তোমাকে (এও) জিজ্ঞেস করে যে, তারা (নেক কাজে) কি কি খরচ করবে, তুমি তাদের বলো, নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের পর যা থেকে যায় তা থেকেই খরচ করবে[৩৫৫] (তাদের এও বলে দাও যে,) এ ভাবেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তার নির্দেশ সমূহ খুলে খুলে বলে দেন যাতে করে, তোমরা এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারো।

২২০. (এই নির্দেশ মেনে চললে) তোমাদের ইহকাল ও পরকালের জীবনে বহুতর কল্যাণ সাধিত হবে।৩৫৬ লোকেরা তোমাকে অনাথ ইয়াতীমদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বলো তাদের ভালাই'র (জন্যে যতো রকম কল্যানকর) পন্থা (আছো তা) তোমরা মেনে চলো।

যদি (কখনো কোনো পর্যায়ে) তাদের অর্থনেতিক কাজকর্ম তোমরা নিজেদের সাথে মিশিয়ে ফেলো (তাতে নিজেদের অপরাধী ভাবার কোনো কারণ নাই) কারণ তারা তো তোমাদেরই ভাই, আর আল্লাহ তায়ালা তো এটা ভালো করেই জানেন কে ন্যায়ানুগ পন্থায় আছে আর কে তাদের মাঝে অমংগল কারী৩৫৭ আল্লাহ তায়ালা চাইলে ইয়াতীমদের (মালামালকে নিজেদের সাথে মিশিয়ে নেয়ার) ব্যাপারে আরো অধিক কড়াকড়ি আরোপ করতে পারতেন৩৫৮ কিন্তু তিনি শুধু যে ক্ষমতাবান তাই নয়, (কিষে কার মংগল একথা জানার ব্যাপারে) তিনি সর্বজ্ঞও।৩৫৯

---

৩৪৬. রসূল (সাঃ) কাফেরদের বিরুদ্ধে একটা বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা কাফেরদেরকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে আসে। মুসলমানরা জানত যে, এটা জমাদিউস সানীর শেষ দিন। অথচ আসলে তা ছিলো রজব মাসের প্রথম দিন। রজব মাস ছিলো অন্যতম হারাম মাস (যে মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ তারই একমাস)। কাফেররা ভৎর্সনা করে বলে যে, মোহাম্মদ (সঃ) হারাম মাসকেও হালাল করে নিয়েছে। তার লোকজনকে হারাম মাসেও লুটতরাজের অনুমতি দিয়েছে। মুসলমানরা রসূলের -দরবারে হাযির হয়ে জিজ্ঞাসা করে যে, আমরা সন্দেহ বশতঃ এ কাজ করেছি। এর কি হুকুম? এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়।

৩৪৭. অর্থাৎ হারাম মাসে যুদ্ধ করা নিঃসন্দেহে গুনাহের কাজ। কিন্তু সাহাবারা তো তাদের জ্ঞান অনুযায়ী জামাদিউস সানীতে জেহাদ করেছিলেন- হারাম মাস অর্থাৎ রজব মাসে নয়। তাই তারা ক্ষমার যোগ্য। এজন্য তাদের প্রতি দোষারোপ করা বে-ইনসাফী হবে।

৩৪৮. অর্থাৎ লোকদেরকে ইসলাম থেকে বারণ করা এবং স্বয়ং দ্বীন-ইসলামকে স্বীকার না করা, আল্লাহর ঘরের যিয়ারত থেকে মানুষকে বারণ করা এবং মক্কার বাসিন্দাদেরকে সেখান থেকে বহিস্কার করা এসব কাজ হারাম মাসে যুদ্ধ করার চেয়েও বেশী গুনাহ। আর কাফেররাতো সবসময় এসব কাজ করে থাকে। সার কথা এই যে, হারাম মাসে অকারণে যুদ্ধ করা নিঃসন্দেহে বড় গুনাহ। কিন্তু যারা হেরেমেও কুফরী বিস্তার করে, বড় বড় বিপর্যয় ঘটায়, হারাম মাসেও মুসলমানদেরকে উত্যক্ত করতে কসূর করেনা, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ নয়। উপরন্তু কাফেররা যখন এসব ঘৃণ্য কাজে তৎপর, তখন একটা ছোট অপরাধের জন্য-যা সংঘটিত হয়েছে না জানার কারণে- মুসলমানদের ভৎর্সনা করা অত্যন্ত লজ্জার কথা।

৩৪৯. অর্থাৎ দ্বীনের মধ্যে কেৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করা, যাতে মানুষ সত্য দ্বীন কবুল করতে না পারে, হারাম মাসে সংঘটিত মুসলমানদের যুদ্ধ থেকে অনেক গুণ বেশী ঘৃণীত। মোশরেকদের অভ্যাস ছিলো তারা দ্বীন-ইসলামের ব্যাপারে নানা ধরণের সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করতো, যাতে মানুষ সন্দেহে পতিত হয় এবং ইসলাম কবুল না করে। মুসলমানদের দ্বারা না জানার কারণে হারাম মাসে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, মোশরেকরা এ ব্যাপারে নানা কথা বলে। এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যাতে ইসলাম সম্পর্কে ভীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে। সার কথা এই দাঁড়ায় যে, মুসলমানদের দ্বারা যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তাতে মোশরিকদের ভর্ৎসনা করা, যাতে মানুষ সত্য দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়, এটা উপরোক্ত হত্যার চেয়ে অনেক বেশী ঘৃণ্য, জঘন্য।

৩৫০. অর্থাৎ যতক্ষণ তোমরা সত্য দ্বীনে অটল-অবিচল থাকবে, এ মোনাফেকরা কোন পরিস্থিতিতে কোন অবস্থায়ই তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং তোমাদের বিরোধিতা করায় কোন ত্রুটি করবে না। মক্কার হেরেম আর হারাম মাস যাই হোক না কেন। যেমন হোদায়বিয়ার ওমরায় এরা করেছে। মক্কার হেরেমের কোন ইজ্জত এরা করেনি, ইজ্জত করেনি হারাম মাসের। অকারণে নিছক শত্রুতার বশবর্তী হয়ে মারা এবং মরার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল মুসলমানদের মক্কায় যাওয়া এবং ওমরা করার জন্যও উদার হতে পারেনি। এমন দুশমনদের নিন্দা-ভর্ৎসনার কি পরোয়া করা হবে, হারাম মাসের কারণে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে কেন বিরত থাকতে হবে।

৩৫১. অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত এই ফিরে যাওয়ায় অটল থাকা এমন এক কঠিন আপদ যে, তাদের সারা জীবনের নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়, কোন কল্যাণেরই তারা আর যোগ্য থাকেনা। দুনিয়ায় তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকেনা, বিয়ে বহাল থাকে না, উত্তরাধিকার পায় না, তারা পরকালে সাওয়াব পাবে না, কখনো জাহান্নাম থেকে নাজাতও নছিবে জুটবেনা। অবশ্য পুনরায় যদি ইসলাম কবুল করে, তবে ইসলাম পরবর্তী কালের ভালো কাজের পুরস্কার অবশ্যই পাবে।

৩৫২. আগের আয়াত থেকে সাহাবীদের উপরোক্ত জামায়াত এটাই জানতে পেরেছে যে, এ ব্যাপারে আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ তো করা হবেনা। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দে ছিলেন যে, এ জেহাদের সাওয়াব পাওয়া যাবে কি-না। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর জন্য তার দুশমনদের সঙ্গে লড়াই করে, এ লড়াইয়ে নিজেদের কোন গরজ নেই, তারা নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী এবং তা লাভের যোগ্য হবে। আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের অপরাধ ক্ষমা করেন এবং তাদেরকে ইনাম দান করেন। তিনি এমন অনুগতদেরকে কখনো বঞ্চিত করবেন না।

৩৫৩. মদ এবং জুয়া সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। প্রতিটি আয়াতে এগুলোর খারাপ দিক তুলে ধরা হয়। অবশেষে সূরা মায়েদার আয়াতে এসব নিষিদ্ধ করা হয়

সুস্পষ্টভাবে। এখন নেশাদার সব জিনিষই হারাম। কোন বিষয়ে হার-জিতের শর্ত আরোপিত হলে তা নিছক হারাম। কিন্তু এক পাশের শর্ত হারাম নয়।

৩৫৪. জ্ঞান-বুদ্ধি মানুষকে সকল ঘৃণ্য কার্য থেকে রক্ষা করে। মদ পানের ফলে জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায়। যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি নানাবিধ অন্যায় সংঘটিত হয় নানা প্রকার মানসিক এবং শারীরিক রোগ-ব্যাধী সৃষ্টি হয়। কোন কোন সময় এসব ধ্বংসের কারণও হয়ে দাঁড়ায় আর জুয়া খেলায় হারাম মাল খাওয়া, চুরি, ধন-সম্পদ এবং পরিবার পরিজনের বিনাশ, পারস্পরিক শত্রুতা ইত্যাদি নানা রকমের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ক্ষতি সাধিত হয়। অবশ্য এসবে বাহ্যিক কিছু লাভও আছে। যেমন মদ পান করে স্বাদ ও আনন্দ না লাভ করা এবং জুয়া খেলে বিনা কষ্টে অর্থ লাভ করা।

৩৫৫. লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছিল, আল্লাহর জন্য কত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে। হুকুম হয়েছে, নিজের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা অতিরিক্ত থাকে। কারণ, আখেরাতের চিন্তা যেমন জরুরী, তেমনি দুনিয়ার চিন্তাও জরুরী। সব অর্থ দান করে দিলে নিজের প্রয়োজন কি-ভাবে পূরণ করবে। তোমাদের ওপর যেসব অধিকার অবশ্য করণীয়, তা কিভাবে আদায় করবে? কে জানে কত রকমের পার্থিব ও পারলৌকিক অসুবিধায় পড়বে।

৩৫৬. অর্থাৎ দুনিয়া নশ্বর কিন্তু প্রয়োজনের স্থান। আর আখেরাত অবিনশ্বর এবং সাওয়াবের স্থান। এ কারণে একান্ত চিন্তা-ভাবনা করে সব ব্যাপারে প্রয়োজন অনুপাতে ব্যয় করতে হবে। দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় প্রয়োজন সামনে রাখাই সমিচীন। বিধানসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করার তাৎপর্যই হচ্ছে এই যে, তোমরা যাতে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাও।

৩৫৭. কিছু লোক এতীমের সম্পদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতোনা। এই প্রসঙ্গে হুকুম হয় 'তোমরা এতীমের মালের কাছেও আসবেনা, কিন্তু এমন (পন্থায়) যা উত্তম' এবং 'নিঃসন্দেহে যারা যুলুম করে এতীমের মাল খায়'। এর ফলে যারা এতীমদের লালন-পালন করতো তারা ভীত হয়ে পড়ে এবং শিশুদের খানা-খরচ সম্পূর্ণ পৃথক করে দেয়। কারণ, এক সঙ্গে থাকলে এতীমের মাল খেতে হয়, এতে অসুবিধা দেখা দেয়। একটা জিনিষ এতীমের জন্য তৈরী করা হয়েছে। সে খাওয়ার পর অবশিষ্টাংশ নষ্ট হয়ে যেতো এবং ফেলে দিতে হতো। এই সতর্কতা অবলম্বনে এতীমদের ক্ষতি হতে লাগলে রসূলের দরবারে আরয করার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়।

৩৫৮. অর্থাৎ উদ্দেশ্য তো কেবল এই যে, এতীমের সম্পদ যথাযথভাবে রক্ষা করা। সুতরাং যেখানে এক সঙ্গে রাখার মধ্যেই তার কল্যাণ নিহিত থাকে, সেখানে তার ব্যয়ও শামিল করে নিলে কোন দোষ নেই। এক সময় তার জিনিষ খেলে, আর তাকে খাওয়ালে নিজের জিনিষ এতীম শিশুরা তোমাদের দ্বীনি বা বংশগত ভাই। আর ভাইয়ের মধ্যে এক সঙ্গে থাকা, খাওয়া এবং খাওয়ানো অন্যায় নয়। অবশ্য এতীমের সংশোধনের প্রতি

পুরাপুরি লক্ষ্য রাখবে। এতীমের অর্থ- সম্পদ আত্মসাৎ ও ধ্বংস করা-কার উদ্দেশ্য, আর কার লক্ষ্য এতীমের সংশোধন ও তার কল্যাণ সাধন, আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন।

৩৫৯. কষ্টে ফেলতেন অর্থাৎ খাওয়া-পরায় সংশোধনের উদ্দেশ্যেও এতীমদেরকে শরীক করা তোমাদের জন্য 'মোবাহ' করতেন না। অথবা না জেনে-শুনে বিনা উদ্দেশ্যে বাধ্য হয়ে যদি কিছু কম-বেশী হয়ে যায়, তবে তিনি পাকড়াও করতেন।

অর্থাৎ কঠোর থেকে কঠোরতর নির্দেশ দিতে পারেন। কারণ, তিনি মহা পরাক্রমশালী। কিন্তু তিনি এরূপে করেননি। বরং সহজ হুকুম দিয়েছেন। কারণ, যুক্তি আর উপযোগিতা অনুযায়ী তিনি কাজ করেন।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۚ وَلَاَمَةٌ
مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۚ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى
النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ
وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

২২১. তোমরা কখনো কোনো মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, (হাঁ) তারা যদি আল্লাহর দ্বীনের ওপর ঈমান আনে (তবে বিয়ে করতে পারো, মনে রাখবে) একজন ক্রীতদাস মুসলমান মেয়ে একজন (ঐতিহ্যবাহী শরীফ খান্দানের) মুশরিক নারীর চাইতে (অনেক) উত্তম, যদিও এই মুশরিক নারীটিকে তোমাদের বেশী ভালো লাগে। আবার মুসলিম মহিলারাও কখনো কোনো মুশরিক পুরুষের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবে না তবে (হাঁ) তারা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান আনে (তবে তা ভিন্ন কথা, কেননা) একজন ঈমানদার দাসও (কোনো উঁচু খান্দানের শরীফ) ব্যক্তির চাইতে মর্যাদা সম্পন্ন, যদিও এই মুশরিক ব্যক্তিটিকে সবার পছন্দ হয়ে থাকে!

(এই বিধান এ জন্যেই করা হয়েছে যে) এই মুশরিক ব্যক্তিরা (তারা স্বামী হোক কিংবা স্ত্রী) তোমাদের (আস্তে আস্তে) জাহান্নামের আগুনের দিকে ডেকে নেবে।৩৬০. আর আল্লাহ তায়ালা হামেশাই তার মুমীন বান্দাহদের তার আদেশ বলে জান্নাত ও (সেখানে পৌঁছার মূল মন্ত্র) ক্ষমার দিকেই আহবান জানাবেন- এবং (এ জন্যে) তিনি তার আয়াত ও নিদর্শন সমূহকে মানুষদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনাও করেন, যাতে করে তারা এ থেকে নিজেদের জন্যে উপদেশ গহণ করতে পারে।

৩৬৯. আগে মুসলিম পুরুষ এবং কাফের স্ত্রী এবং কাফের স্ত্রী ও মুসলিম পুরুষের মধ্যে বিয়ের অনুমতি ছিলো। এ আয়াত দ্বারা তা রহিত করা হয়েছে। পুরুষ বা নারী মোশরেক হলে মুসলমানের সঙ্গে তার বিয়ে জায়েয নেই। অথবা বিয়ের পর একজন মোশরেক হয়ে গেলে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। আর শেরক হচ্ছে এই যে, ইল্‌ম্ কুদরত বা অন্য কোন খোদায়ী ছিফাতে কাউকে খোদার সমকক্ষ মনে করা বা খোদার অনুরূপ কারো সম্মান করা, কাউকে মান্য করা। যেমন কাউকে সেজদা করা বা কাউকে ক্ষমতাবান মনে করে তার কাছে প্রয়োজনীয় বিষয়ে চাওয়া তার আরাধনা করা। অন্যান্য আয়াত থেকে এতটুকু জানা যায় যে, ইহুদী-খৃষ্টানরারদের সঙ্গে মুসলিম পুরুষের বিয়ে জায়েয আছে। তারা যদি আপন আপন দ্বীনে অটল থাকে, প্রকৃতিবাদী বা নাস্তিক না হয়, যেমন বর্তমানে অধিকাংশ খৃষ্টানকে দেখা যায়।

গোটা আয়াতের সারকথা এ যে, মোশরেক নারীর সঙ্গে মুসলমান পুরুষের বিবাহ জায়েয নেই, যতক্ষণ না সে মুসলমান হয়। নিঃসন্দেহে মুসলিম দাসী কাফের নারীর চেয়ে উত্তম। অর্থ-সম্পদ, শোভা-সৌন্দর্য আর শরাফত, বংশ মর্যাদার বিচারে মোশরেক নারী তোমাদের পছন্দ হলেও তাদের সঙ্গে তোমাদের বিয়ে জায়েয নাই। তেমনি ভাবে মুসলিম নারীদেরকে মোশরেক পুরুষের কাছে বিবাহ দেবেনা। মোশরেক নারী আযাদ হলেও মুসলমান গোলাম তার চেয়ে অনেক ভালো। যদিও চেহারা-সুরত এবং অর্থ-সম্পদের বিচারে গোলাম মুসলমান তোমাদের পসন্দ হয় না। অর্থাৎ সর্ব নিকৃষ্ট মোসলমানও মোশরেকের চেয়ে অনেক উত্তম, মোশরেক বাহ্যিক দিক থেকে যত উত্তমই হোক না কেন।

অর্থাৎ মোশরেক নারী-পুরুষ, যাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তাদের কথা বার্তা, কার্যকলাপ, তাদের প্রতি ভালোবাসা ও মেলামেশা করা, শেরকের প্রতি মনের ঘৃণা হ্রাস করে এবং শেরকের প্রতি আকর্ষণের কারণ হয়। এর পরিণাম ফল হয় দোযখ। এ কারণে এদের সঙ্গে বিয়ে থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى
يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوْا
حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ ۫ وَقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾
وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْا
وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾

রুকু ২৮

২২২. হে নবী লোকেরা তোমার কাছ থেকে জানতে চাইবে (মহিলাদের মাসিক) ঋতু কালীন সময়ে (তাদের সাথে দৈহিক মিলন) সম্পর্কে। তুমি তাদের বলো, (আসলে) এই (সময়টা) হচ্ছে একটি অসুস্থ অপবিত্র ও অসুবিধাজনক অবস্থা, কাজেই এই সময়টাতে তোমরা (যৌন কাজের জন্যে) তাদের কাছে যেওনা যতোক্ষণ না তারা পুনরায় পবিত্র হয় (সে সময়টা পার হয়ে) তারা যখন পুনরায় পাকসাফ হয়ে যায়, তখন (যৌন প্রয়োজনে) তাদের কাছে যাও। (তবে এখানেও মনে রাখতে হবে যে, এই যাওয়ার) যে পদ্ধতি আল্লাহ তায়ালা শিখিয়ে দিয়েছেন সেই ভাবেই (যেতে হবে), আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সে সব লোকদের ভালবাসেন যারা (ভুল ভ্রান্তি করে পুনরায়) আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে এবং যারা পাক পবিত্রতা অবলম্বন করে।৩৬৩

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্যে ফসল (ফলানোর) ক্ষেত্র, (কারণ তাদের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তায়ালা মানব সন্তানের উৎপাদন করেন, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্যে এই বিধান দিয়েছেন যে) তোমরা তোমাদের এই ফসল ফলানোর মাঠে যেভাবেই ইচ্ছে সেভাবেই গমন করো (তবে দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে না চলে) তোমরা সব সময় আগামী দিনের কথা চিন্তা করবে এবং (সর্বদাই এসব ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করবে।

(প্রতিটি কাজের ব্যাপারেই) ভালো করে এ কথাটা জেনে রাখবে যে, জীবনের শেষে একদিন তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। (হাঁ যারা যারা এই সাক্ষাতের দিনকে বিশ্বাস করেছে এমন সব) বিশ্বাসীদের তুমি (আমার পক্ষ থেকে) অগুণতি পুরস্কারের সুসংবাদ দান করো।

২২৪. এমন সব শপথ (ভাংগার) ব্যাপারে আল্লাহর নামকে লক্ষ বস্তু বানিয়ো না যার উদ্দেশ্য হবে, তুমি ভালো কাজ করবে, আল্লাহকে ভয় করবে এবং মানুষদের মাঝে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করবে (এ ধরনের কোনো কাজে আল্লাহর নামে শপথ করা হলে তা ভেংগে ফেলার ব্যাপারে আল্লাহর নামকে অজুহাত হিসেবে পেশ করো না) কারণ আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের (বলা না বলা) সব কিছুই শুনেন, এবং (মনের) সব কথাই তিনি জানেন।[৩৬৭]

---

৩৬৩. ঋতুস্রাবকে বলা হয় হায়েয। এ অবস্থায় সঙ্গম, নামায-রোযা সবই হারাম। অভ্যাসের বিপরীতে যে রক্ত স্রাব হয়, তা রোগ। এ সময় নামায-রোযা সঙ্গম, সবই জায়েয। এটা আঘাত বা শিঙ্গা দেয়ার ফলে রক্ত স্রাবের মতো। ইহুদী এবং অগ্নি পূজকরা হায়েয অবস্থায় নারীর সাথে পানাহার এবং একই গৃহে বাস করাকেও জায়েয মনে করতোনা। খৃষ্টনরা সঙ্গম থেকেও বিরত থাকতো না। এ ব্যাপারে রাসূলকে জিজ্ঞাসা করা হলে আয়াতটি নাযিল হয়। অতঃপর রসূল (দঃ) স্পষ্ট বলেছেন যে, হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করা সম্পূর্ণ হারাম। তাদের সঙ্গে পানাহার, বসবাস সবই জায়েয। এর ফলে ইহুদী-খৃষ্টানদের বাড়াবাড়ি রহিত হয়ে গেছে।

পাক হওয়ার ব্যাপারে সোজা কথা এই যে, পূর্ণ মুদ্দত অর্থাৎ দশদিন পরে হায়েয বন্ধ হলে তখন থেকে স্ত্রী সঙ্গম জায়েয। দশ দিনের আগেই হায়েয বন্ধ হলে, যেমন ৬ দিন পর, আর তার অভ্যাসও ছিলো ৬ দিনের, এ অবস্থায় রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পরই স্ত্রী সঙ্গম জায়েয নেই। বরং স্ত্রী গোসল করলে বা নামাযের সময় অতিবাহিত হলে তখন স্ত্রী সঙ্গম জায়েয হবে। স্ত্রীর অভ্যাস যদি ৭/৮ দিনের হয়, তবে এ দিনগুলো শেষ হওয়ার পর স্ত্রী সঙ্গম জায়েয হবে।

সে স্থান থেকে স্ত্রী সঙ্গমের অনুমতি দিয়েছেন অর্থাৎ সামনের দিক থেকে, যেখান থেকে শিশু পয়দা হয়। অন্য পথ অর্থাৎ (লাওয়াতাত) হারাম।

অর্থাৎ যারা তওবা করে এমন গুনাহ্ থেকে, যা তাদের দ্বারা হয়ে গেছে; যেমন ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করে। আর যারা নাপাকী অর্থাৎ গুনাহ্, ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম এবং অস্থানে স্ত্রী সঙ্গম থেকে বিরত থাকে।

৩৬৭. ইহুদীরা পেছনের দিক থেকে স্ত্রী সঙ্গমকে নিষিদ্ধ বলতো। তারা বলতো যে এর ফলে শিশু কানা হয়। এ সম্পর্কে রসূলকে জিজ্ঞাসা করা হলে আয়াতটি নাযিল হয়। অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ভূমি স্বরূপ, যাতে বীর্য বীজ স্বরূপ আর সন্তান ফসল। অর্থাৎ এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল বংশ ধারা রক্ষা করা এবং সন্তান জন্মলাভ করা। সুতরাং তোমাদের এক্তিয়ার আছে, সামনের দিক থেকে, পেছনের দিক থেকে, স্পর্শ থেকে বা বসে যেভাবে ইচ্ছা স্ত্রী সঙ্গম করতে পার। কিন্তু অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে বীজ বপন কর সে বিশেষ স্থানে, যেখান থেকে উৎপাদনের আশা করা যায়। অর্থাৎ সঙ্গম হতে হবে বিশেষ যৌনাঙ্গে, কোন অবস্থায়ই 'লাওয়াতাত' হতে পারবেনা। এর ফলে শিশু কানা হয় বলে ইহুদীদের ধারণা ভুল।

অর্থাৎ নিজের জন্য ভাল কাজ করতে থাকবে। অথবা এই অর্থ হতে পারে যে, স্ত্রী সঙ্গম দ্বারা নেক সন্তান কাম্য হতে হবে, কেবল আত্ম বিলাস হলে চলবেনা।

অর্থাৎ কোন ভালো কাজ না করার জন্য খোদার কসম খেয়ে বসলে, যেমন পিতা-মাতার সঙ্গে কথা বলবোনা বা ফকীরকে কিছু দেবোনা, বা কারো মধ্যে মিল-মিশ করাবোনা। এমন কসমে আল্লাহর নামকে খারাপ কাজের অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এমন কাজ কখনো করবে না। কেউ এমন কসম খেলে তা ভাঙ্গা এবং কাফফারা দেয়া ওয়াজেব।

অর্থাৎ কেউ কসম খেলে আল্লাহ্ তা শুনেন। আর কেউ যদি খোদার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কারণে কসম থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ্ তার নিয়ত ভালো করেই জানেন। তোমাদের যাহেরী-বাতেনী কোন কাজই তাঁর কাছে গোপন নয়। এ জন্য মনের নিয়ত আর মুখের কথায় সংযত হওয়া জরুরী।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ

يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ

حَلِيْمٌ ﴿২২৫﴾ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ

اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿২২৬﴾ وَاِنْ

عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿২২৭﴾ وَالْمُطَلَّقٰتُ

يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ

اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْۤ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ

يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ

بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْۤا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ

مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿২২৮﴾

২২৫. (এবং এই কারণেই) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্যে কখনো পাকড়াও করবে না (বলে ঘোষণা দিয়েছেন) তবে তিনি অবশ্যই সে সব প্রতিজ্ঞা ও শপথের ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন যা তোমরা জেনে বুঝে আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করেছো (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমা ও ধৈর্যশীল।

২২৬. যে সব লোক নিজ স্ত্রীদের কাছে যাবে না বলে কসম করেছে তাদের (এ ব্যাপারে মনস্থীর করার জন্যে) চার মাসের অবকাশ দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, (এই সময়ের ভেতর) যদি তারা (তাদের কসম ফিরিয়ে নেয় এবং নিজ স্ত্রীদের কাছে) ফিরে আসে (তারা যে বাড়াবাড়ি করলো এটা আল্লাহ্ হয়তো ক্ষমা করে দেবেন) অবশই আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমার আধার ও দয়ার সাগর!

২২৭. (আর) তারা যদি (এই সময়ের ভেতর) তালাক দেয়ারই সিদ্ধান্ত করে থাকে তাহলেও তাদের জানা থাকা দরকার যে) আল্লাহ্ তায়ালা (মানুষের বলা না বলা) সব কথা শুনেও (তাদের মনে কোনো অভিসন্ধি লুকিয়ে থাকলে তাও) সব তিনি জানেন।৩৭১

২২৮. যে সব স্ত্রী লোককে তালাক দেয়া হয়েছে,তারা যেন তিনটি মাসিক ঋতু অথবা ঋতু থেকে পবিত্র থাকার তিনটি মুদ্দত পর্যন্ত (অপেক্ষা করে) নিজেদের কোনো পুরুষের (সাথে বিয়ের বন্ধন) থেকে দূরে রাখে- (তাছাড়া) তাদের গর্ভে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা কোনো অবস্থায় তাদের পক্ষে ন্যায়সংগত হবে না। যদি তারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং পরকালের ওপর বিশ্বাস করে (তাহলে এটা কোনো অবস্তায়ই তাদের করা উচিৎ নয়) এই সময়ের ভেতর ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে স্বামীদের অধিকার সংরক্ষিত থাকবে।

(অবশ্য) উভয়েই যদি পরস্পর মিলে মিশে চলতে চায় (তাহলেই স্ত্রী হিসেবে ফিরে যাবার প্রশ্ন আসবে (এসব ব্যাপারে) নারীদের পুরুষদের ওপর ন্যায়ানুগ অধিকার রয়েছে, যেমনি রয়েছে নারীদের ওপর পুরুষের অধিকার, (অবশ্য) তাদের ওপর পুরুষের মর্যাদা এক মাত্রা বেশী রয়েছে।৩৭৪ (তবে সব ক্ষমতার উর্ধ্বে হচ্ছেন) বিশ্ব জাহানের মালিক) আল্লাহ্ তায়ালা সর্বাধিক ক্ষমতার মালিক তিনিই সর্বজ্ঞানের জ্ঞানী, সব বিচারকের বড়ো বিচারক।

---

৩৭১. যে কসম অভ্যাস আর চল অনুযায়ী হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, অথচ তার ইচ্ছা নেই, অন্তরের খবরও নেই, তাই অযথা কসম। এমন কসমে গুনাহ্ও হয়না, কাফফারাও দিতে হয় না। অবশ্য কেউ যদি ইচ্ছা করে কসমের শব্দ যেমন 'ওয়াল্লাহ বিল্লাহ' উচ্চারণ করে আর তা দ্বারা নিছক জোর দেয়াই উদ্দেশ্য হয় কসমের উদ্দেশ্য না থাকে, তবে অবশ্যই কাফফারা দিতে হবে। কাফফারা সম্পর্কে পরে বলা হচ্ছে।

অর্থাৎ জেনে-শুনে যে কসম খাবে, যে কসমে যবানও অন্তরের অনুকুল হবে, সে কসম ভাঙ্গলে কাফফারা দিতে হবে।

তিনি গাফুর-ক্ষমাশীল যে, অযথা কসমের জন্য পাকড়াও করেননা। আর তিনি 'হালীম' ধৈর্যশীল যে, পাকড়াও করায় তাড়াহুড়া করেননা। হতে পারে বান্দাহ তাওবা করবে।

অর্থাৎ কেউ যদি কসম করে যে, আমি স্ত্রীর কাছে যাবোনা, তবে তখন চার মাসের মধ্যে স্ত্রীর কাছে গেলে কসমের কাফফারা দিতে হবে এবং স্ত্রী তার বিয়ে থাকবে। আর চার মাস গত হওয়ার পরও স্ত্রীর কাছে না গেলে স্ত্রী বায়েন তালাক হবে। চার মাস বা তার চেয়ে বেশী সময় বা কোন সময় নির্ধারণ না করে স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার কসম করাকে শরীয়তে 'ঈলা বলা হয়। চার মাসের কম সময়ে 'ঈলা' হবেনা। ঈলার তিনটি সূরতেই তিন মাসের মধ্যে স্ত্রীর কাছে গমন করলে কসমের কাফফারা দিতে হবে। অন্যথায় চার মাস গত হওয়ার পর তালাক দেয়া ছাড়াই স্ত্রী বায়েন তালাক হয়ে যাবে। আর যদি চার মাসের কম সময়ে কসম খায়, যেমন কসম খেয়েছে যে তিন মাসের মধ্যে স্ত্রীর কাছে যাবেনা, শরীয়তে এটা ঈলা হবেনা। এর বিধান এ যে, যদি কসম ভাঙ্গে অর্থাৎ উপরোক্ত সূরতে তিনমাসের মধ্যে স্ত্রীর কাছে যায়, তবে কসমের কাফফারা অবশ্যই দিতে হবে। আর যদি কসম পূরা করে অর্থাৎ তিন মাস পর্যন্ত স্ত্রীর কাছে না যায়, তখন স্ত্রী তালাক হবেনা, কাফফারাও দিতে হবেনা।

৩৭৪. পুরুষ স্ত্রীকে তালাক দিলে তিন হায়েয অতিক্রান্ত হওয়ার আগে কারো সঙ্গে তার বিয়ে জায়েয নাই। যাতে অন্তঃস্বত্তা হলে তা জানা যায় এবং একজনের সন্তান অন্যজন না পায়। এজন্য নারীর কর্তব্য হচ্ছে তার পেটে কিছু আছে, তা প্রকাশ করা, হায়েয হোক বা গর্ভ হোক। এ মুদ্দতটাকে 'ইদ্দত' বলা হয়।

জেনে রাখা দরকার যে, এখানে তালাক দেয়া স্ত্রী বলতে সেই স্ত্রী বুঝানো হয়েছে, বিয়ে পর যার সঙ্গে সঙ্গম অথবা শরীয়ত সম্মত নিঃসঙ্গতার সুযোগ হয়েছে স্বামীর এবং স্ত্রীর হায়েযও হয় এবং সে নারী আযাদ, কারো দাসী নয়। কারণ, যে নারীর সঙ্গে সঙ্গম বা নিঃসঙ্গতার সুযোগ হয়নি, তালাকের পর তাকে ইদ্দত পালন করতে হয় না। যে নারীর হায়েয হয়না, যেমন অল্প বয়স্ক বা বৃদ্ধা বা অন্তঃস্বত্বা, প্রথম দুই অবস্থায় তার ইদ্দম তিন মাস আর অন্তঃসত্বার ইদ্দত হচ্ছে গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত। আর যে নারী আযাদ নয়. বরং শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী কারো দাসী, তার হায়েয হলে ইদ্দত হবে দু হায়েয, না হলে সে যদি অল্প বয়স্কা বা বৃদ্ধা হয়। তবে তার ইদ্দত হচ্ছে দেড় মাস। আর অন্তঃস্বত্বা হলে তার ইদ্দত গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত। অন্যান্য আয়াত এবং হাদীস দ্বারা এ বিবরণ প্রমাণিত।

অর্থাৎ পুরুষ ইচ্ছা করলে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরায়ে আনতে পারে, স্ত্রী এতে সন্তুষ্ট না থাকলেও পারে। তবে এ ফিরায়ে আনার উদ্দেশ্য হতে হবে সংশোধন ও সদাচরন। তাকে উত্যক্ত করা বা চাপের মুখে মোহরানা মাফ করায়ে নেয়া উদ্দেশ্য থাকলে চলবেনা, এটা যুলুম। এমন করলে গুণাহগার হবে। অবশ্য ফিরায়ে আনা সহীহ হবে।

অর্থাৎ এটাতো সত্য যে, নারীর ওপর যেমন পুরুষের অধিকার আছে, তেমনি পুরুষের ওপরও স্ত্রীর অধিকার আছে। নিয়ম অনুযায়ী এ অধিকার আদায় করা প্রত্যেকের উচিৎ। নারীর সাথে পুরুষের অসদাচরণ এবং তার অধিকার হরণ করা নিষিদ্ধ। এটাও সত্য যে, স্ত্রীর ওপর পুরুষের মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। তাই প্রত্যাবর্তনে পুরুষকে এক্তিয়ার দেয়া হয়েছে।

اَلطَّلَاقُ

مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ
بِاِحْسَانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ
اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ
اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ حُدُوْدُ
اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

রুকু ২৯

২২৯. তালাক দু'বার, (উচ্চারণ করা যেতে পারে, তৃতীয়বার উচ্চারণ করার আগেই) হয়, সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে অথবা সহৃদয়তার সাথে (বিয়ের বন্ধন খুলে) তাকে যেতে দেবে। তোমাদের জন্যে এটা কোনো অবস্থায়ই ন্যায়সংগত নয় যে, (বিয়ের আগে পরে) যা কিছু তোমরা তাদের দিয়েছো তা তাদের থেকে ফিরিয়ে নেবে, তবে (কোনো সময়) আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমারেখার ভেতরে থেকে স্বামী স্ত্রী একত্রে জীবন কাটাতে পারবে না এমন আশংকা দেখা দেয় (তবে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

এই ধরনের কোনো অবস্থা দেখা দিলে) যদি তোমাদের (সত্যিই) ভয় হয় যে, এরা আল্লাহর বিধানের গন্ডির ভেতর থাকতে পারবে না তাহলে স্ত্রী যদি স্বামীকে কিছু বিনিময় দেয় (এবং তা দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নেয়-) তাহলে তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই এটা কোনো দোষনীয় (ব্যাপার) বলে গণ্য হবে না। (জেনে রাখো) এই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমানা- এই সীমা রেখা কখনো অতিক্রম করো না। আর আল্লাহর দেয়া সীমা রেখা যারা লংঘন করে তারাই হচ্ছে যালেম।৩৭৮

---

৩৭৮. ইসলামের পূর্বে নিয়ম ছিলো ১০/২০ যতবার খুশী স্ত্রীকে তালাক দেয়া হতো। কিন্তু ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে প্রত্যাবর্তন করতো। আবার যখন খুশী তালাক দিতো এবং প্রত্যাবর্তন করতো এমনিভাবে নারীকে নানাভাবে উত্যক্ত করতো। এ উপলক্ষে আয়াতটি নাযিল হয়। এতে বলা হয় যে, কেবল দু দফা তালাক দিয়ে প্রত্যাবর্তন করা যায়। এক বা দু তালাক পর্যন্ত এক্তেয়ার দেয়া হয়েছে যে, ইদ্দতের মধ্যে পুরুষ ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে নিয়ম অনুযায়ী রেখে নিতে পারে, অথবা ভালোভাবে বিদায় করে দিবে। ইদ্দতের পর প্রত্যাবর্তন করতে পারেনা। অবশ্য উভয়ে রাযী হলে পুনরায় বিয়ে করতে পারে। তৃতীয়বার তালাক দিলে তাদের মধ্যে বিবাহও আর জায়েয হবেনা, যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তাকে বিবাহ করে সঙ্গম করে।

'ভালোভাবে বিদায় করবে'-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যাবর্তন করলে মিলমিশ এবং সদাচরণের সঙ্গে থাকবে, নারীকে বন্দী করে রাখা এবং উত্যক্ত করা উদ্দেশ্য হবেনা, যেমন তাদের মধ্যে নিয়ম ছিল। অন্যথায় সহজ এবং উত্তরূপে বিদায় করে দেবে।

অর্থাৎ নারীকে যে মোহরানা দিয়েছে, তালাকের বিনিময়ে তা ফেরৎ নেওয়া পুরুষের জন্য জায়েয নয়। অবশ্য যখন নিরুপায় হয়, কিছুতেই উভয়ের মধ্যে মিলমিশ না হয় এবং তাদের আশংকা হয় যে, তীব্র বিরোধিতার ফলে খোদার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ হবে, কেবল তখন এটা জায়েয হতে পারে। যখন পুরুষের পক্ষ হতে স্ত্রীর অধিকার আদায়ে ক্রটিও হয় না। অন্যথায় মাল গ্রহণ করা পুরুষের জন্য হারাম।

অর্থাৎ হে মুসলমানরা! তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন মনোমালিন্য যে, তাদের মিলে-মিশে জীবন যাপন সম্ভব হবেনা, তখন স্ত্রী অর্থ দিয়ে নিজেকে বিয়ে থেকে মুক্ত করবে এবং পুরুষ সে অর্থ গ্রহণ করবে-এতে তাদের উভয়ের কোন গুনাহ হবেনা। এটাকে খোলা বলা হয়। প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রীর জন্য যখন খোলা- জায়েয, তখন সকল মুসলমানের এজন্য চেষ্টা করাও অবশ্যই জায়েয।

একজন নারী রসূলের দরবারে হাযির হয়ে আরয করে যে, আমি আমার স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট, তার কাছে থাকতে চাইনা। রসূল আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে স্ত্রী লোকটি বলে যে, তিনি আমার হক আদায়ে ক্রটি করেননা, তাঁর চরিত্র এবং বিশ্বস্ততা সম্পর্কে

আমার কোন অভিযোগ নেই, কিন্তু তার প্রতি আমার স্বাভাবিক ঘৃণা-বিদ্বেষ রয়েছে। রসূল উক্ত স্ত্রী লোকটির কাছ হতে মোহর ফেরৎ নেন এবং স্বামী কাছ থেকে তালাক নিয়ে দেন। এই প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়।

উপরে উল্লেখিত এসব বিধান অর্থাৎ তালাক, প্রত্যাবর্তন এবং খোলা'-এইগুলো আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমারেখা ও বিধি-বিধান। পরিপূর্ণরূপে এটা মেনে চলা জরুরী। এতে কোন প্রকার বিরোধিতা, পরিবর্তন এবং ত্রুটি করা যাবেনা।

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ

لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا
أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا

اللهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٣١﴾ وَاِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ
اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ ۗ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى
لَكُمْ وَاَطْهَرُ ۗ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٢﴾

২৩০. অতঃপর যদি স্বামী (তৃতীয়বার) তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তারপর এই স্ত্রী তার জন্যে কোনো অবস্থায় বৈধ হবে না, (হাঁ) যদি তাকে অপর স্বামী বিয়ে করে এবং (নিয়ম মাফিক) তালাক দেয়, এবং (পরবর্তী পর্যায়ে) তারা যদি (সত্যিই) মনে করে যে, তারা (এখন থেকে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে) আল্লাহর সীমা রেখা মেনে চলতে পারবে, তাহলে তাদের (মধ্যে) পুনরায় (বিয়ের বন্ধনে) ফিরে আসাতে কোনো দোষ নাই। এই হচ্ছে আল্লাহর বেধে দেয়া সীমারেখা, যারা (এর ভালো মন্দ সম্পর্কে সম্যক) অবগত আছে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে এই নির্দেশ সুস্পষ্ট করে পেশ করেন।

২৩১. যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের যখন অপেক্ষার সময় (ইদ্দত) পূর্ণ করে নেয় তখন (হয়) মর্যাদার সাথে তাদের ফিরিয়ে আনো নতুবা ভালোভাবে (সহৃদয়তার সাথে) তাদের বিদায় করে দাও, শুধু কষ্ট দেয়া ও ভোগান্তির উদ্দেশ্যে কখনো তাদের ধরে রেখো না। এতে তোমরা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রেখাই লংঘন করবে। আর আল্লাহর নিদৃষ্ট সীমারেখা যে ব্যক্তি লংঘন করে সে (প্রকারান্তরে) নিজের উপরই যুলুম করে।

(সব চাইতে বড়ো কথা হচ্ছে) আল্লাহর নির্দেশ সমূহকে কখনো হাসি তামাসার বস্তু মনে করো না, স্মরণ করো, (তোমরা ছিলে অজ্ঞ, আল্লাহর হেদায়াত ও পথ নির্দেশ সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিলো না) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর (এই হেদেয়াতের বাণী পাঠিয়ে) কতো বড়ো নেয়ামত দান করেছেন, (শুধু

তাই নয়) তিনি তোমাদের জন্যে জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ কেতাব নাযিল করেছেন- যা তোমাদের (দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করার) নিয়ম কানুন বাতলে দেয়। (অতএব) তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং এও জেনে রাখো যে, তিনি তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিব হাল রয়েছেন।[৩৮২]

রুকু ৩০

২৩২. যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দেয় এবং স্ত্রীরাও তাদের জন্যে নির্ধারিত অপেক্ষার সময় (উদ্দত) পালন করা শেষ করে নেয় তখন তোমরা (কোনো অবস্থায়ই) তাদের স্বামীদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ো না, যদি তারা (পুনরায়) সম্মান জনক ভাবে (দাম্পত্য জীবন নির্বাহ করার বাপারে কোনো) ঐক্যমতে পৌঁছে থাকে। তোমাদের ভেতর যারা আল্লাহ ও পরকালীন জীবন সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করে এই নির্দেশের মাধ্যমে তাদের আদেশ দেয়া হচ্ছে (তোমরা এ ধরনের কাজ করবে না) এটা তোমাদের জন্যে অনেক সম্মানের এবং অনেক পবিত্র (কর্মধারা কারণ কোন কাজে কার কতোটুকু কল্যাণ নিহিত আছে তা) আল্লাহ তায়ালা জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।[৩৮৫]

---

৩৮২. অর্থাৎ স্বামী তার স্ত্রীকে তিনবার তালাক দিলে সেই স্ত্রী আর তার জন্য হালাল হবেনা, যতক্ষণ বা সে স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিয়ে করে নেয় এবং দ্বিতীয় স্বামী তার সঙ্গে সঙ্গম করে স্বেচ্ছায় তাকে তালাক দিয়ে দেয়। ইদ্দত পুরা করার পর প্রথম স্বামীর সঙ্গে পুনরায় বিয়ে হতে পারে। এটাকে 'হালালা' বা হিল্লা বলা হয়। হালালার পর প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিয়ে কেবল তখনই হতে পারে, যখন তারা আল্লাহর বিধান কায়েম করা অর্থাৎ একে অপরের অধিকার আদায়ে খেয়াল রাখবে, একের ওপর অন্যের আস্থা থাকবে। অন্যথায় পারস্পরিক ঝগড়া ঝাটি এবং অধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটবে এবং গুনায় লিপ্ত হবে।

অর্থাৎ ইদ্দত সমাপ্ত হয়েছে।

অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত স্বামীর এক্তেয়ার রয়েছে সে নারীকে ঐক্য ও মিলমিশের সঙ্গে পুনরায় মিলায়ে নিতে পারে, বা সুন্দরভাবে সন্তুষ্টচিত্তে একেবারে বিদায় করে দিবে। বিয়ে বন্ধনে রেখে তাকে উত্যক্ত করার জন্য প্রত্যাবর্তন করা, যেমন কেউ কেউ করে থাকে-এটা কিছুতেই জায়েয নয়। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, দু তালাক পর্যন্ত স্বামীর এক্তেয়ার আছে, স্ত্রীকে ভালোভাবে পুনরায় মিলায়ে নেবে অথবা একেবারে ছেড়ে দেবে। এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, এ এক্তেয়ার কেবল ইদ্দত পর্যন্ত। ইদ্দতের পর স্বামীর উপরোক্ত এক্তেয়ার থাকবে না। সুতরাং এখানে পুনরুক্তির সন্দেহ করা ঠিক নয়।

৩৮৫. 'বিয়ে-তালাক, ঈলা-খোলা রাজআাত' ইত্যাদির মধ্যে অনেক তাৎপর্য ও রহস্য রয়েছে। এসবে 'হিল্লা' করা এবং অযথা মতলব বের করা যেমন কোন প্রত্যাবর্তনকারী নারীকে উত্যক্ত করার মতলবে প্রত্যাবর্তন করলে তা হবে আল্লাহর বিধানের সঙ্গে উপহাস করা। নাউযুবিল্লাহ!-এ থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহর কাছে সব কিছুই স্পষ্ট। এসব হিল্লা দ্বারা ক্ষতি ছাড়া আর কি-ইবা অর্জিত হতে পারে।

একজন নারীকে তার স্বামী এক দু তালাক দিয়েছে অতঃপর ইদ্দতের মধ্যে প্রত্যাবর্তনও করেনি। ইদ্দত সমাপ্ত হলে অন্যান্যের সঙ্গে প্রথম স্বামীও বিয়ের প্রস্তাব দেয়। স্ত্রীও রাজী। কিন্তু তার ভাইয়ের রাগ হয়। সে বিয়ে বাধা দিলে আয়াতটি নাযিল হয় এতে বলা হয় যে, নারীর সন্তুষ্টি এবং কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তদনুযায়ী বিয়ে হওয়া উচিৎ। নিজেদের কোন চিন্তা বা অসন্তুষ্টিকে এখানে স্থান দেবেনা। এটা সাধারণ নির্দেশ। বিয়ে থেকে বারণকারী সকলেই এ নির্দেশের শামিল। প্রথম স্বামী যে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, সে নারীকে অন্যত্র বিয়েতে দানে বাধা দান করুক বা স্ত্রীর ওলী-ওয়ারিশ নারীকে প্রথম স্বামী বা অন্য কারো কাছে বিয়ে দানে বারণ করুক, সকলকেই বাধা দান থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অবশ্য রীতি বিরুদ্ধে কোন কাজ হলে যেমন অসংগত সম্পর্কের বিয়ে বা ইদ্দতের মধ্যে অপরের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাওয়া, এমন বিয়ে বাধা দেয়ার অধিকার অবশ্যই আছে। 'বিল মারুফ' দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ ওপরে উল্লেখিত নির্দেশ দ্বারা ঈমানদারদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। কারণ, তারাই সামাজিক ভাবে এ উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়। এমনিতে উপদেশ তো সকলের জন্য, কারো জন্য নির্দিষ্ট নয়। ঈমানদারদের জন্য বিশেষ করা দ্বারা অন্যদের প্রতি হুমকি এবং তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করাও বুঝায়। অর্থাৎ এ নির্দেশ অনুযায়ী যারা কাজ করেনা, আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি যেন তাদের ঈমান নেই।

অর্থাৎ নারীকে বিয়ে থেকে বারণ করায় অধিকার কারো আদৌ নেই। আর নারী যদি প্রথম স্বামীর প্রতি আগ্রহী হয়, তখন তারই সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় এমন পবিত্রতা রয়েছে, যা অন্যের সঙ্গে বিবাহ হওয়ার মধ্যে কিছুতেই নেই। আল্লাহ তাআলা তাদের মনের কথা এবং ভবিষ্যতের ভালো-মন্দ ভালোভাবে জানেন। তোমরা জাননা।

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ

لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ

نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ

مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

২৩৩. যদি কোনো পিতা চায় যে, তার সন্তান পূর্ণ মাত্রায় মায়ের দুধ খেতে থাকুক তাহলে তার জন্মদাত্রী মা'র তাকে পুরো দুটো বছরই বুকের দুধ খাওয়ানো উচিৎ। (এই পরিস্থিতিতে) মায়েদের (সম্মানজনকভাবে বেচে থাকার জন্যে) সব ধরনের ভরণ পোষণের দায়িত্ব থাকবে সন্তানের পিতার ওপর। (খেয়াল রাখতে হবে,) কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয়া উচিৎ নয়, (পিতার সংগতির কথা বেশী ভাবতে গিয়ে দেখতে হবে) মায়েরাও যেন আবার নিজ সন্তান নিয়ে বেশী কষ্টে পড়ে না যায়- এবং পিতাকেও যেন সন্তান জন্ম দেয়ার কারণে

অযথা কষ্টে পড়ে যেতে না হয় (সন্তানের পিতার অবর্তমানে) তার উত্তরাধিকারদের ওপর সন্তানের জন্মদাত্রী মায়ের অধিকার (তেমনি) বহাল থাকবে।

(তবে কোনো পর্যায়ে) পিতামাতা যদি পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে আগে ভাগেই সন্তানের দুধ ছাড়িয়ে নিতে চায় তাতেও কোনো দোষের কিছু নেই তোমরা যদি নিজেদের বদলে অন্য কাউকে সন্তানের দুধ খাওয়ানোর জন্যে নিয়োগ করতে চাও এবং যদি দুধ সেবনকারিনীর পাওনা যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়- তাতেও কোনো গুনাহ নাই।[৩৯০] এসব ব্যাপারে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং এও জেনে রেখো যে, তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই দেখতে পান।

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়- এবং (তাদের মৃত্যুর পর) তাদের স্ত্রীরা জীবিত থাকে সে ক্ষেত্রে স্ত্রীরা যদি বিয়ে করতে চায় তাহলে তাদের চার মাস দশ দিন পর্যন্ত সময় অপেক্ষা করতে হবে।[৩৯৪] অপেক্ষার এই সময় টুকু যখন তারা পার করে নেবে- তখন নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে তারা ন্যায়ানুগ পন্থায় যা ইচ্ছে তাই করতে পারে এবং এই বিষয়টিতে তাদের জন্যে কোনো গুনাহ নাই[৩৯৫], (এ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত করা তাদের একান্ত নিজেদের ব্যাপার মূলতঃ তোমরা যে যাই করো না কেন) আল্লাহ তায়লা তোমাদের সব ধরনের কাজেরই খবর রাখেন।

---

৩৯০. অর্থাৎ বাবাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে শিশুকে দু বসর পর্যন্ত দুধ পান করাতে- যে পিতা-মাতা শিশুকে দুধ পান করার মুদ্দত পূর্ণ করতে চায়, এ নির্দেশ তাদের জন্য। অন্যথায় এতে হ্রাস করাও জায়েয, যেমন আয়াতের শেষে বলা হয়েছে। যেসব মাতার বিয়ে বহাল রয়েছে এবং যারা তালাক পেয়ে ইদ্দতও পূর্ণ করেছে, তারাও এ নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত। অবশ্য এতটুকু পার্থক্য হবে যে, বিবাহিতা বা তালাক প্রাপ্তা ও ইদ্দত অতিক্রান্তা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেয়া স্বামীর জন্য সকল অবস্থায়ই জরুরী, দুধ পান করাক বা না করাক। আর ইদ্দত শেষ হয়ে থাকলে কেবল যে মাতা দ্বারা দুধ পান করানোর মুদ্দত পূর্ণ করাতে চায় বা যে অবস্থায় পিতার কাছ থেকে দুধ পান করানোর বিনিময় মাতাকে আদায় করায়ে দিতে চায়, তার শেষ সীমা পূর্ণ দু'বসর। সাধারণতঃ দুধ পান করানোর মেয়াদ দুই বসরের বেশী নয়-এমন কথা এ আয়াত থেকে জানা যায়না।

অর্থাৎ পিতাকে সকল অবস্থায় শিশুর মাতার খোর-পোশ দিতে হবে। প্রথম অবস্থায় এ জন্য দিতে হবে যে, তার স্ত্রী সে। দ্বিতীয় অবস্থায় এজন্য যে, সে ইদ্দত পালন করছে। তৃতীয় অবস্থায় শিশুকে দুধ পান করানোর বিনিময়ে। শিশুর পিতা-মাতা যেন শিশুর কারণে একে অপরকে কষ্ট না দেয়। যেমন, মাতা বিনা কারণে দুধ পান করাতে অস্বীকার করা বা পিতা অকারণে শিশুকে অন্য কারো কাছে দুধ পান করাতে দেয়া বা খোরপোশে টানাটানী করা।

অর্থাৎ পিতা মারা গেলে শিশুর ওয়ারিশদের কর্তব্য হবে দুধ পান করার মুদ্দতে তার মাতার আহার-পোশাকের ব্যয় বহন করা এবং তাকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়া। এখানে ওয়ারিশের অর্থ 'মুহররম' ওয়ারিশ।

অর্থাৎ পিতা-মাতা যদি কোন কারণে যেমন মায়ের দুধ ভালো না হওয়া কিংবা শিশুর সুযোগ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে পারস্পরিক পরামর্শ এবং সম্মতিক্রমে দু বসরের মধ্যে শিশুকে দুধ পান করানো বন্ধ করাতে চাইলে তাতে কোন গুনাহ হবেনা।

অর্থাৎ হে পুরুষরা! কোন প্রয়োজনে মাতা ছাড়া অন্য কারো দ্বারা দুধ পান করাতে চাইলে তাতেও কোন গুনাহ হবেনা। কিন্তু এই মায়ের এই অজুহাতে কোন হক কেটে রাখবেনা। বরং নিয়ম অনুযায়ী মাতাকে যা দেওয়া সাব্যস্ত করেছিলে, তা দেবে। এ অর্থও থেকে আবার, স্ত্রীর বেতন কর্তন করে রাখবেনা।

৩৯৪. পূর্বে বলা হয়েছে যে, তালাকের ইদ্দতে তিন হায়েয অপেক্ষা করবে। এখন বলা হচ্ছে যে, মৃত্যুর ইদ্দতে চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। এ মুদ্দতে যদি জানা যায় যে, নারী অন্তঃস্বত্ত্বা নয়, তবে তার জন্য বিয়ের অনুমতি আছে। অন্যথায় গর্ভ খালাসের পর বিয়ের অনুমতি হবে। সূরা তালাকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। মূলতঃ গর্ভের অবস্থা জানার জন্যই তিন হায়েয বা চার মাস দশ দিন নির্ধারিত করা হয়েছে।

৩৯৫. বিধবা নারীরা যখন তাদের ইদ্দত পুরা করবে অর্থাৎ গর্ভবতী না হলে চার মাস দশ দিন, আর গর্ভবতী হলে গর্ভ খালাস, তখন শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদের বিয়ে করায় কোন গুনাহ নেই। যীনত-সৌন্দর্য এবং খোশবু প্রসাধনী সব কিছু ব্যবহার করা তখন তাদের জন্য হালাল।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ

فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ

وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا

قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ

حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ
يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۳۵﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ
النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ
وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًۢا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۲۳۶﴾

২৩৫. (এমন কি সে বিধবা মহিলার অপেক্ষার সময় শেষ হওয়ার আগেও) তোমাদের কেউ যদি তাকে বিয়ে করার প্রকাশ্য পয়গাম পাঠাও কিংবা তেমন কোনো ইচ্ছা যদি তোমরা নিজেদের মনের ভেতরও লুকিয়ে রাখো- (এই উভয় অবস্থায়ই) এটাতে কোনো দোষ নাই। (এমন কিছু কথা মনের গোপনে লুকিয়ে রাখলে) আল্লাহ তায়ালা এটা ভালো করেই জানেন যে, তাদের কথা অবশ্যই (বার বার) তোমাদের মনে পড়বে, কিন্তু (সাবধান) আড়ালে আবডালে থেকে কিংবা গোপনে তাদের বিয়ের কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ো না (গোপনে তাদের সাথে দেখা করো না তাদের সাথে কখনো কোনো ব্যাপারে) তোমাদের কথা বলতে হলে তা সম্মানজনক পন্থায় (সমাজের) প্রচলিত সুন্দর পন্থায়ই তা করবে।

তার ইদ্দত (অপেক্ষার শরিয়াত সম্মত সময়টুকু) শেষ হবার আগে কখনো তার সাথে বিয়ের ইচ্ছা ও সংকল্প করো না।[৩৯৬] ভালো করেই জেনে রাখো যে, তোমাদের মনের (কোণে রক্ষিত) সব (ইচ্ছা ও অভিসন্ধির) কথা আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন, অতএব একমাত্র তাকেই ভয় করো। এবং একথাও জেনে রেখো যে, আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ধৈর্যশীল, তিনি মহান ক্ষমাকারীও বটে।[৩৯৭]

রুকু ৩১

২৩৬. শারীরিক ভাবে তাদের স্পর্শ করা কিংবা তাদের জন্যে মোহরের কোনো অংক নির্ধারনের আগেই যদি তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও তাতে (শরিয়তের

দৃষ্টিতে) কোনো গুনাহ নেই। (এ ধরনের অবস্থায় যদিও মোহরের কোনো অংক নির্ধারিত হয়নি তবুও) তাদের ন্যায়ানুগ পন্থায় কিছু পরিমাণ (অর্থ) আদায় করবে- ধনী ব্যক্তি নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী এবং গরীব ব্যক্তি নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী এই পরিমাণ নির্ধারণ করবে) বস্তুত এভাবে (পরিমান মতো) আদায় করা নেক কার লোকদের (ওপর আরোপিত) একটি দায়িত্ব বটে।৩৯৮

---

৩৯৬. আয়াতের সারকথা হচ্ছে এই যে, স্ত্রী স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পর যতদিন ইদ্দত পালন করে, ততদিন তাকে বিয়ে করা, বা স্পষ্ট ওয়াদা করা বা স্পষ্ট পয়গাম পাঠানো কারো জন্য জায়েয নয়। কিন্তু মনে মনে যদি নিয়ত রাখে যে, ইদ্দতের পর তাকে বিবাহ করবো, বা ইশারা-ইঙ্গিতে আপন ইচ্ছা, সম্পর্কে তাকে জানায়ে দেয়, যেন অন্য কেউ তার আগে বিয়ে পয়গাম না দিয়ে বসে, কেউ তোমাকে পসন্দ করলে যেন বলে দেয় যা, আমার কোথাও বিয়ে করার ইচ্ছা আছে, এতে গুনাহ হবে না। কিন্তু বিয়ের স্পষ্ট পয়গাম কিছুতেই দেবেনা।

৩৯৭. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মনের কথা জানেন। সুতরাং না জায়েয ইচ্ছা থেকে বিরত থাকবে। আর না জায়েয ইচ্ছা হয়ে গেলে তা থেকে তওবা করবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল। আর গুনাহগারের ওপর আযাব না হলে সে জন্য চিন্তাযুক্ত হওয়ার কিছুই নেই। কারণ, তিনি হালীম-মহা ধৈর্যশীল। শাস্তি দানের ব্যাপারে তিনি তাড়াহুড়া করেন না।

৩৯৮. বিয়ের সময় মহরানার উল্লেখ করে বিনা মহরানায় বিবাহ করলেও জায়েয হবে। মহরানা পরে ধার্য করতে হবে। কিন্তু এ অবস্থায় স্পর্শ করার অর্থাৎ সঙ্গম ও বিশুদ্ধ নিঃসঙ্গত্যর আগেই যদি তালাক দেয় তবে কোন মহরানা দিতে হবেনা। কিন্তু স্বামীর উচিৎ হবে নিজের পক্ষ থেকে কিছু দিয়ে দেয়া। অন্ততঃ নিজের অবস্থা অনুযায়ী তিন প্রস্ত কাপড়-জামা, শাড়ী এবং চাদর স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে দেবে।

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ

النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ

وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿২৩৭﴾ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿২৩৮﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ
فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿২৩৯﴾
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ
وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي
مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿২৪০﴾ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿২৪১﴾ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿২৪২﴾

২৩৭. আবার যদি শারীরিক স্পর্শ না করলেও মোহরের অংক নির্ধারিত করে নেয়ার পর যদি তোমরা তাদের তালাক দাও তাহলে তাদের অর্ধেক পরিমাণ মোহর আদায় করে দিতে হবে। (হাঁ) তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী নিজের থেকে যদি (এ থেকে

অব্যাহতি প্রদান করে) তোমাদের মাফ করে দিতে চায় কিংবা যে স্বামীটির হাতে বিয়ের বন্ধনটি রয়েছে সে যদি স্ত্রীকে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী দিয়ে) তার ওপর অতিরিক্ত অনুগ্রহ দেখাতে চায় তাহলে তা হবে (সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা।)

এই অনুগ্রহ করাটা আল্লাহ ভীতির একান্ত কাছাকাছি। (এই হিসাব নিকাশের সময়) কখনো একে অপরের প্রতি দয়া ও সহৃদয়তা দেখাতে ভুলো না, কারণ তোমরা (কে কোথায়) কি করো সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন।৩৯৯

২৩৮. তোমরা তোমাদের নামায সমূহের ব্যাপারে (গভীর) যত্নবান হও মধ্যবর্তি নামায সহ (সব কয়টি নামাযেরই হেফাযত করো) একজন অনুগত সেবক যেমন মনিবের সমনে অবনত মনে দাঁড়িয়ে থাকে তোমরাও তেমনি আল্লাহ তায়ালার সামনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দাঁড়াও।৪০০

২৩৯. (অতঃপর নামাযের সময়) যদি তোমরা ভীতিপ্রদ কোনো অবস্থার সম্মুখীন হও (যখন বিছানায় দাঁড়িয়ে নামায পড়া অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন প্রয়োজনে) তোমার পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে কিংবা সওয়ারীর ওপর থাকা অবস্থায়ও নামায আদায় করে নেবে, অতঃপর যখন (সে ভীতিপ্রদ অবস্থা কেটে গিয়ে) শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরে আসবে, তখন (ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণ ভাবে নামাযের মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করো, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তাকে স্মরণ করার নিয়ম শিখিয়েছেন, কিছুই তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না।৪০১

২৪০. তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ বিধবা স্ত্রী, জীবিত রেখে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, সে যেন (তার উত্তরসুরীদের) ওসীয়ত করে যায় যেন তারা তার বিধবা স্ত্রীর এক বছর পর্যন্ত যাবতীয় জীবিকা ও ব্যয়ভার বহন করে- (কোনো অবস্থায়) তাকে যেন তার ভিটে মাটি থেকে বের করে না দেয়৪০২ , (এই এক বছর সময় পূরণ হবার আগেই) যদি তার বিধবা স্ত্রী নিজের ব্যাপারে কোনো ভিন্ন সিদ্ধান্ত করে কোনো সম্মানজনক ব্যবস্থা করে নেয় (এবং নিজে নিজেই এখান থেকে চলে যেতে চায়) তাহলে এ জন্যে তোমাদের ওপর কোনো দায়িত্ব থাকবে না- (মূলতঃ কারো ওপরই কারো আধিপত্য খাটানোর উপায় নাই কারণ) আল্লাহ তয়ালা সবার ওপর শক্তিশালী, তিনি বিজ্ঞও বটে!৪০৩

২৪১. যে মহিলাদের তালাক দেয়া হয় তাদের (যথাযোগ্য ও) ন্যায়সংগত কিছু প্রদান করা উচিৎ আল্লাহ তায়ালাকে যারা ভয় করে এটা তাদের (ওপর আরোপিত) একান্ত দায়িত্ব।৪০৪

২৪২. এই ভাবেই আল্লাহ তায়ালা (দাম্পত্য জীবনের সাথে জড়িত) তার নির্দেশ খুলে সুস্পষ্ট করে (খুলে খুলে) বলে দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝে শুনে চলতে পারো।৪০৫

৩৯৯. বিয়ের সময় মহরানা ধার্য করা হলে স্পর্শ করার আগে যদি তালাক দেয় তবে অর্ধেক মহরানা দিতে হবে। কিন্তু নারী বা পুরুষ- যার হাতে বিবাহ টিকায়ে রাখা বা ভাঙ্গা নির্ভর করে, সে যদি নিজের অধিকার মাফ করে দেয়, তা উত্তম। স্ত্রীর মাফ করা এই যে, অর্ধেক মহরানা ও মাফ করে দেবে আর পুরুষের মাফ করা এই যে, যে মহরানা ধার্য করা হয়েছিল তার সম্পূর্ণটাই স্ত্রীকে দিয়ে দেবে বা সম্পূর্ণ মহরানা পরিশোধ করে থাকলে অর্ধেক ফেরৎ না নিয়ে বরং সবটাই ছেড়ে দেবে । অতঃপর বলা হচ্ছে যে, পুরুষ মাফ করলে তা হবে তাকওয়ার কাছাকাছি। কারণ, আল্লাহ্ তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, বিবাহ টিকায়ে রাখার এক্তেয়ার দিয়েছেন, এক্তেয়ার দিয়েছেন তালাক দেয়ার। নিছক বিবাহ দ্বারা সমস্ত মহরানা পরিশোধ করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে স্বামী তার দায়িত্ব থেকে অর্ধেক মহরানার অব্যাহতি নেয়। এটা তাকওয়ার উপযোগী নয়। স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোন প্রকার ক্রটি হয়নি। যা কিছু করেছে, স্বামীই করেছে। এই সকল কারণে স্বামীর জন্যই বেশী সমীচীন হচ্ছে মাফ করে দেয়া।

মহরানা এবং সঙ্গমের বিবেচনায় তালাকের চারটি রূপ হতে পারে। এক, মহরানাও না, তালাকও না। দুই, মহরানা ধার্য হয়েছে ঠিক, কিন্তু সঙ্গমের সুযোগ হয়নি। এ দুটি রূপের বিধান আয়াত দুটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তিন, মহরানা ধার্য করা হয়েছে এবং সঙ্গমের ঘটনাও ঘটেছে। এ পরিস্থিতিতে ধার্যকৃত মহরানা পূরাপুরি দিতে হবে। আল্লাহর কালামে অন্যত্র এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। চার, মহরানা ধার্য করা হয়নি এবং স্পর্শ করার আগেই তালাক দেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় 'মহরে মেছেল' অর্থাৎ সে নারীর বংশের রেওয়াজ অনুযায়ী তাকে মহরানা দিতে হবে। স্বামীর মৃত্যুতেও এ চারটি রূপই দাঁড়াবে। কিন্তু মৃত্যুর বিধান তালাকের বিধান থেকে ভিন্ন। মহরানাও ধার্য করা হয়নি আর স্পর্শও করা হয়নি এমতাবস্থায় অথবা স্পর্শ করার পর স্বামীর মৃত্যু হলে পূর্ণ মহরে মেছেল দিতে হবে। আর যদি মহরানা ধার্য হয়ে থাকে এবং স্পর্শ করে থাকে, বা না করে থাকে, এ দুই অবস্থায় ধার্যকৃত মহরানা পুরা দিতে হবে।

৪০০. মধ্যবর্তী নামাযের অর্থ আসর-এর নামায। কারণ, এটা রাত এবং দিনের মধ্যস্থলে। এর প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এ জন্য যে, তখন দুনিয়ার ব্যস্ততা বেশী থাকে। আর বলা হয়েছে-বিনয়ের সঙ্গে দন্ডায়মান থাকবে অর্থাৎ নামাযের মধ্যে এমন কোন কাজ করবেনা, যাতে মনে হয় যে, নামায পড়ছনা। এমন কাজের দ্বারা নামায ভেঙ্গে যায়। যেমন পানাহার, কারো সঙ্গে কথা বলা এবং হাসা।

তালাকের বিধানের মধ্যে নামাযের বিধান বর্ণনা করার কারণ এ হতে পারে যে, দুনিয়ার মোয়ামালা এবং পারস্পরিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ে খোদার এবাদতকে ভুলে বসবে না। অথবা এ কারণও হতে পারে যে, প্রবল লোভ-লালসা আর কার্পণ্যের কারণে নফসের দাসত্বের পক্ষে ইনসাফ-সুবিচার করা আর, তাও আযাব দুঃখ ও তালাকের অবস্থায়-খুবই কঠিন। এর পর বলা হয়েছে, এ অবস্থায় তদনুযায়ী আমল করা তাদের পক্ষে সুদূর

পরাহত বলে প্রতীয়মান হতো। সুতরাং এর চিকিৎসার উপায় বলে দেয়া হয়েছে যে, নামাযের গুরুত্ব ও পাবন্দী এবং তার হক গুলো মেনে চলা উত্তম চিকিৎসা। কারণ, ঘৃণ্য বিষয় বর্জন আর পসন্দনীয় বিষয় অর্জনে নামাযের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

৪০১. অর্থাৎ যুদ্ধ বা দুশমনের পক্ষ থেকে ভয়-ভীতিকালে নিরূপায় হয়ে সওয়ারীর পিঠে বা পদব্রজে ইশারা-ইঙ্গিতেও নামায জায়েয এমনকি কেবলার দিকে মুখ করা সম্ভব না হলেও।

৪০২. আগে এ বিধান ছিল। পরে যখন সিরামের আয়াত নাযিল হয় এবং নারীদের অংশও নির্ধারিত হয় এবং অপরদিকে নারীর ইদ্দতও চারমাস দশ দিন নির্ধারিত হয়। তখন থেকে এই আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে যায়।

৪০৩. অর্থাৎ হে ওয়ারিসরা! নারীরা যদি বছর শেষ হওয়ার আগেই স্বেচ্ছায় গৃহ থেকে বেরিয়ে যায়, তবে তোমাদের কোন গুনাহ হবেনা তারা শরীয়ত অনুযায়ী নিজেদের ব্যাপারে যে কাজ করে অর্থাৎ বিয়ে করুক বা ভালো পোশাক পরিধান করুক, তাতে কোন দোষ নেই।

৪০৪. প্রথমে খরচ অর্থাৎ জোড়া দেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে স্বাভাবিকভাবে, যখন মহরও ধার্য হয়নি এবং হাতও লাগায়নি স্বামী। এখন এ আয়াতে সকলকে এ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, সকল তালাক ওয়ালীকে জোড়া দেয়া মোস্তাহাব জরুরী নয়। কিন্তু প্রথম অবস্থায় জোড়া দেয়াই জরুরী।

৪০৫. অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ তায়ালা এখানে বিয়ে-তালাক-ইদ্দতের বিধান বর্ণনা করেছেন, তেমনি তাঁর বিধান এবং আয়াতকে স্পষ্ট ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা বুঝে নিতে এবং আমল করতে পার। বিয়ে-তালাকের বিধান এখানে শেষ হয়েছে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا

مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ص

فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا قف ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ

لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۭ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۠ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٥﴾

রুকু ৩২

২৪৩. তুমি কি (ইতিহাসের পাতায় তাদের পরিণতি) দেখোনি যাদের হাজার হাজার লোক মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ভিটে মাটি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলো, (আল্লাহর নবীর আদেশে যালেমদের মোকাবেলা না করার কাপুরুষোচিত আচরণে রুষ্ট হয়ে আল্লাহ)। বললেন, তোমরা নিপাত হয়ে যাও, (এক দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হবার পর তাদের পরবর্তী বংশধররা সাহসিকতার সাথে জালেমের মোকাবেলা করলো) আল্লাহ তায়ালাও (তাদের জমিনের বুকে) নতুন করে (সামাজিক) জীবন দান করলেন। আল্লাহ তায়ালা (এ ধরনের সাহসী) মানুষদের ওপর সর্বদাই অনুগ্রহ নাযিল করে থাকেন, কিন্তু মানুষদের (সমস্যা হচ্ছে তাদের) অধিকাংশই (এ জন্যে) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।৪০৬

২৪৪. (অতএব হে আল্লাহ বিশ্বাসী মুসলমানরা) তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো এবং একথাটি ভালো করে জেনে রাখো আল্লাহ তায়ালা (যেমন) তোমাদের কথাবার্তা শুনেন (তেমনি) তিনি তোমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কেও সম্যক অবগত আছেন।

২৪৫. তোমাদের মধ্য থেকে কে এমন এগিয়ে আসবে যে আল্লাহকে (মুক্ত হস্তে) ঋণ দিতে রাজী হবে, তোমাদের যে কেউই আল্লাহকে ঋণ দেবে- আল্লাহ তায়ালা (শুধু তার মূলধনই তাকে ফেরৎ দেবে না- তিনি সে হাওলাতি অংককে) বহুগুণ বাড়িয়ে তবে তা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করবেন। (আসলে মানুষদের একথাটা বুঝা উচিত যে,) আল্লাহ তায়ালাই (ধনসম্পদ দিয়ে) কাউকে ধনী আবার (তা ছিনিয়ে নিয়ে) গরীব করে দেন (আর সব কিছুর শেষে) -তোমাদের সবাইকে তো একদিন তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।৪০৭

৪০৬. এটা এক অতীত উম্মতের কাহিনী। কয়েক হাজার লোক বাড়ী-ঘর সঙ্গে নিয়ে দেশ থেকে পলায়ন করে। তাদের ভয় হল গণীমত সম্পর্কে এবং যুদ্ধ থেকে প্রাণ বাঁচায় বা তাদের ভয় হয় মহামারী সম্পর্কে। তকদীরের প্রতি তাদের বিশ্বাস-ভরসা ছিলো না। অতঃপর এক মনযিলে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর হুকুমে সকলেই মারা যায়। সাতদিন পর পয়গম্বরের দোয়ায় সবাই জীবিত হয়। ভবিষ্যতে তওবা করার জন্য এ অবস্থাটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে এ জন্য, যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বা আল্লাহর পথে জেহাদ করায় অর্থ ব্যয়ে জান-মালের মহব্বতের কারণে যাতে কুণ্ঠিত না হয় এবং জেনে নেয় যে, আল্লাহ মৃত্যু দিলে বাঁচার কোন উপায় নেই। তিনি জীবন চাইলে মৃত ব্যক্তিকে ক্ষণিকের জীবিত করতে পারেন। জীবিত ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা তো কোন ব্যাপারই নয়। অতঃপর তাঁর হুকুম তামীলে মৃত্যুকে ভয় করে জেহাদ থেকে বিরত থাকা বা দারিদ্র্য থেকে বেঁচে সদকা, অপরের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ এবং ক্ষমা-দাক্ষিণ্য থেকে বিরত থাকা বদ-দ্বীনির সাথে সাথে পূর্ণ বোকামীও।

৪০৭. অর্থাৎ যখন জানতে পারলে যে, তোমাদের জান-মাল আল্লাহর নির্দেশের অধীন, তখন আল্লাহর ওয়াস্তে দ্বীনের খাতিরে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিৎ এবং তোমাদের জেনে নেয়া উচিৎ যে, আল্লাহ তায়ালা ছল-চাতুরী কারীদের কথাবার্তা শুনেন এবং তাদের পরিকল্পণা সম্পর্কে জানেন। তোমাদের উচিৎ, দারিদ্রকে ভয় না করে আল্লাহর রাস্তায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা। দারিদ্র-সংকীর্ণতার ভয় করবেনা। সংকীর্ণতা-প্রশস্ততা সবকিছুই তাঁহার এক্তেয়ারে রয়েছে। সকলকে তাঁরই হুযুরে ফিরে যেতে হবে। যে ঋণ দিয়ে তাকাদা করা হয় না, দাবী করা হয়না, খোঁটা দেয়া হয়না, বিনিময় দাবী করা হয়না এবং ঋণ গ্রহীতা তুচ্ছ জ্ঞান করা হয় না, তাকে বলা হয় 'করযে হাসানা' -সুন্দর ঋণ। আল্লাহকে দেয়ার অর্থ জেহাদে ব্যয় করা বা অভাবীকে দান করা।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ
بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا
مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ
إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا
وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا

مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ط فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ

الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيمٌ

بِالظّٰلِمِينَ ﴿٢٤٦﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ

بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ط قَالُوا أَنّٰى يَكُونُ

لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ

يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ط قَالَ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ

بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ط وَاللّٰهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاءُ ط

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ أَنْ

يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا

تَرَكَ اٰلُ مُوسٰى وَاٰلُ هٰرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰئِكَةُ ط إِنَّ

فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

২৪৬. বনি ইসরাইল দলের কতিপয় নেতা সম্পর্কে তুমি কি চিন্তা করোনি? তারা মুসার আগমনের পর (তদানীন্তন) নবীর কাছে কি দাবী জানিয়েছিলো?৪০৮ (তারা) বলেছিলো- আমাদের জন্যে একজন বাদশাহ ঠিক করে দিন যেন (তার সাথে মিলে) আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারি, আল্লাহর নবী (তাদের দাবীর এই বলে) জবাব দিলেন। (আসলে) তোমরা কি (লড়াই করবে?) আগের

লোকদের মতো তোমাদের অবস্থা? এমন হবে না (তো) যে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের লড়াইর আদেশ দেবেন এবং তোমরা (ময়দান ছেড়ে) পালিয়ে যাবে?

তারা বললো, (তা কি করে সম্ভব) আমরা কি আল্লাহর পথে লড়বো না, বিশেষ করে যখন আমাদের নিজেদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, আমাদের ছেলেমেয়েদের আমাদের থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে, অতপর যখন (শেষ পর্যন্ত) তাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হলো তখন কতিপয় (সাহসী) বান্দা ছাড়া তাদের অধিকাংশই ময়দান ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। (আসলে) আল্লাহ তায়ালা (তার আদেশের বরখেলাফকারী প্রতিটি) যালেমকে ভালো করেই জানেন।৪০৯

২৪৭. (তাদের দাবীর জবাব দিতে গিয়ে) আল্লাহর নবী তাদের বললো, আল্লাহ তায়ালা তালুতকে তোমাদের ওপর বাদশাহ (নিযুক্ত) করে পাঠিয়েছেন। (অন্য এক ব্যক্তির বাদশাহ নিযুক্ত হবার খবর শুনে) তারা বললো, আমাদের ওপর রাজত্ব করার কি অধিকার তার আছে, বাদশাহীর অধিকার (বরং) তার চাইতে আমাদেরই বেশী রয়েছে। (তাছাড়া) অর্থ প্রাচুর্যও তো তার বেশী নাই, (সে কিসের বলে রাজত্ব করবে)। আল্লাহর নবী বললো, (এই রহস্যের জবাব আল্লাহই ভালো জানেন, তবে) তোমাদের ওপর শাসন ক্ষমতা চালানোর জন্যে আল্লাহ তাকেই বাছাই করেছেন এবং রাজত্বের যোগ্য করে তোলার জন্যে) সে পরিমাণ তার শারীরিক যোগ্যতা ও জ্ঞানগত (প্রতিভা) আল্লাহ তায়ালা বাড়িয়ে দিয়েছেন, (আর সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই এ জমিনের রাজত্ব দান করে থাকেন, (কারণ) তার ভান্ডার (সংকীর্ণ নয়) অনেক প্রশস্ত, (কাকে রাজত্ব দেয়া উচিৎ তিনিই তা ভালো জানেন কারণ) তিনি মহাবিজ্ঞ।৪১০

২৪৮. তাদের নবী তাদের (আরো) বললো, (আল্লাহ যাকে তোমাদের ওপর বাদশাহ করে পাঠাচ্ছেন) তার বাদশাহীর অবশ্যই একটা চিহ্ন থাকবে, (যা দেখে তোমরা সহজেই বুঝে নিতে পারবে যে, সে কে?) (সে নিদর্শন হচ্ছে) সে তোমাদের সামনে (সেই হারানো) সিন্দুক এনে হাযীর করবে, এই (হারানো)সম্পদে তোমাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে (সান্ত্বনা ও) প্রশান্তির বিষয় মজুত থাকবে। (তাছাড়া) এই (অমূল্য) সিন্দুকে মুসা ও হারুনের পরিত্যাক্ত কিছু পরিবার পরিজনের জিনিসপত্রও থাকবে, (আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে) তার ফেরেস্তারা এই সিন্দুক তোমাদের জনে বহন করে আনবেন। যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ ও তার দ্বীনের ওপর বিশ্বাস রেখে থাকো তাহলে (তোমরা দেখতে পাবে) এসব কিছুতে তোমাদের জন্যে কতো বড়ো ধরনের নিদর্শন রয়েছে।৪১১

৪০৮. ইতিপূর্বে আল্লাহ তায়ালার যে সংকীর্ণতা-প্রশস্ততার উল্লেখ করা হয়েছে, এ কাহিনী দ্বারা তা ভালোভাবে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ ফকীরকে বাদশাহ করা এবং বাদশার কাছ থেকে বাদশাহী ছিনিয়ে নেয়া, দুর্বলকে সবল এবং সবলকে দুর্বল করা এটা আল্লাহর কাজ।

৪০৯. হযরত মূসা (আঃ)-এর পর কিছুদিন পর্যন্ত বনী ইসরাইলের কাজ-কর্ম ঠিক ছিল। অতঃপর তাদের নিয়াতের পরিবর্তন ঘটলে জালূত নামে একজন ধনবান কাফের বাদশাহকে তাদের ওপর চাপায়ে দেয়া হয়। তাদেরকে শহর থেকে বের করে দেয়া হয় এবং আবার ফেরৎ আনা হয়। বাদশাহ তাদেরকে পাকড়াও করে দাসে পরিণত করে। বনী ইসরাইল পলায়ন করে বায়তুল মাকদেসে সমবেত হয়। তখন পয়গম্বর ছিলেন হযরত ইশমুইল (আঃ)। তাঁর নিকট নিবেদন জানায় যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিয়োগ করুন, যাঁর সঙ্গী হয়ে আমরা আল্লাহর পথে জেহাদ করতে পারি।

৪১০. তালুতের জাতিতে পূর্ব থেকে বাদশাহী ছিলনা। গরীব-পরিশ্রমী লোক ছিলো তারা। তাদের দৃষ্টিতে তাকে রাজত্বের যোগ্য বলে মনে হয়নি। অর্থ-সম্পদের কারণে নিজেদেরকেই রাজত্বের যোগ্য মনে করে। বনী ইসরাইল বলে যে, রাজত্ব কারো অধিকার নয়। রাজত্বের বড় যোগ্যতা হচ্ছে জ্ঞান-বুদ্ধি, দৈহিক বল-বীর্য। এ ক্ষেত্রে তালুত তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

বনী ইসরাইলরা এটা শুনে পয়গম্বরকে বলে, তার বাদশাহীর স্বপক্ষে এ ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ উপস্থাপন কর, যাতে আমাদের মনে কোন সংশয় না থাকে। বনী ইসরাইল আল্লাহর দরবারে দোয়া করলে তালুতের রাজত্বের অন্যান্য নিদর্শনও জানিয়ে দেয়া হয়।

৪১১. বনী ইসরাইলের মধ্যে একটা সিন্দুক চলে আসছিল। তাতে অনেক বরকত ছিল। হযরত মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাইলের অন্যান্য নবীরা যুদ্ধে এ সিন্দুকটি সম্মুখে রাখতো এবং এর বরকতে যুদ্ধে জয়লাভ করতো। জালূত বিজয়ী হয়ে সিন্দুকটি নিয়ে যায়। সিন্দুকের পরিচয় দেয়া আল্লাহ তায়ালার মনযুর হলে তিনি এমন ব্যবস্থা করেন যে, কাফেররা সিন্দুকটি যেখানে রাখতো, সেখানে রোগ-ব্যাধী মহামারী সৃষ্টি হতো। এভাবে পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তাকে দুটা বলদের কাঁধে তুলে ছেড়ে দেয়। ফেরেশতারা বলদকে হাঁকায়ে তালুতের দরজায় নিয়ে যায়। বনী ইসরাইলা এ নিদর্শন দেখে তালুতের রাজত্বে বিশ্বাস করে। তালুত জালুতের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করে। তখন ছিলো ভীষণ গরমের মওসুম।

فَلَمَّا فَصَلَ

طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ
شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّىْٓ اِلَّا
مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ
فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا
الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ
مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ
اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (২৪৯) وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ
قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (২৫০) فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ۫ وَقَتَلَ دَاوٗدُ
جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ
الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (২৫১) تِلْكَ
اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (২৫২)

রুকু ৩৩

২৪৯. (আল্লাহর পক্ষ থেকে রাজত্ব পেয়ে) তালুত নিজ বাহিনী নিয়ে যখন (শত্রুর মোকাবেলায়) এগিয়ে গেলো যখন (কিছুদূর গিয়ে সে তার লোকদের) বললো, আল্লাহ তায়ালা একটি নদীর পানি দিয়ে তোমাদের (ঈমানের)পরীক্ষা করবেন (তোমরা কিছুতেই এই নদীর পানি খাবে না) যদি তোমাদের মধ্যে কেউ এই নদীর পানি খায় তাহলে সে আর আমার দলভুক্ত থাকবে না, আর যে ব্যক্তি এই নদীর পানি পান করবে না- সে অবশ্যই আমার দলভুক্ত থাকবে, তবে কেউ যদি তর হাত দিয়ে সামান্য এক আজলা পানি খেয়ে নেয় তাতে তেমন দোষ হবে না।

(এ কারণেই সে আমার দলের বাহির্ভুত হয়ে যাবে না) অতঃপর (নদীর পাশে গিয়ে) হাতে গুণা কয়জন লোক ছাড়া আর সবাই তৃপ্তি ভরে পানি পান করে নিলো, এই (হাতে গুনা) কয়জন লোক যারা তার কথায় তার সাথে ঈমান এনেছিলো- এদের নিয়ে তালুত যখন নদী পার হয়ে এগয়িে গেলেন, তখন তারা (নিজেদের শক্তি সামর্থের হীনতা দেখে) বলে উঠলেন, হে আল্লাহ আজ জালুত এবং তার বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করার আমাদের শক্তি সামর্থ নাই, (দলের এই মানসিক অবস্থা দেখে- তাদেরই সাথী বন্ধুরা) যারা জানতো- (এই জীবনের শেষে এর ভালো মন্দের হিসাব নিয়ে) তাদের আল্লাহর সামনে হাযীর হতে হবে। তারা (বাকী লোকদের সাহস দিয়ে) বললো, (মানব ইতিহাসে) অনেকবারই দেখা গেছে আল্লাহর সাহায্য নিয়ে একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীও বিশাল বাহিনীর উপর জয়ী হয়েছে, (এ সংকটে যারা আল্লাহর সাহায্য ও ধৈর্য ধারণ করে) আল্লাহ তায়ালা (সে সব) ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।৪১২

২৫০. তার পর যখন সে তার সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে (প্রকাশ্য সমরে জালুত ও তার বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্যে দাঁড়ালো তখন তারা নিজেদের বৈষয়িক শক্তির ওপর ভরসা না করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলো) বললো, হে আমাদের মালিক তুমি আমাদের (অন্তরে) সবরের তাওফিক দান করো, দুশমনের মোকাবেলায় আমাদের কদমকে অটল রাখো (সর্বোপরি এই) অবিশ্বাসী কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।

২৫১. (শেষ পর্যন্ত) লড়াইর ময়দানে আল্লাহর সাহায্য নিয়ে মুসলমানরা কাফেরদের বাহিনীকে পর্যদস্তু ও লাঞ্চিত করেছিলো এবং দাউদ জালুতকে নিমূর্ল করলো। আল্লাহ তায়ালা দাউদকে দুনিয়ার রাজত্ব ও দান করলেন এবং (এই রাজত্ব পরিচালনার) জ্ঞানও তাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে নিজ ইচ্ছা মতো আরো বহুতরো বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন। (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যদি যুগে যুগে একদল লোককে দিয়ে আরেকদল লোককে শায়েস্তা না করতেন তাহলে এই ভূখন্ড ফেৎনা ফাসাদে ভরে যেতো (এটি মানব বসতির উপযোগী থাকতো না-

কিন্তু আল্লাহ পাক তা চাননি কেননা) আল্লাহ্ তায়ালা এই জনপদের বাসিন্দাদের ওপর বড়োই অনুগ্রহশীল।[৪১৩]

২৫২. এই পুস্তকে (বর্ণিত) এই সব ঘটনা হচ্ছে আল্লাহ এক একটা নিদর্শন (মাত্র) যা, যথাযথভাবে আমি তোমাদের শুনিয়েছি। (এর কোনো ঘটনাই তো তুমি জানতে না, এগুলোর সঠিক প্রতিবেদনই প্রমাণ করে যে,) তুমি অবশ্যই আমার পাঠানো নবী রসূলদের একজন।[৪১৪]

---

৪১২. তালুতের সঙ্গে যাওয়ার জন্য সকলে প্রস্তুত হয়। তালুত বলেছেন যে, শক্তিশালী জওয়ান এবং চিন্তামুক্ত ব্যক্তিরাই কেবল আমার সাথে গমন করবে। এরপরও ৮০ হাজার লোক গমন করে। অতঃপর তালুত তাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। এক মনযিলে কোন পানি ছিল না। অতঃপর মনযিলে একটি নহর পাওয়া যায়। তালুত বললেন, যে এক অঞ্জলীর বেশী পানি পান করবে, সে আমার সঙ্গে যেতে পারবেনা। কেবল ৩১৩ জন তাঁর সঙ্গে ছিলো। অন্যরা সকলেই কেটে পড়ে। যারা এক অঞ্জলীর বেশী পানি পান করেনি, তাদের পিপাসা নিবারণ হয়, যারা এর বেশী পান করে, তাদের পিপাসা আরও বেড়ে যায় এবং সামনে অগ্রসর হতে পারেনা।

৪১৩. সেই তিনশত তেরজন লোক যখন তালুতের মুখোমুখী হয়। এ তিনশত তের জনের মধ্যে হযরত দাউদ (আঃ)-এর পিতা, তাঁর ছয় ভাই এবং স্বয়ং হযরত দাউদ (আঃ)-ও ছিলেন। হযরত দাউদ (আঃ) তিনটা পাথর পান। পাথর তাঁকে বলে, আমাদেরকে নিয়ে চল। আমরা জালুতকে বধ করবো। সংঘর্ষ শুরু হলে জালুত নিজে বেরিয়ে এসে বলে, আমি একাই তোমাদের মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট। আমার সম্মুখে এসে দেখ। হযরত ইশমুইল হযরত দাউদের পিতাকে ডেকে বলেনঃ তোমার পুত্রদেরকে আমায় দেখাও। তিনি ৬ জন সন্তানকে দেখান। এরা ছিলো হাট্টা-কাট্টা নওজোয়ান। হযরত দাউদ কে(আঃ)-দেখাননি। কারণ, তিনি ছিলেন ক্ষুদে খাটো। বকরী চরাতেন তিনি। পয়গম্বর তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি জালুতকে বধ করতে পারবে? তিনি বললেন, পারবো। অতঃপর জালুতের সামনে নিয়ে বিশেষ কায়দায় পাথর তিনটি নিক্ষেপ করেন। জালুতের শুধু মাথা খোলা ছিলো। গোটা দেহ লোহা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিলো। পাথর তিনটি তার মাথা ভেদ করে বেরিয়ে যায়। জালুতের সৈন্যরা পলায়ন করে এবং মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। অতঃপর তালুত হযরত দাউদের সঙ্গে তাঁর কন্যাকে বিবাহ দেন। তালুতের পরে তিনি বাদশাহ হন।এ থেকে জানা যায় যে, জেহাদের বিধান সর্বদা চলে আসছে। অথচ খৃষ্টানরা বলে, জেহাদ নবীদের কাজ নয়।

৪১৪. বনী ইসরাইলদের সে কাহিনী বর্নীত হয়েছে, অর্থাৎ হাজার হাজার লোকের বহির্গত হওয়া এবং এক সঙ্গে তাদের মরে যাওয়া ও জীবিত হওয়া এবং তালুতের বাদশাহ হওয়া ইত্যাদি সবই আল্লাহর নিদর্শন। তোমাকে এসব নিদর্শনের কথা শুনানো

হচ্ছে। তুমি নিঃসন্দেহে আল্লাহর অন্যতম রাসূল। অর্থাৎ অতীতে যেমন রাসূল ছিলো, তেমনি তুমিও নিঃসন্দেহে রাসূল। অতীত জাতি সমূহের এসব কাহিনী আমি যথাযথভাবে তোমাকে শুনাচ্ছি। অথচ এসব কথা কোন কিতাবে তুমি দেখনি এবং কারো কাছ থেকে এসব কাহিনী শুননি।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ
اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ
مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ
الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم
مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا قف وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ
مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم
مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

২৫৩. (আল্লাহর এই যে নবী রসূলরা রয়েছে তাদের (সবার মর্যাদা সমান নয়) কাউকেও কারো ওপর আমি বেশী মর্যাদা ও সম্মান দান করেছি। এদের মধ্যে এমনও ছিলো যাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি কথা বলেছেন। আবার কাউকে তিনি অন্য দিকে বেশী মর্যাদা দান করেছেন। আমি মরিয়মের ছেলে ইসাকে কতিপয় উজ্জ্বল নিদর্শন দিয়েছিলাম অতপর পূতপবিত্র রুহের মাধ্যমে তাকে আমি সাহায্য করেছি।[৪১৫] আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন রসূলদের আগমনের পর যারা এসব উজ্জ্বল দির্শন নিজেরা স্বচক্ষে দেখেছে তারা কখনো নিজেরা কাটাকাটি হানাহানিতে লিপ্ত হতো না। (কিন্তু আল্লাহ কাউকে জোর করে তার পথে রাখতে

চান না) অবশেষে রসূলদের পর তাদের অনুসারীরা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে গেলো। তারা নিজেরা বিভিন্ন পথ অবলম্বন করলো।

তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমান আনলো আবার কিছু লোক (সে সব উজ্জ্বল নিদর্শনকে উপেক্ষা করে আল্লাহ ও তার নবীকে) অস্বীকার করলো- (এখানেও) আল্লাহ পাক চাইলে এরা কেউই নিজেদের মাঝে মতবিরোধ করে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ (মানব জাতির পরীক্ষার জন্যেই তেমনটি করেননি তিনি) তাই করেন, যা তার ইচ্ছা।৪১৬

রুকু ৩৪

২৫৪. হে মানুষ, (তোমরা যারা আল্লাহ ও তার নবীর আনীত হেদায়াতে ঈমান এনেছো) -তোমরা আমারই দেয়া ধন সম্পদ থেকে (এর কিছু অংশ আমারই পথে) ব্যয় করো। সে দিনটি আসার আগে- যেদিন (চূড়ান্ত হিসাবের বেলায়) কোনো বেচাকেনা চলবে না, (সেদিন ভালো মন্দ নির্ধারণের বেলায়) কোনো রকম বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কাজে আসবে না- (সব চাইতে বড়ো কথা বিচারের রায় ঘোষনার সময়) সেদিন কোনো সুপারিশও গ্রহণ করা হবে না।৪১৭ আসলে তারাই হচ্ছে (সীমা লংঘনকারী) যালেম যারা (এসব আগাম সাবধানবানীকে) অস্বীকার করেছে।৪১৮

---

৪১৫. এসব পয়গম্বর, যাদের কথা বলা হচ্ছে, তাদের মধ্যে কাউকে আমি ফযীলত দিয়েছি কারো ওপরে। তাদের মধ্যে কেউ এমনও আছেন, যেমন আদম এবং মূসা (আঃ) যাদের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কথা বলেছেন, আর কারো মর্তবা বুলন্দ করেছেন; যেমন কেউ নবী ছিলেন একটা কাওমের, কেউ একটা গ্রামের, কেউ একটা শহরের আর কেউ গোটা বিশ্বের। যেমন মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। আর হযরত ঈসা (আঃ)-কে দান করা হয়েছে স্পষ্ট মুজেযা, যেমন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা, জন্মগত অন্ধ এবং কুষ্ঠ রুগীকে ভালো করা ইত্যাদি। আর শক্তি দিয়েছে তাকে পাক রূহ অর্থাৎ হযরত জিবরাইল (আঃ)-কে তার সাহায্যে প্রেরণ করে।

৪১৬. যারা এসব নবীদের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আমাদের পয়গম্বর (সাঃ) নবী হওয়ার স্পষ্ট হুকুম ও উজ্জ্বল নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছে, আল্লাহ চাইলে এরা পরস্পরে লড়াই-ঝগড়ায় লিপ্ত হতোনা। একে অপরের বিরোধিতায় জড়াতোনা, তাদের কেউ মোমেন আর কেউ কাফের থাকতোনা। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ে ওয়াকেফহাল। তাঁর কোন কাজ রহস্যমুক্ত নয়।

৪১৭. এই সূরায় এবাদাত এবং মুয়ামালাত সম্পর্কে অনেক বিধান বর্ণীত হয়েছে। এসব বিধান মেনে চলা নফসের জন্য অসহ্য এবং কঠিন মনে হয়। সমস্ত আমলের মধ্যে জান-মাল ব্যয় করাই মানুষের কাছে সবচেয়ে কঠিন। দেখা যায়, অধিকাংশ খোদায়ী

বিধান জান সম্পর্কিত বা মাল সম্পর্কিত। অধিকন্তু জান-মালের প্রতি ভালোবাসা এবং আকর্ষণই মানুষকে পাপে লিপ্ত করে। এ দুটি জিনিসের করে ভালোবাসাই হচ্ছে পাপের মূল। এ থেকে মুক্তি পাওয়া সমস্ত এবাদাত-আনুগত্যকে সহজ করে দেওয়ার কারণ হয়। তাই এসব বিধান বর্ণনা করে যুদ্ধ এবং অর্থ ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করা যথার্থ হয়েছে। এতে প্রথমটি সম্পর্কে বলা দ্বিতীয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর পর তালুতের কাহিনী দ্বারা প্রথমটির তাকীদ করা হয়েছে। আর এখন এ দ্বারা দ্বিতীয়টির তাকীদ করাই উদ্দেশ্য। আর যেহেতু অর্থ ব্যয়ের ওপরই এবাদাত-মোয়ামালাতের অনেক কাজই নির্ভরশীল, একারণে এর বর্ণনায় অনেক বিস্তৃত আলোচনা এবং তাকীদ করা হয়েছে। পরবর্তী রুকুগুলোর অধিকাংশ দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যার কথা হচ্ছে এ যে, এখনও আমলের সময় আছে। আখেরাতে আমল বিক্রয় হবেনা, বন্ধুত্ব করেও কেউ দেবেনা, গ্রেফতারকারী যতক্ষণ না ছাড়েন, ততক্ষণ সুপারিশ করেও কেউ ছাড়াতে পারবেনা।

৪১৮. অর্থাৎ কাফেররা নিজেরা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে, যার পরিণতিতে তারা এমন হয়ে গেছে যে, আখেরাতে কারো বন্ধুত্বে তাদের কোন উপকার হবেনা- উপকার হবেনা কারো সুপারিশে।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ

الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ

وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا

بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا

یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ

الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۵﴾ لَاۤ اِكْرَاهَ فِی الدِّیْنِ ۙ قَدْ تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ

مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ

يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ۬ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا

اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى

الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا

خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾

২৫৫. আল্লাহ তায়ালা এক চিরঞ্জীব পরাক্রমশালী সত্ত্বা- এই বিশ্ব ভূমন্ডলের সব কিছুকে তিনি অত্যন্ত শক্ত হাতে ধরে রেখেছেন- তিনি ছাড়া (এই আকাশ নভোমন্ডলে) দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নাই।[৪১৯] (সমগ্র সৃষ্টি কূলের সৃষ্টি ও পরিচালনার কাজে) ঘুম (তো দূরে থাক) সামান্য তন্দ্রাও তাকে আচ্ছন্ন করে না, এই বিশ্ব চরাচরে যেখানে যা কিছু আছে তার সব কিছুরই একচ্ছত্র মালিকানা তার, কার এমন সাহস আছে যে এই শাহানশাহর দরবারে তার বিনা অনুমতিতে কিছু সুপারিশ পেশ করবে?

তার প্রতিটি সৃষ্টির বর্তমান ভবিষ্যতের সব কিছুই তিনি জানেন। তার জানা বিষয় সমূহের কোনো কিছুই তার সৃষ্টি জীবের জ্ঞানের সীমা পরিসীমার আয়ত্বাধীন হতে পারে না, তবে কোনো ছিটে ফোটা বিষয়ের কিছু জ্ঞান যদি তিনি কাউকে দান করে থাকেন, (তবে তা ভিন্ন কথা) আসমান জমীনের সব কিছুই পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। এ উভয়টি ও এর মধ্যে সৃষ্টি কূলের হেফাযত করার কাজ তাই কখনো তাকে পরিশ্রান্ত করে দিতে পারে না। (সত্যিকার অর্থে) তিনিই হচ্ছেন মহান ও অসীম ক্ষমতার আধার![৪২০]

২৫৬. (আল্লাহর) দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি কিংবা কোনো রকম বাধ্য বাধকতা (থাকার অবাকশ) নেই, (কারণ) এখানে সঠিক মত ও পথ মিথ্যা

মতাদর্শ থেকে (দিবালোকের মতোই) পরিস্কার হয়ে গেছে।[৪২১] (অতএব যে কোনো ব্যক্তিই দেখে নিতে পারে হক কোনটা, বাতিল কোনটা?) তোমাদের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তিই এই (আল্লাহ বিরোধী অসার ও) ভুল মতাদর্শকে অস্বীকার করে আল্লাহর (ও তার দেয়া জীবনাদর্শের) ওপর ঈমান আনবে সে যেন এমন এক শক্তিশালী হাতল ধরলো, যা কোনোদিনই ভাংবার নয়, মহান আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই শুনেন এবং (এ ন্যায় অন্যায়ের মাঝে মানুষ কোন পথ গ্রহণ করেছে তা) ভালো করেই জানেন।[৪২২]

২৫৭. যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে আল্লাহ তায়ালা (হক ও বাতিলের সংগ্রামে) সর্বদা তাদের সাহায্য করেন, তিনি তাদের (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোতে নিয়ে আসেন (আবার এরই পাশাপাশি) যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে আল্লাহ বিরোধী শক্তি সমূহই হবে তাদের সাহায্যকারী, আর এই শক্তিসমূহ তাদের দ্বীনের আলো থেকে কুফরীর অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। এই সব লোকই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের অধিবাসী- এই জাহান্নামই হবে এদের চিরন্তন আবাস স্থল।

---

৪১৯. প্রথম আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালার মহত্বও অনুভূত হয়। অতঃপর এ আয়াত নাযিল করা হয়। এতে 'তাওহীদে যাত' 'বা আল্লাহ তায়ালার মূল স্বত্বার একত্ব, তাঁর পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব একান্ত গুরুত্বের সঙ্গে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ আয়াতের নাম 'আয়াতুল কুরসী'। হাদীস শরীফে একে বলা হয়েছে, 'আ'যামু আয়াতে কিতাবিল্লাহ'- আল্লাহর কিতাবের শ্রেষ্ঠ আয়াত। হাদীস শরীফে এ আয়তের অনেক ফযীলত অনেক মর্যাদা এবং সাওয়াব উল্লেখিত হয়েছে। আসল কথা এ যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর কালামে পাকে তিন ধরনের বিষয় সংমিশ্রন করে বর্ণনা করেছেন স্থানে স্থানে। 'ইলমুত তাওহীদ ওয়াস সিফাত', 'ইলমূল আহকাম' এবং 'ইলমুল কিসাস আল হেকায়াত'-তাওহীদ সিফাতের ইলম, বিধি-বিধানের ইলম এবং কিসসা-কাহিনীর ইলম। কিসসা-কাহিনী দ্বার তাওহীদ ও সিফাত ভালোভাবে মনে বদ্ধমূল করা এবং তার সহায়তা করাই উদ্দেশ্য অথবা 'ইলমুল আহকাম' মনে বদ্ধমূল করা এবং এর প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিভাত করে তোলা। ইলমে তাওহীদ ও সিফাত এবং ইলমে আহকাম ও পরস্পর এমনভাবে সম্পৃক্ত যে, একটা হয় অপরটার কারণ ও প্রতীক। শরীয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সিফাতই হচ্ছে উৎস-মূল। শরীয়তের বিধি-বিধান ও সিফাতের জন্য ফল-পরিনতি বা শাখা স্বরূপ। এখন এটা স্পষ্ট যে, ইলমে কিসাস বা ইলমে আহকাম দ্বারা ইলমুত তাওহীদ অবশ্যই শক্তি-সহায়তা লাভ করবে। ইলমে কাসাস এবং ইলমে তাওহীদ ও সিফাত দ্বারা অবশ্যই ইলমে আহকামের সমর্থন সহায়তা, তার প্রয়োজনীয়তা এমনকি তত্ত্বকথা ও মৌলিকত্ব প্রমাণিত হবে। এ তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত পন্থাটি অত্যন্ত সুন্দর, সহজ এবং হৃদয়গ্রাহী। প্রথমতঃ এজন্য যে, একটা পন্থা সব সময় মেনে চলা এক ঘেয়েমী এবং বিতৃষ্ণার কারণ হয়। একটা জ্ঞান থেকে অন্য একটা জ্ঞানের

দিকে অগ্রসর হওয়া যেমন একটা বাগানে পরিভ্রমণ শেষে অন্য বাগানে পরিভ্রমণ করা। দ্বিতীয়তঃ তিনটি পন্থার সম্মিলনের ফলে মূলতত্ত্ব, কার্যকারণ, পরিণতি-ফলাফল সবই জানা যায়। এতে অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনা, প্রজ্ঞা এবং প্রস্তুতির সঙ্গে নির্দেশ মেনে নেয়া হবে। একারণে উপরোক্ত পন্থা অত্যন্ত উন্নত উপকারী এবং কোরআন মজীদে বহুল ব্যবহৃত। এখানে দেখে নেয়া উচিৎ যে, প্রথমে কতো বেশী এবং বিস্তারিতভাবে আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। এর পর প্রয়োজন অনুপাতে কিসসা-কাহিনী বর্ণনা করে উপরোক্ত সমস্ত বিধানের উপকারিতা এবং ফলাফল যেন আমাদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরা হয়েছে। এসবের পর তাওহীদ সিফাতের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট আয়াত-'আয়াতুল কুরসী'-উল্লেখ করে সকল বিধানের শিকড়কে মনে এতটা বদ্ধমূল করা হয়েছে যে, মন থেকে তা উৎপাটিত করা সম্ভব নয়।

৪২০. এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালার স্বত্ত্বার একত্ব এবং সিফাতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্নীত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সর্বদা বর্তমান আছেন। কেউ তাঁর শরীক নেই। গোটা সৃষ্টিকূলের তিনিই স্রষ্টা। সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি এবং সকল প্রকার পরিবর্তন থেকে তিনি মুক্ত। তিনি সব কিছুর মালিক। তাঁর রয়েছে সব কিছুর পূর্ণ জ্ঞান, সব কিছুর ওপর পরিপূর্ণ ক্ষমতা এবং পূর্ণ মাত্রায় শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁর হুকুম ব্যতীত কারো সম্পর্কে সুফারিশ করার ক্ষমতা-অধিকার কারো নেই। এমন কোন কাজ নেই, যা করা তাঁর জন্য কঠিন। তিনি সব কিছু এবং সকল জ্ঞানের উর্ধে। তাঁর মোকাবিলায় সব কিছুই তুচ্ছ। এ দ্বারা দুটি বিষয় মনে ভালোভাবে বদ্ধমূল হয়েছে। একঃ আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়্যাত ও হুকুমত অর্থাৎ তাঁর লালন-পালন কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং মানুষের কর্তৃত্বাধীনতা, দীনতা-হীনতা-দাসত্ব। এ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালার উল্লেখ্য-অনুল্লেখ্য সকল বিধি-বিধান বিনা বাক্য ব্যয়ে জানা এবং মানা অবশ্য কর্তব্য। তাঁর বিধানে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের আদৌ কোন অবকাশ নেই। দুই, উপরে উল্লেখিত এবাদাত-মোয়ামালাতের অসংখ্য কাজ কারবার এবং সেগুলোর সঙ্গে নেয়ামত বা শাস্তির বিধান দেখে কারো মনে সংশয় দেখা দিতে পারে যে, প্রতিটি ব্যক্তির এবাদাত-মোয়ামালাতের সংখ্যা এত বিপুল যে, সেসবের সমষ্টির নিয়ন্ত্রণ এবং হিসাব-কিতাব রাখা অসম্ভব বলে মনে হয়। অতঃপর এসবের জন্য পুরস্কার বা শাস্তি দান, এই কাজও জ্ঞান বৃদ্ধির অতীত, অসম্ভব বলে মনে হয়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে তাঁর এমন কিছু পূত-পবিত্র গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন, যার ফলে এসব সন্দেহ-শংসয়, অতি সহজে দূর হয়ে যায় অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা এমন পরিপূর্ণ যে, কোন একটা জিনিসও তার বাইরে নয়। তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা এবং এমন অসীম অটুট যে, বিশ্বের সকল খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং তার বিনিময় দানে তাঁর কোন অসুবিধা হয় না।

৪২১. তাওহীদের যুক্তি-প্রমাণ ভালোভাবে বুঝায়ে দেয়া হয়েছে, কাফেরের কোন রকম ওযর-আপত্তির আর কোন অবকাশ নেই। সুতরাং এখন আর জোর -জবরদস্তী কাউকে

মুসলমান করার কি প্রয়োজন থাকতে পারে। যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, তাদের নিজেকেই বুঝে নিতে হবে। কাউকেও জোর করে মুসলমান করা শরীয়তেরও বিধান নয়। কুরআন মজীদের স্পষ্ট আয়াত?

'তারা যাতে ইসলাম গ্রহণ করে এজন্য তুমি কি তাদের ওপর পীড়াপীড়ি করবে?' বর্তমানে রয়েছে। আর যারা জেনে কবুল করবে, তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে।

৪২২. অর্থাৎ হেদায়াত-গোমরাহীতে যখন পার্থক্য সূচীত হয়ে গেছে, তখন যে কেউই গোমরাহী ছেড়ে হেদায়াত গ্রহণ করে, সে এমন এক সুদৃঢ় বস্তু ধারণ করে, যা ভেঙ্গে ছুটে যাওয়ার কোন আশংকা নেই। আল্লাহ্ তাআলা বাহ্যিক কথাবার্তা ভালোভাবেই শুনেন এবং নিয়ত ও মনের অবস্থা ভালোভাবে জানেন। কারো খেয়ানত এবং নিয়তের বিকৃতি তাঁর কাছে গোপন রাখা যায় না।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِىْ حَاجَّ إِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ

أَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ م إِذْ قَالَ إِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ

يُحْىٖ وَيُمِيْتُ لا قَالَ أَنَا أُحْىٖ وَأُمِيْتُ ط قَالَ

إِبْرٰهٖمُ فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ

فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ط وَاللّٰهُ

لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥٨﴾ أَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى

قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ج قَالَ أَنّٰى يُحْىٖ

هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ج فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ

بَعَثَهٗ ط قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ط قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ

يَوْمٍ ط قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ

وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ج وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ

آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ

نَكْسُوهَا لَحْمًا ط فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ لا قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿২৫৯﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ

أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ط قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ط

قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ط قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً

مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ

مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ط وَاعْلَمْ أَنَّ

اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿২৬০﴾

রুকু ৩৫

২৫৮. তুমি কি (ইতিহাসে) সে ব্যক্তির অবস্থা দেখোনি যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা (দুনিয়ার) রাজ ক্ষমতা দেয়ার পর সে ইব্রাহীমের সাথে- এই (বিশ্ব নিখিলের) সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কে- এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলো, (কারণ রাজ্য ক্ষমতা পেয়ে সে নিজেকে এখানে সার্বভৌম ভেবে বসেছিলো, বিতর্কের এক পর্যায়ে) ইব্রাহীম বললো, আমার মালিক তিনি, যিনি সৃষ্টিকুলের জীবন মৃত্যু নির্ধারণ করেন।

(ক্ষমতার দম্ভে বলিয়ান) ব্যক্তিটি বললো, জীবন মৃত্যু তো আমিও দিতে পারি, ইব্রাহীম বললেন, (তাই) আমার আল্লাহ তো পূর্ব দিক থেকে প্রতিদিন সূর্যের উদয়ন ঘটান- একবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে বের করে দেখাও তো? এইবার (সত্য) অস্বীকার কারী ব্যক্তিটি হতভম্ব হয়ে গেলে (তার আর কোনো জবাব রইলো না আসল কথা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালা যালেম ও তার সাংগ পাংগদের কখনো পথের দিশা দেন না।[৪২৩]

২৫৯. অথবা সেই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে কি চিন্তা করেছো যে একটি বস্তির পাশ দিয়ে যাবার সময় যখন দেখলো গোটা জনপদটি বিধ্বস্ত হয়ে আপন অস্তিত্বের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, (এই অবস্থা দেখে পথচারী ব্যক্তিটি) বললো, এই মৃত জনপদকে কি ভাবে আল্লাহ আবার পুনরুজ্জীবন দান করবেন। আল্লাহ তায়ালা (তার সে সত্য অনুসন্ধিৎসু বান্দাহকে মৃতের জীবন দানের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাতে গিয়ে এবার) তাকে মৃত্যু দান করলেন, এবং এভাবেই তাকে একশত বছর ধরে ফেলে রাখলেন, অতপর একদিন তাকে পুনরায় জীবিত করলেন[৪২৪] এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন- (বলতে পারো) কতোকাল এভাবে মৃত অবস্থায় তুমি পড়েছিলে?

সে বললো, একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ?[৪২৫]

আল্লাহ বললেন, এমনি অবস্থায় তুমি একশত বছর কাটিয়েছো- (আমার এই উক্তির সত্যতা যাচাই করার জন্যে) তোমার নিজস্ব খাবার ও পানীয়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো- (দেখবে) তাতে বিন্দুমাত্র পঁচন ধরেনি। তোমার গাধাটিকেও পরীক্ষা করে দেখো- (আসলে আমি এসব লীলা খেলা এ জন্যেই দেখালাম যে) আমি তোমাকে ও দুনিয়ার মানুষদের জন্যে (পরকালীন জীবনের) একটি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে চাই, এই মৃত জীবের হাড় পাজর গুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো। (তুমি নিজেই দেখতে পাবে) আমি কিভাবে এগুলো জোড়া লাগিয়ে নতুন জীবন দান করেছি এবং কিভাবে এই মরা হাড়ে আমি চামড়ার পোশাক পরিয়ে দিয়েছি।[৪২৬] (এই ভাবেই একদিন পরকালীন জীবনের) এই সত্য যখন তার এই বান্দাহর সামনে পরিস্কার হয়ে গেলো তখন সে বলে উঠলো আমি (এই সত্য) জানি, অবশই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।[৪২৭]

২৬০. (মৃতকে পুনরায় জীবন দানের ব্যাপারে ইব্রাহীমের ঘটনাটিও তুমি লক্ষ্য করো!) ইব্রাহীম বললো, হে মালিক মরা দেহে আপনি কিভাবে পুনরায় জীবন দেন তা আমাকে একটু দেখিয়ে দিন, আল্লাহ তায়ালা বললেন, কেন (চোখে না দেখতে পেলে) তোমার কি বিশ্বাস হয় না? ইব্রাহীম বললো তাঁ প্রভূ অবশ্যই (আমি তা বিশ্বাস করি), আমার মনকে একটু সান্ত্বনা দেয়ার জন্যেই[৪২৮] (বললাম), আল্লাহ বললেন, (তুমি বরং এক কাজ করো) চারটি পাখি ধরে আনো। আস্তে আস্তে এই পাখিগুলোকে পোষ মানিয়ে নাও (যাতে ওদের নাম ধাম তোমার কাছে পরিচিত হয়ে যায়)। তারপর তাদের শরীরকে কেটে কয়েক টুকরায় ভাগ করো। এই কাটা অংশগুলোর এক একটি টুকরোকে এক একটি পাহাড়ের ওপর রেখে এসো।

অতঃপর এদের (সবার নাম ধরে) তুমি ডাকো। (দেখবে বিভিন্ন জায়গায় রেখে আসা এই কাটা অংশগুলো জীবন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে) ওরা তোমার কাছে দৌড়ে আসবে। তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা মহা শক্তিশালী এবং বিজ্ঞ কুশলী বটে।৪২৯

---

৪২৩. প্রথম আয়াতে ঈমানদার ও কাফের এবং তাদের হেদায়াতের নূর ও কুফরীর যুলমত, অন্ধকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখন তার সমর্থনে কতিপয় নযীর পেশ করা হচ্ছে। প্রথম নযীরে নমরূদ বাদশার উল্লেখ করা হয়েছে। রাজত্বের দম্ভে সে নিজেকে সেজদা করার জন্য লোকদের বাধ্য করতো। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার সামনে উপস্থিত হয়ে তাকে সেজদা করেননি। নমরূদ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি আমার রব ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করিনা। সে বললো, আমিই তো 'রব'। তিনি বললেন, আমি শাসনকর্তাকে 'রব' বলে স্বীকার করিনা। রব তো তিনি, যিনি বাঁচান-মারেন। নমরূদ দুজন কয়েদীকে ডেকে এনে নিরপরাধকে হত্যা করে আর অপরাধীকে ছেড়ে দিয়ে বলে দেখতে পেলে, আমি যাকে খুশী মারি আর যাকে খুশী ছেড়ে দেই। এর পর হযরত ইবরাহীম (আঃ) সূর্যের দলীল পেশ করে অহংকারী আহম্মককে নির্বাক করে দেন। কিন্তুএর পরও তার হেদায়াত নসীব হয়নি অর্থ্যাৎ লা-জবাব হয়েও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কথায় ঈমান আনেনি। অথবা এভাবে বলা যেতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বিতীয় কথার কোন জবাব দিতে পারেনি। অথচ প্রথম কথার যেমন জবাব দিয়েছিল, এখানেও তেমনি জবাব দেয়ার অবকাশ ছিল।

৪২৪. সেই লোকটি ছিলেন হযরত ওযাইর পয়গম্বর (আঃ)। গোটা তাওরাত তাঁর মুখস্ত ছিলো। 'বুখতা নাসসার 'ছিলো কাফের বাদশাহ। সে বায়তুল মাকদেস ধ্বংস করে এবং বনী ইসরাইলের অনেককে বন্দী করে নিয়ে যায়। এসব বন্দীদের মধ্যে হযরত ওযাইরও ছিলেন। বন্দী জীবন থেকে মুক্ত হয়ে আসার পর তিনি রাস্তায় একটা বিরান শহর দেখতে পান। শহরের এমারতগুলো সব ভেঙ্গে পড়ে আছে। শহরটি দেখে তিনি মনে মনে বলেন, এখানকার অধিবাসীরা সকলে মরে গেছে। আল্লাহ তায়ালা কি করে তাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন, এ শহর কি করে পুনরায় আবাদ হবে।

অতঃপর সেখানেই তাঁর জান কবয হয়। তাঁর সওয়ারীর গাধাও মারা যায়। তিনি শত বৎসর এ অবস্থায় পড়ে থাকেন। কেউ সেখানে আসিয়া তাকে দেখেনি। কোন খবরও নেয়নি। এসময়ে 'বুখ্‌তা নাসসারা'ও মারা যায়। ইতিমধ্যে অন্য বাদশাহ বায়তুল মাকদেসকে আবাদ করে। শহরটি বেশ জমে উঠে। একশত বসর পর হযরত ওযাইরকে পুনরায় জীবিত করা হয়। তাঁর খাদ্য ও পানীয় ঠিক তেমনি ছিল। তাঁর মরা গাধার গলিতে হাঁড় পড়ে ছিল। তাঁর সম্মুখে এ গাধাকেও পুনরায় জীবিত করা হয়। এ একশত বৎসরে বনী ইসরাইলরাও বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে শহরে আবাদ হয়। হযরত ওযাইর জীবিত হয়ে আবাদ শহরই দেখতে পান।

৪২৫. হযরত ওযাইর (আঃ) যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কিছু বেলা হয়েছিল। আর যখন জীবিত হন, তখন সন্ধ্যা হয়নি। তিনি মনে করলেন, আমি গতকাল এখানে এসে থাকলে এক দিন হয়েছে। আর আজ এসে থাকলে এখনো এক দিনও হয়নি।

৪২৬. হযরত ওযাইর (আঃ)-এর সম্মুখে হাঁড়গুলো দেহের গঠন কাঠামো অনুযায়ী সাজানো হয়। অতঃপর হাঁড়ের ওপরে গোস্ত জড়ানো হয়। চামড়া সজ্জিত হয়। অতঃপর খোদার কুদরতে হাঁড়ে প্রাণের সঞ্চার হয়। দাঁড়িয়ে আপন কথা বলতে থাকে।

৪২৭. হযরত ওযাইর (আঃ) এসব অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বলেন, আমার ভালোভাবে বিশ্বাস জন্মেছে যে, আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান, সব কিছুই তিনি করতে পারেন। অর্থাৎ আমি জানতাম যে, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা আল্লাহর জন্য সহজ কাজ। সুতরাং এখন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। এ অর্থ নয় যে, আগে বিশ্বাসে কিছু ত্রুটি ছিল, অবশ্য প্রত্যক্ষ করেননি। অতঃপর হযরত ওযাইর (আঃ) সেখান থেকে বায়তুল মাকদেস পৌছেন। সেখানে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনা। কারণ, তিনি তখনো জওয়ান। অথচ তাঁর পরের শিশুরাও বৃদ্ধ হয়ে গেছে। তিনি মুখস্ত তাওরাত শুনালে লোকে তাঁকে বিশ্বাস করে। 'বুখার তা নাসসার' বনী ইসরাইলের সমস্ত কিতাব জ্বালায়ে দিয়েছিল। এসবের মধ্যে তাওরাতও ছিলো।

৪২৮. সারকথা এই যে, পূর্ণ একীন ছিলো, কেবল 'আইনুল একীনের' তিনি প্রত্যাশী ছিলেন, যা প্রত্যক্ষ করার ওপর নির্ভরশীল।

৪২৯. হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী চারটি প্রাণী নিয়ে আসেন ময়ুর-মোরগ-কাক-কবুতর। প্রাণী চারটিকে নিজের সঙ্গে দোলা দেন, যাতে চেনা যায় এবং ডাকলে আসতে পারে। অতঃপর এগুলোকে জবাই করে একটা পাহাড়ের ওপর এদের মাথা রাখেন। একটার ওপর পালক রাখেন, একটার ওপরে দেহ রাখেন; একটার ওপরে রাখেন পা। মধ্যখানে দাঁড়িয়ে প্রথমে একটাকে ডাকেন। তার মাথা উঠে আসে। অতঃপর দেহ জড়ায়, এর পর পালক এবং সবশেষে পা। সে ছুটে আস। এমনিভাবে চারটি প্রাণী হাযির হয়।

এখানে দুটি সন্দেহ দেখা দেয়ার আশংকা রয়েছে। এক, প্রাণহীন দেহের বিক্ষিপ্ত অংশগুলোতে প্রাণের সঞ্চার হয়ে মেনে নেয়া যায় না। দুই, সেগুলো পাখী হবে, সংখ্যায় চার হবে, তা-ও আমার অমুক পাখী হবে, তাদের অংশগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ায়ে ডাকলে জীবিত হয়ে ছুটে আসবে,এসব বৈশিষ্ট্যের কোন দখল এবং এসব শর্তের কোন উপকারিতা তো জানা যায়না। এজন্য প্রথম সন্দেহের জবাবে 'আযীযুন অর্থাৎ মহা পরাক্রমশালী এবং দ্বিতীয় সন্দেহের জবাবে 'হাকীমুন' অর্থাৎ মহাজ্ঞানী বলে উভয় সন্দেহের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। অর্থাৎ ভালোভাবে জেনে রাখবে যে, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর প্রতিটি নির্দেশে এমনসব তত্ত্ব নিহিত থাকে, যা আয়ত্ব-উপলব্ধি করা আদৌ সম্ভব নয়।

আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ তাআলার 'ইলম-কুদরত' ইত্যাদি সিফত বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তিনটি কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা, হেদায়াত করতে পারেন, আর যাকে খুশী গোমরাহ করতে পারেন। জীবন-মৃত্যু তাঁরই এক্তেয়ারে। এখন জেহাদ এবং আল্লাহর রাস্তায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ফযীলত এবং এ সম্পর্কে কিছু সীমা-শর্তের কথা বলা হচ্ছে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেও কিছুটা আলোচনা হয়েছে। কারণ, জিহাদ এবং অর্থ ব্যয়ে যেসব প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়, আল্লাহ তায়ালার অশেষ জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাস করা এবং তাঁর রকমারী কুদরত সম্পর্কে জানার পর এসব দূর হয়ে যাবে। অন্যথায় এসব দ্বারা ক্ষতি অবধারিত।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ

كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۱﴾ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ

اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۶۲﴾

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ

وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿۲۶۳﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا

صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ

النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ

صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ
لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ
بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن
لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

রুকু ৩৬

২৬১. যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহর (নির্ধারিত) পথে খরচ করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে একটি বীজের মতো, যে বীজটি বপন করার পর তা থেকে (একে একে) সাতটি শীষ বেরোয়, আবার এর প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্য দানা। (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে (এই শস্য দানা ও বীজের উদাহরণের মতোই) বিপুল পরিমাণ দান করেন। আল্লাহর (দয়ার) ভান্ডার অনেক প্রশস্ত, (কাকে কি পরিমাণ দেয়া দরকার তা) তিনিই সব চাইতে বেশী জানেন।[৪৩১]

২৬২. যারা আল্লাহর নির্ধারিত পথে নিজের ধনসম্পদ ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর তা প্রচার করে বেড়ায় না (যার ওপর অনুগ্রহ করা হয়েছে তার কাছ থেকে) প্রতিদান চেয়ে (কিংবা দানের তুলনা দিয়ে তাকে পথে ঘাটে) কষ্ট দিয়ে বেড়ায় না- (তাদের এই একনিষ্ঠ দানের জন্যে) তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্যে সংরক্ষিত রয়েছে বহুবিধ পুরস্কার। শেষ বিচারের দিন তাদের যেমনি কোনো ভয় ভীতির সম্মুখীন হতে হবে না তেমনি তাদের এ নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনারও দরকার নেই।[৪৩২]

২৬৩. (অথচ) একটু খানি সুন্দর কথা বলা এবং (কোনো ঋণ যথাযথ পরিশোধ করতে না পারলে তাতে একটু উদারতা দেখিয়ে তা) ক্ষমা করে দেয়া সেই দানের চাইতে অনেক ভালো যে দানের পরিনামে উভয়ের মাঝে তিক্ততা ও মন কষাকষিই বাড়ে, আল্লাহ তায়ালা বিপুল সম্পদশালী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন এবং সাথে সাথে তিনি কঠিন ধৈর্যশীলও বটে।[৪৩৩]

২৬৪. হে (আমার) ঈমানদার বান্দারা, তোমরা প্রচার প্রোপাগান্ডা করে, (উপকারের) প্রতিদান চেয়ে এবং (তা না পেয়ে অনুগৃহীত ব্যক্তিকে) কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান সদকাকে বরবাদ করে দিয়ো না- ঠিক সেই (হতভাগ্য) ব্যক্তির মতো যে, শুধু লোক দেখানোর (ও তাদের বাহবা কুড়ানোর) উদ্দেশেই দান করে- (যার সন্তুষ্টির জন্যে দান করা উচিৎ সেই) আল্লাহর ওপরই বিশ্বাস স্থাপন করে না, (এবং যেদিন আল্লাহ এর বিনিময় দেবেন বলেছেন) সে পরকালীন দিনেও সে বিশ্বাস করে না[৪৩৪]; তার (দানের) উদাহরণ হচ্ছে যেমন একটি মসৃণ শিলা খন্ডের ওপর কিছু মাটির আবরণ পড়লো- (একদিন সেখানে) মুসলধারে বৃষ্টিপাত হলো।

(বৃষ্টির পানি বাইরের মাটি সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিয়ে গেলে দেখা গেলো শক্ত) পাথর শক্ত হয়েই পড়ে থাকলো, দান খয়রাত করেও তারা এর থেকে কিছুই অর্জন করতে পারলো না) আর যারা আল্লাহকে (ও তার প্রতিদানকে) বিশ্বাস করে না আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের সঠিক পথ দেখান না।[৪৩৫]

২৬৫. (অপরদিকে যারা আল্লাহর পথে তারই সন্তুষ্টির জন্যে এবং নিজের মানসিক অবস্থাকে (আল্লাহর পথে) সুদৃঢ় রাখার জন্যে নিজেদের মাল সম্পদ ব্যয় করে তাদের (এ কাজের) উদাহরণ হচ্ছেঃ যেন কোনো উচু পাহাড়ের উপত্যকায় একটি সুসজ্জিত ফসলের বাগান, যদি সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় তাহলে ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়- আর প্রবল বৃষ্টিপাত না হলেও বৃষ্টির শিশির বিন্দুই (পর্যাপ্ত ফসলের জন্য) যথেষ্ট। আল্লাহ ভালো করেই জানেন তোমরা (কি জন্যে) কি কি কাজ করো।[৪৩৬]

---

৪৩১. অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় সামান্য মালের সওয়াবও অনেক, যেমন একটা বীজ থেকে সাতশত বীজ উৎপন্ন হয়। আল্লাহ তায়ালা যার জন্য চান, বৃদ্ধি করে দেন। সাতশত থেকে সাত হাজার বা তার চেয়েও বেশী দেন। আল্লাহ তায়ালা বড় দানশীল, প্রত্যেক ব্যয়কারীর নিয়ত, ব্যয়ের পরিমাণ এবং মালের অবস্থা সম্পর্কে তিনি ভালো করেই জানেন। অর্থাৎ প্রত্যেকের সঙ্গে তার যথাযোগ্য ব্যবহার করেন।

৪৩২. যারা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে আর ব্যয়ের জন্য মুখে খোঁটা দেয়না, উত্যক্ত করেনা, হেন-তেন বলে, খেদমত-বিনিময় নিয়ে এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কোন ভাবেই নয়, এমন লোকদের জন্য রয়েছে পূর্ণ সওয়াব। সওয়াব হ্রাস পাওয়ার ভয়ও নেই তাদের ভিখারীকে সওয়াব হ্রাস পাওয়া দ্বারা তাদেরকে দুঃখিত হতে হবে না।

৪৩৩. অর্থাৎ 'সায়েল' কে গরম ভাবে জবাব দেওয়া এবং তার পীড়াপীড়ি ও অসদাচার ক্ষমা করা সেই দান-খয়রাতের চেয়ে উত্তম, যার ফলে বারবার তাকে লজ্জা দেয়া হয়, বা খোঁটা দেয়া হয় অথবা দানের কথা স্মরণ করায়ে ব্যথা দেয়া হয়। আর আল্লাহ তো হচ্ছেন মহাধনী। কারো সম্পদে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে, সে করে নিজের জন্য আর আল্লাহতো শাস্তি দানে তাড়াহুড়া করেননা।

৪৩৪. অর্থাৎ সদকা দিয়ে অভাবীকে উত্যক্ত করা এবং এজন্য খোঁটা দেয়ার ফলে সদকার সওয়াব নষ্ট হয়ে যায়। বা অন্যদেরকে দেখায়ে এজন্য সদকা দেয়া যাতে মানুষ দানশীল বলে, এমন সদকা দানেও কোন সওয়াব হয়না। সে আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস করেনা-একথা বলা সদকা বাতেল করার জন্য সীমা-শর্ত নয়। কারণ, সদকাতো নিছক লোক দেখানো দ্বারাই বাতেল হতে পারে। ব্যয়কারী মোমেন হলেও। শর্তটি আরোপ করা হয়েছে একটা প্রয়োজনে। এটা বুঝাবার জন্য লোক দেখানো ভাব মু'মেনের শান থেকে অনেক দূরে। বরং এটাতো মোনাফেকদেরই সাজে।

৪৩৫. উপরে সদকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, খয়রাত এমন, যেন একটা বীজ বপন করলে তা থেকে শত শত বীজ উৎপন্ন হয়। আর এখন বলা হচ্ছে নিয়ত শর্ত। কেউ যদি লোক দেখানোর নিয়তে সদকা করে, তার দৃষ্টান্ত এমন মনে করবে, যেমন কেউ পাথরের ওপর বীজ বপন করেছে, যার উপর সামান্য মাটি দেখা যায়। বৃষ্টি বর্ষণের পর পাথর ধুয়ে একেবারে সাফ হয়ে যায়। এখন পাথরের উপর দানা কি কাজে আসবে। তেমনিভাবে সদকায় লোক দেখানোর কি সওয়াব হবে।

৪৩৬. জোরে বৃষ্টির অর্থ অঢেল সম্পদ ব্যয় করা আর কয়েক বিন্দু বৃষ্টির অর্থ স্বল্পমাল ব্যয় করা, আর মনকে দৃঢ় রাখার অর্থ সওয়াব লাভের ব্যাপারে মনকে দৃঢ় রাখা। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করে যে, খয়রাতের সওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। সুতরাং নিয়ত ঠিক থাকলে অনেক অর্থ ব্যয়ের জন্য অনেক সওয়াব পাবে, আর সামান্য খয়রাতেও উপকার হবে। যেমন, জঞ্জাল মুক্ত মাটিতে বাগান আছে। যতটা বৃষ্টি হয়, বাগানের ততটাই উপকার হবে। আর নিয়ত ঠিক না থাকলে যত পরিমাণ ব্যয় করবে, অত পরিমাণ অর্থই নষ্ট হবে। কারণ, বেশী অর্থদানে রিয়া বা লোকদেখানোও বেশী হবে। যেমন পাথরের উপর চারা গজালে বৃষ্টি যত জোরে হবে, ক্ষতিও ততই বেশী হবে।

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ

فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٦٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ

طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ص

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ

اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ط وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

২৬৬. তোমাদের মাঝে এমন (হতভাগ্য) ব্যক্তি কি কেউ আছে- যে চাইবে যে, তার কাছে (ফুলে ফুলে সুশোভিত) একটি বাগান থাকুক যাতে খেজুর ও আঙ্গুর সহ বিভিন্ন ধরনের ফলমুল থাকবে- তার তলদেশ দিয়ে আবার থাকবে একটি প্রবাহমান ঝর্ণাধারা, আর (এই ফল ভোগ করার আগেই) বাগানের মালিক বয়েসের ভারে নুয়ে পড়বে, (তাকে সাহায্য করার মতো) তার সন্তান সন্ততি থাকবে (তখনো) দুর্বল, যাদের বয়েস হবে নিতান্ত কম- (এই নাযুক পরিস্থিতিতে একদিন হঠাৎ করে) এক আগুনের ঘুর্ণিবায়ু এসে তার সব (স্বপ্ন) ধূলিস্মাৎ করে দিয়ে যাবে। (এমনটি নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ চাইবে না) আসলে এই ভাবেই (বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা তার নিদর্শন গুলো তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা (আল্লাহর এসব কথার ওপর ভিত্তি করে) চিন্তা ও গবেষণা করতে পারো।[৪৩৭]

রুকু ৩৭

২৬৭. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেরা যে ধন সম্পদ (ন্যায়ানুগ পন্থায়) অর্জন করেছো। যে সম্পদ আমি জমিনের ভেতর থেকে তোমাদের জন্যে বের করে এনেছি- তার থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো। (আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্যে মাল আসবাব থেকে তার) নিকৃষ্টতম জিনিসগুলোকে বেছে বেছে নিয়ো না।

(বিশেষতঃ সে ধরনের জিনিসপত্র) যা অন্যরা তোমাকে দিলে তুমি নিজে তা গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করো। এ কথাটা জেনে রেখো যে, আল্লাহ তায়ালা কখনো তোমাদের দানের মুখাপেক্ষী নন, (তার কিছুরই অভাব নেই) সব প্রশংসার মালিক তো তিনিই![৪৩৮]

৩৩৭. এটা তাদের দৃষ্টান্ত, যারা লোক দেখানোর জন্য সদকা-খয়রাত করে, বা খয়রাত করে খোঁটা দেয়, কষ্ট দেয়। অর্থাৎ যেমন কোন ব্যক্তি যৌবন এবং শক্তি-সামর্থকালে বাগান লাগায় বার্ধক্যকালে ফল খাওয়া এবং প্রয়োজনে কাজে লাগার জন্য। অবশেষে যখন বার্ধক্য উপস্থিত হয়, ফলের খুব প্রয়োজন দেখা দেয়, ঠিক এ প্রয়োজনের মুহূর্তে বাগানটি জ্বলে যায়। অর্থাৎ সদকা ফলদায়ক বাগানের মত আর তার ফল আখেরাতে কাজে আসবে। যখন কারো নিয়ত খারাব হয়, তখন বাগানটি জ্বলে যায়। অতঃপর তার ফল যে সওয়াব, তা কিভাবে তার ভাগ্যে জুটবে। তোমরা যাতে বুঝতে এবং চিন্তা করতে পার। এজন্য আল্লাহ তায়ালা খুলে খুলে তোমাদেরকে আয়াত সমূহ বুঝান।

৪৩৮. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে সদকা মকবুল হওয়ার জন্য এটাও শর্ত যে, মাল হতে হবে হালাল উপার্জনের। হারামের মাল বা সন্দেহজনক মাল হলে চলবেনা। সর্বোত্তম বস্তু আল্লাহর রাস্তায় দান করবে। খারাপ জিনিস খয়রাতের কাজে ব্যবহার করবে না। এমন জিনিস দান করবে না, যা গ্রহণ করতে মন চায় না। অবশ্য লজ্জা-শরমে পড়ে গ্রহণ করে, স্বানন্দ চিত্তে কখনো গ্রহণ করেনা। জেনে রাখবে যে, আল্লাহ কারো পরোওয়া করেন না। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি সকল গুণের আধার। মনের আগ্রহ আর ভালোবাসার সঙ্গে সর্বোত্তম জিনিস দান করলে তিনি পসন্দ করেন।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ

يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٨﴾ يُّؤْتِي

الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ

خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾ وَمَآ

اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ۗ

وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ

فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ

وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧١﴾

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ

وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ

لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٢﴾ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ

اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ

الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ج

لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ

بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢٧٣﴾

২৬৮. শয়তান (সব সময়ই তোমাদের আল্লাহর পথে দানের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেয়, দান করলে সে) তোমাদের অভাব অনটনের ভয় দেখাবে- এবং নানাবিধ অশ্লীল কর্মকান্ডের দিকে সে তোমাদের ডাকবে, আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে তার অসীম বরকত ও ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, (এবং সে দিকেই তিনি তোমাদের ডাকছেন) তার দেয়ার ভান্ডার অপরিমিত, তিনি তোমাদের (পূর্বাপর সব ব্যাপারেই) সম্যক অবগত।৪৩৯

২৬৯. আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই (তিনি তার এ অসীম ভান্ডার থেকে) বিশেষ জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করেন- আর যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা সেই বিশেষ জ্ঞান দিয়ে ধন্য করলেন- সে সত্যিই একটা বিরাট রকমের সম্পদ লাভ করলো। আর প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া (আল্লাহর এসব কথা থেকে জীবনের জন্যে) অন্যরা এই শিক্ষাও গ্রহণ করতে পারে না।৪৪০

২৭০. তোমরা যা কিছু খরচ করো- আর যা কিছু খরচ করার জন্যে (মনে মনে) মানত করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন- (সীমালংঘনকারী) যালেমদের (আসলে কোথায়ও) কোনো বন্ধু নেই।[৪৪১]

২৭১. (আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যে) তোমরা যা কিছু দান সদকা করতে চাও তা যদি প্রকাশ্য ভাবে মানুষদের সামনে করো তা ভালো কথা (এতে কোনো দোষ নেই) তবে যদি তুমি এই দানের কথা মানুষদের কাছে গোপন রাখতে চাও এবং চুপে চুপে তা অসহায়দের কাছে পৌঁছে দাও তাহবে তোমার জন্যে সব দিক থেকে উত্তম। (এ ধরনের একনিষ্ট দানের মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বহুবিধ গুনাহ খাতা মুছে দেন, আর তোমরা যাই করো না কেন আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছু সম্পর্কেই ওয়াকেবহাল।[৪৪২]

২৭২. (যারা তোমার কথায় কর্ণপাত করে না) তাদের আল্লাহর পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব তোমার নয়, (এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর ব্যাপার) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই সঠিক পথ দেখান, (গরীব ও অসহায় ব্যক্তিদের) তোমরা যেভাবে দান সদকা করো এটা (প্রকারান্তরে) তোমাদের জন্যেই কল্যাণকর, (কারণ) তোমরা তো (নিজেদের মালসম্পদ) এ জন্যেই খরচ করো যেন (পরিনামে তোমরা) আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারো। (তোমাদের এই দান বিফলে যাবে না, আজ) তোমরা যা কিছু দান করবে তার পুরোপুরি (বিনিময় ও যথাযথ) পুরস্কার তোমাদের আদায় করে দেয়া হবে। (তোমাদের এই পাওনা বুঝে দেয়ার সময় সেদিন) তোমাদের ওপর কোনো রকম যুলুম করা হবে না।[৪৪৩]

২৭৩. তোমাদের মাঝে এমন কিছু গরীব ব্যক্তিও আছেন (যাদের তোমাদের দান করা উচিৎ) যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে জড়িত হয়ে গেছে যে সাধারণ লোকদের ন্যায় তারা (নিজেদের রুটী রুজির জন্যে) জমিনের বুকে চেষ্টা সাধনা করতে পারে না, এসব লোকের আত্ম সম্মান বোধের কারণে অজ্ঞ ও মুর্খ লোকেরা মনে করে এরা বুঝি স্বচ্ছল। কিন্তু তুমি তো এদের বাহ্যিক চেহারা দেখেই এদের (সঠিক অবস্থা) বুঝে নিতে পাররা- এরা মানুষদের কাছ থেকে কাকুতি মিনতি করে ভিক্ষা করতে পারে না[৪৪৪] (বলে এদের তোমরা ভুলে যেয়ো না, যে দানের এরাই বেশী হকদার এ ধরনের লোকদের জন্য) তোমরা যা কিছুই খরচ করবে আল্লাহ তায়ালা (তার কিছুই গোপন করনে না) কারণ তিনি সব কিছুই দেখেন।[৪৪৫]

---

৪৩৯. কারো যদি মনে হয় যে, দান-খয়রাত করলে গরীব হয়ে পড়বে, আল্লাহ তায়ালার গুরুত্ব দানের কথা শুনেও এই ধারনার পরিবর্তন হয়না, তার মন যদি মাল খরচ করতে না চায়, আল্লাহর ওয়াদা থেকে মুখ ফিরায়ে শয়তানী ওয়াদায় মন বসে এবং আস্থা জন্মে তখন তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, এটা শয়তানের কাজ। এমন কথা চলবেনা যে, শয়তানের তো কখনো ছবিও দেখিনি, তার হুকুম করাতো দূরের কথা। আর তার যদি এ

ধারণা হয় যে, সদকা-খয়রাত দ্বারা গুনাহ্ মাফ হবে, অর্থ সম্পদে ও বরকত হবে, তাকে জেনে নিতে হবে যে, এটা আল্লাহর কাজ। তার উচিৎ আল্লাহর শুকর আদায় করা। তাঁর ভান্ডারে কম নেই। তিনি সকলের যাহের-বাতেন এবং কাজের নিয়ত সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন।

৪৪০. অর্থাৎ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের কাজে জ্ঞান এবং খয়রাত করার বুদ্ধি দান করেন। কোন্ নিয়তে, কোন্ মাল থেকে কাকে কিভাবে দান করতে হবে, তিনি তা শিক্ষা দেন, অভাবীকে কিভাবে দিতে হবে, তিনি তাও শিক্ষা দেন। আর যার জ্ঞান-বুদ্ধি অর্জিত হয়েছে, সে বিরাট নেয়ামত এবং বিরাট সৌন্দর্য লাভ করেছে।

৪৪১. অর্থাৎ কম-বেশী, গোপনে-প্রকাশ্যে ভালো বা খারাব নিয়তে যা কিছু ব্যয় করা হয় বা কোন প্রকার মান্নত করা হয়, আল্লাহ তায়ালা নিঃসন্দেহে সবকিছু সম্পর্কে ভালো করেই জানেন। আর যারা অর্থ ব্যয় বা মান্নতে আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করে, তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। আল্লাহ চাইলে তাদের ওপর আযাব নাযিল করতে পারেন। মান্নত করলে তা ওয়াজেব হয়ে যায়। আদায় না করলে গুনাহগার হতে হয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মান্নত করা জায়েজ নেই। অবশ্য যদি এরকম বলে যে, আল্লাহর জন্য অমুক ব্যক্তিকে দেবে বা মান্নতের সওয়াব অমুক ব্যক্তির কাছে পৌছুক, তবে কোন দোষ নেই।

৪৪২. মানুষকে দেখানোর নিয়ত না থাকলে মানুষের সামনে খয়রাত করাই উত্তম। এর ফলে অন্যদেরও আগ্রহ সৃষ্টি হয়। দান গ্রহণকারী যাতে লজ্জা না পায়, এজন্য গোপনে খয়রাত করাও উত্তম। সার কথা এই যে, দান-খয়রাতে গোপন প্রকাশ্য উভয়ই উত্তম। অবশ্য পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী।

৪৪৩. রাসূল (সঃ) মুসলমান ছাড়া অন্যদেরকে দান-সদকা থেকে সাহাবায়ে কেরামকে বারণ করলে তাতে লক্ষ্য ছিলো এই যে, যাতে অর্থের কারণে সত্য দ্বীনের প্রতি তারা আগ্রহী হয়। পরে বলা হয় যে, যতক্ষণ আল্লাহর সন্তুষ্টি কাম্য থাকে, ততক্ষণ এ সওয়াব পাওয়া যাবে, তখন আয়াতটি নাযিল হয়। এতে সাধারণ নির্দেশ দেয়া হয় যে, আল্লাহর রাস্তায় যাকে অর্থদান করবে, তার সওয়াব পাবে, মুসলিম-অমুসলিমের কোন কথা নেই। অর্থাৎ যাকে সদকা দেবে, তাকে মুসলিম হতে হবে এঁমন কোন কথা নেই। অবশ্য সদকা অবশ্যই আল্লাহর জন্য হতে হবে।

৪৪৪. অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাস্তায় এবং তাঁহার দ্বীনের কাজে আটকা পড়ে চেষ্টা-সাধনা এবং আয়-উপার্জন করতে অক্ষম এবং কারো কাছে নিজেদের প্রয়োজন প্রকাশ করেনা-এমন লোককে দান করা বেশী সওয়াবের কাজ। যেমন, রাসূলের সাহাবীরা যারা ছিলেন। আহলে সুফফা এরা বাড়ী-ঘর ত্যাগ করে রাসূলের সংসর্গ গ্রহণ করেন দ্বীনের ইলম শিক্ষা করার জন্য। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সঙ্গে জেহাদ করার জন্য। তেমনিভাবে

এখনও যদি কেউ কোরআন মজীদ হিফয করে বা ইলমে দ্বীন হাসিলে মশগুল হয়, তাদেরকে সাহায্য করা মানুষের কর্তব্য। চেহারা দ্বারা তাদেরকে চেনা যায়, এর অর্থ তাদের চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে আর দেহ জীর্ণ-শীর্ণ হচ্ছে। কষ্ট ক্লেশের চিহ্ন তাদের চেহারা থেকেই স্পষ্ট।

৪৪৫. সাধারণতঃ এবং বিশেষ করে যাদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿২৭৪﴾ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا

لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۖ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ

عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿২৭৫﴾

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ

لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿২৭৬﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ
فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

রুকু ৩৮

২৭৪. যারা নিজেদের মাল সম্পদ ব্যয় করে দিন রাত- (সব সময়ে) প্রকাশ্যে ও সংগোপনে- নিজেদের মালিকের দরবারে তাদের এ দানের প্রতিফল সুরক্ষিত রয়েছে, (তাই যেদিন তারা মালিকের দুয়ারে হাযির হবে সেদিন) তাদের কোনো রকম চিন্তা ভীতির কিছুরই দরকার নাই।[৪৪৬]

২৭৫. (অর্থনৈতিক কাজ কারবারে) যারা সুদ খায়- তারা (দুনিয়া ও আখেরাতের কোথাও) মাথা উচু করে) দাঁড়াতে পারবে না, (দাঁড়ালেও) তার দাঁড়ানো হবে সে ব্যক্তির মতো যাকে শয়তান নিজস্ব পরশ দিয়ে (দুনিয়ার লোভ লালসায়) মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে- তারা যেহেতু বললো ব্যবসা বাণিজ্যেতো সূদের মতোই (একটা কাবারের নাম, মূলত এ দুটো জিনিস কখনো এক না) আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল করেছেন এবং সূদকে করেছেন হারাম[৪৪৭], তাই (আজ থেকে) তোমাদের যার যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে (সূদের হারাম হওয়ার) এ বাণী

পৌঁছেছে সে অবশ্যই সূদের কারবার থেকে বিরত থাকবে। এই আদেশ আসার আগ পর্যন্ত আগে যা সূদ সে খেয়েছে তা হবে তার জন্যে পেছনের ঘটনা মাত্র। (আল্লাহ তাকে তার জন্যে পাকড়াও করবে না) তার ব্যাপারে ফয়সালা আল্লাহর ওপরই থাকবে কিন্তু (এরপর) যে ব্যক্তি (আবার) সূদী কারবারে ফিরে এসেছে সে অবশই হবে একজন জাহান্নামের আগুনের অধিবাসী, সেই জাহান্নাম হবে তার চিরন্তন আবাস।[৪৪৮]

২৭৬. আল্লাহ তায়ালা (সূদের ওপর অভিশম্পাত নাযিল করেন-) তিনি সূদী কারবারকে যাবতীয় অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করেন, অপর দিকে দান সদকার পবিত্র কাজকে তিনি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেন[৪৪৯], আল্লাহ তায়ালা (তার প্রদত্ব সম্পদের প্রতি) অকৃতজ্ঞ পাপীষ্ট ব্যক্তিদের কখনো পছন্দ করেন না।[৪৫০]

২৭৭. তবে যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তায়ালা ও (তার প্রদত্ত ব্যবস্থার ওপর) ঈমান এনেছে এবং (সে ঈমানের দাবী মোতাবেক) দুনিয়ায় ভালো কাজ করেছে, (ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে) নামায প্রতিষ্ঠা করেছে, যাকাত আদায় করেছে, তাদের কোনো ভয় আশংকা ও চিন্তার কারণ নাই[৪৫১] . (কারণ তাদের যাবতীয় পাওনাই তাদের মালিকের দরবারে সুরক্ষিত আছে)।

২৭৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা (সূদের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করো, আগের সূদী কারবারের যে সব বকেয়া আছে তা তোমরা ছেড়ে দাও, যদি সত্যিই তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকো![৪৫২] (তাহলে এতোটুকু কোরবানী তোমাদের স্বীকার করতেই হবে)।

২৭৯. যদি তোমরা এমনটি না করো- তাহলে জেনে রাখো আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে রয়েছে যুদ্ধের ঘোষণা! (সাহস থাকলে এই যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয়ে নাও) আর যদি এখনো তোমরা (আগের সূদী বকেয়া ছেড়ে দিয়ে) আল্লাহর দিকে ফিরে আসো তাহলে তোমরা তোমাদের মূলধন ফিরে পাবার অধিকারী হবে। (সূদী কারবার করে) অন্যের ওপর যুলুম করো না-(একই অবস্থায়) তোমাদের ওপরও কাউকে (এই সুদের) যুলুম চালাতে দিয়োনা।[৪৫৩]

২৮০. ঋণ গ্রহীতা ব্যক্তি কখনো যদি (খুব বেশী) অভাব গ্রস্থ হয়ে পড়ে তাহলে (ঋণ আদায়ের জন্যে তার ওপর চাপ দিয়ো না বরং) তার স্বচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও আর যদি গোটা পাওনার অংকই মাফ করে দাও তাহলে তা হবে তোমাদের জন্যে অতি উত্তম কাজ। যদি তোমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারো![৪৫৪]

২৮১. সে দিনটিকে ভয় করো- যেদিন তোমাদের সবাই (এই জীবনের শেষে) আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে, সেদিন প্রত্যেকটি মানব সন্তান (জীবন ভর) যা পাপ পূন্য কামাই করেছে, তার পুরোপুরি ফলাফল পেয়ে যাবে, এবং (শাস্তি ও পুরস্কার দেয়ার ব্যাপারে) কারো ওপর সেদিন কোনো ধরনের যুলুম করা হবে না।[৪৫৫]

৪৪৬. এ যাবৎ খয়রাত, তার ফযীলত এবং সীমা-শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর যেহেতু খয়রাত করা দ্বারা একদিকে কাজ কারবার সহজভাবে আঞ্জাম দেয়ার অভ্যাস গড়ে উঠে, অভদ্রতা ও কঠোর খারাব দিক মনে বদ্ধমূল হয়, অপরদিকে মোয়ামালা ও কাজ কারবারে যে গুণাহ্ হয়, খয়রাত দ্বারা তার কাফফারা হয়ে যায়। উপরন্তু খয়রাত করা দ্বারা স্বভাব-চরিত্র, কল্যাণ চিন্তা ও মানুষের উপকার সাধনে তরক্কী হয়। এ কারণে উপরের কয়েকটি আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূদ গ্রহণ করা যেহেতু খয়রাতের বিপরীত। খয়রাতে ছিলো ভদ্রতা ও কল্যাণ সাধন, কিন্তু সূদে আছে অভদ্রতা, অকল্যাণ ও যুলুম। একারণে খয়রাতের ফযীলতের পর সূদের নিন্দা এবং নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা ছিলো স্বাভাবিক। খয়রাতে যে পরিমাণ কল্যাণ রয়েছে, সূদে তত পরিমাণ অকল্যাণ থাকাই স্বাভাবিক।

৪৪৭. অর্থাৎ যারা 'রিবা' সূদ খায়, কেয়ামতের দিন তারা এমনভাবে কবর থেকে উঠবে, যেমন ভূতে পাওয়া ও পাগল লোক। তাদের এ অবস্থা হবে এ জন্য যে, তারা হালাল হারামকে একাকার করেছে। উভয়টার মধ্যেই যেহেতু মুনাফা কাম্য, তাই দুটাকেই হালাল বলেছে। অথচ ব্যবসা এবং সুদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ব্যবসায়'কে হালাল করেছে আর সূদকে করেছেন হারাম।

কেনা-বেচায় যে মুনাফা হয়, তা হয় মালের বিনিময়ে। যেমন, কেউ এক দিরহাম মূল্যের কাপড় দু দিরহামে বিক্রী করলো। আর সুদ হচ্ছে তাই, যেখানে কোন বিনিময় ছাড়াই মুনাফা হয়। যেমন, এক দিরহাম দিয়ে দুই দিরহাম খরীদ করা। প্রথম অবস্থায় যেহেতু কাপড় এবং দিরহাম দুটি ভিন্ন ধরণের জিনিস এবং প্রত্যেকটির মুনাফা ও লক্ষ্য অপরটি থেকে ভিন্ন। তাই সেখানে বাস্তবে সমান সমান করা অসম্ভব। বেচা-কেনার প্রয়োজনে-নিজের প্রয়োজন এবং চাহিদার বিষয়টি ছাড়া অন্য কিছুই সেখানে মুখ্য হতে পারেনা। প্রত্যেকের প্রয়োজন এবং চাহিদা অপর থেকে একান্ত ভিন্ন হয়ে থাকে। কারো এক দিরহামের এতটা প্রয়োজন পড়ে যে, দুশ টাকা দামের কাপড়েরও এতটা প্রয়োজন পড়েনা। আর কারো একটা কাপড়ের এতটা প্রয়োজন হয়, বাজারে যার মূল্য এক দিরহাম। এ এক দিরহাম মূল্যের কাপড় তার কাছে দশ দিরহামের চেয়েও বেশী। এ এক দিরহাম মূল্যের কাপড় খানা কেউ দশ দিরহাম মূল্যে ক্রয় করলে, বা প্রয়োজন এবং তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেই যে, কেউ এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খরীদ করলেও তাতে সুদ অর্থাৎ বিনিময় মুক্ত মুনাফা হবেনা। কারণ, বাস্তব পক্ষে মূল্যে সমান সমান করা সম্ভব নয়। একমাত্র প্রয়োজন এবং চাহিদা দ্বারাই এটা পরিমাপ করা যেতে পারে। আর প্রয়োজন ও চাহিদায় রয়েছে বিরাট ব্যবধান। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সূদ কিভাবে নিরূপীত হবে? কিন্তু দু দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রী করলে সে ক্ষেত্রে বাস্তবে সমান সমান করা সম্ভব। এক্ষেত্রে এক দিরহাম হবে এক দিরহামের বিনিময়, অপর দিরহামটি বিনিময়হীন হয়ে সূদ হবে। ফলে শরীয়ত মতে এ কাজ-কারবার হবে হারাম।

৪৪৮. অর্থাৎ সূদ হারাম করার আগে তোমরা যে সূদ গ্রহণ করেছ, দুনিয়াতে তা মালিকের কাছে ফেরৎ দেয়ার হুকুম দেয়া যায়না অর্থাৎ তার কাছ থেকে তা দাবী করার অধিকার তোমাদের নেই। আর আখেরাতে আল্লাহ তায়ালার এখতিয়ার রয়েছে। ইচ্ছা করলে আপন রহমতে তাকে মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু সূদ হারাম করার পরও কেউ যদি ফিরে না আসে, বরং নিয়মিত সূদ গ্রহণ করেই যায়, তবে সে হবে জাহান্নামী। আল্লাহ তায়ালার হুকুমের সম্মুখে নিজের বুদ্ধি মতো প্রমাণ উপস্থাপনকারীর শাস্তি কি হবে, তা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৪৯. আল্লাহ সূদের মালকে নিশ্চিহ্ন করেন অর্থাৎ তাতে বরকত হয়না, বরং আসল মালও নষ্ট হয়ে যায়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, সূদের অর্থ যতই বর্ধিত হোক না কেন, তার পরিণতি হবে দারিদ্র্য। আর খয়রাতের মাল বৃদ্ধি করার অর্থ সেই মালে তরক্কী হয়, বরকত দেন আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহ তায়ালা তার সওয়াব বৃদ্ধি করেন।

৪৫০. অর্থ এই যে, সূদ গ্রহীতা বিত্তবান হয়ে এতটুকুও করেনি যে, অভাবীকে বিনা সূদে ঋণ দেবে। অথচ তার উচিৎ ছিলো-অভাবীকে দান করে দেয়া। আল্লাহর নেয়ামতের এর চেয়ে বড় না শুকরী কি হবে?

৪৫১. এ আয়াতে সূদ গহীতার বিপরীতে ঈমানদারদের গুণাবলী এবং তাদের ইনাম সম্পর্কে বলা হয়েছে। এটা সূদ খোরের গুণাবলী এবং তার অবস্থার পরিপন্থী। এ দ্বারা সূদখোরের নিন্দা-অবজ্ঞা ভালোভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

৪৫২. অর্থাৎ তোমরা নিষিদ্ধ হওয়ার আগে যে সূদ গ্রহণ করেছ, তাতো হয়ে গিয়েছে। নিষিদ্ধ করার পর সূদ কখনো দাবী করবেনা।

৪৫৩. অর্থাৎ তোমরা আগে যে সূদ নিয়েছ, এখন তা মূল মালের সঙ্গে হিসাব করে কেটে নিলে তা হবে তোমাদের ওপর যুলুম। আর নিষিদ্ধ হওয়ার পর তোমরা বর্ধিত টাকা দাবী করলে এটা হবে তোমাদের যুলুম।

৪৫৪. অর্থাৎ সূদ যখন হারাম করা হয়েছে, তার লেন-দেন রহিত করা হয়েছে, তখন নিঃস্ব ঋণ গৃহীতার কাছে তা কোনমতেই দাবী করবেনা। বরং নিঃস্ব ব্যক্তিকে অবকাশ দেবে, সম্ভব হলে মাফ করে দেবে।

৪৫৫. অর্থাৎ কেয়ামতের দিন সমস্ত আমলের পুরস্কার-তিরস্কার লাভ করবে। এখন সকলের উচিৎ হচ্ছে নিজ নিজ চিন্তা করা, ভালো কাজ করবে, না খারাব কাজ। সূদ গ্রহণ করবে, না দান করে দিবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ

إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ

كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا

عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ

وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ

ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ

أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟

شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ

فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن

تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ

ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ

صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ

ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ أَن

تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ط وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ص

وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۵ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ

فُسُوْقٌ بِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا

كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ط فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ط

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ط وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ

قَلْبُهٗ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٣﴾ ع

রুকু ৩৯

২৮২. হে আমার ঈমানদার লোকেরা, যখনি তোমরা পরস্পরের সাথে নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্যে ঋণের চুক্তি করো তখন অবশ্যই তা লিখে রাখবে। তোমাদের মধ্যকার যে কোনো একজন লেখক সুবিচারের ভিত্তিতে (উভয়ের মাঝে সম্পাদিত এই দলিল) লিখে দেবে, যাকে আল্লাহ পাক লেখার যোগ্যতা দিয়েছেন তার কখনো লেখার কাজে অস্বীকৃতি জানানো ঠিক নয়, (যখনি তাকে অনুরোধ করা হোক তখনি) তার লিখে দেয়া উচিৎ। দলিল লিখার সময় ঋণ গ্রহীতা (লেখককে) বলে দেবে কি (কি শর্ত) লিখতে হবে। এ পর্যায়ে (লেখখকে) অবশ্যই আল্লাহর ভয় করে চলা উচিৎ (চুক্তি নামায় যেসব কথাবার্তা সিদ্ধান্ত হবে লেখার সময় তার) কিছুই যেন বাদ না পড়ে।[৪৫৬] যদি ঋণ গ্রহীতা অজ্ঞ মূর্খ হয়, এবং (সব দিক থেকে) হয় দূর্বল- অথবা (চুক্তি নামার কথাবার্তা বলে দেয়ার) ক্ষমতাই তার না

থাকে তাহলে তার পক্ষ থেকে কোনো অভিভাবক ন্যায়ানুগ পন্থা বলে দেবে, কি কি লিখতে হবে।[৪৫৭] (শুধু এর ওপরই নির্ভর করা চলবে না) তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন পুরুষকে (এই চুক্তিপত্রে) সাক্ষী বানিয়ে নিয়ো, যদি দুইজন পুরুষ (একত্রে) পাওয়া না যায় তাহলে একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলাকে সাক্ষী বানাবে- যদি এই মহিলাদের একজন ভুলে যায় দ্বিতীয় জন তাকে মনে করিয়ে দিতে পারবে[৪৫৮] (এসব সাক্ষী বাছাই করনের সময় এমন সব লোকদের মধ্য থেকে তাদের নিতে হবে) যাদের সাক্ষী তোমাদের (উভয় পক্ষের কাছেই) গ্রহণীয় হবে। (সাক্ষীদেরও মনে রাখতে হবে যে) যখনি তাদের সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে ডাকা হবে তখন তারা তা অস্বীকার করবে না, (লেন দেনের সময়) পরিমাণ ছোট হোক কিংবা বড়ো হোক দিন ক্ষণ সহ তা লিখে রাখার ব্যাপারে অবহেলা করো না। (এই লিখে রাখাটা) আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় এবং পরবর্তি কালে কোনো সন্দেহ সংশয় দেখা দিলে তা দূর করাও এতে সহজ হয়[৪৫৯] এবং (সমগ্র বিষয়টি লিখিত থাকার কারণে)সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করাও নিশ্চিত হয়। সে সব লেন দেনের সময় যা তোমরা নগদ হাতে হাতে আদান প্রদান করো তা সব সময় না লিখলেও তোমাদের কানো ক্ষতি নেই তবে ব্যবসায়িক লেনদেন (কিংবা চুক্তি সম্পাদনের) সময় অবশ্যই সাক্ষী হাযির রাখবে। দলিলের লেখক ও চুক্তিনামার স্বাক্ষীদের কখনো কষ্ট দেয়া যাবে না[৪৬০], (কারণ তাদের সব কথা সব সময় সবার পক্ষে যাবে না) তারপরও তোমরা যদি তাদের এ ধরনের যাতনা প্রদান করো তাহলে (জেনে রেখো) তা হবে একটি মারাত্মক গুনাহ, এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে (ও তার কঠোর শাস্তিকে) ভয় করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সব কিছুই শিখিয়ে দিচ্ছেন, কোথায় তোমরা কি করো তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা জানেন।

২৮৩. আর যদি তোমরা কখনো সফরে থাকো- এবং (পথে ঘাটে থাকার কারণে ঋণ চুক্তি) লেখার মতো কোনো লেখক না পাও তাহলে (চুক্তি লেখার বদলে) কোনো জিনিস বন্দক রেখে দাও যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোনো বন্দকী জিনিসের ব্যাপারে বিশ্বাস করে এমতাবস্থায় যে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা হয়েছে তার উচিত আমানতদারের সেই আমানত যথাযথ ফেরৎ দেয়া- এবং (এই ব্যাপারে তার মালিক) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা, তোমরা কখনো সাক্ষ্য গোপন করো না, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন করে- সে অবশ্যই অন্তরের দিক থেকে হয় পাপিষ্ট ব্যক্তি। বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের ব্যাপারেই সম্যক অবগত রয়েছেন।[৪৬১]

---

৪৫৬. প্রথমে সদকা-খয়রাতের ফযীলত এবং তার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এর পর রিবা, তা নিষিদ্ধ করন এবং খারাব দিক বর্ণিত হয়েছে। আর এখন বলা হচ্ছে সেসব কাজ কারবার সম্পর্কে, যাতে ঋণ থাকে এবং ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে ফেরৎ দেয়ার প্রতিশ্রুতি থাকে। এ সম্পর্কে জানান হয়েছে, যে, এমন কাজ-কারবার জায়েয। কিন্তু যেহেতু কাজটা হয় আগামীতে কোন এক সময়ের জন্য। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ভূল-ভ্রান্তি

এবং বিবাদ-বিরোধের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এমন ব্যবস্থা করা উচিৎ, যাতে ভবিষ্যতে কোন সমস্যা এবং বিরোধ দেখা না দেয়। এর সূরত এ হতে পারে যে, একটা কাগজে লিখে নিবে। এতে সময় নির্ধারিত থাকবে। তাতে উভয় পক্ষের নামধাম এবং বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে। সব কিছু খোলাখুলি ভাবে উল্লেখ করবে। লেখকের উচিৎ নির্দ্বিধায় শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ইনসাফে ত্রুটি না করা। ঋণ গ্রহীতার নিজহাতে লেখাই ভালো। অথবা লেখককে মুখে মুখে বলে লেখায়ে নিতে পারে। অপরের ব্যাপারে সামান্য ক্ষতিও করবেনা।

৪৫৭. অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ, সাদাসিধে বা অক্ষম-দুর্বল হয়, যেমন শিশু বা অতিবৃদ্ধ. ব্যাপারটি বুঝার মত বুদ্ধিই যার নাই, অথবা লেখককে বুঝিয়ে বলতে পারেনা, এমতাবস্থায় ঋণ গ্রহীতার উকীল ওয়ারিস এবং কার্য সম্পাদনকারীর কর্তব্য হচ্ছে কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি না করে ইনসাফের সঙ্গে বিষয়টি লেখায়ে দেয়া।

৪৫৮. আর তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে এ ব্যাপারে ন্যূনপক্ষে দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ দুজন মহিলাকে সাক্ষী করা। আর সাক্ষীকে হতে হবে তার পসন্দযোগ্য অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত।

৪৫৯. অর্থাৎ সাক্ষীকে সাক্ষ্যদান বা সাক্ষী করার জন্য ডাকা হলে তার অস্বীকার করা উচিৎ নয়। তার অসর্তকতা এবং গড়িমসি করাও ঠিক নয়। লেখার ব্যাপারেও সাক্ষীর পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে। ছোট-বড় কোন বিষয়ই বাদ দেয়া যাবেনা। এর ফলে ভুল-ত্রুটি এবং কারো অধিকার হরণ হবেনা।

৪৬০. অর্থাৎ যদি হাতে হাতে কাজ-কারবারের ব্যাপার হয়, পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বা নগদ লেন-দেন হয়, বাকী কাজ-কারবার না হয়, তখন না লিখলে গুনাহ হবেনা; কিন্তু তখনো সাক্ষী করতে হবে, যাতে এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে কোন বিরোধ দেখা দিলে কাজে আসে। লেখক এবং সাক্ষী কোন ক্ষতি করবেনা অর্থাৎ বাদী-বিবাদীর মধ্যে কারো ক্ষতি করবেনা, বরং অবশ্য পালনীয় কর্তব্য পালন করবে।

৪৬১. অর্থাৎ সফর অবস্থায় যদি ঋণ বা বাকীতে কাজ-কারবার কর এবং দলীল-দস্তাবেজের জন্য লেখক পাওয়া না যায়, তখন ঋণের বিনিময়ে ঋণ দাতার কাছে কোন জিনিষ বন্ধক রাখতে হবে।

বন্ধক রাখার প্রয়োজন সফরে বেশী দেখা দেয়। কারণ, সফর ছাড়া অন্য সময়ে লেখক এবং সাক্ষী সহজে পাওয়া যায়। ফলে ঋণদাতা চিন্তামুক্ত থাকে। একারণে সফরে বন্ধক রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সফর ছাড়া কোন সময়ের লেখকের উপস্থিতিতেও বন্ধক রাখা জায়েয বলে হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে। ঋণ গ্রহীতার ওপর যদি ঋণদাতার আস্থা থাকে, তাকে বিশ্বাস করে বন্ধক দাবী না করে, তখন ঋণগ্রহীতার উচিৎ ঋণদাতার সমস্ত হক পূরাপূরি আদায় করা এবং আল্লাহকে ভয় করা, আমানতদারী-বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করা।

لِلّٰهِ مَا فِي

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ

اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ

يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ

وَرُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَقَالُوْا

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا

مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ

مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا

بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا وقفه وَاغْفِرْ لَنَا وقفه وَارْحَمْنَا وقفه

أَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

রুকু ৪০

২৮৪. এই আসমান জমীনের যেখানে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তায়ালার- (এই পরাক্রমশালী সার্বভৌমত্বের মালিকের সামনে) তোমরা তোমাদের মনের ভেতরকার সব পরিকল্পনা ও অভিসন্ধির কথা বলো আর না বলো (তাতে কিছুই আসে যায় না) আল্লাহ (একদিন) তোমাদের কাছ থেকে এর পুরোপুরি হিসাব গ্রহণ করবেন। এরপর তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেবেন আবার যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি শাস্তি দেবেন। (এটা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব ইখতিয়ার) আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।[৪৬২]

২৮৫. আল্লাহর রসূল সেই বিষয়ের ওপরই ঈমান এনেছে, যা তার ওপর তার মালিকের পক্ষ নাযিল করা হয়েছে- আর যারা রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাও সবাই সেই একই বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে। এদের সবাই (একই বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে) ঈমান এনেছে, আল্লাহর ওপর, তার ফেরেস্তাদের ওপর, তার (পাঠানো) কেতাবের ওপর তার (মনোনীত) রসূলদের ওপর, (তারা আরো বলে যে,) আমরা আল্লাহর পাঠানো নবী রসূলদের মাঝে কোনো রকম পার্থক্য করি না, আমরা তো (আল্লাহর নির্দেশ) শুনেছি এবং (নিজেদের জীবনে তা) মেনেও নিয়েছি। হে আমাদের মালিক, আমরা তোমার ক্ষমা চাই। (আমরা জানি) আমাদের একদিন তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে।[৪৬৩]

২৮৬. আল্লাহ তায়ালা কখনো (তার সৃষ্টি করা) কোনো প্রাণীর ওপরই তার শক্তি সামর্থের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না, সে ব্যক্তির জন্যে ততোটুকুই (পুরস্কার) রয়েছে যতোটুকু (কাজ) সে (এ দুনিয়ায়) সম্পন্ন করেছে, আবার পাপের শাস্তিও তার ওপর ততোটুকু পড়বে যতোটুকু পরিমাণ অন্যায় সে (এই দুনিয়ায়) করে এসেছে, হে মুমিন ব্যক্তিরা এই বলে তোমরা দোয়া করো) হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কিছু ভুলে যাই, জীবনে চলার পথে কোথায়ও যদি আমরা কোনো ভুল করে বসি, তার জন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পূর্ববর্তি জাতিসমূহের ওপর যে ধরনের বোঝা তুমি চাপিয়েছিলে, তা আমাদের ওপরও চাপিয়ো না, হে আমাদের মালিক- যে বোঝা বইবার শক্তি সামর্থ আমাদের নেই, তা তুমি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না, তুমি আমাদের ওপর মেহেরবানী করো, আমাদের তুমি মাফ করে দাও, আমাদের ওপর তুমি দয়া করো, তুমিই আমাদের (একমাত্র) আশ্রয় দাতা বন্ধু, অবিশ্বাসী কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।[৪৬৪]

৪৬২. বর্তমান সূরায় ইবাদাত-মোয়ামালাতের মূলনীতি ও খুঁটিনাটি এবং জান-মালের বিষয়ে অনেক বিধানের আলোচনা হয়েছে। সম্ভবতঃ একারণেই সূরাটিকে 'সেনামুল কুরআন' বা কোরআনের শীর্ষদেশ বলা হয়েছে। এ কারণে উচিৎ আমানতকারী বান্দাদেরকে সব রকম তাকীদ করা, সব বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া, যাতে উপরোক্ত বিধি-বিধান পালনে অবহেলা-অমনোযোগিতা থেকে বিরত থাকা যায়। এ উদ্দেশ্যে সূরার শেষের দিকে বিধান বর্ণনা করে আয়াতটিকে সতর্কবাণী হিসাবে উল্লেখ করে উপরোক্ত সকল বিধান মেনে চলতে সকলকে বাধ্য করা হয়েছে। বিবাহ-তালাক, কিসাস-যাকাত, বাই'-রিবা ইত্যাদিতে অধিকাংশ লোক নানা প্রকার হিল্লা আর নিজেদের মনগড়া কলা-কৌশল অবলম্বন করে না-জায়েযকে জায়েয করার ব্যাপারে নিজেদের মর্জী এবং সীনাজুরী কাজে লাগায়। এখানে তাদেরকেও পূর্ণরূপে সতর্ক করা হয়েছে। আমাদের ইবাদাত পাওয়ার অধিকার যাঁর আছে, তাঁকে মালিক হতে হবে। যিনি আমাদের যাহেরী-বাতেনী সব বিষয়ের হিসাব নেবেন, সব বিষয়ে তাঁর জ্ঞান থাকা জরুরী। যিনি আমাদের সব কিছুর হিসাব গ্রহণ করতে পারবেন, সকলকে শাস্তি বা শান্তি দিতে পারবেন, সব কিছুর ওপর তাঁর অসীম ক্ষমতা থাকতে হবে। সুতরাং এ তিনটি পরিপূর্ণতা অর্থাৎ মালিক হওয়া, জ্ঞান থাকা এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। 'আয়াতুল কুরসীতে'ও এ সম্পর্কে বলা হয়েছিল। মোদ্দা কথা এই যে, মহান আল্লাহর পুত-পবিত্র স্বত্বা সব কিছুর মালিক, সব কিছুর শ্রষ্টা। তাঁর জ্ঞান সব কিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে। তাঁর ক্ষমতা সর্বব্যাপক। সুতরাং গোপন-প্রকাশ্য কোন কাজে তাঁর নাফরমানী করে বান্দাহ কেমন করে মুক্তি পেতে পারে?

৪৬৩. প্রথম আয়াত থেকে যখন জানা যায় যে, মনের চিন্তার ওপরও হিসাব এবং পাকড়াও হবে, এতে সাহাবায়ে কেরাম ভীত-শংকিত হয়ে পড়েন। তাঁরা এতটা ব্যথিত হন, যা অন্য কোন আয়াতে হননি। এব্যাপারে রসূলের কাছে উদ্বেগের কথা বললে তিনি বলেন, তোমরা বল আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। অর্থাৎ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মেনে নেয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ইতস্ততও করবেনা। প্রশান্ত মনে বলে দাও আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। তোমার হুকুম তামীল করেছি। মনের স্বস্তির সঙ্গে তাঁদের যবান থেকে এবাক্য নিসৃত হয়ে পড়ে অতর্কিতে। এর তাৎপর্য এ যে, আমরা ঈমান এনেছি এবং আল্লাহর হুকুম তামীল করেছি অর্থাৎ আমাদের অসুবিধা-দুশ্চিন্তা সব কিছু ত্যাগ করে হুকুম তামীলে তৎপরতা এবং তাৎক্ষণিক প্রস্তুতি প্রকাশ করেছি। তাঁদের এ কাজটি আল্লাহ তায়ালার পসন্দ হলে আয়াত দুইটি নাযিল হয়। প্রথম আয়াতে রাসূলে করীম এবং তাঁর পরে সাহাবায়ে কেরাম-যাদের সম্মুখে উপরোক্ত অসুবিধা উপস্থিত হয়েছিল-আল্লাহ তায়ালা তাদের ঈমানের বিস্তর প্রশংসা করেছেন। এর ফলে তাঁদের শান্তি পরিতৃপ্তি লাভ করে এবং আগের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-দুশ্চিন্তা বিদূরীত হয়। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয় যে, কাকেও সাধ্যের অতীত কষ্ট দেয়া হয়না। কেউ যদি মনে গুণাহর ভাব বা শংকা

অনুভব করে, কিন্তু তা কাজে পরিণত করেনা, তখন তার কোন গুণাহ্ হবেনা। ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করা হবে। মোট কথা, স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব কাজ থেকে বিরত থাকা সাধ্যের অতীত, যেমন খারাব কাজের চিন্তা-শংকা, ত্রুটি-বিচ্যুতি-এসবের জন্য পাকড়াও করা হবেনা। অবশ্য যেসব কাজ বান্দাহ্র ইচ্ছা-এখতিয়ারে রয়েছে। সেগুলোর জন্য পাকড়াও করা হবে। আগের আয়াতগুলো শুনে যে দুঃখ হয়েছিল বিগত নিয়ম অনুযায়ী তারা তাঁর অর্থও গ্রহণ করতে হবে। হয়েছেও তাই। ফলে আগের দুশ্চিন্তা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছে। সুবহানাল্লাহ।

তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কাকেও পৃথক করেনা অর্থাৎ ইহুদী-নাসারাদের মত করেনা যে, কোন পয়গম্বরকে মানলো, আর কোন পয়গম্বরকে মানলো না।

৪৬৪. প্রথম আয়াতে সাহাবায়ে কেরামদের অনেক অস্থিরতা দেখা দিলে তাঁহাদের শান্তনার জন্য এ দুটি আয়াত নাযিল হয়। এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত নাযিল করে এমন শান্তনা তাদের দেয়া হয় যে, কোন কষ্ট-কঠোরতার কোন আশংকাই আর অবশিষ্ট রাখেননি। কারণ, আমাদেরকে যেসব দোয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, নিঃসন্দেহে আমাদের ওপর তোমার সব রকমের কর্তত্ব এবং ইবাদত লাভের অধিকার রয়েছে। কিন্তু হে আমাদের পরওয়ার দেগার! আমাদের জন্য এমন নির্দেশ হোক, যা পালন করতে আমাদের কষ্ট এবং অসুবিধা না হয়। ভূল-ত্রুটির জন্য আমরা যাতে ধরা না পড়ি। অতীত উম্মতের মতো আমাদের ওপরে যাতে কঠোর নির্দেশ না আসে। আমাদের সাধ্যের অতীতে কোন হুকুম যাতে আমাদের ওপরে আপতিত না হয়। এত সহজ করার পরও আমাদের দ্বারা যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, তা ক্ষমা করে আমাদের ওপর করুণা বর্ষন কর। হাদীস শরীফে আছে যে, এ সব দোয়াই কবুল করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে যে অসুবিধা দেখা দিয়েছিল, আল্লাহার রহমতে সেসব থেকে আমরা যখন নিরাপত্তা লাভ করেছি, এখন এতটুকুও হওয়া দরকার যে, কাফেরদের ওপর আমাদেরকে বিজয়-প্রতিপত্তি দান করা হোক। অন্যথায় তাদের পক্ষ থেকে নানা প্রকার বিপত্তি এবং দ্বীন-দুনিয়ার নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে এবং আল্লাহর ফযলে যেসব অসুবিধা থেকে প্রাণ রক্ষা করা হয়েছিল করে, কাফেরদের বিজয়ের ফলে সেসব খটকা পুনরায় অশান্তি-অস্থিরতার কারণ হয়ে যেন দেখা না দেয়।

সূরা আলে ইমরান

সূরা নম্বর ঃ ৩, আয়াত সংখ্যা ২০০, রুকু সংখ্যা ২০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓ ۝١ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝٢ نَزَّلَ

عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ

التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝٣ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ

وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۬ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ

عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝٤ اِنَّ اللّٰهَ

لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ؕ ۝٥

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ

اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٦ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ

الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ

مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ

مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ
آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو
الْأَلْبَابِ ۝٧ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝٨
رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝٩

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকু ১

১. আলিফ-লাম-মীম। ২. মহান আল্লাহ তায়ালা-তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি চিরস্থায়ী।[১]

৩. তিনি তোমার ওপর এই মহান কিতাব নাযিল করেছেন (এই গ্রন্থ এসেছে) সত্য বাণী নিয়ে[২], যা তোমার আগে নাযিলকৃত যাবতীয় (আসমানী) কিতাবের সত্যতাকে স্বীকার করে, আল্লাহ তায়ালা তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছেন। ৪. মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে[৩] ইতিপূর্বেও (আল্লাহ তায়ালা এভাবে কিতাব নাযিল করেছেন) তিনি হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করার মানদন্ড হিসেবে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন[৪], (এসব হিদায়াত সম্বলিত গ্রন্থ আগমনের পরও) যারা আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করবে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তির বিধান। আল্লাহ তাআলা (যেমনি) অসীম ক্ষমতার মালিক, (তেমনি) তিনি (সব রকমের বিদ্রোহের) চরম প্রতিশোধও গ্রহণ করে থাকেন।[৫] ৫. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার কাছে আকাশমালা ও ভূমন্ডলের কোনো (ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র) তথ্যও গোপন নেই।[৬] ৬. তিনিই-তো সেই মহান সত্তা যিনি (এই ভূমন্ডলে পা রাখার আগেই) মায়ের পেটে তার ইচ্ছে মতো তোমাদের আকৃতি

গঠন করেছেন। (সত্য কথা হচ্ছে) আল্লাহ তাআলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই, তিনি প্রচন্ড ক্ষমতাশালী এবং প্রবল প্রজ্ঞাময়।[৭] ৭. তিনিই সেই মহান সত্বা যিনি তোমার ওপর এই কিতাব নাযিল করেছেন, (সেখানে রয়েছে দু'ধরনের আয়াত) এর কিছু আয়াত হচ্ছে, সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন (যা পাঠ করেই এর মর্মোদ্ধার করা যায়, আর) এগুলোই হচ্ছে কিতাবের মৌলিক অংশ। (এ ছাড়া) বাকী আয়াতগুলো হচ্ছে রূপক (বর্ণনায় বর্ণিত, যার উদ্দেশ্য সরাসরি না বলে ঘটনা, উদাহরণ কিংবা অন্য কোনো ভাবে পেশ করা হয়েছে। মানুষদের মাঝে) যাদের অন্তরে (নানা ধরনের) কুটিলতা রয়েছে, অরা (হামেশাই সমাজে) নানা ধরনের ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহর কিতাবের অপব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এসব রূপক আয়াতেরই অনুসরণ করে বেড়ায়। (অথচ) এসব (রূপক) বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না, (আল্লাহর জ্ঞানে-জ্ঞানী, ব্যক্তিরা (এসব আয়াতের ব্যাখ্যার পেছনে সময় ব্যয় না করে সব সময়ই) বলে, আমরা তো এর সবটুকুর ওপরই ঈমান এনেছি, এই (উভয় ধরনের আয়াত) তো আমাদের মালিকের পক্ষ থেকেই (আমাদের দেয়া হয়েছে, সত্য কথা হচ্ছে (আল্লাহর হিদায়াত থেকে) প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোকেরাই কেবল শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।[৮] ৮. (তারা আরো বলে) হে আমাদের মালিক (একবার) যখন তুমি আমাদের সঠিক পথের দিশা দিয়েছো (তখন আর) আমাদের মনে কোনোরূপ কুটিলতা (ঢুকতে) দিয়ো না। তোমার দয়ার (ভান্ডার) থেকে আমাদের প্রতিও কিছু দয়া করো কারণ যাবতীয় দয়াও করুণার মালিক তো তুমিই।[৯] ৯. হে আমাদের মালিক তুমি একদিন অবশ্যই সমগ্র মানব জাতিকে তোমার সামনে (হিসাব নিকাশ বুঝে নেয়ার জন্য) একত্রিত করবে, এতে কোন রকম সন্দেহ নেই। আল্লাহ তাআলা (তো) কখনোই কোনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।[১০]

---

১. নাজরানের খৃস্টানদের ৬০ জনের একটা সম্মানিত প্রতিনিধি দল মহানবী (সঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। এদের মধ্যে ৩ জন ছিলো অত্যন্ত প্রশিদ্ধঃ আব্দুল মসীহ আকেব নেতা কর্তা ব্যক্তি হিসাবে, আইসাম সাইয়্যেদ প্রজ্ঞা-বুদ্ধিমত্তা হিসেবে এবং আবু হারেসা ইবনে আলকামা বড় ধর্মীয় আলেম এবং লাট পাদ্রী হিসাবে খ্যাত ছিলো। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলো মূলতঃ আরবের মশহুর কবীলা বনু বিকর ইবনে ওয়ায়েল-এর লোক। পরে সে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। বার জন রোম সম্রাট তার ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও মান-মর্যাদার বিষয় বিবেচনা করে তাকে সম্মান করে, বিপুল পরিমাণ আর্থিক সাহায্য ছাড়াও তারা তার গীর্জা নির্মাণ করে দেয়। ধর্মীয় বিষয়ে তাকে উচ্চপদে স্থান দেয়। প্রতিনিধি দলটি অত্যন্ত জাঁক-জমকের সাথে মহানবীর খেদমতে হাযির হয় এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করে।

মহানবীর জীবন-চরিত্র লেখক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রসূলের জীবনী গ্রন্থ 'সীরাতে মোহাম্মদ বিন ইসহাক'-এ আলোচনা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। সূরা আলে ইমরান-এর প্রথম দিকের প্রায় ৮০-৯০ আয়াত এ ঘটনা প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। খৃষ্টানদের

মৌলিক আকীদা ছিলো যে, হযরত ঈসা (আঃ) অবিকল খোদা বা খোদার পূত্র বা তিন খোদার একজন। এই সূরার প্রথম আয়াতে খালেছ তাওহীদের শিক্ষা পেশ করে আল্লাহর 'চিরজীব ও চিরন্তন' একটা গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনের এ ঘোষণা খৃষ্টানদের এই দাবীর অসারতা প্রতিপন্ন করে, তাকে একেবারেই উড়ায়ে দেয়। মহানবী (সঃ) মুনাযারা কালে বিতর্কের সময় তাদেরকে বলেন, তোমরা কি জাননা যে, আল্লাহ্ তায়ালা চিরজীব তিনি চিরন্তন। মৃত্যু তাকে কখনো আচ্ছন্ন করতে পারেনা। তিনিই গোটা সৃষ্ট লোককে অস্তিত্ব দান করেছেন, বেঁচে থাকার উপায়-উপকরণ দ্বারা তার অসীম ক্ষমতাবলে সব কিছুকে শামাল দিয়ে রেখেছেন। ঠিক এর বিপরীত ঈসা (আঃ) নিঃসন্দেহে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন, ধ্বংস হবেন। আর এটা স্পষ্ট যে, যে স্বয়ং নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেনা, সে অপরের অস্তিত্ব কি করে রক্ষা করবে। খৃষ্টানরা একথা শুনে স্বীকার করে যে, নিঃসন্দেহে ঠিক কথা। তারা হয়ত মনে করে বসেছিল যে, তিনি তার আকীদা অনুযায়ী একথা 'ঈসা অবশ্যই বিনাশ হবে, নিঃসন্দেহে সে ধ্বংস হবে' প্রসঙ্গটি তিনি আগে উত্থাপন করবেন। নেতিবাচক জবাব দিলে তিনি আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদেরকে আরও স্পষ্টভাবে অভিযুক্ত ও হতবাক করে দিতে পারবেন যে, অনেক আগেই ঈসার মৃত্যু ঘটেছে। তাই শব্দের মার-প্যাঁচে পড়া রাসূল (সঃ) ঠিক মনে করেননি। হতে পারে এরা ছিলো সেসব দলের লোক, যারা ইসলামের আকীদা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিহত বা শূলীবিদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে এবং সশরীরে ওপরে তুলে নেয়া স্বীকার করে। যেমন হাফেয ইবনে তাইমিয়া 'আল-জওয়াবুস সহীহ' (সঠিক উত্তর) গ্রন্থে এবং 'আল-ফারেক বাইনাল মাখলূক ওয়াল খালেক' (স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যকারী) গ্রন্থের রচয়িতা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সাধারণতঃ এটা ছিলো সিরিয়া এবং মিসরের খৃষ্টানদের বিশ্বাস। দীর্ঘদিন পর পর্যন্ত শূলীবিদ্ধ করার ধারণা প্রচার করে। অতঃপর এই ধারণা ইউরোপ থেকে সিরিয়া-মিসর ইত্যাদি দেশে পৌছে। এই পটভূমিতে রসূলের সতর্ক শব্দ বাছাই করনে মসীহকে খোদা বলে স্বীকৃতি দানকে রদ করা হলে আগের শব্দগুলো অধিক স্পষ্ট ও দ্ব্যার্থহীন। এ থেকে জানা যায় যে, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যও হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর আগে তার জন্য 'মৃত্যু' শব্দ ব্যবহার করা মহানবী (সঃ) পসন্দ করতেন না।

২. অর্থাৎ কোরআনে করীম, যা অবিকল হেকমত অনুযায়ী একান্ত যথার্থ সময়ে সততা ও ইনসাফ বক্ষে ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছে।

৩. অর্থাৎ কোরআন পূর্ববর্তী কিতাব গুলোর সত্যতা স্বীকার করে। আর পূর্ববর্তী কিতাব গুলো অর্থাৎ তাওরাত-ইঞ্জীল ইত্যাদি পূর্ব থেকেই কোরআন এবং তার উপস্থানকারীর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং সে সময়ের উপযোগী বিধান ও নির্দেশ দিয়েছে। বলে দেয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) যে খোদা বা খোদার পূত্র এমন কথা কোন আসমানী কিতাবেই বর্তমান ছিলনা। কারণ, দ্বীনের মূলনীতির ব্যাপারে সকল

আসমানী কিতাবই একমত। এসব কিতাবে কখনো মোশরেকী আকীদার শিক্ষা দেওয়া হয়না।

৪. অর্থাৎ সকল যুগের উপযোগী এমন সব বিষয় নাযিল করেছেন, যা হক-বাতিল, হালাল-হারাম এবং সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সূচীত করে। কোরআনে করীম, অন্যান্য আসমানী কিতাব, আম্বিয়ায়ে কেরামের মুজেযা-সব কিছু এর অন্তর্ভূক্ত। এ দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যেসব ব্যাপারে ইহুদী-খৃষ্টানদের বিরোধ চলে আসছে, সেসব ক্ষেত্রেও কোরআন দ্বারা ফয়সালা করা হয়েছে।

৫. অর্থাৎ এমন অপরাধীদেরকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না, আর তারা তার পরাক্রমশালী ক্ষমতা থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবেনা। মাসীহ (আঃ)-এর খোদা হওয়ার ধারণা যে বাতেল, এতে সেদিকেও এবটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, আল্লাহর জন্য যে নিরংকুশ ক্ষমতা প্রমাণ করা হয়েছে, স্পষ্টত তা মাসীহ (আঃ)-এর মধ্যে পাওয়া যায়না। বরং খৃষ্টানদের মতে কাউকে শাস্তি দেয়াতো দূরের কথা, হযরত মাসীহ (আঃ) তো একান্ত আকুতী আর কাকুতী-মিনতি স্বত্বেও নিজেকে যালেমদের থাবা থেকে রক্ষা করতে পারেননি। তা হলে খোদা বা খোদার পূত্র হবেন তিনি কি করে! পুত্রতো বলাই তাকে, যে পিতার শ্রেণীভূক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং খোদার পূত্রকেও খোদা হতে হয়। একজন অক্ষম মানুষকে বাস্তবে নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারীর পূত্র বলা পিতা-পূত্র উভয়কেই চরমভাবে দোষারোপ করার নামান্তর। আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

৬. অর্থাৎ তার ক্ষমতা-এক্তেয়ার যেমন নিরংকুশ, তেমনি তাঁর জ্ঞানও ব্যাপক ও সামগ্রিক। বিশ্বের ছোট-বড় কোন জিনিস এক মুহূর্তের জন্যও তার থেকে গায়েব হয়না। সকল অপরাধী ও নিরপরাধী এবং সকল অপরাধের ধরণ-প্রকৃতি ও পরিমাণ-সব কিছুই তার জানা আছে। অপরাধী পালিয়ে আত্ম গোপন করার চেষ্টা করে কোথায় যাবে? এখানে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, হযরত মাসীহ (আঃ) খোদা হতে পারেননা। কারণ, এমন ব্যাপক সর্বাত্মক জ্ঞান তার ছিলনা। তিনি ততটুকু জানতেন, যতটুকু আল্লাহ তায়ালা তাকে জানাতেন। মহানবী (সঃ)-এর জবাবে নাজরানের খৃষ্টানরাও এটা স্বীকার করে নিয়েছে, আর বর্তমানে প্রচলিত ইঞ্জীল থেকেও এটা প্রমাণিত হয়।

৭. অর্থাৎ তার জ্ঞান ও হেকমত অনুযায়ী অসীম ক্ষমতাবলে যেমন ও যেভাবে চেয়েছেন, মাতৃগর্ভে তোমাদের চিত্র অংকন করেছেন। নারী-পুরুষ, খোবসূরত-বদসূরত যেমন পয়দা করার ছিলো, করেছেন। এক বিন্দু পানিকে কত পর্যায় অতিক্রম করে মানুষের আকৃতি দান করেছেন। যার ক্ষমতা ও কারিগরী এমন, তার জ্ঞানে কি ত্রুটি থাকতে পারে? অথবা মাতৃগর্ভের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে যে মানুষ এসেছে, সাধারণ শিশুর মতই যে পানাহার এবং পেশাব-পায়খানা করে,, তাকে কি মহান আল্লাহর পূত্র-পৌত্র বলা যায়?

'তাদের মুখ থেকে যা নির্গত হয়, তাতো এক বিরাট কথা। তারা তো মিথ্যা বৈ কিছুই বলেনা। খৃষ্টানদের প্রশ্ন ছিলো, যেহেতু মাসীহ-এর বাহ্যিক পিতা কেউ নেই, সুতরাং খোদা ছাড়া কাকে পিতা বলা যাবে? এ আয়াতে তার জবাব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তার ক্ষমতা আছে, তোমাদের মধ্যে যেভাবে খুশী মানুষের আকৃতি সৃষ্টি করেন। মাতা-পিতা উভয়ের মিলনের ফলে হোক বা কেবল মাতার গ্রহণ ক্ষমতা বলে হোক। এ কারণে পরে বলা হয়েছে; 'তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।' অর্থাৎ তিনি এমন ক্ষমতাবান, যার ক্ষমতাকে কেউ সীমাবদ্ধ করতে পারেনা। তিনি হাকীম-মহাজ্ঞানী। যেমন উপযুক্ত মনে করেন, তেমনই করেন। 'মাসীহ'কে পিতা ছাড়া এবং 'আদম'কেও মাতা-পিতা উভয় ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। তার রহস্য কে বুঝতে পারে?

৮. নাজরানের খৃষ্টানরা সমস্ত দলীল-প্রমাণে অক্ষম হলে পাল্টা প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, আপনিও তো হযরত মাসীহ (আঃ)-কে 'কালোমাতুল্লাহ'-আল্লাহর বানী-এবং 'রূহুল্লাহ'-আল্লাহর আত্মা বলে স্বীকার করেন। আমাদের দাবী প্রমান করার জন্য এ শব্দগুলোই যথেষ্ট। এখানে একটা সাধারণ নীতির আকারে তার বিস্তারিত ও বিশ্লেষণধর্মী জবাব দেয়া হয়েছে। এই নীতিগত জবাব বুঝে নিতে পারলে অনেক বিরোধ-দ্বন্দ্ব আপনা আপনিই দূর হতে পারে। তা এভাবে বুঝে নেয়া যেতে পারে যে, কোরআন করীম সহ সকল আসমানী কিতাবে দু' ধরণের আয়াত পাওয়া যায়। এক, এমন আয়াত, যার অর্থ ও তাৎপর্য সুবিদিত ও সুনির্দিষ্ট। এ জন্য যে, ভাষা এবং বাক্য বিন্যাশ ও অন্যান্য দিকের বিচারে শব্দে কোন অস্পষ্টতা অসংলগ্নতা নেই, মূল পাঠ কয়েকটি অর্থ জ্ঞাপক নয়। অথবা এজন্য যে, মূলপাঠ এবং শব্দ একাধিক অর্থ জ্ঞাপক হলেও শরীয়ত প্রণেতার স্পষ্ট উক্তি, নিষ্কলুষ 'ইজমা' এবং ইসলামের সাধারণ স্বীকৃত নীতি দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে নির্ণীত হয়েছে যে, বক্তার বক্তব্যের মূল অর্থ কি?

এমন আয়াতকে 'মুহকামাত' অর্থাৎ সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বলা হয়। মূলতঃ এগুলোই হচ্ছে কিতাবের সমস্ত শিক্ষার মূল, সকল মূলনীতির উৎস। অপর প্রকার আয়াতকে বলা হয় 'মুতাশাবেহাত' -দ্ব্যর্থবোধক বা রূপক। অর্থাৎ এমন আয়াত, যার অর্থ ও তাৎপর্য নির্ণয় করতে কিছুটা সন্দেহ সংশয় দেখা দেয়। সঠিক পন্থা হচ্ছে এই যে, এ দ্বিতীয় প্রকার আয়াতকে প্রথম প্রকার আয়াতের সঙ্গে মিলায়ে দেখতে হবে এবং এর অর্থ 'মুহকামাত' আয়াতের বিপরীত হলে আদৌ তা গ্রহণ করা যাবেনা। বক্তার বক্তব্যের এমন অর্থ গ্রহণ করতে হবে, যা 'মুহকাম' আয়াতের পরিপন্থী নয়। 'ইজতিহাদ' এবং নিরলস চেষ্টা চালিয়েও বক্তার সঠিক অর্থ উদ্ধার করতে না পারলে নিজেকে সব জান্তা বলে দাবী করে সীমা অতিক্রম করবেনা। জ্ঞানের স্বল্পতা এবং যোগ্যতার অভাবের কারণে অনেক তত্ত্বই আমরা অবগত হতে পারিনা। এটাকেও সে সূচীরই অন্তর্ভূক্ত করে নেবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যাতে এমন অর্থ ও হেরফের গ্রহণ করা না হয়, যা ইসলামের স্বীকৃত মূলনীতি এবং 'মুহ্কাম' আয়াতের বিপরীত। যেমন কোরআন হাকীমে হযরত মাসীহ

(আঃ) সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সে তো আমার বান্দাহ ছাড়া আর কিছুই নয়, আমি যাকে পুরস্কার দিয়েছি। 'নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত আদমের মত। তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।

এতো ঈসা ইবনে মারইয়াম। সত্য কথা, যে সম্পর্কে তারা সন্দেহ করে। কোন সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি তো হচ্ছেন 'মহা পবিত্র'। কোরআন মজীদের স্থানে স্থানে হযরত ঈসা (আঃ) খোদা বা খোদার পুত্র-এ কথার রদ করা হয়েছে। এখন কেউ যদি এসব 'মুহকাম' তথা দ্ব্যর্থহীন আয়াত সম্পর্কে চক্ষু বন্ধ করে একটা বাণী 'যা তিনি প্রয়োগ করেছেন মারইয়াম' এর প্রতি এবং তার 'রূহ' ইত্যাদি দ্ব্যর্থবোধক আয়াত নিয়ে ছুটে যায় এবং এর 'মুহকাম' আয়াতের অনুকুল অর্থ ত্যাগ করে তার এমন সব অর্থ করে, যা কোরআনের সাধারণ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা এবং নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণনা ধারার পরিপন্থী, তবে এটাকে বক্রতা-হঠকারিতা না বলে আর কি বলা যাবে? কোন কোন পাপাচারী তো এমনিভাবে মানুষকে প্রতারিত করে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করতে চায়। আর কোন কোন দুর্বল আকীদার লোকেরা এসব 'মুতাশাবেহ' আয়াত দ্বারা টানা-হেচড়া করে নিজেদের মন মত অর্থ করতে চায়। অথচ এর সঠিক অর্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন। তিনি নিজ অনুগ্রহে যাকে যেটুকু অংশ সম্পর্কে অবহিত করতে চান, করান। যারা প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী, তারা 'মুহকাম' আর 'মুতাশাবেহ'-উভয়কেই হক বলে স্বীকার করে নেয়। তারা বিশ্বাস করে যে, উভয় প্রকার আয়াত একই উৎসমূল থেকে উৎসারিত। তাতে দ্বন্ধ আর বৈপরীত্বের কোন অবকাশ নেই। তাই তারা 'মুহকাম' আয়াতের সাথে মিলিয়ে 'মুতাশাবেহ' আয়াতের অর্থ গ্রহণ করে। আর যে অংশ তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির আওতার বাহিরে থাকে, তাকে আল্লাহর ওপরে ছাড়িয়া দেয়। কারণ, তিনিই ভালো জানেন। কারণ, আমাদের তো দরকার ঈমান। এই অধমের মতে এই আয়াতের বিষয়বস্তু সূরা হজ্ব-এর আয়াত এর বিষয়বস্তুর সাথে অনেকাংশে সামঞ্জস্যশীল। সেখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ।

৯. অর্থাৎ সুদৃঢ় জ্ঞানের অধিকারীরা তাদের জ্ঞানের পরিপক্কতা আর ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য গর্ব-অহংকার না করে বরং আল্লাহ তায়ালার কাছে আরও দৃঢ়তা-স্থিরতা আরও অনুগ্রহ ভিক্ষা করে। যাতে তাদের অর্জিত পুঁজি নষ্ট না হয় এবং খোদা না করুন, অন্তর সোজা হওয়ার পর আবার বাঁকা হইয়া না যায়। হাদীস শরীফে আছে যে, নবী করীম (দঃ) উম্মতকে শুনাবার জন্য সব সময় এই দোয়া করতেন 'হে অন্তরের মালিক! তোমার দ্বীনের ওপর আমার অন্তরকে অটল রাখ'।

১০. সেদিন অবশ্যই আসবে। যাদের অন্তর বাঁকা, তারা যেসব ব্যাপারে বিরোধে লিপ্ত ছিলো, সেসব ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করা হবে। অতঃপর সকল অপরাধীকে নিজ নিজ বক্রতা ও হঠকারিতার শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ভয়ে আমরা তাদের পথ হতে মুখ ফিরায়ে নেই এবং আপনার রহমত ও দৃঢ়তা প্রার্থনা করি। এদের বিরুদ্ধে আমাদের পথ-পন্থা অবলম্বন করা কোন কুমতলব এবং মনের খাহেশের বশবর্তী হয়ে নয়, বরং কেবল পরকালের কল্যাণই আমাদের লক্ষ্য।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ
اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ
وَقُوْدُ النَّارِ (১০) كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ
وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (১১) قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ
وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (১২) قَدْ كَانَ
لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ
يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي
الْاَبْصَارِ (১৩) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ
وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ (১৪)

রুকু ২

১০. যারা (আল্লাহ ও তার বিধানকে) অস্বীকার করেছে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর কাছে (কোনোটাই) কোনো উপকারে আসবে না। (আল্লাহর আযাব থেকে এর কোনোটাই তাদের বাঁচাতে পারবে না, বরং এ আচরণের পরিণামে) এরাই হবে জাহান্নামের ইন্ধন।[১১] ১১. (এদের পরিণতি হবে) ঠিক ফেরআউন ও তাদের পূর্ববর্তী (নাফরমান) জাতি সমূহের মতো, তারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছিলো, এই (বিদ্রোহী আচরণের) জঘন্য পাপের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের (শক্ত করে) পাকড়াও করলেন। (বস্তুত শাস্তি ও) দন্ডদানে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত কঠোর।[১২] ১২. (হে নবী) যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে সে সব (বিদ্রোহী) কাফেরদের তুমি বলে দাও, সেদিন খুব দূরে নয়-যেদিন তোমরা (এই দুনিয়ায়) লাঞ্ছিত ও পরাজিত হবে এবং (পরকালে) তোমাদের জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাবিত করা হবে। আর জাহান্নাম! (সে তো) অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থান![১৩] ১৩. সে দল দুটোর মধ্যে তোমাদের জন্যে শিক্ষণীয় অনেক কিছুই ছিলো-যারা (বদরের সম্মুখ সমরে একে অপরের সামনা সামনি হয়েছিলো-(এদের মধ্যে) এক বাহিনী লড়ছিলো আল্লাহর (দ্বীনের) পথে আর অপর বাহিনীটি ছিলো (অবিশ্বাসী) কাফেরদের (যারা লড়ছিলো আল্লাহর বিরুদ্ধে, এমন এক অবস্থায়, যখন) আল্লাহর বাহিনী চর্মচক্ষু দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলো যে, প্রতিপক্ষ সংখ্যায় তাদের দ্বিগুণ! (সংখ্যায় কম হলেও) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান সাহায্য (ও বিজয়) দিয়ে তাকেই শক্তিশালী করেন, সত্য সত্যই এমন সব ঘটনার মাঝে সেসব লোকের জন্যে অনেক কিছু শেখার আছে যারা অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন।[১৪] ১৪. নারী জাতি,[১৫] সন্তান-সন্ততি, কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা-রূপা, পছন্দসই ঘোড়া[১৬], গৃহপালিত জন্তু ও যমীনের ফসলকে (সব সময়ই) মানব সন্তানের জন্যে লোভনীয় করে রেখেছে। (কিন্তু) এর সবই তো হচ্ছে (ক্ষণস্থায়ী) পার্থিব জীবনের ভোগের সামগ্রী (মাত্র, স্থায়ী জীবনের) উৎকৃষ্ট আশ্রয় তো রয়েছে একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছেই।[১৭]

---

১১. কেয়ামতের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে কাফেরদের পরিণতিও বলে দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়া-আখেরাতে খোদার শাস্তি থেকে কোন কিছুই তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনা। সূরার শুরুতে আমি উল্লেখ করেছি যে, মূলতঃ এ আয়াতগুলোতে সম্বোধন করা হয়েছে নাজরানের প্রতিনিধি দলকে। এদেরকে খৃষ্টধর্মের সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি দল বলা যায়। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের সীরাত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন যে, এই প্রতিনিধিদলটি যখন নাজরান থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে, তখন তাদের সবচেয়ে বড় পাদ্রী আবু হারসা ইবনে আলকামা খচ্চরের পিঠে সওয়ার ছিলো। খচ্চর হোচট খেলে তার ভাই কুরজ ইবনে আলকামার মুখ থেকে বের হয়; 'দূরবর্তীর বিনাশ হোক'। দূরবর্তী দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিলো মোহাম্মদ (সঃ) নাউযু বিল্লাহ। আবু হারেসা তার ভাইকে বলে-------'তোমার মা তোমাকে বিনাশ করুক'। কুরজ অবাক হয়ে একথা

বলার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আবু হারেসা বলেন, আল্লাহ ভালোই জানেন যে, ইনি হচ্ছেন সেই প্রতীক্ষীত নবী, আমাদের কিতাবে যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। কুরজ জিজ্ঞাসা করেন তা হলে তাকে মাননা কেন? জবাবে সে বলেঃ 'আমরা মুহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতি ঈমান আনলে এসব রাজা-বাদশাহরা আমাদেরকে যে বিপুল ধনরাজি দিয়াছে, মান-মর্যাদায় ভূষিত করেছে'। আমাদের কাছ থেকে এর সবটুকুই ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কুরজ এ কথাগুলো মনে রেখেছে এবং শেষ পর্যন্ত এটাই তার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছে। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাকে সন্তুষ্ট করুন।

আমার মতে এ আয়াতগুলো'তে আবু হারেসার সে বক্তব্যের জবাব দেয়া হয়েছে। যেন যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা তাদের বিকৃত আকীদা রদ করে সতর্ক করে বলে দেয়া হয়েছে যে, সত্য প্রতিভাত হওয়ার পর নিছক বৈষয়িক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে যারা ঈমান আনেনা, তাদের ভালো করে জেনে নেয়া উচিৎ যে, ধনবল আর জনবল তাদেরকে দুনিয়ায় খোদার শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবেনা, পারবেনা পরকালে মহা শাস্তি থেকে বাঁচাতে। বদর যুদ্ধে তারা এর জ্বলন্ত প্রমাণ দেখতে পেয়েছে। দুনিয়ার বাহার কেবল কয়েক দিনের জন্য। ভবিষ্যতের সাফল্য তাদের জন্য, যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে। বহুদূর পর্যন্ত এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং সাধারণ শব্দের বৃত্তে ইহুদী মোশরেক এবং কাফেরদেরকেও সম্বোধনের আওতাভূক্ত করা হয়েছে। যদিও মূলতঃ সম্বোধন ছিলো নাজরানের খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে। আল্লাহই ভালো জানেন।

১২, অর্থাৎ কেউ তা হটাতে পারবেনা। যেমনিভাবে তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছে, তেমনি তোমরাও খোদার কাছে ধরা পড়বে।

১৩. অর্থাৎ সময় এসেছে যে, তোমরা ইহুদী-খৃষ্টান ও মুশরেকরা অদূর ভবিষ্যতে খোদায়ী বাহিনীর সামনে পরাভূত হয়ে অস্ত্র সমর্পণ করবে। এটা তো হবে দুনিয়ার লাঞ্ছনা। পরকালে যে আযাব প্রস্তুত রাখা হয়েছে, তাতো স্বতন্ত্র।

কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদর যুদ্ধ থেকে বিজয়ীর বেশে ফিরে মহানবী (সঃ) ইহুদীদেরকে বলেনঃ তোমরা সত্যকে মেনে নাও। অন্যথায় কোরাইশের যে দশা হয়েছে, তোমাদেরও সে দশা হবে। জবাবে তারা বলেঃ মোহাম্মদ (সঃ)! কোরাইশের অনভিজ্ঞের ওপর বিজয় লাভ করে তুমি প্রতারিত হবেনা। আমাদের সাথে মুকাবিলা হলে বুঝতে পারবে যে, আমরা যুদ্ধে পরীক্ষিত বীর। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়। কেউ কেউ বলে যে, বদর-এর বিজয় দেখিয়া ইহুদীরা ইসলাম গ্রহণ করতে কিছুটা প্রস্তুত হয়। এর পর বলে, বেশী তাড়াহুড়া করবেনা। দেখ, ভবিষ্যতে কি হয়। পরবর্তী বছর ওহোদের সাময়িক পরাজয় দেখে তাদের অন্তর কঠোর হয়ে পড়ে। সাহস বেড়ে যায়। এমনকি চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কা'আব ইবনে আশরাফ ৬০ জন অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মক্কা গমন করেঃ আবু সুফিয়ান প্রমুখ কোরাইশ সর্দারদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বলে ঃ আমরা আর তোমরা এক। যৌথ ফ্রন্ট গঠন করে মোহাম্মদ (দঃ)-এর মোকাবিলা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

যাই হোক, কিছু দিনের মধ্যেই আল্লাহ তা'য়ালা দেখায়ে দেন যে, জাযিরাতুল আরবে মোশরেকদের নাম-গন্ধও ছিলনা। বনু কোরায়যার চুক্তি ভঙ্গকারী ইহুদীদেরকে তরবারীর আঘাতে উড়িয়ে দেয়া হয়। বনু নযীয়কে দেশান্তরিত করা হয়। নাজরান-এর ইহুদীরা অপদস্ত হয়ে বার্ষিক জিযিয়া-কর দান করতে সম্মত হয়। প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত দুনিয়ার বড় বড় দাম্ভিক শক্তি মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব-কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। আল্লাহর লাখ লাখ শোকর।

১৪. বদর যুদ্ধে কাফেরদের সংখ্যা ছিলো প্রায় এক হাজার। তাদের কাছে ছিলো সাত শত উট, এক হাজার ঘোড়া। অপরপক্ষে মুসলমান মুজাহিদদের সংখ্যা ছিলো তিনশ'র চেয়ে কিছু বেশী। তাদের কাছে ছিলো মোট সত্তুরটি উট, দু'টি ঘোড়া, ৬টি লৌহ বর্ম এবং ৮টি তরবারী। মজার ব্যাপার এই যে, প্রত্যেক দলের কাছে প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখা যেতো। এর ফল দাঁড়িয়েছিলো এই যে, মুসলমানদের সংখ্যা দেখে কাফেররা মনে মনে ভীত হতো, আর মুসলমানরা কাফেরদের দ্বিগুণ সংখ্যা দেখে আল্লাহ তায়ালার প্রতি আরও বেশী মনোনিবেশ করতো এবং পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল ও স্থিরতার সঙ্গে আল্লাহর ওয়াদা তোমাদের মধ্যে যদি একশত ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দুইশত জনের ওপর বিজয়ী হবে'-এর ওপর আস্থা রেখে বিজয়ের আশা করতো। তাদের পূর্ণ সংখ্যা ছিলো তিনগুণ। তা দেখতে পেলে ভীত হওয়া স্বাভাবিক ছিলো। উভয় পক্ষ যে একে অপরের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখতো, তাও আবার সব সময় নয়। কোন কোন সময় একপক্ষ অপরপক্ষের সংখ্যা কমও দেখতো। এ সম্পর্কে সূরা আনফালে আলোচনা করা হবে। যাই হোক, মক্কায় করা ওয়াদা অনুযায়ী সহায়-সম্বলহীন একটা ক্ষুদ্রদলকে এভাবে বিজয়ী করা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

১৫. অর্থাৎ মানুষ এ সবের মধ্যে পড়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। একারণে হাদীস শরীফে বলা হয়েছেঃ 'আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে মারাত্নক আর কোন ফেৎনা রেখে যাইনি।' অবশ্য নারী দ্বারা যদি নিজের সতীত্ব রক্ষা এবং সন্তনাদীর সংখ্যা বৃদ্ধি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে তা নিন্দনীয় নয়। বরং তখন নারী হয় কাম্য ও বিধেয়। একারণে মহানবী (দঃ) বলেছেন ঃ দুনিয়ার শ্রেষ্ট সম্পদ হচ্ছে নেক স্ত্রী। যার দিকে তাকালে অন্তর খুশী হয়, নির্দেশ দিলে সে অনুগত পায়, স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সতীত্ব এবং স্বামীর সম্পদ হেফাযত করে।' এমনিভাবে দুনিয়ার সম্পদ প্রসঙ্গে যেসব বিষয় নিয়ে পরে আলোচনা হয়েছে, তার পছন্দনীয় ও নিন্দনীয় হওয়া নিয়ত এবং কর্মপন্থার পার্থক্যের ফলে তাতেও পার্থক্য দেখা দেয়। কিন্তু যেহেতু দুনিয়ায় এমন লোকের সংখ্যাই বেশী, যারা আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাশের উপায় উপকরণে পড়ে আল্লাহকে এবং নিজের পরিণতির কথা ভুলে যায়, তাই মানুষের জন্য সুশোভিত ও চাকচিক্যময় করা হয়েছে একথাটি সাধারণ পর্যায়ে বলা হয়েছে।

১৬. অর্থাৎ যাদের গায়ে সংখ্যা এবং চিহ্ন দেওয়া হয় বা এমন ঘোড়া, যাদের হাত-পা এবং কপালে প্রাকৃতিক চিহ্ন থাকে। অথবা যেসব ঘোড়া চারণ ভূমিতে বিচরণের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়।

১৭. অর্থাৎ এসব জিনিষ দ্বারা চিরন্তন কল্যাণ অর্জিত হয়না। দুনিয়ায় সাময়িক কিছু সময়ের জন্য উপকৃত হওয়া যায় মাত্র। সফল-সার্থক ভবিষ্যৎ এবং সুন্দর ঠিকানা চাইলে তা পাবে আল্লাহর কাছে। তার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের ফিকির করবে। কি সে সুন্দর ঠিকানা, কারা তা লাভ করবে, পরবর্তী আয়াতে সেকথা বলা হয়েছে।

قُلْ

أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ

رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا

وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ

بِالْعِبَادِ ﴿১৫﴾ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا

ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿১৬﴾ الصّٰبِرِينَ وَالصّٰدِقِينَ

وَالْقٰنِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿১৭﴾

شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ

قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿১৮﴾ إِنَّ

الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ

وَمَن يَكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ط

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ط

فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ج وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ

الْبَلٰغُ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

১৫. (হে নবী! তুমি তাদের) বলো, আমি কি তোমাদের (বরং) এর চাইতে উৎকৃষ্ট কোনো বস্তুর কথা বলবো? (হ্যাঁ সে উৎকৃষ্ট বস্তু হচ্ছে) তাদের জন্যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে, এমন সব লোকদের জন্যে তাদের মালিকদের কাছে রয়েছে (সুরম্য) উদ্যান মনোরম জান্নাত-যার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহমান থাকবে (অগণিত) ঝর্নাধারা, (সেটা কোনো ক্ষণস্থায়ী ব্যবস্থা হবে না) তারা সেখানে থাকবে অনন্ত ও অনাদি কাল, আরো থাকবে (তাদের সংগ দেয়ার জন্যে) পূত পবিত্র সংগী ও সংগীনীরা[১৮] সর্বোপরি (তাদের ওপর) থাকবে আল্লাহ তাআলার (নিরংকুশ) সন্তুষ্টি।[১৯] আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দাদের (কার্যকলাপের) ওপর সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।[২০] ১৬. (তারাই এসব পুরস্কারে ভূষিত হবে) যারা বলে, হে আমাদের মালিক আমরা অবশ্যই তোমার ওপর (তোমার বিধানের ওপর) ঈমান এনেছি, অতপর (এই ঈমানের দাবী আদায়ের সময়) আমাদের করা গুনাহখাতা সমূহ তুমি মাফ করে দাও এবং (জীবনের শেষে) তুমি আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিয়ো।[২১] ১৭. (যারা এভাবে দোয়া করে) তারাই মূলত ধৈর্যশীল এবং সত্যাশ্রয়ী, তারাই অনুগত এবং দানশীল, (সর্বোপরি) এরাই, শেষ রাতে কিংবা প্রাতকালীন সময় ক্ষমা প্রার্থনাকারী।[২২] ১৮. আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, (সৃষ্টি জগতে) তিনি ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই।[২৩] (আল্লাহর বার্তাবাহক) ফেরেশতা[২৪]সহ যে সব মানুষকে আল্লাহ জ্ঞানের মহিমায় ভূষিত করেছেন,[২৫] তারাও (এই একই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই) আল্লাহ তাআলাই একমাত্র ন্যায় ও ইনসাফ কার্যকর করেন। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রজ্ঞাময়।[২৬] ১৯. একথা সুনিশ্চিত যে, (মানব) জীবনের বিধান হিসেবে আল্লাহ তায়ালার কাছে ইসলামই একমাত্র (গ্রহণযোগ্য) ব্যবস্থা।[২৭] যাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব দেয়া

হয়েছিলো, তারা (এই জীবন বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে) নিজেরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন দলে, উপদলে বিভক্ত হয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো তাও আবার তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে) সঠিক জ্ঞান আসার পর।[২৮] (এসব কিছু সত্তেও) যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করবে (তার জানা উচিত) আল্লাহ তাআলা (এ ধরনের লোকদের কাছ থেকে) দ্রুত হিসাব গ্রহণে (সর্বৈব) সক্ষম।[২৯] ২০. (আজ) যদি এসব মানুষ তোমার সাথে (এই জীবন বিধানের ব্যাপারে) কোনোরূপ বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে (তুমি তাদের) বলে দাও, আমি এবং আমার অনুসারীরা[৩০] (সবাই) আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছি। অতপর যাদের (আমার পক্ষ থেকে) কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা (কোনো কিতাব না পেয়ে) মুর্খ (থেকে গেছে) তাদের (সবাইকেই) জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি সবাই আল্লাহর আনুগত্য মেনে নিয়েছো? (হ্যাঁ) তারা যদি (জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য মেনে নেয়, তাহলে (তা ভালো কথাই) তারা তো সঠিক পথই পেয়ে গেলো, কিন্তু তারা যদি (ঈমান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমার কোনো উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার কারণ নেই) তোমার দায়িত্ব হচ্ছে কেবল (আমার কথা, পৌছে দেয়া, তারপর বান্দাদের (কর্মকান্ড) পর্যবেক্ষণ করার জন্যে আল্লাহ তাআলাই রয়েছেন।[৩১]

---

১৮. অর্থাৎ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সব রকম পংকীলতা থেকে মুক্ত হবে।

১৯. কারণ, তার চাইতে বড় আর কি নেয়ামত হতে পারে! মূলতঃ জান্নাত কাম্য এজন্যই যে, তা সন্তুষ্টির স্থান।

২০. বান্দাদের সমস্ত আমল ও অবস্থা তার সম্মুখে রয়েছে। যে ব্যক্তি যে পুরস্কার বা শাস্তির যোগ্য হবে, বিন্দুমাত্র হ্রাস না করে তাকে তা দেয়া হবে। দুনিয়ার সৌন্দর্যে যারা প্রাণপাত করে, আর যারা দুনিয়ার নশ্বর স্বাদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে, সকলকে আপন আপন ঠিকানায় পৌছিয়ে দেয়া হবে। অথবা এ অর্থ করা যেতে পারে যে, পরহেজগার বান্দাদের ওপর খোদার কৃপা দৃষ্টি রয়েছে, যা তাদেরকে দুনিয়ার চাকচিক্যে জড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা করে। তাই হাদীস শরীফে আল্লাহর নবী বলেছেন যে, 'আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমরা রুগীকে পানি ইত্যাদি থেকে বাঁচায়ে রাখ।'

২১. এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, গুণাহ মাফ হওয়ার জন্য ঈমান আনা-শর্ত।

২২. অর্থাৎ আল্লাহর পথে বিরাট বিরাট কষ্ট স্বীকার করেও তার আনুগত্যে অটল অবিচল থাকে এবং তার নাফরমানী থেকে বিরত থাকে।' মনে এবং মুখে, নিয়তে এবং কাজ-কারবারে সত্য। পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পনের সাথে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে। আল্লাহর দেয়া সম্পদ তার বলে দেওয়া পথে ব্যয় করে। রাতের শেষ প্রহরে শয্যা ত্যাগ করে পরওয়ার দেগারের দরবারে পাপ-তাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। কারণ, রাতের

শেষ প্রহর মনের অনাবিল শান্তি ও দোয়া কবুল হওয়ার সময়। যদিও তখন শয্যা ত্যাগ করা খুব সহজ কাজ নয়। 'তারা রাত্রে খুব কম সময়ই নিদ্রায় অতিবাহিত করে। রাত্রের শেষ প্রহরে তারা মাগফেরাত কামনা করে।' (যারিয়াত রুকু'১)।

২৩. শুরুতে নাজরানের খৃষ্টানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং একান্ত সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে মাসীহ যে খোদা এ আকীদা রদ করে নিরেট-নিরংকুশ তাওহীদ তথা একত্ববাদ ঘোষণা করে ঈমান আনার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। মধ্য খানে এমনসব উপলক্ষ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, সত্য প্রতিভাত হওয়ার পরও যা মানুষকে ঈমান আনার গৌরব থেকে বঞ্চিত করে। অর্থাৎ ধন-সম্পদ, সন্তানাদী এবং ভোগ-বিলাস আরাম-আয়েশের উপায়-উপকরণ। এই আয়াতগুলোতে মোমেনদের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর পুনরায় মূল বিষয় অর্থাৎ তাওহীদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ খালেস তাওহীদ মেনে নিতে ইতস্ততঃ করার কি কারণ থাকতে পারে! আল্লাহ তায়ালাতো নিজেই সমস্ত কিতাবে সবসময় এ বিষয়ের সাক্ষ্য দান করে আসছেন। আর তার বাস্তব কিতাব অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতের এক একটা পাতা এমনকি প্রতিটি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, রাব্বুল আলামীন ব্যতীত অন্য কেউ বন্দেগীর যোগ্য নয়। হতে পারেনা। সব কিছুর মধ্যেই তার জন্য নির্দেশ রয়েছে, যা স্বাক্ষ্য দেয় যে, তিনি এক ও একক। '----' অনতি বিলম্বে আমি তাদেরকে আমার নির্দেশাবলী প্রদর্শন করব এবং বিশ্ব প্রকৃতিতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও। যার ফলে তাদের কাছে প্রতিভাত হবে যে, তাই একামাত্র সত্য। তোমার পরওয়ারদেগারের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তিনি সব কিছুর ওপর সাক্ষী, সব কিছু প্রত্যক্ষ করছেন (হামীম আস্ সাজদাহঃ ৫৩)।

২৪. এটা স্পষ্ট যে, ফেরেশতাদের সাক্ষ্য আল্লাহর সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে কি করে হবে? ফেরেশতা তো এমন এক সৃষ্টকূলের নাম, যারা সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারেনা। পারেনা তার বিরুদ্ধে কিছু করতে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার একত্বকে কেন্দ্র করেই চলে। ফেরেশতাদের সমস্ত প্রশংসো ও তারিফ।

২৫. জ্ঞানের অধিকারীরা সকল যুগেই তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়ে আসছে। বর্তমানে তো তাওহীদের বিরুদ্ধে একটা শব্দ উচ্চারণ করাকেই নিছক অজ্ঞতার সমার্থক বলে মনে করা হয়। মোশরেকরাও অন্তরে অন্তরে স্বীকার করে যে, জ্ঞান ও যুক্তির মানদন্ড কখনো শেরকবাদী আকীদাকে সমর্থন করতে পারেনা।

২৬. ইনসাফ করার জন্য দু'টো জিনিষ জরুরী। এক, দোর্দন্ড প্রতাপ যাতে কেউ তার ফয়সালা অমান্য করতে না পারে। দুই, প্রজ্ঞা-বুদ্ধিমত্তা। যাতে পুংখ্যানুপংখ্যভাবে পরখ করে যথার্থ সিদ্ধান্ত নিতে পারে,অন্যায়ভাবে কোন সিদ্ধান্ত না দেয়। আল্লাহ তায়ালার মধ্যে দুইটি গুণই বর্তমান রয়েছে। তিনি 'আযীযুন হাকীম'-মহাপরাক্রমশালী এবং মহাজ্ঞানী। সুতরাং তিনি যে সবচেয়ে বড় ইনসাফকারী, তাতে আর কি সন্দেহ থাকতে পারে! সম্ভবতঃ এ দ্বারা খৃষ্টানদের পরিত্রাণ ধারণাও রদ করা হয়েছে। সারা দুনিয়ার সমস্ত

অপরাধ এক ব্যক্তির ঘাড়ে চাপানো কি করে ইনসাফ হতে পারে! আর সে এক ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করে সকল অপরাধীকে চিরতরে মুক্ত করে দেবে, সুবিচারক ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তায়ালার দরবার এমন হাস্যস্পদ কাজের অনেক উর্ধে।

২৭. ইসলামের আসল অর্থ হচ্ছে আত্ম সমর্পণ করা। ইসলাম ধর্মকে ইসলাম বলা হয় এজন্য যে, একজন মুসলমান নিজেকে সর্বতোভাবে এক আল্লাহ্‌র সামনে সমর্পণ করে এবং তার নির্দেশের সামনে আত্নসমর্পণ করার অঙ্গীকার করে। যেন ইসলাম হচ্ছে মেনে নেয়া আর মুসলমানী হচ্ছে হুকুম পালন করার অপর নাম। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল পয়গম্বর এ ইসলাম নিয়েই আগমন করেছেন। তারা স্ব-স্ব সময়ে নিজ নিজ জাতিকে সময়োপযোগী নির্দেশ পৌছিয়ে আনুগত্য ও একনিষ্ঠভাবে এক খোদার দাসত্বের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু এ ধারায় খাতেমুল আম্বিয়া মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) সারা বিশ্বকে যে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ সর্বব্যাপক, বিশ্ব জনীন ও অপরিবর্তনীয় নির্দেশ দান করেছেন, অতীতের সকল শরীয়তের ওপর কিছুটা বাড়তি সংযোজনের ফলে তা বিশেষভাবে-ইসলাম নামে অভিহিত হয়েছে। যা হোক, এ আয়াতে নাজরানের খৃষ্টানদের সামনে বিশেষভাবে এবং সারা বিশ্বের সকল জাতির সামনে সাধারণভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, দ্বীন --কেবল একটা জিনিষেরই নাম হতে পারে। আর তা হচ্ছে এই যে, বান্দাহ্ নিজেকে মনে প্রাণে মহান আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবে আর তার পক্ষ থেকে যখন যেই নির্দেশ লাভ করবে, কোন প্রকার বাক্য ব্যয় ছাড়াই তার সামনে মাথা নুইয়ে দিবে। এখন যারা আল্লাহর জন্য পূত্র-পৌত্র প্রস্তাব করে, মাসীহ্ এবং মারইয়ামের ছবি এবং ক্রুশের কাষ্ঠের পূজা করে, শূকর খায়, মানুষকে খোদা এবং খোদাকে মানুষে পরিণত করে, নবী-ওলীদেরকে হত্যা করা মামূলী কাজ মনে করে, সত্য দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়, মূসা ও মাসীহ্-এর সুসংবাদ অনুযায়ী যে পয়গম্বর তাঁদের চেয়েও অধিক শান-শওকত ও জাঁক-জমকের সহকারে আগমন করেছেন, বুঝে শুনে তাকে অস্বীকার করে এবং তার উপস্থাপিত বাণী-বিধানকে বিদ্রুপ উপহাস করে, বা যেসব আহাম্মক পাথর-বৃক্ষ-নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির সামনে মাথানত করে এবং মনের খাহেশকেই হালাল-হারামের একমাত্র মানদন্ড বলে মনে করে-এদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি বা দলটি নিজেকে মুসলিম এবং মিল্লাতে ইবরাহীম এর অনুসারী বলে দাবী করতে পারে? নাউযু বিল্লাহ।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় দেখা যায়ঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেন তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। জবাবে তারা বলেঃ আমরা তো ইসলাম গ্রহণ করেছি। রাসূলুল্লাহ (দঃ) বললেনঃ তোমাদের ইসলাম গ্রহণ কেমন করে যথার্থ হতে পারে? তোমরা তো আল্লাহর জন্য পূত্র প্রমাণ কর, ক্রুশের পূজা কর এবং শূকর খাও '(তাফসীরে কাবীর)'।

২৮. অর্থাৎ ইসলাম একটা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল জিনিস। যে ধরনের দলীল-প্রমাণ দ্বারা হযরত মূসা ও হযরত মাসীহ (আঃ)-এর রেসালাত বা তাওরাত-ইঞ্জীলকে আসমানী

কিতাব বলে প্রমাণ করা যায়। তার চেয়ে উন্নত, সুদৃঢ় এবং জীবন্ত দলীল প্রমাণ দ্বারা মোহাম্মদ (দঃ) এর রেসালাত এবং কোরআন আল্লাহর কালাম, তার স্বপক্ষে বর্তমান রয়েছে। বরং স্বয়ং সেসব আসমানী কিতাবও তার সত্যতার সাক্ষী দিচ্ছে। খালেস তাওহীদ একটা স্বচ্ছ বিষয়। যার বিরুদ্ধে পিতা-পুত্রের দর্শন নিছক একটা অর্থহীন উপাখ্যান হয়ে দাঁড়ায়। কোন বুদ্ধিবৃত্তিক নীতিই এটা সমর্থন করেনা। এখন যেসব আহলে কিতাব ইসলাম বিরোধী হয়ে এসব স্পষ্ট তত্বকে অস্বীকার করে, আল্লাহ তায়ালার হুকুম মেনে নিতে অস্বীকার করে, তারা নিছক হঠকারিতা, ঈর্ষা, বিরোধীতা এবং অর্থ-সম্পদও মান-মর্যাদার বশবর্তী হয়ে এটা করছে-এমন কথা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? ইতিপূর্বে 'ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ লান তুগনিয়া আনহুম----' এর তাফসীর প্রসঙ্গে নাজরান প্রতিনিধি দলের নেতা আবু হারেসা ইবনে আলকামার স্বীকারোক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে তাদের পূরাতন অভ্যাস। ইহুদী-খৃষ্টানদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, বা এক একটি ধর্মে যে অনেক ফের্কার সৃষ্টি হয়েছে, অতঃপর এই বিরোধ যে ভয়ংকর যুদ্ধ বিগ্রহ এবং রক্তপাত পর্যন্ত গড়িয়েছে, ইতিহাস বলে যে সাধারণতঃ এর কারণ ভুল বুঝাবুঝি বা অজ্ঞতা ছিলনা, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু বৈষয়িক স্বার্থপ্রীতি এবং গদী পূজার ফলেই এসব গোত্রগত বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

২৯. ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা দাবী করতো যে, আমরাও মুসলমান। এখানে তাদেরকে বলা হয়েছে যে, এমন (কাল্পনিক) ইসলাম কোন কাজে আসবে? ইসলাম কাকে বলে, এসে দেখ। আসল ইসলাম রয়েছে মোহাম্মদ (দঃ) এবং তার সঙ্গী-সাথীদের কাছে। ইতিপূর্বে এটাও আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলাম হচ্ছে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের নাম। অর্থাৎ বান্দাহ নিজেকে সর্বতোভাবে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবে। মোহাম্মদ (দঃ) এবং আনসারদের দিকে দেখ। তারা কিভাবে শেরক, মূর্তি পূজা, নৈতিকতাহীনতা এবং ফিসক-ফুজুর আর যুলুম নির্যাতনের মোকাবিলা করে নিজেদের জান-মাল, দেশ-জাতি, স্ত্রী-পুত্র পরিজন এক কথায় সব কিছু সমস্ত প্রিয়বস্তু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন। কিভাবে তারা সর্বদা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি উন্মুক্ত হয়ে থাকেন। যে কোন হুকুম তা'মীল করার জন্যই তারা প্রস্তুত হয়ে থাকেন। অপরপক্ষে তোমরা নিজের অবস্থা দেখ। তোমরা নিজেরাই একান্তে স্বীকার কর যে, মোহাম্মদ (দঃ) সত্যের ওপর রয়েছেন। কিন্তু তার প্রতি ঈমান আনলে দুনিয়ার মান ও গদি হারাইতে হয়। যাই হোক, সত্য প্রতিভাত হওয়ার পরও যদি তোমরা ইসলামের দিকে না আস, তবে জেনে রাখ যে, আমরা নিজেদেরকে এক খোদার কাছে সমর্পণ করেছি।

৩০. অর্থাৎ চিন্তা করে দেখ, তোমরাও আমাদের মত আল্লাহর অনুগত বান্দাহ হবে কি-না। এমনটি করলে বুঝবে যে, তোমরা সত্যপথের সন্ধান পেয়েছ। আমাদের ভাই-এ পরিণত হয়েছে। অণ্যথায় আমাদের কাজ হচ্ছে বুঝায়ে দেয়া, চড়াই-উৎরাই বলে দেয়া।

আমরা তা করেছি। সকল বান্দাহ এরং তাদের যাহেরী বাতেনী সমস্ত কাজ খোদার নযরে রয়েছে। তিনি সকলকে নিজ নিজ আমলের ফল ভোগ করাবেন। 'উম্মী' বলা হতো আরবের মুশরেকদেরকে। কারণ, তাদের কাছে আসমানী কিতাবের জ্ঞান ছিলনা।

৩১. হাদীস শরীফে আছে যে, বনী ইসরাইলরা একদিনে ৪৭ জন নবী এবং ১৭০ বা ১১২ জন সালেহীনকে শহীদ করেছিলো। এখানে নাজরানের খৃষ্টান এবং অন্যান্য কাফেরদেরকে শুনানো হচ্ছে যে, খোদার নির্দেশ অমান্য করে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও ইনসাফ প্রিয় সৎ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং নিকৃষ্ট স্তরের বর্বরতা নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাদের রক্তে হাত রঞ্জীত করা কোন মামুলী কাজ নয়। এমন লোকেরা কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য এবং দুনিয়া-আখেরাতে সাফল্য থেকে বঞ্চিত হবে। তাদের মেহনত বরবাদ, চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। দুনিয়া আখেরাতে তাদেরকে যখন শাস্তি দেয়া হবে, তখন কেউ রক্ষা করতে পারবেনা, সাহায্য করারও থাকবেনা কেউ।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ

الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٢﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ

وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

রুকু ৩

২১. যারা আল্লাহ তায়ালার (পক্ষ থেকে নাযিল করা) নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করে, যারা (আল্লাহর তরফ থেকে এই বিধান বয়ে এনেছে সেই সম্মানিত) নবীদের অন্যায় ভবে হত্যা করে এবং মানুষদের যারা ন্যায় ও ইনসাফ মেনে চলার আদেশ দেয় তাদেরকেও হত্যা করে, তাদের তুমি এক কঠোরতম শাস্তির সুসংবাদ দাও। ২২. (এ হতভাগ্য লোকদের অবস্থা হচ্ছে) দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই এরা ব্যর্থ ও নিষ্ফল-(আর এ কারণেই) এদের কোথাও কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।[৩২] ২৩. (হে নবী!) তুমি তাদের সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছো কি, যাদের আমার বিধি-নিষেধের কিছু অংশ দেয়া হয়েছিলো![৩৩] (এবং পরে তারা এর সাথে কি আচরণ করেছিলো?) অতঃপর তাদের যখন আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হলো যা তাদের মধ্যকার অমীমাংসিত বিষয়সমূহের মীমাংসা করে দেবে তখন তাদের একদল লোক (এই হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরে দাঁড়িয়ে গেলো - মূলত এরাই (হচ্ছে সেই হতভাগ্য ব্যক্তি) যারা (আল্লাহর ফায়সালা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৩৪] ২৪. এটা এই কারণে যে এই (নিবোধ) লোকেরা বলে বেড়ায়, (দোযখের) আগুন আমাদের (শরীর) কখনো স্পর্শ করবে না, (আর যদি একান্তই তা করেও, তা হবে) হাতে গনা কয়েকটি দিনের ব্যাপার মাত্র। মূলত তাদের নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসে নিজেদের মনগড়া ধারণা তাদের প্রতারিত করে রেখেছে।[৩৫]

---

৩২. অর্থাৎ তাদের শব্দের এবং অর্থের পরিবর্তন থেকে তাওরাত-ইঞ্জীলের যে সামান্য অংশটুকু রক্ষা পেয়েছে অথবা কিতাব বুঝার যে সামান্যটুকু অংশ তারা পেয়েছে।

৩৩. অর্থাৎ তাদেরকে যখন দাওয়াত দেয়া হয় যে, কোরআনে করীমের দিকে আস, যা তোমাদের মেনে নেয়া কিতাবের সুসংবাদ হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমাদের মতবিরোধের যথার্থ ফয়সালা করে, তখন তাদের এক শ্রেণীর আলেম অবহেলা করে মুখ ফিরায়ে নেয়। অথচ কোরআনের দিকে দাওয়াত মূলতঃ তাওরাত-ইঞ্জীলের দিকেই দাওয়াত। এটাও অসম্ভব নয় যে, এখানে কিতাবুল্লাহর অর্থ তাওরাত-ইঞ্জীল। অর্থাৎ এই নাও, আমরা তোমাদের বিরোধের ফয়সালা তোমাদের কিতাবের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, তারা নিজেদের হীন স্বার্থের সামনে স্বয়ং নিজেদের কিতাবের নির্দেশ থেকেও মুখ ফিরায়ে নেয়। তারা সুসংবাদ শুনেনা, নির্দেশ কানে নেয় না। ব্যভিচারীর প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপের ব্যাপারে তাওরাতের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এ সম্পর্কে সূরা মায়েদায় আলোচনা করা হবে।

৩৪. অর্থাৎ তাদের ঔদ্ধত্য-নাফরমানী এবং গুনাহের ব্যাপারে নির্বাক হওয়ার কারণ এই যে, শাস্তি সম্পর্কে তারা নির্ভীক ও বেপরোয়া। তাদের বুযুর্গরা মিথ্যা কথা বরচনা করে বলে গেছে যে, আমাদের মধ্যে কেউ মারাত্নক গুনাহ করলেও আঙ্গুলে গণা কয়েকটা দিনের বেশী শাস্তি ভোগ করবেনা। এ সম্পর্কে সূরা বাকারা আলোচনা করা হয়েছে।

এমনি আরো অনেক কথা তারা রচনা করেছে। যেমন তারা বলত যে, আমরাতো আল্লাহর প্রিয় পুত্র, নবীদের সন্তান। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে, তার সন্তানদেরকে শাস্তি দেবেনা। আর খৃষ্টানরা তো কাফফারার প্রশ্ন তুলে গুনাহর সকল হিসাব-কিতাবই চুকিয়ে দিয়েছে। পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে নাফসের দুষ্টামী থেকে পানাহ দাও।

৩৫. অর্থাৎ তখন বুঝতে পারবে যে, কত অন্ধকারে নিপতিত ছিলে। হাশরের দিন যখন আগে-পরের সকলে এবং তাদের বুযুর্গদের সম্মুখে অপদস্ত হবে, যখন সকল মানুষ আমলের পূরা প্রতিদান লাভ করবে। তখন কাফফারা বা পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা মনে হবেনা, কোন বিশেষ বংশের সঙ্গে সম্পর্ক এবং মনগড়া আকীদা কোন কাজেই আসবেনা।

فَكَيْفَ إِذَا

جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۣ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ

مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ ز

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط

اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ

وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاۤءُ بِغَيْرِ

حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ

دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ

شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ

وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾

২৫. কিন্তু সেদিন (তাদের অবস্থা) কি হবে - যেদিন আমি সমগ্র মানব সন্তানকে (একই ময়দানে) একত্রিত করবো, যেদিনের আগমন সম্পর্কে কোনো দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ নেই। সেদিন প্রত্যেকটি মানব সন্তানকেই তার নিজস্ব (অর্জিত ভালো-মন্দের পুরোপুরি) বিনিময় দিয়ে দেয়া হবে[৩৬] এবং (এই পাওনা চুকিয়ে দেয়ার সময় সেদিন) কারো ওপর কোনো রকম যুলুম করা হবে না।[৩৭] ২৬. (হে নবী!) তুমি বলো, হে রাজাধিরাজ (যাবতীয় সার্বভৌমত্ব ও সাম্রাজ্যের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ) তুমি যাকে ইচ্ছা তাকেই এই সাম্রাজ্য দান করো। আবার (মুহূর্তেই) যার কাছ থেকে চাও) তা আবার কেড়েও নিয়ে নাও। যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মানিত করো, যাকে ইচ্ছা তুমি অপমানিত করো, সব রকমের 'ভালাই' তো তোমার হাতেই নিবদ্ধ। নিশ্চয়ই তুমি সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।[৩৮] ২৭. তুমিই রাতকে দিনের মাঝে শামিল করো, আবার দিনকে রাতের ভেতর শামিল করে[৩৯] (দিবারাত্রির বিবর্তন ঘটাও)। প্রাণহীন বস্তু থেকে তুমি (যেমন) প্রাণের আবির্ভাব ঘটাও, আবার প্রানহীন (আসাড়) বস্তু বের করে আনো প্রান সর্বস্ব জীব থেকে।[৪০] (অপরদিকে এই সৃষ্টিরাজির) যাকে ইচ্ছা তুমি বিনা হিসেবে রিযিক দান করো।[৪১] ২৮. ঈমানদার ব্যক্তিরা কখনো ঈমানদারদের রেখে অবিশ্বাসী কাফেরদের নিজেদের বন্ধু (কিংবা অভিভাবক) বানাবে না। যদি তোমাদের কেউ তা করে তবে (সে যেন জেনে রাখে যে) আল্লাহ্ তাআলার সাথে তার কোনো সম্পর্কই থাকবে না। তবে তাদের কাছ থেকে কোনো আশংকা কিংবা ভয় থাকলে) তোমরা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে[৪২] (সাময়িকভাবে তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে পারো) এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা তার নিজের ব্যাপারেই তোমাদের ভয় দেখাচ্ছেন (বেশী), (কারণ একদিন) আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।[৪৩]

---

৩৬. অর্থাৎ কল্পিক অপরাধের জন্য শাস্তি হবেনা। শাস্তি হবে সেসব কাজের জন্য যেগুলো অপরাধ বলে তারা নিজেরাই স্বীকার করবে। যে পরিমাণ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে, তার চেয়ে বেশী শাস্তি দেয়া হবেনা। আর কারো সামান্যতম নেকীও বরবাদ করা হবেনা।

৩৭. ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাজরান প্রতিনিধি দলের নেতা আবু হারেসা ইবনে আলকামা বলেছে যে, আমরা মোহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতি ঈমান আনলে রোম সম্রাট আমাদেরকে যে সম্মান আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন, তা সবই বন্ধ করে দেবেন। সম্ভব দোয়া-মুনাজাতের ভঙ্গিতে এখানে তার জবাব দিয়ে বলা হয়েছে যে, যেসব রাজা-বাদশাহর রাজত্ব-সাম্রাজ্য আর তাদের দেয়া সম্মানের জন্য তোমরা গর্বিত, তা নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। ভালোভাবে চিন্তা করে দেখ, সমস্ত রাজত্ব-সাম্রাজ্য আর সকল মান-ইজ্জতের আসল মালিক মহান আল্লাহ তায়ালা। সব কিছুই তার অসীম ক্ষমতার অধীনে। তিনি যাকে খুশী দান করেন, যার কাছ থেকে খুশী ছিনিয়ে নেন। রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য এবং তাদের ইজ্জত-সম্মান ছিনিয়ে নিয়ে মুসলমানদেরকে দান করা কি অসম্ভব কিছু? বরং তার ওয়াদা আছে যে, অবশ্যই তিনি দেবেন।

বর্তমানে মুসলমানদের সহায়-সম্বলহীন অবস্থা এবং দুশমনদের শক্তি দেখে এটা তোমাদের বুঝে আসবেনা। একারণেই ইহুদী এবং মোনাফেকেরা বিদ্রূপ করে বলতো যে, কোরাইশের আক্রমণে ভীত হয়ে মদীনায় পৌঁছে যারা শহরের দিকে আত্ম রক্ষার জন্য, পরিখা খনন করেছিলো সেসব মুসলমানরা কায়সার-কিসরার মুকুট আর সিংহাসন দখল করার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রোম ও পারস্যের যেসব সম্পদের কুনজী তিনি নবীর হাতে দিয়েছিলেন, খলীফা হযরত ওমর ফারুকের শাসনামলে তা কিভাবে মুসলমানদের মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে এই যে, এইসব বস্তুগত সাম্রাজ্য ও মান-ইজ্জত অতি তুচ্ছ বিষয়। মহান আল্লাহ তায়ালা যখন আত্মিক সাম্রাজ্যের সর্বশেষ স্থান অর্থাৎ নবুয়্যাত রেসালতের মর্যাদা বনী ইসরাইল থেকে এনে বনী ইসমাইল তথা হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর সন্তানদেরকে দান করেছেন, তখন রোম ও অনারবের বাহ্যিক সাম্রাজ্য আরবের বেদুইনদেরকে দান করা তার জন্য কি অসম্ভব ব্যাপার? এই দোয়া যেন এক ধরণের ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো। এতে বলা হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতে দুনিয়ার চেহারা পাল্টে যাবে। যে জাতিটি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো, তারা সাম্রাজ্য আর সম্মানের অধিকারী হবে। আর যারা বর্তমানে রাজত্ব করছে, নিজেদের কুকর্মের ফলে তারা অধঃপতন ও অপমানের গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে। সকল প্রকার কল্যাণ ও সৌন্দর্য তোমার হাতে নিহিত। সহীহ হাদীস শরীফে আছে ---- 'সকল মঙ্গল ও কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত। অমঙ্গল-অকল্যাণ তোমার কাছে পৌঁছায়না'।

৩৮. অর্থাৎ রাত্রিকে হ্রাস করে দিনকে বৃদ্ধি করেছেন, আর কখনো করেন এর বিপরীত। যেমন এক মওসুমে রাত্রি হয় ১৪ ঘন্টা আর দিন হয় ১০ ঘন্টা। কয়েক মাস পরে রাত্রের চার ঘন্টা কর্তন করে দিনের মধ্যে শামিল করে দেন। তখন রাত্রি হয় দশ ঘন্টার আর দিন হয় ১৪ ঘন্টার। (উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দেশগুলোতে এই হিসাবও চলেনা। শুধু বৃটেনই ফজর ও মাগরীব নামাযের সময়ের মধ্যে মওসূমের তারতম্যের

কারণে ছয়ঘন্টা তফাৎ হয়ে যায়)। -অনুবাদক। এসব উলট-পালট তোমার হাতে নিহিত রয়েছে। কারণ, চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি তোমার ইচ্ছা ছাড়া সামান্য তাড়াহুড়াও করতে পারেনা। মোটকথা, কখানো দিন বড় আর কখনো রাত্রি বড়।

৩৯. অর্থাৎ ডিম থেকে মুরগী এবং মুরগী থেকে ডিম, বীর্য থেকে মানুষ এবং মানুষ থেকে বীর্য, জাহেল থেকে আলেম এবং আলেম থেকে জাহেল, অপূর্ণ থেকে পূর্ণ এবং পূর্ণ থেকে অপূর্ণ বের করা তোমার কুদরতের কাজ।

৪০. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন, আগে আমাদের মধ্যে যে, বুযুর্গী-শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, তা সব সময় থাকবে। তারা আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে উদাসীন। তিনি যাকে ইজ্জত-সালতানাত-রাজত্ব ও মর্যাদা দান করেন, আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নেন। অপদস্ত করেন। তিনি জাহেলদের মধ্যে কামেল সৃষ্টি করেন, যেমন আরবের উম্মী-নিরক্ষরদের মধ্যে করেছেন। তিনি কামেলদের মধ্যেও জাহেল সৃষ্টি করেন, যেমন বনী ইসরাইলের মধ্যে করেছেন। আর যাকে ইচ্ছা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন বে-হিসাব রিযিক দান করেন।

৪১. অর্থাৎ যখন রাজত্ব কর্তৃত্ব, মান-ইজ্জত এবং সব রকম কর্মকান্ডের চাবি-কাঠি একমাত্র মহান আল্লাহর হাতে নিহিত, তখন মুসলমান ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধুত্ব উপেক্ষা করে আল্লাহর দুশমনদের বন্ধুত্ব-সৌহার্দের প্রতি অগ্রসর হওয়া তাদের জন্য শোভা পায় না। কারণ, তারাতো সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান রাখে। আল্লাহ এবং রাসূলের দুশমনরা কখনো তাদের বন্ধু হতে পারেনা। যারা এই চক্করে পড়বে, বুঝতে হবে যে, আল্লাহর বন্ধুত্ব-ভালোবাসার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। একজন মুসলমানের আশা-নিরাশা সব কিছুই কেন্দ্রীভূত হবে কেবল মহান আল্লাহর ওপর। আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে এ ধরণের সম্পর্ক যাদের রয়েছে, কেবল তেমন লোকেরাই তার আস্থা-ভালোবাসা ও সহযোগিতা পাওয়ার যোগ্য। অবশ্য কাজকর্ম ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে কাফেরদের বিরাট ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয় যুক্তি-বুদ্ধি ও শরীয়াত সম্মত উপায় অবলম্বন করা কাফেরদের সঙ্গে অসহযোগিতার হুকুম থেকে তেমনি ব্যতিক্রম, যেমনি সূরা আনফাল-এ পরিস্কার করে বলে দেয়া হয়েছে। যেমনি ভাবে সেখানে রন কৌশল গ্রহণ এবং দলে যোগদান করা মূলতঃ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পশ্চাৎপদ হওয়া নয়। কেবল দৃশ্যতঃই তা হয়-বাস্তবে নয়। তেমনিভাবে এখানেও 'কিন্তু তোমরা যদি তাদের থেকে রক্ষা পেতে চাও' এ আয়াতকেও এখানে দৃশ্যতঃ সহায়ক মনে করতে হবে। আমরা এটাকে উদারতা বলে অভিহিত করে থাকি। এ সম্পর্কে সূরা মায়েদায় এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সেখানে দেখে নিতে হবে। এ সম্পর্কে আমার একটা স্বতন্ত্র পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছে। যা রচিত হয়েছে হযরত উস্তাদজী (মওলানা মাহমূদুল হাসান)-এর-ঈঙ্গীতে। আল্লাহ তার রূহকে শান্তি দান করুণ। আমার এ স্বতন্ত্র পুস্তিকাও দেখা যেতে পারে।

৪২. অর্থাৎ মোমেনের অন্তরে আসল ভয় হওয়া উচিৎ খোদার। এমন কোন কাজ করবেনা, যা তার অসন্তুষ্টির কারণ হয়। যেমন, মুসলিম দলকে পাশ কাটিয়ে বিনা প্রয়োজনে কাফেরদের সঙ্গে ওপরে ওপরে এবং নীচে নীচে বন্ধুত্ব পাতা বা প্রয়োজনে বন্ধুত্ব স্থাপন কালে শরীয়ত নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা বা নিছক কল্পিত ও তুচ্ছ বিপদকে নিশ্চিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিপদ বলে মনে করা। এ ধরণের ব্যতিক্রম এবং শরীয়তের অনুমতিকে মনের খাহেশের অনুসরণের কৌশলে পরিণত করা। মনে রাখতে হবে যে, সকলকেই আল্লাহর আদালতে হাযির হতে হবে। মিথ্যা কূট-কৌশল দ্বারা সেখানে কোন কাজ হবেনা। অবকাশ-অনুমতির সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে মূল নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করাই সত্যিকার মোমেনের কাজ। মখলুক-সৃষ্টিকূলের চেয়ে খালেক বা স্রষ্টাকেই বেশী ভয় করা তার কর্তব্য।

৪৩. অর্থাৎ মানুষ তার নিয়ত এবং মনের কথা মানুষের কাছে গোপন রাখতে পারে, কিন্তু এভাবে সে আল্লাহকে ধোকা দিতে পারেনা। 'আর আল্লাহ তো বিপর্যয়কারী আর সংশোধনকামীকে জানেন। তাদেরকে পরখ করে নেন'।

قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ
أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ
نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ
سُوءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ
اللّٰهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

---

২৯. (হে নবী!) তুমি লোকদের বলে দাও তোমাদের মনের ভেতর যা কিছু তোমরা গোপন করে রাখো, কিংবা তা (সবার সামনে) প্রকাশ করে দাও তা (সর্ব অবস্থায়ই) আল্লাহ তাআলা, (ভালো ভাবে) অবগত হন[৪৪], (তিনি শুধু যে, তোমাদের মনের কথা জানেন, তাই নয়) আসমান জমীন ও (তাঁর আভ্যন্তরীন জিনিসের) তার সব কিছুই তিনি জানেন।

সর্বোপরি (সৃষ্ট,লোকের) সব কিছুর ওপর রয়েছে তার সার্বভৌম ক্ষমতা, তিনিই সকল শক্তির আধার[৪৫], ৩০. (এমন) একদিন (আসবে), যখন প্রত্যেকটি মানব সন্তান তার কৃতকর্মের (প্রত্যক্ষ) ফলাফল পেয়ে যাবে, ভালো হলো যেমনি সে মহা বিচারের দিন) তাকে সামনে দেখতে পাবে, (তেমনি ভাবে) খারাপ হলেও, তা সেখানে মজুত থাকবে তবে যে হতভাগ্য ব্যক্তির কৃতকর্ম খারাপ থাকবে, সে সেদিন কামনা করতে থাকবে যে, তার মধ্যে এবং (বিচারের এই) দিনটির মাঝে যদি দুস্তর একটা তফাৎ থাকতো![৪৬] (তাহলে তাকে আজ তারা দুস্কর্ম গুলো এভাবে দেখতে (হতোনা), আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তার নিজের (ভয়াবহ আযাব) থেকে ভয় দেখাচ্ছেন, কারন আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের সাথে অত্যন্ত বেশী অনুগ্রহশীল[৪৭] (বলে তিনি তোমাদের আগে ভাগেই এসব ব্যপারেসাবধান করে দিচ্ছেন)

৪৪. তার জ্ঞান যখন এতই ব্যাপক এবং ক্ষমতা যখন এতই সর্বাত্নক-সর্বব্যাপক, তখন অপরাধীর জন্য অপরাধ গোপন করা বা শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নাই।

৪৫. অর্থাৎ কেয়ামতের দিন নেকী-বদী সব কিছুই মানুষের সামনে হাযির হবে। সারা জীবনের আমলনামা হাতে তুলে দেয়া হবে। সেদিন অপরাধীরা আকাংখা করে বলবে। এ দিন যদি আমাদের থেকে দূরে থাকতো! বা এসব খারাব কাজের সঙ্গে আমাদের যদি দূরতম সম্পর্কও না থাকতো। অর্থাৎ আমরা যদি এইসবের কাছেও না যেতাম।

৪৬. এটাও তার মেহেরবানী যে, সে ভয়ংকর দিন আসার আগেই সে সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান-সতর্ক করে দেন, যাতে খারাবের উপায় বিশেষ করে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ত্যাগ করে এবং কল্যাণের পথে চলে সময় আসার আগেই নিজেকে মহান খোদার গযব থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করে নিতে পারে। কোরআনুল করীমের ইহা একটা বিশেষ ধারা যে, সাধারণতঃ ভয়ের সঙ্গে আশা এবং আশার সঙ্গে ভয়ের কথা শুনায়ে থাকে। এখানেও ভয়ের বিষয়কে সামঞ্জস্য করার জন্য শেষে '------আর আল্লাহ তো বান্দাহদের প্রতি দয়ালূ-বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাকে ভয় করে খারাব কাজ ত্যাগ করলে তার মেহেরবানী তোমাদেরকে খোশ আমদেদ জানাবার জন্য প্রস্তুত। নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। আস, তোমাদেরকে এমন পথ বলে দেই, যে পথে চলে তোমরা রহমত ও মাগফেরাতের পূর্ণ অধিকারী হতে পার; বরং হতে পার আল্লাহ তায়ালার প্রিয়পাত্রঃ

-'বল, তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসলে আমার অনুস্মরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন। আর আল্লাহতো মহা ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু'।

৪৭. আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে সখ্যতা-ভালোবাসা সম্পর্কে বারণ করার পর আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসার মানদন্ড বলে দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ কেউ আজ দুনিয়ায় সত্যিকার

মালিকের ভালোবাসার দাবী করলে তাকে মোহাম্মদ (দঃ)-এর অনুস্মরণের কষ্টিপাথরে যাছাই করে দেখতে হবে, নেকী ও খাঁটি সব যাছাই হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি যতটা আল্লাহর প্রিয় নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর পক্ষে এবং তার উপস্থাপিত আলোকে চলার পথকে মশাল করে নেয়, তাকে আল্লাহর ভালোবাসার দাবীতে ততটাই সত্য ও খাঁটি বলে জানবে। আর এ দাবীতে যে যতটা সত্য হবে, সে হুযুর (সঃ) এর অনুসরণে ততটা অটল-অবিচল ও প্রস্তুত থাকবে। এর ফল হবে এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালোবাসবেন। আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা এবং প্রিয় নবীর (সঃ) অনুসরণের বরকতে তার অতীতের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আর ভবিষ্যতে যাহেরী-বাতেনী নানা রকম মেহেরবানী তার ভাগ্যে জুটবে। যেন তাওহীদ ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ করে এখান থেকে আহবান জানানো হয়েছে।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ

اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ

تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى

اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾ اِذْ قَالَتِ

امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ

مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٥﴾

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ؕ وَاللّٰهُ

أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۗ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّي
سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا
نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا
الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ
لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ
مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ
قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ
سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

রুকু ৪

৩১. (হে নবী! লোকদের) তুমি বলো, তোমরা যদি আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসো, তাহলে (তার দাবী মোতাবেক) আমার কথা মেনে চলো, এতে করে আল্লাহ তাআলাও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং (এই ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে) তিনি তোমাদের গুনাহখাতা, মাফ করে দেবেন। (মূলত) আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[৪৮] ৩২. তুমি (তাদের আরো) বলো, (জীবনের সর্ব কাজে) আল্লাহ ও (তার) রসূলের কথা মেনে চলো। তারা যদি (তোমার দেখানো এই পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে (কোনো রকম গোঁড়ামির আশ্রয়) নেয় (তাহলে তারা যেন জেনে রাখে যে) আল্লাহ তায়ালা কখনো এই (গোড়ামীতে লিপ্ত) অবিশ্বাসকারীদের পছন্দ করেন না।[৪৯] ৩৩. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আদম, নূহ এবং ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদের[৫০] পৃথিবীর অন্যান্য

অধিবাসীদের ওপর (নেতৃত্বের জন্যে) বাছাই করে নিয়েছেন। ৩৪. (বিশ্বে নেতৃত্বে সমাসীন) এরা বংশানুক্রমে পরস্পর পরস্পরের বংশধর[৫১], আল্লাহ তায়ালা (সর্বকালেই সবার কথাবার্তা সম্যকভাবে) শুনতে পান এবং জানেন।[৫২] ৩৫. (স্মরন করে দেখো) যখন ইমরানের স্ত্রী বললো, হে আমার মালিক, আমার গর্ভে যে সন্তান আছে তাকে আমি (স্বাধীনভাবে) তোমার (দ্বীনের) জন্যে উৎসর্গ করলাম। (হে আমার মালিক) তুমি আমার পক্ষ থেকে (আমার উৎসর্গিত) এই সন্তানটিকে (তোমার দ্বীনের জন্যে) কবুল করে নাও। অবশ্যই তুমি (সব অজানা কথা) শোনো এবং (সব অদেখা বিষয়) জানো।[৫৩] ৩৬. অতপর (এক সময়) যখন ইমরানের স্ত্রী (সেই) সন্তান জন্ম দিলো, (তার দিকে তাকিয়ে) সে বললো, হে আমার মালিক, (একি হলো!) আমি তো এক মেয়ে সন্তান জন্ম দিয়েছি![৫৪] (এ সন্তানকে কিভাবে তোমার দ্বীনের জন্যে আমি উৎসর্গ করবে)। আল্লাহ তায়ালা তো ভালোভাবেই জানতেন, ইমরানের স্ত্রী কোন্ ধরনের (শিশু) জন্ম দিয়েছে। (যে মহান কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্যে এ শিশুর জন্ম সেই কথাই আল্লাহ বললেন যে,) ছেলে কখনো মেয়ের মতো (এই বিশেষ কাজের উপযোগী) হবেনা।[৫৫] (ইমরানের স্ত্রী বললো) আমি এই শিশুর নাম রাখলাম মরিয়ম, আমি এই শিশু ও তার (অনাগত) সন্তানকে অভিশপ্ত শয়তানের (অনিষ্ট) থেকে রক্ষার জন্যে তোমার কাছে আশ্রয় (ও সাহায্য) চাই।[৫৬] ৩৭. আল্লাহ তায়ালা (ইমরানের স্ত্রীর, এই দোয়া কবুল করলেন এবং) এই মেয়েটিকে (সেই মহান কাজের জন্যে) অত্যন্ত আগ্রহভরেই গ্রহণ করে নিলেন এবং (ধীরে ধীরে) এই মেয়েটিকে ফুলে ফুলে সুশোভিত করে ভালোভাবেই গড়ে তুললেন, (আর সে জন্যেই) আল্লাহ তাআলা তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বধানে রেখে দিলেন।[৫৭] (মেয়েটি যখন বড়ো হলো এবং) যখনি যাকারিয়া তার কাছে (তার নিজস্ব) ইবাদাতের কক্ষে যেতো, (তখনি দেখতে) পেতো সেখানে কিছু না কিছু খাবার[৫৮] (মজুদ রয়েছে খাবার দেখে) যাকারিয়া জিজ্ঞেস করতো হে মরিয়ম, এসব খাবার তুমি কোত্থেকে পাও? মরিয়ম জবাব দিতো, এ সবই (এসেছে আমার মালিক) আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে! (আর এটা তো জানা কথাই যে) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে বিপুল পরিমাণে দান করেন।[৫৯] ৩৮. (মেয়েটির আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠা দেখে) সেখানে (দাঁড়িয়েই) যাকারিয়া তার মালিকের কাছে দোয়া করলো, হে আমার মালিক, তুমি তোমার (কুদরতের অশেষ) ভান্ডার থেকে আমাকেও একটি নেক সন্তান দান করো, নিশ্চয়ই তুমি (মানুষের) ডাক শোনো।[৬০]

---

৪৮. ইহুদী খৃষ্টানরা বলতো---'আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তার প্রিয় পাত্র'। এখানে বলে দেয়া হয়েছে যে, কাফেররা কখনো আল্লাহর প্রিয় পাত্র হতে পারেনা। সত্যিই তার প্রিয়পাত্র হতে চাইলে তার নির্দেশ মেনে চলবে, পয়গম্বরের কথা মত কাজ করবে আল্লাহর সবচেয়ে বড় প্রিয়পাত্রের পদাংক অনুসরণের পথ অবলম্বন কর। নাজরান প্রতিনিধিদল একথাও বলে ছিল যে, আল্লাহর ভালোবাসা এবং তা'যীমের জন্যই আমরা মাসীহ-এর ইবাদাত ও তা'যীম করি। এখানে তাদেরও জবাব দেয়া হয়েছে। পরে আল্লাহ তায়ালার কিছু প্রিয় ও প্রেমিক বান্দাহর অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। নাজরান প্রতিনিধি দলের বিবেচনায়

হযরত মাসীহ (আঃ) জীবন বৃত্তান্ত কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মুবারক আলোচনার ভূমিকা। পরে এ সম্পর্কে জানা যাবে।

৪৯. ইমরান দু'জন। একজন হযরত মূসা (আঃ)-এর পিতা, অপরজন হযরত মারইয়ামের পিতা। আগে-পরের অধিকাংশ মনীষী এখানে দ্বিতীয় ইমরানের অর্থ গ্রহণ করেছেন। কারণ পরে ----'যখন ইমরানের স্ত্রী বললো'-থেকে এ দ্বিতীয় ইমরানের পরিবারের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এজন্যই 'আলে ইমরান' সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। কারণ এ সূরায় দ্বিতীয় ইমরানের পরিবার অর্থাৎ হযরত মারইয়াম ও মাসীহ (আঃ) ঘটনা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

৫০. আসমান-যমীন-চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র, গাছ-পালা-পাথর, ফেরেশতা-জিন সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার মখলুকাত বা সৃষ্টিকুলের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু আপন বিরাট জ্ঞান আর অশেষ রহস্য বলে তিনি দৈহিক ও আত্মিক পরিপূর্ণতার যে সমষ্টি দ্বারা আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) বিভূষিত করেছেন, তা অন্য কোন সৃষ্টি জীবকেই দেন নাই। বরং তিনি আদমকে (আঃ) ফেরেশতাদের সেজদার পাত্র করে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সকল সৃষ্টিকূলের মধ্যে আদমের মর্যাদা সকলের চেয়ে বেশী।

হযরত আদমের এ নির্বাচিত মর্যাদা-আমরা যাকে নবুয়্যাত বলে অভিহিত করি- এটা আদৌ তার ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল ছিলনা, ছিলনা কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বরং এটা স্থানান্তরিত হয় তার সন্তানদের মধ্যে হযরত নূহ (আঃ)-ও এ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। পরে হযরত নূহের (আঃ) সন্তানদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত পৌঁছে। এখান থেকে এক নূতন রূপ গ্রহণ করে। আদম ও নূহের পর দুনিয়ায় যত মানুষের আগমন ঘটে, তারা সকলেই ছিলো এদের বংশোদ্ভূত। এই দুই নবীর বংশের বাইরে কোন পরিবার দুনিয়াতে ছিলনা। পক্ষান্তরে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পর তার বংশধারা ছাড়াও দুনিয়ায় অনেক পরিবার বর্তমান ছিলো। কিন্তু যে আল্লাহ অসংখ্য-অগণিত সৃষ্টিকূলের মধ্যে নবুওয়্যাতের পদ-মর্যাদার জন্য হযরত আদম (আঃ)কে বাছাই করে নিয়েছিলেন, তারই সর্বব্যাপী জ্ঞান এবং নিরংকুশ এখতিয়ার এ মহান মর্যাদার জন্য ভবিষ্যতে হাজার হাজার পরিবারের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) পরিবারকে বেছে নিয়েছিলো, করেছিলো নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট। এ পরিবারে হযরত ইবরাহীম (আঃ) পর অনেক নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে। এরা সকলেই ছিলেন তার দুই পুত্র হযরত ইসহাক ও হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধর। যেহেতু বংশধারা শুমার করা হয় পিতার নামে, আর হযরত মাসীহ (আঃ) বাপ ছাড়াই পয়দা হয়েছিলেন, এই হিসাবে ধারণা নামে পারে যে, তাকে হযরত ইবরাহীমের বংশধারা বহির্ভূত মনে করতে হবে। একারণে আল্লাহতায়ালা জানায়ে দিয়েছেন যে, হযরত মাসীহ মাতা থেকে জন্ম গ্রহণ করেছেন বিধায় তাঁর বংশধারা মাতার ধারা থেকেই গ্রহণ করতে হবে। নাউযু বিল্লাহ- খোদার পক্ষ থেকে নয়। আর এটা স্পষ্ট যে, তার মাতা মারইয়াম ছিদ্দীকার পিতা ইমরানের

বংশধারাও শেষ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সিলসিলা পর্যন্ত পৌঁছায়। সুতরাং আলে ইমরান তথা ইমরানের বংশধারা আলে ইবরাহীম অর্থাৎ হযরত ইবরাহীমের বংশধারারই একটা শাখা। কোন পয়গম্বরই হযরত ইবরাহীমের খান্দানের বাইরে নয়।

৫১. তিনি সকলের দোয়া, সকলের কথা শুনেন এবং সকলের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল অবস্থা ও যোগ্যতা-ক্ষমতা সম্পর্কে জানেন। সুতরাং এমন ধারণা করা উচিৎ নয় যে, এমনিতে বুঝি অবিবেচকের মতো তিনি বাছাই করে নিয়েছেন। তার সমস্ত কাজই পূর্ণ জ্ঞান ও অসীম রহস্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৫২. ইমরানের স্ত্রীর নাম হেনা বিনতে ফাকুয়া। তিনি তাঁর সময়ের রেওয়াজ অনুসারে, মান্নত করেন, 'পরওয়ার দেগার', আমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে, আমি তাকে 'মুহাররার' অর্থাৎ তোমার নামে আযাদ তথা উৎসর্গ করছি। এর অর্থ ছিল এ যে, সে হবে সকল জাগতিক কাজকর্ম এবং বিবাহ বন্ধন ইত্যাদি থেকে মুক্ত। এসব থেকে মুক্ত হয়ে সে সর্বদা আল্লাহর ইবাদত এবং গীর্জার সেবা নিয়োজিত থাকবে। 'প্রভুহে ! তুমি আপন মেহেরবাণীতে আমার মান্নত কবুল কর। তুমি আমার আরয শুন এবং আমার নিয়ত ও নিষ্ঠা সম্পর্কে জান।' যেন সুক্ষ্মভাবে আরয করা হয়েছিল যে, একটা পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করুক। কারণ, এ সেবার জন্য কন্যাদেরকে গ্রহণ করা হয়না।

৫৩. আক্ষেপ, অনুতাপ করে এটা বলেছিলেন। কারণ, একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছিল। আর কন্যা সন্তান এই সেবার কাজে গ্রহণ করার নিয়ম ছিলনা।

৫৪. এটা মধ্যখানে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব হিসাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে জানেনা যে, কি জিনিষ জন্ম দিয়েছে। সে কন্যা সন্তানের মূল্য আল্লাহই জানেন। যে ধরনের কন্যা সন্তানের আকাংখ্যা তার ছিলো, তা এ কন্যা দ্বারা কি করে লাভ করবে? এ কন্যাতো এমনিতেই মোবারক ও ভাগ্যবতী। তার অস্তিত্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এক মহান পুত্র সন্তানের অস্তিত্ব।

৫৫. আল্লাহ তায়ালা এ দোয়া কবুল করেছেন। হাদীস শরীফে আছে; ভূমিষ্ট হওয়ার সময় সন্তান যখন মায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে, তখন শয়তান শিশুকে স্পর্শ করে। কিন্তু ঈসা (আঃ) ও মারইয়াম এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। অন্যান্য হাদীসের আলোকে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, শিশু জন্ম গ্রহণ করে সুস্থ প্রকৃতি নিয়ে, শিশুর এ প্রকৃতি প্রকাশ পায় বড় হয়ে তার মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধির উন্মেষের পর। কিন্তু পারিপার্শিক অবস্থা এবং বাইরের প্রভাবের ফলে অনেক সময় তার আসল প্রকৃতি চাপা পড়ে যায়। হাদীস শরীফে এটাই বলা হয়েছে।

অতঃপর শিশুর পিতা-মাতা তাকে ইহুদী-খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক বানায়। ঈমান ও আনুগত্যের বীজ তার প্রকৃতির গভীরে নিহিত রয়েছে। কিন্তু তা দেখা যায়না। তখন ঈমান তো দূরের কথা, মোটা মোটা বিষয়ের অনুভূতিও তার থাকেনা। কিছু বুঝতে পারেনা সে। এমনি ভাবে বাইরের প্রভাব বিস্তারও শুরু হয় জন্মের পর এক ধরনের

শয়তানের স্পর্শের ফলে, তাও এখানে দেখা যায়না। এমনকি অনুভবও করতে পারেনা। সকলকেই এ শয়তানী স্পর্শের প্রভাব গ্রহণ করতে হবে, এমন কোন কথা নাই। আবার গ্রহণ করলেও ভবিষ্যতেও তা বহাল থাকবে-- এমনও নয়। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু সমস্ত নবীদের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাই যদি ধরেও নেয়া হয় যে, শিশুর জন্মের প্রাথমিক পর্যায়ে তাদেরও এ অবস্থা হয়েছিল, তারা মারইয়াম ও ঈসা (আঃ) এর মতো এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না, তা হলেও সেসব পবিত্র ও মাসুম বান্দাহদের ওপর শয়তানের এহেন কান্ডের কোন ক্ষতিকর প্রভাব যে আদৌ পড়তে পারেনা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পার্থক্য হবে কেবল এটুকু যে, আল্লাহর বিবেচনায় বিশেষ কোন কারণে মারইয়াম ও হযরত ঈসা (আঃ) আদৌ এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হলেও তার কোন ক্রিয়া হয়নি তাদের ওপর। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্য সার্বিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের কারণ হতে পারেনা।

হাদীস শরীফে আছে যে, দুজন বালিকা একদিন কিছু কবিতা আবৃত্তি করছিল। আল্লাহর নবী সে দিক থেকে মুখ ফিরায়ে নেন। অতঃপর হয়রত আবু বকর আগমন করেন। কিন্তু বালিকারা যথারীতি আবৃত্তি করেই চলছে। এর পর হযরত ওমর উপস্থিত হলে বালিকারা পালিয়ে যায়। আল্লাহর নবী বলেছেন, ওমর যে পথে যায়, শয়তান সে পথ ছেড়ে পালায়। কোন সুবোধ ব্যক্তি কি এর এ অর্থ গ্রহণ করবে যে, আল্লাহর নবী হযরত ওমরকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং বুজুর্গ প্রমাণ করছেন? অবশ্য হযরত আবু হোরয়ারা বর্নিত শয়তানের স্পর্শের হাদীসকে এ আয়াতের তাফসীর হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক হবেনা। এ আয়াত কে তরতীব বা পর্যায়ক্রমের অর্থেও গ্রহণ করা যাবেনা। এ হাদীসে ব্যতিক্রম দ্বারা মারইয়ামের গর্ভে মাসীহ (আঃ)- এর জন্মের ঘটনা গ্রহণ করা হবে। মারইয়াম ও মাসীহকে পৃথক পৃথক অর্থে গ্রহণ করা হবেনা। বোখারী শরীফের এক বর্ননায় কেবল হযরত ঈসার (আঃ) উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

৫৬. অর্থাৎ যদিও সে ছিলো কন্যা সন্তান, কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তাকে পুত্র সন্তানের চেয়ে বেশী কবুল করেছেন। সাধারণ নিয়মের বিরুদ্ধে কন্যা সন্তানকে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য বায়তুল মাকদেস এলাকায় লোকজনের মনকে তিনি প্রস্তুত করছিলেন। এমনিতেই তাঁর বাহ্য আকৃতি ছিলো গ্রহণ করে নেয়ার মতো। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মাকবুল বান্দাহ হযরত যাকারিয়ার দায়িত্বে তাঁকে দিয়েছিলেন, আর নিজ দরবারে তাঁকে কবুল করে নিয়েছিলেন। দৈহিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক- সব দিক থেকেই তাঁকে অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তার লালন পালনের বিষয়ে প্রতিবেশীদের মত বিরোধ দেখা দিলে লটারীর মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়। লটারীতে হযরত যাকারিয়ার নাম উঠে। সাব্যস্ত হয় যে, খালার স্নেহ-ছায়ায় তিনি প্রতিপালিত হবেন এবং হযরত যাকারিয়ার জ্ঞান ও বিচক্ষণতা ক্ষমতা দ্বারা তিনি উপকৃত হবেন। হযরত যাকারিয়া সর্বাত্নক চেষ্টা করেন। তিনি বড়ো হলে মসজিদের কাছের হুজরা তার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। মারইয়াম সারাদিন সেখানে এবাদতে মশগুল থাকতেন এবং রাত্র খালার গৃহে কাটাতেন।

৫৭. অধিকাংশ মনীষীর মতে 'রিযিক' এর অর্থ বাহ্যিক খাবার। কথিত আছে হযরত মারইয়ামের জন্য যে মৌসূমী ফল আসতো, শীত মওসুমে গ্রীষ্মের আর গ্রীষ্মকালে শীত মওসুমের। মোজাহিদ থেকে বর্নীত এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী রিযিক অর্থ ইলমী ছহীফা-জ্ঞানের পুস্তক। এটাকে অধ্যাত্মিক খাদ্য বলা হয়। যা হোক, এখন মারইয়ামের বরকত তথা অস্বাভাবিক নিদর্শন প্রকাশ পেতে শুরু করেছে প্রকাশ্য ভাবেই। বারবার এসব দেখে হযরত যাকারিয়া সহ্য করতে পারেন নাই। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মারইয়াম! তোমার কাছে এসব জিনিস কোথা থেকে আসে?

৫৮. অর্থাৎ খোদার কুদরত এমনভাবে এসব জিনিস আমার কাছে পৌছায়, ধারনা-কল্পনার অতীত।

৫৯. হযরত যাকারিয়া অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর স্ত্রী ছিলো বন্ধ্যা। সন্তানাদী হওয়ার বাহ্যিক কোন আলামত ছিলনা। মারইয়ামের নেকী, বরকত এবং এসব আলৌকিক কান্ড দেখে তার অন্তরেও হঠাৎ জোশের জোয়ার সৃষ্টি হয়। মনে ভাব জাগে যে, আমিও সন্তানের জন্য দোয়া করি। আশা করা যায় আল্লাহ্ তায়ালা তা শুনবেন।

৬০. তাঁর দোয়া কবুল হয়। তাঁকে সূসংবাদ দেয়া হয় যে, পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করবে। সন্তানের নাম রাখা হয় ইয়াহইয়া।

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ

فِي الْمِحْرَابِ ۙ أَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًۢا

بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾

قَالَ رَبِّ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ

وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ

ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ

بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٤١﴾

৩৯. (তার আকুতিপূর্ণ দোয়ার জবাব দিতে গিয়ে) ফেরেশতারা (আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে) ডাকলো-এমন এক সময় যখন সে ইবাদতের কক্ষে নামায আদায় করছিলো-(ফেরেশতারা বললো, হে যাকারিয়া আল্লাহ্ তায়ালা তোমার ডাক শুনেছেন) আল্লাহ তোমাকে (তোমার কাংখিত সুসন্তান ইয়াহইয়ার (জন্ম) সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন-৬১ (তোমার সে সন্তান আল্লাহর) বিধি-বিধানের সত্যতা প্রমাণ করবে৬২, সে হবে সমাজের নেতা, সে হবে সততার প্রতীক৬৩, সে হবে নবী, সর্বোপরি সে হবে সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের দলে শামিল।৬৪ ৪০. (এসব কথা শুনে) যাকারিয়া বললো - হে আমার মালিক, (এ আবার কিভাবে সম্ভব?) আমার ঘরে ছেলে (র জন্ম) হবে কিভাবে (একেতো) আমি নিজে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে গেছি, (তদুপরি) আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা (সন্তান ধারণে পুরোপুরিই অক্ষম), আল্লাহ বললেন, এভাবেই (আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেন) আল্লাহ তাআলা যা চান তাই তিনি করেন।৬৫ ৪১. যাকারিয়া নিবেদন করলো, হে মালিক (এমনি একটি অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘঠিত হওয়ার কিছু পূর্ব) লক্ষণ তুমি আমার জন্যে ঠিক করে দাও।৬৬ আল্লাহ তাআলা (তাঁর বান্দার নিবেদন মঞ্জুর করলেন এবং) বললেন, (সন্তান আগমনের ব্যাপারে) তোমার লক্ষণ হবে এই যে, তুমি তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা ইংগিত ছাড়া কোনো কথাবার্তা বলতে সক্ষম হবে না।৬৭ (এই অবস্থা দেখা দিলে) তুমি তোমার মালিককে বেশী বেশী স্মরণ করবে এবং সকাল সন্ধ্যায় তাঁর (পবিত্র নামের) তসবীহ পাঠ করতে থাকবে।

---

৬১. এক নির্দেশের অর্থ এখানে হযরত মাসীহ (আঃ)। ইনি আল্লাহর হুকুমে বাপ ছাড়াই পয়দা হন। হযরত ইয়াহিয়া। হযরত ইয়াহিয়া আগে থেকে লোকদেরকে সংবাদ দেন যে, মাসীহ (আঃ) জন্ম নেবেন।

৬২. অর্থাৎ মনস্কামনা ও যৌন আবেগ থেকে তিনি অনেকাংশে বিরত থাকবেন। তিনি আল্লাহর এবাদতে এত মশগুল থাকেন যে,নারীর প্রতি লক্ষ্য করার সুযোগই তাঁর ঘটতো না। এটা হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এর বিশেষ অবস্থা। শেষ নবীর উম্মতের জন্য এটাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। আমাদের নবীর (সাঃ) সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এ যে, তিনি সামাজিকভাবে পূর্ণতার সঙ্গে এবাদাতের পূর্ণতার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন।

৬৩. অর্থাৎ কল্যাণ ও দিব্যদৃষ্টির উন্নত স্তরে পৌছবেন, যাকে নবুওয়্যাত বলা হয়। অথবা ছালেহ্ এর অর্থ পরিশীলিত। অর্থ্যাৎ তিনি হবেন অত্যন্ত পরিশীলিত, অত্যন্ত মার্জিত।

৬৪. অর্থাৎ তাঁর কুদরত ও ইচ্ছা কর্ম কারণ পরস্পরের অধীন নয়। যদিও এ বিশ্বে তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস এ যে, তিনি নৈমিত্তিক কার্যকারণ দ্বারাই এর ফল নিরুপণ করেন।

কিন্তু মাঝে মধ্যে এ অভ্যাসের ব্যতিক্রম করাও তার বিশেষ অভ্যাস। আসল কথা এ যে, মারইয়াম ছিদ্দিকার কাছে অলৌকিকভাবে রিযিক পৌঁছা, অনেক অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশ পাওয়া, এসব দেখে হযরত মারইয়ামের হুজরায় হযরত যাকারিয়ার অকস্মাৎ দোয়া করা, অতএব তার বন্ধ্যা স্ত্রীকে অস্বাভাবিকভাবে সন্তান দান করা, এসব নিদর্শনকে কুদরতের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহর অসীম নিদর্শনের ভূমিকা বলে মনে করতে হবে, যা হযরত মারইয়াম দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে কোন পুরুষের মিলন ছাড়াই প্রকাশিত হবে। যেন হযরত ইয়াহিয়ার অস্বাভাবিক জন্ম 'এমনিভাবে আল্লাহ যা খুশী করেন বলা' তা করেন-এর

ভূমিকা ছিলো, যা পরে হযরত মাসীহ-এর অস্বাভাবিক উপায়ে জন্মগ্রহণ প্রসঙ্গে সংঘটিত হবে।

৬৫. যার ফলে জানা যাবে যে, এখন গর্ভ ধারণ হয়েছে। যার ফলে জন্ম গ্রহণ পূর্বের অবস্থা দেখে নূতন আনন্দ লাভ হয় এবং নেয়ামতের শোকর আদায়ে আগের চেয়ে বেশি নিয়োজিত থাকতে পারি।

৬৬. অর্থাৎ যখন তোমার অবস্থা এ দাঁড়ায় যে, ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া তিন দিন পর্যন্ত কারো সঙ্গে কথা বলতে না পার, এবং তোমার যবান একমাত্র আল্লাহর যিকিরের জন্য ওয়াকফ হয়ে যায়, তখন বুঝবে যে, গর্ভধারণ স্থির হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। লক্ষণও এমন স্থির করা হয়েছে, যা অতুলনীয়, আর অবগত হওয়ার যে উদ্দেশ্য ছিলো অর্থাৎ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা, তা পূর্ণভাবে অর্জিত হয়। যেন আল্লাহর যিকির শোকর ছাড়া ইচ্ছা করলেও মুখে অন্য কোন কথাই বলতে পারবে না।

৬৭. অর্থাৎ এখন বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং সকাল-বিকাল তাসবীহ-তাহলীলে নিয়োজিত থাকবে। জানা যায় যে, মানুষের সাথে কথা বলতে না পারা যদিও ছিল অস্বাভাবিক, যাতে সে দিনগুলোকে কেবল যিকির শোকরের জন্য একান্ত ভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু তাঁর নিজের যিকির ফিকিরে মাশগুল থাকা কোন অস্বাভাবিক কাজ ছিল না। তাই এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ

الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ

مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿৪৩﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ

اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ

يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿৪৪﴾

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖق

اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا

وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿৪৫﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى

الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿৪৬﴾ قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى

يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ

يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ

فَيَكُوْنُ ﴿৪৭﴾ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ

وَالْاِنْجِيْلَ ﴿৪৮﴾ وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْۤ اِسْرَآئِيْلَ ۙ۬ اَنِّىْ قَدْ

جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْۤ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ

كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ

وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ
اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي
بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾

রুকু ৫

৪২. (অতপর মরিয়ম বয়ঃপ্রাপ্তা হলো, তখনকার কথা স্মরন করো) যখন আল্লাহর ফেরেশতারা (এসে) বললো, হে মরিয়ম, আল্লাহ তাআলা নিসন্দেহে তোমাকে (এক মহান কাজের জন্যে) বাছাই করেছেন এবং (এজন্যে এবাদতের দীর্ঘ সাধনায় রেখে) তোমাকে তিনি পবিত্র করেছেন, বিশ্বের নারীকুলের ওপর তিনি তোমাকে (একটি গুরু দায়িত্বের জন্যে) নির্বাচিত করেছেন।[৬৯] ৪৩. (সেই দায়িত্বের যোগ্য হওয়ার জন্যে) তুমি সর্বদা তোমার মালিকের হয়ে থাকো। তাঁর কাছে (আনুগত্যের) মাথা নত করো[৭০], অন্য ইবাদতকারীদের মতো তুমিও (তাদের দলে শামিল হয়ে) আল্লাহর সামনে অবনত হও।[৭১] ৪৪. (হে নবী!) এর সবই (হচ্ছে) অদৃশ্যালোকের সংবাদ, আমিই এগুলো ওহীর মাধ্যমে তোমাকে জনিয়েছি[৭২], নতুবা তুমি তো সেখানে তাদের পাশে হাযির ছিলে না, যখন (ইবাদতখানায় পুরোহিতরা) মরিয়মের পৃষ্ঠপোষক কে হবে এটা নির্বাচনের জন্যে 'তীরবাজি' করছিলো, আর (মরিয়মের পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারটা নিয়ে) তাদের এ বিতর্কের সময়ও তুমি তাদের ওখানে উপস্থিত ছিলে না।[৭৩] ৪৫. অতঃপর যখন ফেরেশতারা বললো, হে মরিয়ম! অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে (এক পুত্র সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত) নিজস্ব এক বানীর সুসংবাদ দিচ্ছেন - তার নাম হবে মসীহ (মরিয়মের পুত্র ঈসা হিসেবে সে পরিচিত হবে) দুনিয়া, আখেরাতের উভয় স্থানেই সে হবে সম্মানিত, সে হবে আল্লাহ তায়ালা সান্নিধ্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম।[৭৪] ৪৬. সে দোলনায় থাকা অবস্থায় (যেমন) মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে, পরিণত বয়সেও (তেমনিভাবে) কথা বলবে, বস্তুত সে হবে নেককার মানুষদের একজন।[৭৫] ৪৭. (এ কথা শুনে) মরিয়ম বললো, হে আমার মালিক, আমার (গর্ভে) সন্তান আসবে কোত্থেকে? আমাকে তো কখনো কোনো মানব সন্তান স্পর্শ করেনি![৭৬] আল্লাহ বললেন, এই ভাবেই আল্লাহ যাকে চান তাকে (মানুষের স্পর্শ তথা সন্তান উৎপাদনের চিরাচরিত নিয়ম ছাড়াই) পয়দা করেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত করেন, তখন শুধু তাকে বলেন - হয়ে যাও, অতপর (সাথে সাথে) তা (সংঘটিত) হয়ে যায়।[৭৭] ৪৮. (ফেরেশতারা মরিয়মকে আরো বললো) তোমার সন্তানকে আল্লাহ তায়ালা তার কিতাব ও প্রজ্ঞাময় বিষয়গুলো শেখাবেন, (সাথে সাথে তিনি তাকে আল্লাহর কিতাব) তাওরাত ও ইনজীলের জ্ঞানও শিক্ষা দেবেন।[৭৮] ৪৯. এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে

বনী ইসরাঈলদের কাছে রসূল করে (পাঠাবেন অতপর আল্লাহর রসূল হয়ে আসার পর সে বনী ইসরাঈলদের উদ্দেশ্য বললো) আমি নিসন্দেহে তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে (নবী হওয়ার প্রমান হিসেবে কিছু) নিদর্শন নিয়ে এসেছি।[৭৯] (সে নিদর্শনগুলো হচ্ছে) আমি তোমাদের জন্যে (তোমাদের সামনেই) মাটি দ্বারা পাখির মতো করে একটি আকৃতি গঠন করবো এবং পরে তাতে ফুঁ দেবো, (তোমরা দেখবে মাটি সদৃশ) আকৃতিটি আল্লাহর ইচ্ছায় (জীবন্ত) পাখি হয়ে যাবে[৮০] (একই ভাবে) আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভালো করে দেবো, (এমনকি আল্লাহর নামে) আমি মৃতকেও জীবিত করে দেবো।[৮১] আমি তোমাদের (আরো) বলে দেবো, তোমরা নিজ ঘরে কি কি জিনিস খাও, আবার কি কি জিনিস (না খেয়ে) জমা করে রাখো[৮২], মূলত এর মাঝে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে (আরো বহু) নিদর্শন রয়েছে, অবশ্য তোমরা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকো (তাহলেই এই নিদর্শন তোমাদের কাজে লাগবে)।

---

৬৮. হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর ঘটনা প্রাসংগিকভাবে মধ্যখানে এসে পড়েছে। এ ঘটনায় ইমরান-পরিবারকে নির্বাচিত করার তাকীদ এবং হযরত মাসীহ (আঃ) ঘটনার ভূমিকা ছিলো। হযরত যাকারিয়ার ঘটনা এখানে শেষ করে পুনরায় মাসীহ ও মারইয়ামের ঘটনার প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আগে হযরত মাসীহ (আঃ)-এর মাতার মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ফেরেশতারা মারইয়ামকে বলেছিলেন যে, আল্লাহ তোমাকে প্রথম দিন থেকেই বাছাই করে নিয়েছিলেন যে, কন্যা সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে স্বীয় নিয়াযের জন্য কবুল করে ছিলেন। তাকে নানা রকমে উচ্চ মর্যাদা এবং উন্নত নিদর্শন দান করেছেন। সুন্দর স্বভাব-চরিত্র, পূত-পবিত্র প্রকৃতি এবং যাহেরী-বাতেনী পরিচ্ছন্নতা দ্বারা আপন মসজিদের খেদমতের যোগ্য করে তাঁকে গড়ে তোলেন, নানা বিষয়ে দুনিয়ার অন্যান্য নারীদের ওপর তোমাকে মর্যাদা দান করেছেন। যেমন, এমন যোগ্যতা তাঁর মধ্যে নিহিত রাখা হয়েছে যে, কোন পুরুষের স্পর্শ ছাড়া কেবল তার অস্তিত্ব থেকেই হযরত মাসীহ (আঃ) মত মহান পয়গাম্বর জন্মলাভ করবেন। দুনিয়ায় কোন নারীই এ বৈশিষ্ট্য লাভ করেননি।

৬৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন তোমাকে এমন মর্যাদা ও উচ্চাসন দান করেছেন, তখন তোমার কর্তব্য হচ্ছে, নিষ্ঠা ও বিনয়ের সঙ্গে সর্বদা আপন পরওয়ার দেগারের সম্মুখে অবনত হয়ে থাকা। এবাদাতের নৈমিত্তিক দায়িত্ব পালনে আগের চেয়েও বেশি তৎপরতা প্রদর্শন করা। যাতে আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে যে মহান কার্য সম্পাদনের মাধ্যম করতে চান, তা সম্পন্ন হতে পারে, প্রকাশ পেতে পারে।

৭০. যেমন রুকু'কারীরা আল্লাহর সামনে রুকু' করে, তুমিও তেমনিভাবে রুকূ' করতে থাকবে। অথবা এর অর্থ এ যে, জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায় কর। আর যেহেতু অন্ততঃ রুকু'তে ইমামের সঙ্গে শরীক হলে সে রাকাআত নামায পেয়েছে বলে ধরা হয়, তাই হয়তো রুকু' দ্বারা নামায বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ফাতওয়ায়

তাঁর বক্তব্য থেকেও এটাই বুঝা যায়। বাকী আল্লাহই ভালো জানেন। এ অর্থে কুনূত দ্বারা যদি কেয়াম বা দন্ডায়মান হওয়ার অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে কেয়াম-রুকু, সেজদা নামাযের তিনটা বিশেষ অবস্থার উল্লেখও আয়াতে হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ তখন স্বাভাবিক ভাবে নারীদের জামায়াতে শরীক হওয়া জায়েয ছিলো বা বিশেষ ফেৎনা থেকে নিরাপদ অবস্থায় জায়েয ছিলো, বা এটা ছিলো মারইয়ামের বৈশিষ্ট্য অথবা মারইয়াম তাঁর হুজরায় থেকে একাকী অথবা অন্য নারীদের সঙ্গে ইমামের ইক্তিদা করে নামায আদায় করতেন। এ সবের যে কোন একটা হতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন।

৭১. অর্থাৎ বাহ্যিক দিক থেকে তুমি কোন পড়া লেখা জানা লোক নও। পূর্ব থেকে আহলে কিতাবদের এমন কোন উল্লেখযোগ্য সান্নিধ্যও অর্জিত ছিল না, যার ফলে বিগত কালের ঘটনাবলীর এমন সুক্ষ্ম জ্ঞান লাভ হতে পারে। আর সান্নিধ্য অর্জিত হলেই বা কি লাভ তারা নিজেরাই তো নানা ধারনা কল্পনা আর কল্প-কাহিনীর চোরাবালীতে হাবুডুবু খাচ্ছে। কেউ শত্রুতায় পড়ে আর কেউ সীমাতিরিক্ত ভালোবাসায় পড়ে সঠিক ঘটনা বিকৃত করে রেখেছে। তবে অন্ধের চক্ষুর কাছে থেকে আলো লাভ করার কি আশা থাকতে পারে? এহেন পরিস্থিতিতে মদনী এবং মক্কী-উভয় প্রকার সূরাগুলোতে এসব ঘটনা এমন সবিস্তারে বর্ণনা করা-যা কিতাবের জ্ঞানের বিরাট দাবীদারদের চক্ষুও ছানাবড়া করে দেয়, অস্বীকার করার ক্ষমতা কারো মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না। এটা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ওহীর মাধ্যমে তোমাকে এ জ্ঞান দেয়া হয়েছে। কারণ, তুমি স্বচক্ষে এসব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করনি, জ্ঞান লাভ করার বাইরেলের কোন উপায়ও তোমার ছিলো না।

৭২.মান্নতে যখন হযরত মারইয়ামকে কবুল করে নেয়া হয়, তখন তাঁকে কার প্রতিপালনে রাখা হবে, এ নিয়ে মসজিদের প্রতিবেশীদের মধ্যে ঝগড়া হয়। অবশেষে লটারীর ব্যবস্থা করতে হয়। সকলেই স্বস্ব কলম প্রবাহমান পানিতে নিক্ষেপ করে, যে কলম দিয়ে তারা তাওরাত লিখতো। ঠিক হয় যে, যার কলম পানির গতির সঙ্গে প্রবাহিত না হয়ে বরং বিপরীত দিকে প্রবাহিত হবে, তাকেই হকদার মনে করা হবে। এ লটারীতেও হযরত যাকারিয়ার নাম উঠে এবং হকদারের কাছেই হক পৌঁছে।

৭৩, হযরত মাসীহ (আঃ) কে এখানে এবং কোরআন হাদীসের কয়েক স্থানে আল্লাহর বাণী বলা হয়েছে, 'মাসীই তো হচ্ছে ঈসা ইবনে মারইয়াম। তিনি আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বাণী। যা তিনি প্রেরণ করেছেন মারইয়ামের কাছে এবং তাঁর আত্মা বা আদেশ'। (সূরা নিসা ১৭১)। এমনি তো কালেমাতুল্লাহ বা আল্লাহর বাণী অসংখ্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে 'বল, সমুদ্র যদি হয় আমার পরওয়ারদেগারের বাণীর জন্য কালী, তবে আমার পরওয়ারদেগারের বাণী শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র শুস্ক হয়ে যাবে, অনুরূপ আরো সমুদ্রের কালী আনলেও'। (সূরা কাহাফ ১০৯)। কিন্তু বিশেষ করে হযরত মাসীহকে কালেমাতুল্লাহ বা আল্লাহর বাণী বলা হয়েছে এজন্য যে, তাঁর জন্ম হয়েছে পিতার মাধ্যম ছাড়া, অসাধারণ কার্যকারণ পরম্পরার বিপরীতে কেবল আল্লাহর হুকুমেই। আর যে কাজ

সাধারন চিরায়ত কার্যকারণ ধারার বাইরের, তাকে সরাসরি আল্লাহর কাজ বলা হয়। যেমন বলা হয়েছে, 'আর যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করনি। বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন'। (আনফাল ১৭)।

মাসীহ মূল হিব্রু ভাষায় ছিলো 'না-শীহ' বা 'নাশিহা'। এর অর্থ মুবারক বা বরকতময়, পূণ্যময়। অন্য ভাষা থেকে আরবী শব্দে হয়েছে 'মাসীহ'। দাজ্জালকে যে মাসীহ বলা হয়, সকলেই একমত যে, তা আরবী শব্দ। এর নামকরণ সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। মাসীহ এর অপর নাম বা লকুব ঈসা। মূল হিব্রু ভাষায় শব্দটি ছিলো 'ঈশূ'। ঈশা হচ্ছে এর আরবীরূপ। অর্থ সাইয়্যেদ বা নেতা-কর্তা। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কোরআন করীম এখানে ইবনে মারইয়াম শব্দটিকে হযরত মাসীহ-এর নামের অংশ হিসেবে ব্যবহার করেছে। কারণ, স্বয়ং মারইয়ামকে সুসংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমাকে কালেমাতুল্লাহর-আল্লাহর বাণীর সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে, যার নাম হবে ঈসা ইবনে মারইয়াম। ঈসার পরিচয় দেয়ার জন্য এটা বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়ার জন্য যে, পিতা না থাকার কারণে মাতার নামেই কেবল পরিচিত হবে সে। এমনকি মানুষকে আল্লাহর এহেন বিস্ময়কর নিদর্শন সর্বদা স্মরণ করায়ে দেয়া এবং মারইয়ামের বুযুর্গী যাহির করার জন্য যেন তাকে নামের অংশ করা হয়েছে।

মনূষ্যত্বের দাবী হিসেবে এ সুসংবাদ শুনে হযরত মারইয়ামের অস্থির হওয়া স্বাভাবিক ছিলো এ জন্য যে, শুধু নারী থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করাকে দুনিয়া কিভাবে মেনে নেবে। নিরুপায় হয়ে তারা আমাকে অপবাদ দেবে আর শিশুকে সব সময় খারাপ নামে ডেকে উত্যক্ত করবে। আমি কি করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবো। এ জন্যই পরে দুনিয়া এবং আখেরাতে মর্যাদাবান বলে তাকে আশ্বস্ত করা হয়েছে, আল্লাহ কেবল পরকালেই নয়, বরং ইহকালেও তাকে বিরাট সম্মান-মর্যাদা দান করবেন। দুশমনদের সকল অভিযোগকে করবেন মিথ্যা প্রমাণিত।

হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কেও 'ওয়াজীহ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ 'হে ঈমানদাররা! যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মত হবে না। তারা যা কিছু রটনা করেছে অতঃপর আল্লাহ তাকে সেসব থেকে মুক্ত করেছেন। আর আল্লাহর কাছে সে তো মর্যাদাবান'। (সূরা আহযাবঃ ৬৯)। যেন যারা সত্যি সত্যিই ওয়াজীহ বা মর্যাদাবান হন, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিশেষভাবে মিথ্যা অভিযোগ ও উপহাস-বিদ্রুপ থেকে রক্ষা করেন। হযরত মাসীহ এর বংশধারা সম্পর্কে যে পাপাচারী দুরাচারী বিদ্রুপ করবে, খোদাকে বা কোন মানুষকে মিছামিছি তার পিতা বলবে। বা বাস্তব ঘটনার বিরুদ্ধে তাকে নিহত শূলীবিদ্ধ বা জীবিতাবস্থায় তাকে মৃত বলে অভিহিত করবে অথবা ইলাহ হওয়া বা পুত্র হওয়া ইত্যাদি বাতেল আকীদার শেরক কথা তার প্রতি আরোপ করবে, এ ধরনের অভিযোগ থেকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া আখেরাতে তাকে প্রকাশ্যে নির্দোষ ঘোষণা করে জন সমক্ষে তার নির্দোষিতা, নিষ্কলুষতা প্রমাণ ও প্রকাশ করবেন। জন্মলাভ এবং

নবুওয়্যাত লাভের পর দুনিয়ায় তিনি যে মর্যাদা লাভ করেছেন, পুনরাবির্ভাবের পর তা পুরোপুরি সম্পন্ন হবে। এটাই মুসলমানদের সর্বসম্মত আকীদা।

অতঃপর আখেরাতে বিশেষ করে তাকে এ প্রশ্ন করে যে, 'তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে আমাকে এবং আমার মাতাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ কর আল্লাহকে বাদ দিয়ে'।এবং বিশেষ নেয়ামতের কথা স্মরণ করায়ে দিলে পূর্বাপর সকলের সম্মুখে তাঁর মর্যাদা-কারনমত যাহির করা হবে'। এ সম্পর্কে সূরা মায়েদায় আলোচনা করা হবে। তিনি কেবল দুনিয়া-আখেরাতে মর্যাদাস্থাবান হবেন না, বরং তিনি হবেন আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য ধন্যদেরও একজন।

৭৪. অর্থাৎ অত্যন্ত মার্জিত-পরিশীলিত ও অত্যন্ত নেক হবে। প্রথমে মায়ের কোলে এবং অতঃপর বড় হয়ে বিস্ময়কর কথাবার্তা বলবেন। এসব কথা দ্বারা মূলতঃ মারইয়ামকে পূর্ণরূপে শান্তনা দেয়া হয়েছে। আগের সুসংবাদ দ্বারা তার মনে এ ধারণা জাগতে পারে যে, মর্যাদা লাভ তো পরের কথা, এখানে তো জন্মের পরই বিদ্রুপ-উপহাসের সম্মুখীন হতে হবে। তখন নির্দোষ প্রমাণ করার কি উপায় হবে? এর জবাবে বলা হচ্ছে যে, ঘাবড়াবে না। তোমাকে মুখ খুলতে হবে না। এর প্রয়োজনও পড়বে না। বরং তুমি বলে দেবে যে, আমি আজ রোজা রেখেছি তাই কথা বলতে পারব না। শিশু নিজেই জবাব দেবে। সূরা মারইয়ামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। কোন কোন বিকৃতকারী বলেছেনঃ

'দোলনায় এবং প্রৌঢ়ত্বে মানুষের সাথে কথা বলবে' দ্বারা কেবল মারইয়ামকে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, শিশু বোবা হবে না। অন্য দশটি শিশুর মত শৈশবে এবং প্রৌঢ়ত্বে কথা বলবে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এ যে, হাশর ময়দানেও লোকেরা হযরত ঈসাকে (আঃ) এভাবে সম্বোধন করবেন।

'হে ঈসা! তুমি আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বাণী। আল্লাহ তা প্রেরণ করেছেন মারইয়ামের প্রতি এবং সে তো আল্লাহর নির্দেশ। শৈশবে দোলনায় তুমি মানুষের সাথে কথা বলেছ। আর কেয়ামতের দিন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও বলবে 'তোমার এবং তোমার পিতার প্রতি আমার নেয়ামতের কথা স্মরণ কর। যখন রুহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মা দ্বারা তোমার সহায়তা করেছিলাম। দোলনায় এবং প্রৌঢ়ত্বে তুমি লোকদের সাথে কথা বলতে। শিশুটি যে বোবা হবে না-অন্যান্য শিশুদের মতই কথা বলবে এ নিশ্চয়তা দেয়ার জন্যই কি সেখানে এসব বিশেষ নিদর্শন সম্পর্কে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে গোমরাহী থেকে পানাহ দিন।

৭৫. জানা গেলো যে, সুসংবাদ দ্বারা তিনি এটাই মনে করেছেন যে, বর্তমান অবস্থায়ই শিশু জন্ম গ্রহণ করবে। এতে অবাক হবার কি রয়েছে।

৭৬. অর্থ্যাৎ এমনি ভাবে কোন পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই হয়ে যাবে। নিয়মের বিপরীত বলে অবাক হবে না। আল্লাহ তায়ালা যা চান যে ভাবে চান, পয়দা করেন। তাঁর কুদরত-

অসীম ক্ষমতার সীমা নির্ণয় করা যায় না। তিনি কোন কাজের ইচ্ছা করলেই তা হয়ে যায়। তার জন্য উপাদানের কোন প্রয়োজন নেই কার্যকারনেও বাধ্য নন তিনি।

৭৭. অর্থাৎ লেখা শেখাবেন বা সাধারণ হেদায়াত গ্রহণের এবং বিশেষ করে তাওরাত ইঞ্জিলের জ্ঞান দান করবেন এবং বড় গভীর সূক্ষ তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন। এ অধমের মতে কিতাব ও হেকমতের অর্থ হতে পারে কোরআন ও সুন্নাহ। কারণ, হযরত মাসীহ অবতরণের পর কোরআন ও রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী হুকুম করবেন, শাসন চালাবেন। এ গুলোর জ্ঞান ছাড়া তা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

৭৮. অর্থাৎ পয়গাম্বর হয়ে আপন জাতি বনী ইসরাইলকে একথা বলবেন।

৭৯. নিছক বাইরের আকার-আকৃতি সৃষ্টিকরাকে 'খাল্‌ক্' বলে অভিহিত করা কেবল বাহ্যিক ভাবেই। যেমন সহীই হাদীসে মামূলী ছবি বানানোকে 'খালক' বা সৃষ্টি বলা হয়েছে তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে, তাঁকে প্রাণ দাও, অথবা আল্লাহকে সর্বোত্তম স্রষ্টা বলে অভিহিত করে জানায়ে দেয়া হয়েছে যে, 'গায়রুল্লাহ' সম্পর্কেও এ শব্দটি ব্যবহার করা যায়। যদিও মূলতঃ সৃষ্টির বিচারে আল্লাহ ছাড়া কাউকে স্রষ্টা বা খালেক বলা যায় না। সম্ভবতঃ এ কারণেই এখানে এভাবে বলা হয়নি, আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখী সৃষ্টি করি। বরং বলা হয়েছে, 'আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখীর আকৃতি বানায়ে তাতে ফুঁক দিলে আল্লাহর হুকুমে পাখী হয়ে যায়। যাই হোক, তিনি এ মুজেযা দেখায়েছেন। কথিত আছে যে, শৈশব থেকেই তার দ্বারা এ অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, যাতে অপবাদ আরোপ কারীদেরকে আল্লাহর কুদরতের একটা ক্ষুদ্র নিদর্শন দেখাতে পারেন যে, যখন আল্লাহ তায়ালা আমার ফুঁক দ্বারা মাটির একটা প্রাণহীন অবয়বকে প্রদান করতে পারেন, তখন তিনি যদি কোন মানুষের স্পর্শ ছাড়াই নিছক ' 'রুহুল কুদুস' বা পবিত্র আত্মার ফুঁক দ্বারা একজন বাছাই করা নারীর ওপর ঈসার আত্মা ছড়িয়ে দেন তাতে অবাক হওয়ার কি আছে! বরং হযরত মাসীহ যেহেতু জিবরাইলের ফুঁকে সৃষ্টি হয়েছেন। তাই এ মাসীহী ফুঁককেও ওধরনের জন্মের একটা প্রভাব মনে করতে হবে। সূরা মায়েদার শেষ দিকে হযরত মাসীহ (আঃ)-এর এসব মুজেযা ও প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত কার্যাবলী সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিতে আলোচনা করা হবে, সেখানে দেখে নেবেন।

সারকথা এ যে, হযরত মাসীহ (আঃ) এর ওপর ফেরেশতাসুলভ ও আত্মিক পরিপূর্ণতা বা প্রভাব ছিলো। সে অনুপাতেই নিদর্শনাদী প্রকাশ পেতো। কিন্তু ফেরেশতার ওপর যদি মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়ে থাকে, আদম (আঃ) যদি ফেরেশতাদের সেজদা পাওয়ার যোগ্য হয়ে থাকে, তা হলে কোন সন্দেহ নেই যে, যার মধ্যে সকল মানবীয় পরিপূর্ণতা উন্নত মানে বর্তমান থাকবে, (আর এ মানবীয় পরিপূর্ণতা থাকবে দৈহিক ও আত্মিক পরিপূর্ণতার সমষ্টির, তাকে হযরত মাসীহ থেকে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করতে হবে আর তা হচ্ছে হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর মহা গুনান্বিত পবিত্র স্বত্ত্বা।

৮০. সেকালে বিজ্ঞানি এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের বিরাট প্রভাব ছিলো। হযরত মাসীহকে এমন সব মুজেযা দেয়া হয়েছে, যা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয়ে হযরত মাসীহ এর স্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। সন্দেহ নাই যে, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা আল্লাহ তায়ালার গুণ। তাঁর একক গুণ বৈশিষ্ট্য। 'বিয়াইযনিল্লাহ' বা 'আল্লাহর হুকুমে' দ্বারা এটা স্পষ্ট। কিন্তু মাসীহ তার মাধ্যম হওয়ার কারণে একে সম্প্রসারিত করে সেটাকে নিজের কাজ বলছেন, আল্লাহ তায়ালা কোরআনে কারীমে বা নবী করিম (সঃ) অসংখ্য হাদীসে ঘোষণা করেছেন যে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন মৃত ব্যক্তিকে দুনিয়ায় দ্বিতীয়বার জীবিত করা হবে না, এমন কথা বলা নিছক একটি দাবী, যার কোন প্রমাণ নাই। তিনি যদি কোরআন শরীফে এটা জানান যে, মৃত ব্যক্তির রূহ আল্লাহ তায়ালা ধারণ করে রাখেন, কিন্তু ঘুমন্ত ব্যক্তির রূহ তেমনিভাবে ধারণ করে রাখেন না, তবে একথা কখন বলেছেন যে, এ ধারণ করে রাখার পর পুনরায় তাকে ছাড়ে দেয়ার এক্তিয়ার তাঁর থাকে না। স্মরন রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালার সাধারণ প্রকৃতির বিরুদ্ধে নবুওয়্যতের দাবীর সত্যতা প্রকাশের জন্য যা কিছু প্রকাশ করা হয়, তা হচ্ছে মুজেযা। সুতরাং সেসব আয়াতে আল্লাহ তায়ালার সাধারণ প্রকৃতি বিবৃত হয়েছে, সেবার আয়াত নিয়ে এটা প্রমান করার চেষ্টা করা যে, তাতে মু'জেযা অস্বীকার করা হয়েছে এমন কথা বলা আদপে মু'জেযার অস্তিত্ব অস্বীকার করা এবং বোকামী ও স্থূলবুদ্ধীতা প্রকাশ করার শামিল। মু'জেযা যদি সাধারণ নিয়ম ও অভ্যাস অনুযায়ীই আসবে, তবে তাকে কেন মুজেযা বলা হবে। হযরত মাসীহ (আঃ) পিতা ছাড়া জন্ম হওয়া জন্মান্ধের অন্ধত্ব ঘুচানো, কুষ্ঠ ধবল রোগীকে আরোগ্য করা এবং মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা তাঁর ইত্যকার মুজেযা দেখানো পূর্বাপর সকল মুসলমানের কাছে স্বীকৃত। এর অস্বীকৃতিতে সাহাবা এবং তাবেইনের একটা উক্তিও দেখানো যাবে না, যেতে পারে না। বর্তমানে যে সব নাস্তিকরা দাবী করে যে, এসব স্বভাব বিরুদ্ধ অলৌকিক কর্মকান্ড মেনে নেয়া কোরআনের 'মুহকাম' স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াতের পরিপন্থী, তারা যেন এমন সব জিনিসকে 'মুহকাম' বলেছে, যার সঠিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে গোটা উম্মত অক্ষম রয়েছে। বা সকল 'মুহকাম' আয়াতকে বাদ দিয়ে 'মুতাশাবেহাত' বা দ্ব্যর্থবোধক আয়াতের পেছনে পড়ে তারা সবাই তাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে একথাই প্রমাণ করছে। বর্তমান কালের নাস্তিকরা ছাড়া 'মুতাশাবেহাতকে' 'মুহকমাতের' দিকে প্রত্যাবর্তন করবার তাওফীক আর কারো হয় নাই। আল্লাহর পানাহ।

আসল সত্য এ যে, যেসব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ গোটা উম্মত স্বীকার করে আসছেন, তাই হচ্ছে 'মুহকাম' আয়াত। তাকে উলট-পালট করে নিছক ও রূপক অর্থ গ্রহণ করা এবং মু'জেযা অস্বীকার করার জন্য সাধারণ প্রকৃতি থেকে প্রমাণ গ্রহণ করা, এসবই হচ্ছে 'যায়েগীন' বা বাঁকা লোকদের কাজ। এদের থেকে সতর্ক থাকার জন্য আল্লাহর নবী হেদায়াত করেছেন।

৮১. ভবিষ্যতের জন্য অর্থাৎ অতীত ও বর্তমানের কোন গায়েবের ব্যাপারে তোমাদেরকে অবহিত করি। বাস্তব মু'জেযার পর এটা ছিল এক উন্নত মুজেযার উল্লেখ।

৮২. অর্থ্যাৎ তাওরাতকে স্বীকার করি যে, তা খোদার কিতাব, আর তার সাধারণ নীতি ও বিধান যথাস্থানে বহাল পূর্বক আল্লাহ্‌র নির্দেশে যমানার উপযোগী করে তাকে আংশিক ও খুঁটিনাটি পরিবর্তন সাধন করবো, যেমন কোন কোন বিধানে পূর্বে যে কড়াকড়ি- কঠোরতা ছিলো এখন তা রহিত করা হবে। এটাকে নস্‌খ্ বা রহিতকরণ বা পরিপূর্ণতা বিধান-যা খুশী বলতে পার।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ

بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ تف

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٥٠﴾ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ

فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٥١﴾ فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى

مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ

الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ج اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ج وَاشْهَدْ

بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا

الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٣﴾ وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ

اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٥٤﴾ ع

৫০.(আল্লাহর কিতাব) তাওরাতের যে বাণী আমার কাছে বর্তমানে (অক্ষত) আছে (আমি এসেছি) তার সত্যতা প্রতিপন্ন করতে। (এছাড়া) তোমাদের ওপর হারাম করে রাখা হয়েছে এমন কতিপয় জিনিসকেও আমি তোমাদের জন্যে হালাল করে দেবো[৮৩], (সত্যি কথা হচ্ছে) আমি তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (এর সব কয়টি) নিদর্শন নিয়ে এসেছি। অতএব (এখন থেকে) তোমরা আল্লাহকেই ভয় করো এবং (তার নবী হিসেবে) আমার অনুগত্য করো।[৮৪] ৫১. নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আমার মালিক, তোমাদেরও মালিক, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত করো, (আর) এটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক ও সোজা পথ।[৮৫] ৫২. অতপর ঈসা যখন তাদের কুফরী ও অবাধ্যতার ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলো[৮৬] তখন সে (সবার প্রতি ডাক দিলে এবং) বললো, কে (আছো তোমরা) আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী হবে[৮৭] (তার অনুসারী) হাওয়ারীরা বললো, (হ্যাঁ) আমরা (আছি, আমরাই) আল্লাহর সাহায্যকারী।[৮৮] আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি (হে ঈসা) তুমি সাক্ষী থাকে। আমরা সবাই এক একজন অনুগত বান্দা[৮৯] (আল্লাহর হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণকারী)। ৫৩. (হাওয়ারীরা আরো বললো) হে আল্লাহ, তুমি যে সব (হুকুম, আহকাম আমাদের জন্যে) নাযিল করেছো, তার ওপর আমরা (পুরোপুরি) ঈমান এনেছি। আমরা (তোমার) রসূলের কথাও মেনে নিয়েছি। সুতরাং তুমি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকায় আমাদের নাম লিখে নাও। ৫৪. অতপর বনী ইসরাঈলের লোকেরা (আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে) দারুণ শঠতা (ও দুশমনী) করলো, তাই আল্লাহও (তাদের সাথে) কৌশলের পন্থা গ্রহণ করলেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন, সর্বোত্তম কৌশলী।[৯০]

---

৮৩. অর্থ্যাৎ যখন আমার সত্যতার নিদর্শন দেখতে পেয়েছ, তখন আল্লাহকে ভয় করে আমার কথা মেনে চলা উচিৎ।

৮৪. অর্থাৎ সব কথার বড় কথা এবং সব মূলের বড় মূল এ যে, আল্লাহ তায়ালাকে আমার এবং তোমাদের সমান পরওয়ারদেগার মনে করবে। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক স্থাপন করবে না। তারই বন্দেগী করবে। তাওহীদ, তাকওয়া এবং রাসুলের আনুগত্য অনুসরনই হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যাওয়ার সোজা-সরল পথ।

৮৫. অর্থ্যাৎ তারা আমার দ্বীন গ্রহণ করবে না, বরং শত্রুতা ও অনিষ্ট সাধন করবে।

৮৬. অর্থ্যাৎ আমার সঙ্গী হবে এবং খোদার দ্বীন প্রচার ও প্রতিজ্ঞার কাজে আমার সাহায্য-সহযোগিতা করবে।

৮৭. আল্লাহর সাহায্য করা এই যে, তার দ্বীন-আইন এবং তার পয়গম্বরদের সাহায্য করা। যেমন মদীনার আনসাররা (সঃ) এবং সত্য দ্বীনের সাহায্য করে দেখায়েছেন।

৮৮. 'হাওয়ারী' কারা ছিলো, কেন তাদের এ উপাধি হয়েছে, এ ব্যাপারে আলেমদের অনেক উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ উক্তি এ যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আঃ) এর অনুসারী হয়, তিনি ছিলেন ধোপা। কাপড় ধোলাই করতেন। এজন্যই তাঁকে 'হাওযারী' বলা হতে। হযরত ইসা (আঃ) তাকে বলেন, কাপড় কি ধোলাই করছ। আস, আমি

তোমাকে অন্তর ধোলাই করাব শিক্ষা দেই। তিনি হযরত ঈসা (আঃ) এর সঙ্গী হন। পরে এটা তার সকল সঙ্গীর উপাধিতে পরিণত হয়।

৮৯. পয়গম্বরের সম্মুখে স্বীকার করার পর পরওয়ার দেগারের সম্মুখে স্বীকার করে যে, আমরা ইঞ্জীলের প্রতি ঈমান এনেছি তোমার রাসূলের আনুগত্য অনুসরণ করছি। আপনি দয়া করে আমাদের নাম অনুগতদের তালিকাভুক্ত করুণ, যাতে ঈমানের খাতায় তা রেজিস্ট্রী হয়ে যায়। যাতে ফিরে আসার কোন আশঙ্কা না থাকে।

৯০. 'মাক্‌র' বলা হয় সুক্ষ্ম ও গোপন তদবীরকে। তা ভালো উদ্দেশ্যে হইলে ভালো, আর খারাপ উদ্দেশ্যে হইলে খারাব। আর একারণেই আয়াতে মাকর এর সাথে 'সাইয়্যেউ' শব্দ যোগ করা হয়েছে। আর এখানে আল্লাহকে বলা হয়েছে 'খাইরুল মাকেরীন'। অর্থ এ যে, ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নানা প্রকার চক্রান্ত ষড়যন্ত্র এবং গোপন তহবীর শুরু করেছে। এমনকি এ বলে বাদশাহ্‌র কান ভরে তুলেছে যে, এ লোকটি নাস্তিক (নাউযুবিল্লাহ)। সে তাওরাত পরিবর্তন করতে চায়। সকলকে সে বে-দ্বীন বানায়ে ছাড়বে। বাদশাহ হযরত মাসীহ (আঃ) কে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়। একদিকে এটা হচ্ছিলো, অন্যদিকে আল্লাহ তাআলার সম্পূর্ণ ও গোপন তদবীর চলছিলো তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। সন্দেহ নাই যে, আল্লাহর তদবীর সবচেয়ে উত্তম ও মজবুত। কেউ তা ভাঙ্গতে পারে না।

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ

إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ

كَفَرُوا۟ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا۟

إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ ۖ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا۟

فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِى الدُّنْيَا وَالْءَاخِرَةِ ز

وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٥٦﴾

রুকু ৬

৫৫. যখন (এই কৌশলের পরিকল্পনা মোতাবেক) আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে ঈসা, নিশ্চয়ই আমি তোমার এই দুনিয়ায় (জীবন কাটানোর) কাল শেষ করতে যাচ্ছি। আমি তোমাকে আমার কাছে তুলে আনবো। যারা তোমাকে (নবী হিসেবে) মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদের (যাবতীয় পাপ, পংকিলতা-সংস্রব সাহচর্য্য) থেকেও আমি তোমাকে পবিত্র করে নেবো, আর যারা তোমাকে অনুসরণ করেছে, তাদের কিয়ামত পর্যন্ত এই অস্বীকারকারীদের ওপর আমি বিজয়ী করে রাখবো, অতপর তোমাদের সবাইকে (একদিন সব কিছুর শেষে) আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। সেদিন (ঈসার জন্ম সহ) যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধে লিপ্ত ছিলে তার সব কয়টি বিষয়েই আমি মীমাংসা করে দেবো। ৫৬. যারা (আমার বিধানকে) অস্বীকার করেছে আমি তাদের এই দুনিয়ায় (অপমান) ও আখেরাতে (ভয়াবহ আগুনে দগ্ধ হওয়ার) কঠোরতম শাস্তি দেবো, (আমার এ ভয়াবহ শাস্তি থেকে বাঁচানোর মতো সেদিন তাদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী থাকবে না[৯১]

---

৯১. বাদশাহ লোকজনকে নির্দেশ দেয় হযরত মাসীহ (আঃ) কে ধরে শুলীবিদ্ধ করা জন্য। তাকে এমন দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তি দিতে হবে, যা দেখে অন্যরা তার অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকে। এ প্রসঙ্গে তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে ঃ

'অতঃপর তার সন্ধানে লোক প্রেরণ করে, তাকে পাকড়াও করে শূলীবিদ্ধ করবে এবং তাকে শিক্ষণীয় দন্ড দেবে।' মহান আল্লাহর ইচ্ছার জবাবে মাসীহ (আঃ), আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত করে দেন যে, আমি এসব পাষন্ডদের ইচ্ছা-অভিপ্রায় ও পরিকল্পনা মাটির সঙ্গে মিলায়ে দেবেন। এরা তোমাকে পাকড়াও করে হত্যা করতে চায়। তোমাকে সৃষ্টি করা এবং নবী করার যে উদ্দেশ্য, তারা তা পূরণ হতে দিতে চায় না এরা। এরা এমনিভাবে আল্লাহর মহান নেয়ামতের নাফরমানী করতে চায়। কিন্তু আমি তাদের কাছ থেকে আমার এ নেয়ামত ফেরৎ নেবো তোমার যে বয়স নির্ধারিত রয়েছে এবং এর সঙ্গে যে মহান লক্ষ্য জড়িত রয়েছে, তা অবশ্যই পূরণ করে ছাড়বো। আর তোমাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ অবস্থায় নিয়ে যাবো যে, এরা তোমার কেশাগ্রস্থ ছিন্ন করতে পারবে না। তারা তোমাকে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ তোমাকে আপন আশ্রয়ে নিয়ে যাবেন। তারা তোমাকে শুলীতে তুলতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তোমাকে আসমানে তুলে নেবেন। তাদের ইচ্ছা, তোমাকে অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে লোকদেরকে তোমার অনুসরণ থেকে ফিরিয়ে রাখতে। কিন্তু আল্লাহ তাদের নাপাক হাত তোমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবেন না। বরং সে দুর্গন্ধময় ও নাপাক সমাবেশের মধ্যে থেকে তোমাকে সম্পূর্ণ পাক, ছাফ অবস্থায় তুলে নেবেন। লোকেরা তোমাকে অপমান করবে আর ভয় করে তোমার আনুগত্য থেকে বিরত থাকবে-এর পরিবর্তে তোমার অনুসারী এবং যারা তোমার নাম নিবে, তাদেরকে কেয়ামতের পর্ব পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের ওপর বিজয়ী করবেনা। প্রবল করবেন তোমাকে,

অবিশ্বাসী ইহুদী এবং বিশ্বাস মুসলমান বা খৃষ্টানরা যতদিন দুনিয়ায় থাকবে, ততদিন বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের ওপর প্রবল থাকবে। অতঃপর এক সময় আসবে, যখন তোমাকে এবং তোমার প্রতি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলকে আমার নির্দেশের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তোমাদের বিরোধের চুড়ান্ত ফয়সালা করে দেবো। পরিসমাপ্তি ঘটাবো সকল বিরোধের। এ ফয়সালা কখন হবে? 'অতঃপর যারা অস্বীকার করবে, আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবো' --- থেকে তার যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে, তা জানিয়ে দেয় যে, আগেই দুনিয়াতে এর নমুনা শুরু হবে। অর্থাৎ তখন সমস্ত কাফের কঠোর আযাবের নিচে থাকবে। কোন শক্তিই তাদের সাহায্য করার জন্যে পৌছতে পারবে না। পক্ষান্তরে যারা ঈমানদার থাকবে, দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদেরকে পূর্ন প্রতিদান দেয়া হবে। আর বে-ইনসাফ যালেমদের শিকড় কেটে দেয়া হবে।

মুসলিম উম্মাহ্র সর্বসম্মত আকীদা এ যে, ইহুদীরা তাদের ঘৃণ্য চক্রান্ত যখন চূড়ান্ত করে, তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত মাসীহ (আঃ)কে জীবন্ত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন। নবী করীম (সঃ) অসংখ্য মুতাওয়াতের হাদীস অনুযায়ী কেয়ামতের পূর্বে দুনিয়া যখন প্রতারণা-প্রবঞ্চনা -শয়তানী এবং কুফরী-গোমরাহীতে ভরে যাবে, তখন আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলের শেষ নবী থেকের মাসীহ (আঃ) সর্বশেষ নবী হযরত মোহম্মদ মুস্তফা (সঃ)-এর একজন বিশ্বস্ত জেনারেল হিসেবে প্রেরণ করে বিশ্বকে দেখায়ে দেবেন যে, শেষ নবীর দরবারের সঙ্গে অতীত নবীদের কি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। হযরত মাসীহ (আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করবেন, তার ইহুদী অনুসারীদেরকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করবেন। কোন ইহুদীই প্রাণ বাঁচাতে পারবেনা। গাছ–পাথর পর্যন্ত চিৎকার করে বলে দেবে যে, আমাদের পেছনে এক ইহুদী আত্মগোপন করে আছে, তাকে হত্যা কর। হযরত মাসীহ (আঃ) শূলী ভেঙ্গে ফেলবেন এবং খৃষ্টানদের সকল ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সংশোধন করে গোটা বিশ্বকে ঈমানের পথে নিয়ে আসবেন, তখন সকল বিরোধের মীমাংসা হবে, ধর্মীয় সকল বিরোধের অবসান হয়ে এক আল্লাহর সত্য দ্বীন ইসলাম-ই কেবল অবশিষ্ট থাকবে। এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে। 'এমন কোন আইলে কিতাব নেই, যে মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবেনা' (সূরা নিসাঃ ১৫৯)। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং মাসীহ (আঃ)কে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার ধরন সম্পর্কে সূরা নিসায় উল্লেখ করা হবে।

যাই হোক, আমার মতে 'অতঃপর আমার দিকেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে' এটা কেবল আখেরাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, বরং দুনিয়া আখেরাত উভয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা কালেও একই শব্দ স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে। এতে বুঝা যায় যে, এর অর্থ কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়। সহীহ হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, কেয়ামতের আগে একটা মুবারক সময় অবশ্যই আসবে, যখন সকল বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে একটা মাত্র দ্বীন অবশিষ্ট থাকবে।

এ আয়াত সম্পর্কে কয়েকটা বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। 'তাওয়াফ্‌ফা' সম্পর্কে 'কুল্লিয়্যতে আবুল বাকা' অভিধান গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, সর্বসাধারণের কাছে তাওয়াফ্‌ফা মৃত্যু দেয়া, জান কবয করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের কাছে এর অর্থ পূরাপুরি উসুল করা, ঠিক ঠিক গ্রহণ করা। তাদের মতে মৃত্যু সম্পর্কেও 'তাওয়াফফা' শব্দটির প্রযোগ হয় এ হিসেবে যে, মৃত্যুতে কোন অঙ্গ বিশেষ নয়, বরং আল্লাহর জন্ম থেকে গোটা প্রাণই উসুল করা হয়। এমন ধারণাও যে, আল্লাহ্ যদি দেহ সহ কারো জান কবয করে নেন, তবে তাকে তো উত্তম ভাবেই 'তাওয়াফফা' বলা যাবে। যে সব অভিধান লেখকরা তাওয়াফ্‌ফা অর্থ রূহ্ কবয লিখেছেন, তার, এ কথা বলেননি যে, দেহ সহ রূহ্ কবযকে তাওয়াফ্‌ফা বলা হয় না। তার এমন কোন বিধিও উল্লেখ করেননি যে, যখন 'তাওয়াফ্‌ফা'র কর্তা আল্লাহ্ হয় এবং কর্ম হয় কোন প্রাণী, তখন মৃত্যু ছাড়া এর অন্য কোন অর্থ হয় না। যেহেতু সাধারণতঃ রূহ কবয সম্পন্ন হয় দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই, এ কারণে সাধারণ অধিকন্তু অভ্যাস অনুযায়ী তৎসম্পর্কে মৃত্যু লিখা হয় সূরা যুমার এর ৪২নং আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করুন। এখানে প্রাণ হরণ তথা রূহ কবয করার দুটি উপায় বলা হয়েছে। এক, মৃত্যু। দুই, নিদ্রা। এ বিভক্তি দ্বারা এবং তাওয়াফ্‌ফা'কে নাফ্‌স-এর সঙ্গে যুক্ত করে এবং এর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাওয়াফ্‌ফা এবং মৃত্যু দুটি পৃথক পৃথক জিনিস। আসল কথা এ যে, রূহ্ কবয করার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। এক পর্যায় হচ্ছে মৃত্যুর আকারে। অপর পর্যায় নিদ্রার আকারে। কোরআন করীম উভয় সম্পর্কেই তাওয়াফ্‌ফা শব্দ ব্যবহার করে। এজন্য মৃত্যুকে নির্দিষ্ট করেনি। বলা হয়েছে, 'আর তিনি হচ্ছেন সে স্বত্ত্বা, যিনি রাত্রিকালে তোমাদেরকে 'ওফাত' দেন এবং দিনের বেলা তোমরা যা কিছু কর, তাও জানেন। (আল- আনআমঃ ৬০) এখানে দেখা যায়, দুটি আয়াতেই কোরআন নিদ্রা সম্পর্কে তাওয়াফ্‌ফা 'শব্দটি ব্যবহার করেছে। অথচ নিদ্রায় সর্ম্পূর্ণ রূহ কবয বা হরণ করা হয় না। এমনিভাবে সূরা আলে ইমরান এবং সূরা মায়েদার দুটি আয়াতে দেহ সহ প্রাণ হরণ বা রূহ কবয প্রসঙ্গে তাওয়াফ্‌ফা শব্দটি ব্যবহার করা হলে এমন কি অসাধ্য সাধিত হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে? বিশেষ করে যখন দেখা যায় যে, মৃত্যু এবং নিদ্রা প্রসঙ্গে তাওয়াফ্‌ফা শব্দটি ব্যবহার কোরআন করীমই শুরু করেছে। আল্লাহ্ তায়ালা মৃত্যু বা নিদ্রায় মানুষের কাছ থেকে কোন কিছু হরণ করে নেন জাহেলী যুগের লোকেরা তো সাধারণতঃ এ তত্ত্ব সম্পর্কেই অজ্ঞ ছিলো। তাই মৃত্যু বা নিদ্রা সম্পর্কে তাওয়াফ্‌ফা শব্দ প্রয়োগ তাদের কাছে প্রচলিত ছিল না। মৃত্যু ইত্যাদির তত্ত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্যই কোরআন করীম সর্বপ্রথম এ শব্দটির ব্যবহার শুরু করে। সুতরাং মৃত্যু ও নিদ্রার মত দেহ সহ প্রাণ হরণের দুর্লভ স্থানেও তাওয়াফ্‌ফা শব্দটি প্রয়োগ করার অধিকার কোরআন মজীদের রয়েছে।

যাই হোক, সর্বসম্মত মতে বর্তমান আয়াতে 'তাওয়াফ্‌ফা' অর্থ মৃত্যু নয়। আর হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও বিশুদ্ধতর বর্ণনা এ যে, হযরত মাসীহ (আঃ) কে জীবিত অবস্থায়

আসমানে তুলে নেওয়া হয়েছে। 'তাফসীর রূহুল মাআনী' ইত্যাদিতে এটা উল্লেখিত হয়েছে, জীবন্ত তুলে নেয়া বা পুনরায় তাঁর অবতরণকে অস্বীকার করার বর্ণনা অতীত মনীষীদের কারো সম্পর্কে উল্লেখ নাই। বরং হাফেয ইবনে হাজার তো 'তালীসুল আবীর' গ্রন্থে এ সম্পর্কে ইজমা, বা সর্বসম্মত ঐক্যমতের উল্লেখ করেছেন। ইবনে কাসীর প্রমুখ তো তাঁর পুনরায় অবতরণের হাদীসকে মুতাওয়াতের বলেছেন। এবং 'ইকমালু আকমালিল মুয়াল্লেম' গ্রন্থে ইমাম মালেক (রঃ) এটা স্বীকার করেছেন বলেও উল্লেখ করেছেন।

হযরত মাসীহ (আঃ) যেসব মু'জেযা দেখায়েছেন, তাতে অন্যান্য রহস্য ছাড়াও তাঁর আসমানে উঠায়ে নেয়ার সঙ্গে একটা বিশেষ সামঞ্জস্য দেখা যায়। তিনি শুরু থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মাটির পুতুলীতে আমি ফুঁক দেওয়ার ফলে তা আল্লাহর হুকুমে পাখী হয়ে উপরে উড়ে যায়। যে মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ 'রূহুল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন, রুহুল কুদুসের ফুঁক দ্বারা যিনি সৃষ্টি হয়েছেন, খোদার নির্দেশে তার আসমানে উড়ে যাওয়া কি সম্ভব নয়? যার হাতের স্পর্শে বা দুটি কথা বলার ফলে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ-ধবল রুগী সুস্থ হয়, মৃত ব্যক্তি হয় জীবিত, তিনি যদি এ ধরাধাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফেরেশতাদের মতো হাজার হাজার বসর আসমানে সুস্থ-জীবিত অবস্থান করেন, তা কি অসম্ভব? হযরত কাতাদা বলেন, 'তিনি উড়ে ফেরেশতাদের কাছে পৌছেছেন এবং তাদের সঙ্গে আরশের চারপাশে অবস্থান করছেন। ফলে তিনি ফেরেশতা সুলভ আসমানী এবং জমিনী মানুষে পরিণত হয়েছেন। এ বিষয়ে অনেক স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে'। কিন্তু আল্লামা, সাইয়্যেদ আনওয়ার শাহ কাশমীরী (রঃ) 'আকীদাতুল ইসলামী বইটি পড়ার আবেদন জানাই। আমার মতে এটি এ বিষয়ে একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ

الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ

خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ

مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ قف
ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ
هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ
اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

৫৭. অপরদিকে যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং (সে ঈমান মোতাবেক এই দুনিয়ায়) ভালো কাজ করেছে, তাদের (সবাইকে) তাদের পাওনা পুরোপুরিই আদায় করে দেয়া হবে। আল্লাহ যালিমদের কখনো ভালোবাসেন না।[৯২] ৫৮. এই (কিতাব) যা আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি, তা আল্লাহর এক একটা নিদর্শন ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ বিশেষ। ৫৯. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার কাছে ঈসার উদাহরণ হচ্ছে (প্রথম মানুষ) আদমের মতো! তাকেও আল্লাহ তায়ালা (বিস্ময়করভাবে) পয়দা করেছেন মাটি থেকে। তারপর (মাটির তৈরী) তাকে বললেন (এবার তুমি জীবন্ত মানুষ) হয়ে যাও। সাথে সথেই তা (মানুষ) হয়ে গেলো।[৯৩] ৬০. এই হচ্ছে তোমার মালিক আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে (মানুষের সৃষ্টির) সঠিক ও সত্য (বিবরণ), তাই তোমরা কখনো সে সব দলে শামিল হয়ো না যারা (আজ ইসার জন্মের) ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহ পোষণ করে।[৯৪] ৬১. (তোমার কাছে ঈসার উঠিয়ে নেয়ার ব্যাপারে) আল্লাহর কাছ থেকে এই (সঠিক) জ্ঞান আসার পর যদি (ঈসার জন্ম ও তাকে আল্লাহর কাছে তুলে নেয়ার ব্যাপারে) কেউ তোমার সাথে (খামাখা) ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক করতে চায় তুমি (চরম পন্থা হিসেবে) তাদের বলে দাও, এসো (আমরা সবাই এ ব্যাপারে একমত হই যে,) আমরা আমাদের ছেলেদের ডাকি এবং তোমাদের ছেলেদেরও ডাকি, (একইভাবে আমরা ডাকি) আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদের, (সাথে সাথে) আমরা আমাদের ও তোমাদের নিজেদেরও ডাক দিই। (সবাই যখন এক জায়গায় জড়ো হবো তখন আমরা দোয়া করবো, (আমাদের মধ্যে) যে মিথ্যাবাদী তার ওপর আল্লাহর

অভিশাপ বর্ষিত হোক।[৯৫] ৬২. মূলত এই হচ্ছে সম্পূর্ণ সঠিক ও নির্ভুল ঘটনা আর (এসব ঘটনা যিনি ঘটিয়েছেন সে) আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই,[৯৬] নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা পরম শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাময়।[৯৭] ৬৩. অতপর তারা যদি (ঈসা সম্পর্কিত আল্লাহর এই নির্ভুল ঘটনার ব্যাপারে তোমার এ চ্যালেঞ্জ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিতে চায়, তাহলে (বুঝতে হবে সত্যিকার অর্থে তারাই আল্লাহর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আর) আল্লাহ তাআলা অশান্তি ও কলহ সৃষ্টিকারীদের ভালো করেই জানেন।[৯৮]

---

৯২. খৃষ্টানরা হযরত নবী করীম (দঃ) এর সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়ে বলতো যে, ঈসা আল্লাহর বান্দাহ নয়, বরং তার পুত্র। শেষ পর্যন্ত বলে যে, আল্লাহর পুত্র না হলে বল, তবে সে কার পুত্র। এর জবাবে আয়াতটি নাযিল হয়। এতে বলা হয় যে, আদমের তো মাতা-পিতা কেউই ছিল না। ঈসার পিতা না থাকলে তাতে অবাক হওয়ার কি আছে। (মুযেহুল কুরআন) এ হিসাবে তো আদমকে আল্লাহর পুত্র প্রমাণ করার জন্য বেশী জোর দেওয়া দরকার। অথচ কেউই এটা স্বীকার করে না।

৯৩. অর্থাৎ মাসীহ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যা কিছু বলেছেন, তা সত্য। এতে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়াই আসল কথা বলা হয়েছে।

৯৪. আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দেন যে, এমন ভাবে বুঝাবার পরও যদি নাজরানের খৃষ্টানরা স্বীকার না করে, তবে তাদের সঙ্গে মোবাহালা' কর। এর কার্যকর ও পুরিপূর্ণ চিত্র এ প্রস্তাব করা হয়েছে যে, উভয় প্রশ্ন নিজেকে এবং সন্তানাদিকে নিয়ে হাযির হবে এবং কাকুতী মিনতী করে দোয়া করবে যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, তার ওপর আল্লাহ লা'নত ও আযাব আসুক। মুবাহালায়ার এ ধারা প্রথম পর্যায়েই প্রকাশ করে দেবে যে, কোন প্রশ্ন আপন অন্তরে কি পরিমাণ সততা ও সত্যতার ওপরকে ঈমান ও আস্থা রাখে। মুবাহালায়ার এ আহ্বানের কথা শুনে নাজরান প্রতিনিধি দল অবকাশ চেয়ে নেয় এবং বলে যে, আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে জানাবো। অবশেষে পরামর্শ সভায় তাদের বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞ দায়িত্বশীলরা বলে, হে খৃষ্ট সম্প্রদায়। তোমরা অন্তরে অন্তরে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, মোহাম্মদ (দঃ) প্রেরিত পুরুষ। হযরত মাসীহ (আঃ) সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট এবং সিদ্ধান্তকর কথা বলেছেন। তোমরা জান যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধরের মাঝে নবী প্রেরণ করার ওয়াদা করেছেন। হতে পারে, এই সে নবী। সুতরাং একজন নবীর সঙ্গে মোবাহালা মোনায়ারা করার পরিণতি কোন জাতির পক্ষে এ হতে পারে যে, তাদের ছোট-বড় কেউই ধ্বংস বা আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। আর পয়গম্বরের লা'নতের ক্রিয়া বংশ পরম্পরায় চলতে থাকবে। আমরা তার সঙ্গে সন্ধী করে নিজ নিজ জনপদে ফিরে গেলেই ভালো হয়। কারণ, গোটা আরবের বিরুদ্ধে লড়াই মাথা পেতে নেয়ার ক্ষমতাও আমাদের নাই। অবেশেষে এ প্রস্তাব পাশ করে তারা মহানবী (দঃ) এর খেদমতে হাযির হয়। আল্লাহর নবী তখন হযরত

হাসান হোসাইন-ফাতেমা-আলী (রাঃ) কে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যাচ্ছিলেন। তার নূরানী চেহারা দেখে তাদের বড় পাদ্রী বলে উঠে যে, যাদের দোয়া পাহাড়কে আপন স্থান থেকে সরায় দিতে পারে, তাদের সঙ্গে 'মুবাহালা' করে নিজেদেরকে ধ্বংস করবে না। অন্যথায় একজন খৃষ্টানও বেঁচে থাকবে না। অবশেষে তারা মুকাবিলা করা ত্যাগ করে বার্ষিক জিযিয়া দানে সম্মত হয় এবং সন্ধি করে ফিরে যায়। হাদীস শরীফে আল্লাহর নবী (দঃ) বলেন যে, তারা 'মুবাহালায়' অবতীর্ণ হলে পাহাড়ী উপত্যকা আগুন হয়ে তাদের ওপর বর্ষিত হতো। আল্লাহ্ তায়ালা নাজরানকে সমূলে উৎপাটিত করতেন। এক বসরের মধ্যে সমস্ত খৃষ্টান ধ্বংস হয়ে যেতো

নবী করীম (দঃ) এর পরও মুবাহালা করা যেতে পারে, কুরআন শরীফে একথা বলা হয়নি। এটাও বলা হয়নি যে, নবী করীম (দঃ) এর সঙ্গে মুবাহালার যে ফল হওয়ার ছিলো, তাই সব সময় প্রকাশ পাবে, কোন কোন অতীত মনীষীর কর্মধারা এবং কোন কোন হানাফী ফকীহ্-এর স্পষ্ট উক্তি থেকে জানা যায় যে, 'মুবাহালার' বৈধতা এখনও বর্তমান রয়েছে। কিন্তু তা হতে হবে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ব্যাপারে। 'মুবাহালায়' শিশু এবং নারীদেরকেও শরীক করা জরুরী নয়। আর এতে নবীর মুবাহালার মতো আযাব আসা জরুরী নয়। বরং এক ধরনের প্রমাণ উপস্থাপন করে বিরোধ-বিতর্ক থেকে সরে দাঁড়ানো হবে। আমার মতে কোন মিথ্যাবাদীর সঙ্গে মুবাহালায় অবতীর্ণ হবে না। কেবল চরম মিথ্যাবাদীর সঙ্গেই মুবাহালা চলে। ইবনে কাসীর বলেন, --'অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তার রাসূল (দঃ) কে হযরত ঈসা (আঃ)এর ব্যাপারে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর সত্যের একান্ত বৈরীর সঙ্গে মুবাহালার নির্দেশ দিয়েছেন।

৯৫. মুবাহালার আহবানের সঙ্গে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, মুবাহালা করা হয় হযরত মাসীহ (আঃ) সম্পর্কে কুরআন মজীদে যা কিছু বলা হয়েছে, সে ব্যাপারে এটাই হচ্ছে সত্য বর্ণনা। আল্লাহর দরবার সব রকম শেরক এবং পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ইত্যাদি থেকে মুক্ত।

৯৬. তার বিশাল কুদরত ও হেকমত সত্য-মিথ্যা সকলের সাথে উপযুক্ত ব্যবহার করবেন।

৯৭. তারা যদি দলীল-প্রমাণ দ্বারাও স্বীকার না করে এবং মুবাহালার জন্যও প্রস্তুত না হয়, তখন বুঝে নেবে যে, সত্যকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। তাদের আকীদা-বিশ্বাসের সত্যতা সম্পর্কেও অন্তরে দৃঢ় আস্থা নাই। নিছক ফাতনা ফাসাদ সৃষ্টি করাই তাদের লক্ষ্য। ভাল করে জেনে রাখবে যে, সকল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীই আল্লাহর কড়া নজরে রয়েছে।

৯৮. আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর নবী নাজরান প্রতিনিধিদেরকে যখন বলেন -'তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর'। তারা জবাব দেয় যে,,---'আমরা তো ইসলাম গ্রহণ করেছি'। এ থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের মতো তারাও নিজেদেরকে মুসলমান বলে

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ

سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ

شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾ يٰۤاَهْلَ

الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِىْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمَاۤ اُنْزِلَتِ

التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٥﴾

هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ

فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ

حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٧﴾ اِنَّ اَوْلَى

النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٨﴾ وَدَّتْ

طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ

أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

রুকু ৭

৬৪. (হে নবী!) যাদের ওপর আমি কিতাব নাযিল করেছি, তাদের তুমি বলো, এসো আমরা (উভয়ে একমত হই) এমন এক কথায়-যা (বিশ্বাসের দিক থেকে) আমাদের কাছে এক (ও অভিন্ন, এই কথাটি হচ্ছে এই) যে, আমরা উভয়েই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করবো না এবং তার (সার্বভৌম ক্ষমতার) সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বলে মেনে নেবো না, (সর্বোপরি) এক আল্লাহ ছাড়া আমরা আমাদের নিজেদেরও একে অপরের প্রভু বলে মেনে নেবো না (এই মৌলিক নীতিমালায় একমত না হয়ে) তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদের তুমি (পরিষ্কার) বলে দাও যে, তোমরা সাক্ষী থেকো যে (আমাদের উভয়ের পথ ভিন্ন) আমরা অবশ্যই আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মাথা নত করে দিয়েছি।[১০০] ৬৫. (তাদের) তুমি আরো বলো, হে (আল্লাহর) কিতাবধারীরা, তোমরা কেন ইবরাহীম সম্পর্কে (আমাদের সাথে অযথা তর্ক করো, অথচ (তোমরা জানো যে,) তাওরাত ও ইনজীল (উভয় কিতাবই) তার পরে নাযিল করা হয়েছে, (ইতিহাসের এই সত্যটুকুও) কি তোমরা বুঝতে পারো না? ৬৬. হাঁ, এর কয়েকটি বিষয়ে তোমাদের কিছু কিছু জানা-শোনা ছিলো এবং সে বিষয়ে তো তোমরা তর্ক বিতর্কও করলে, কিন্তু যে সব বিষয়ে তোমাদের কোনোই জ্ঞান নেই সে সব ক্ষেত্রে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছো কেন? (সমস্ত জ্ঞান তো আল্লাহর) আল্লাহই (সব) জানেন, তোমরা কিছুই জানো না[১০১], ৬৭. (সঠিক ব্যাপার হচ্ছে এই যে) ইবরাহীম না ছিলো ইহুদী, না ছিলো খৃস্টান বরং সে ছিলো একজন একনিষ্ঠ মুসলিম। সে কখনো (বাতিলপন্থীদের মতো) মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলো না।[১০২] ৬৮. মানুষদের ভেতর ইবরাহীমের সাথে (ঘনিষ্ঠতম) সম্পর্কের সব চাইতে বেশী অধিকার তো আছে সে সব লোকের, যারা তার অনুসরণ করে (তার মতোই মুসলিম হতে পেরেছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই এখন) এই নবী ও আল্লাহর ওপর ঈমান আনায়নকারীই[১০৩] (হচ্ছে ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি), মূলত আল্লাহ তায়ালা একমাত্র তাদেরই সাহায্যকারী

(পৃষ্ঠপোষক) যারা তার ওপর ঈমান আনে।[১০৪] ৬৯. এই কিতাবধারীদের একটি দল (নানা রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে) তোমাদের কোনো না কোনো ভাবে পথভ্রষ্ট করে দিতে চায়, যদিও তাদের এ বোধটুকু নেই যে, (তাদের এসব হীন কর্মপন্থা) তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কোনো (ঈমানদার) ব্যক্তিকেই পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হবে না।[১০৫] ৭০. হে কিতাবধারীরা, তোমরা জেনে বুঝে কেন আল্লাহর আয়াত (ও তাঁর বিধি-বিধানকে) অস্বীকার করছো, অথচ (ইতিহাসের এই ঘটনা সমূহের) সত্যতার সাক্ষ্য তো তোমরাই বহন করছো।[১০৬] ৭১. হে কিতবধারীর কেন তোমরা 'হক'কে বাতিলের সাথে (মিশিয়ে) মূল বিষয়কে সন্দেহযুক্ত করে) দিচ্ছে (এতে করে প্রকারান্তরে) তোমরা সত্যকেই গোপন করে দিচ্ছো, অথচ (তোমাদের এ কার্যক্রম যে সত্যের পরিপন্থী) তা তোমরা ভালো করেই জানো।[১০৭]

দাবী করতো। এমনি ভাবে ইহুদী, খৃষ্টানদের সম্মুখে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হলে তারা বলতো যে, আমরাওতো আল্লাহকে এক মানি। বরং সকল ধর্মের লোকেরাই কোন না রূপে ওপরে নিয়ে স্বীকার করতো যে, বড় খোদাতো একজনই। এখানে সেদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, বুনিয়াদী আকীদা অর্থাৎ আল্লাহর তাওহীদ এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলে স্বীকার করা। এ ব্যাপারে আমরা উভয়ে একমত। এ বুনিয়াদী আকীদা এমন জিনিষ, যা আমাদের সকলকে এক করতে পারে। অবশ্য এজন্য সত্য এই যে, সামনে অগ্রসর হয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে তার মূল তত্ত্বে কোন রদবদল করতে পারবে না। এজন্য প্রয়োজন হচ্ছে এই যে, যেমনিভাবে মুখে নিজেদেরকে মুসলিম ও তাওহীদবাদী বলে দাবী কর, তেমনি বাস্তবে এবং কার্যেও নিজেকে লা শরীক আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবে। তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী করবে না, তার জন্য নির্ধারিত ছিফাত বা গুণাবলীতে কাউকেও অংশীদার করবে না। মহান পরওয়ার দেগারের সঙ্গে যে আচরণ করা যায়, কোন আলেম পীর-ফকীরের সঙ্গে তা করবে না। যেমন কাউকেও তার পুত্র-পৌত্র করা, বা শরীয়তের স্পষ্ট বিধান উপেক্ষা করে নিছক কারো হালাল-হারাম বলায় কোন জিনিষকে হালাল-হারাম করার মানদন্ড ঠিক করা—তারা আল্লাহর পবিরর্তে আহবার রোহবান অর্থাৎ পাদ্রী-পুরোহিতকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছেন, আয়াতে তাফসীর থেকে যা প্রকাশ পায়। এসব বিষয় ইসলামের দাবী আর তাওহীদের পরিপন্থী।

১০০ অর্থাৎ তোমরা ইসলাম এবং তাওহীদের দাবী করে ফিরে গেছ। আলহামদুলল্লাহ। আমরা তাতে অটল-অবিচল আছি। আমরা নিজেদেরকে কেবলমাত্র এক আল্লাহর নিকট সমর্পণ করেছি। এবং কেবল তাঁরই ফরমানের অনুগত।

১০১ যেমন ইসলাম এবং তাওহীদের দাবীতে সকলেই সম অংশীদার ছিলো, তেমনিভাবে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর সম্মান-মর্যাদায়ও সকলেই সমান অংশীদার ছিলো।

ইহুদী খৃষ্টানদের মধ্যে সকল দল দাবী করতো যে, ইবরাহীম (আঃ) আমাদের দ্বীনের ওপর ছিলেন। অর্থাৎ তিনি ইহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন (নাউযু বিল্লাহ)। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, ইহুদী-খৃষ্টান তো বলা হয় তাওরাত-ইঞ্জীলের অনুসারীদেরকে। আর তাওরাত ইঞ্জীলতো অবতীর্ণ হয়েছে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর হাজার হাজার বসর পরে। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে কি করে ইহুদী-খৃষ্টান বলা যেতে পারে? বরং যে ধরণের ইহুদী-খৃষ্টান তোমরা, সে অর্থে তো স্বয়ং মূসা ও ঈসা (আঃ)কেও তো ইহুদী-খৃষ্টান বলা যায় না। আর যদি এ অর্থ হয়ে থাকে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর শরীয়ত আমাদের ধর্মের নিকটতর ছিলো, তবে এটাও ভুল। তোমরা কোথা থেকে এটা জানতে পারলে? এ কথা তো তোমাদের কিতাবে উল্লেখ নেই, আল্লাহও এ খবর তোমাদের দেননি, এর স্বপক্ষে তোমরা কোন প্রমাণও উপস্থাপন করতে পারনা। অতঃপর এমন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হওয়া, যার কোন জ্ঞান মানুষের নেই, এটা অজ্ঞতা নয় তবে কি? যে বিষয়ে তোমাদের অল্প-বিস্তর জ্ঞান ছিলো, যদিও তা ছিলো একান্ত অসম্পূর্ণ এবং ভাসাভাসা, যেমন মাসীহ (আঃ)-এর ঘটনাবলী অথবা শেষ নবীর সুসংবাদ ইত্যাদি এসব বিষয়ে তো তোমরা বিবাদে লিপ্ত হয়েছ ইতিপূর্বে। কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের আদৌ কোন জ্ঞান নাই, যার বাতাসও কোন সময় তোমাদের গায়ে লাগেনি, তা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দাও। তিনিই জানেন, ইবরাহীম (আঃ) কি ছিলেন, আর আজ দুনিয়ায় কোন্ দলের মতবাদ তাঁর নিকটতর।

১০২. অর্থাৎ ইবরাহীম (আঃ) তো নিজেকে হানীফ বা মুসলিম বলেছেন। 'হানীফ' অর্থ যে ব্যক্তি সকল বাতেল পথ ছেড়ে একমাত্র সত্যপথ অবলম্বন করেছে। আর মুসলিম অর্থ অনুগত। এখন ভেবে দেখ, কে সব কিছু ছেড়ে আল্লাহর পথ ধরেছে এবং নিজেকে একনিষ্ঠভাবে তাঁর কাছে সমর্পণ করেছে? সে-ই হবে ইবরাহীম (আঃ) -এর অতি নিকটতর- তাঁর সঙ্গে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল।

এখানে মুসলিম শব্দে ইসলাম দ্বারা খাদ শরীয়তে মোহাম্মদীয়া অর্থ গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। বরং এখানে ইসলামের অর্থ হচ্ছে সোপর্দ এবং আনুগত্য। এটাই ছিলো সমস্ত নবীদের দ্বীন, আর হযরত ইবরাহীম (আঃ) বিশেষ করে এ নাম ও লকবকে অনেক উজ্জ্বল করেছেন 'তাঁর পরওয়ারদেগার যখন তাঁকে বললেন, আত্ম সমর্পণ কর, তিনি বললেনঃ বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম (আল-বাকারা: ১৩১)। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবন বৃত্তান্তের এক একটি অক্ষর বলে দেয় যে, তিনি সর্বতো ভাবে ইসলাম, আত্ম-সমর্পণ এবং সন্তুষ্টির মূর্ত প্রতীক ছিলেন। হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে জবেহ করার ঘটনায়ঃ 'তাঁরা উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করলো এবং তাকে কাত করে শোয়ালোএ শব্দগুলো তাঁর ইসলামের মর্যাদাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করছে। আমাদের নবী এবং তাঁর প্রতি আল্লাহ বরকত ও সালাম নাযিল করুন।

১০৩ আল্লাহ্ তায়ালা জানায়ে দিয়েছেন যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে বেশী সামঞ্জস্য ছিলো -সমকালীন উম্মতের অথবা বিগত উম্মত গুলোর মধ্যে এ উম্মতের। সুতরাং এ উম্মত নামেও এবং পথ-পন্থায়ও ইবরাহীম (আঃ)-এর সহিত বেশী সামঞ্জস্যশীল। এ উম্মত অর্থাৎ শেষ নবীর উম্মত সীরত-সূরত-আকৃতি-প্রকৃতিতেও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া অনুপাতেই তাঁর আগমন হয়েছে। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে 'হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে নিজেদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদেরকে তোমর আয়াত পাঠ করে শুনাবেন' -এ কারণে হাবশা বা আবিসিনিয়ার খৃষ্টান বাদশাহ নাজ্জাশী মুসলমান মোহাজেরদেরকে 'হেযবে ইবরাহীম' বা ইবরাহীমের দল বলতো। বস্তুতঃ এ ধরণের সামঞ্জস্যের কারণেই দরূদ শরীফে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেই ধরণ এবং সেই নমুনার শান্তি নাযিল কর, যা ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের ওপর নাযিল করেছ। জামেয়ে তিরমিযীতে এই মর্মে একটা হাদীস আছে; এ বিষয়ে পরে কোন এক সূরায় আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ্।

১০৪ অর্থাৎ তাঁর ওপর ওহী নাযিল না হলেই কেবল তাঁর পথ যে, সত্য কারো সাদৃশ্য-সামঞ্জস্য দ্বারা তা প্রমাণ করতে হতো। সুতরাং আল্লাহ তো মুসলমানদের বন্ধু। এরাতো সরাসরি তাঁর নির্দেশেই চলে- (মূযেহুল কোরআন)।

১০৫. পূর্বে বলা হয়েছে; 'আল্লাহ মোমেনদের বন্ধু'। এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যখন মো'মেনদের বন্ধু তখন তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারনা। সন্দেহ নেই যে, অনেক আহলে কিতাবই চায় যে, নিজেরা যেমন গোমরাহ্, তেমনি মুসলমানদেরকেও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। কিন্তু মুসলমানরাতো তাদের জালে জড়াবার নয়। অবশ্য এরা নিজেদের গোমরাহীর ধারণায় আরও সংযোজন করছে। এদের বিভ্রান্তকর চেষ্টার প্রভাব স্বয়ং তাদের ওপরই পতিত হবে, যদিও এখন তাঁরা বুঝছেনা।

১০৬. অর্থাৎ তোমরা তাওরাত ইত্যাদিকে স্বীকার কর। এতে পয়গম্বরে (সঃ) এবং কোরআন মজীদ সম্পর্কে অনেক সুসংবাদ বর্তমান রয়েছে। তোমরা অন্তরে এটা বুঝতে পার এবং একান্তে স্বীকারও কর। তা হলে প্রকাশ্যে কোরআনের প্রতি ঈমান আনবে এবং শেষ নবী (দঃ) এর সত্যতা স্বীকার করতে বাধা কিসের? ভালো করে জেনে রাখবে যে, কোরআনকে অস্বীকার করা অতীতের সকল আসমানী কিতাবে অস্বীকৃতি।

১০৭. পার্থিব স্বার্থের খাতিরে তাওরাতের কোন কোন বিধানতো আদপে রহিত করেছিলো। কোন কোন আয়াতে শাব্দিক পরিবর্তনও করেছিলো। কোন কোন আয়াতে অর্থের পরিবর্তন করেছিলো। আর কিছু বিষয় গোপন রেখেছিলো, সকলকে জানাতোনা। যেমন, শেষ নবীর আগমনের সুসংবাদ।

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا

بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا

اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿৭২﴾ وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ

دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ

مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ

الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ

عَلِيْمٌ ﴿৭৩﴾ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ

الْعَظِيْمِ ﴿৭৪﴾ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ

يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ

اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا

لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ

الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿৭৫﴾ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ

وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿৭৬﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ
لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ
اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ﴿۷۷﴾ وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ
لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ
وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ
وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۷۸﴾
مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ
وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ
الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿۷۹﴾ وَلَا يَاْمُرَكُمْ
اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ
بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۸۰﴾

রুকু ৮

৭২. এই আহলে কিতাবদের (মধ্য থেকে) একদল (নির্বোধ), তাদের নিজেদের লোকদের) বলে যে, (এই নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কারী) মুসলমানদের ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা সকাল বেলায় তার ওপর ঈমান আনো এবং বিকেল বেলায় (পুনরায়) তা অস্বীকার করো, (এ তামাশার আচরণের ফলে) তারা সম্ভবত (নবীর ওপর ঈমান আনা থেকে) ফিরে আসবে।[১০৮] ৭৩. যারা তোমাদের (অবতীর্ণ) বিধানের ওপর ঈমান আনে, এমন সব লোকজন ছাড়া অন্য কারো কথাই মেনে নিয়োনা[১০৯/১১০] (হে নবী!) তুমি বলে দাও একমাত্র হেদায়াত হচ্ছে আল্লাহর হেদায়াত (তোমরা একথা মনে করো না যে) তোমাদের যে ধরনের ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে তেমন ধরনের কিছু অন্য কাউকেও দেয়া হবে এবং সেই সূত্র ধরে অন্য লোকেরা তোমাদের মালিকের দরবারে তোমাদের বিরুদ্ধে কেনো রকম যুক্তিতর্ক খাড়া করবে।[১১১] (হে নবী!), তুমি তাদের (এই প্রসঙ্গে) বলে দাও যে, (হেদায়াত দানের) এ অনুগ্রহ (ও দয়ার ভান্ডার) তো আল্লাহর হাতেই তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দান করেন। বস্তুত আল্লাহর ভান্ডার বিশাল ও বিস্তৃত। তিনি (সকল বিষয়ে) প্রজ্ঞা সম্পন্ন।[১১২] ৭৪. (হেদায়াতের এই অনুগ্রহ দানের জন্যে) নিজের দয়া দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই বিশেষ করে বাছাই করে নেন। আর আল্লাহ্ তায়ালা অসীম দয়া ও অনুগ্রহের মালিক। ৭৫. এই আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন লোকও আছে, তুমি যদি তাদের কাছে ধন-সম্পদের এক স্তূপও আমানত রাখো- তারা (চাওয়া মাত্রই) তা ফেরত দিয়ে দেবে, আবার এদের মধ্যে এমন কিছু (লোকও) আছে যাদের কাছে যদি একটি দিনারও তুমি রাখো, তারা তা আদায় করে দেবে না-হ্যাঁ যদি (এ অর্থ আদায়ের জন্যে) তোমরা তাদের ওপর চেপে বসতে পারো[১১৩] (তবে তা ভিন্ন কথা) এটা এই কারণে যে, এরা বলে, এই অ-ইহুদী আরব অশিক্ষিত লোকদের (সাথে লেনদেনে বিশ্বাস রাখার) ব্যাপারে আমাদের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।[১১৪] (এই ভাবেই) জেনে বুঝে আল্লাহর সম্পর্কে এরা মিথ্যা কথা বলে বেড়ায়।[১১৫] ৭৬. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কৃত (ভালো হয়ে চলার এই) প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলে, অতপর (সেই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে) সাবধানতা অবলম্বন করে (তাদের জন্যে সুখবর হচ্ছে যে) আল্লাহ্ তায়ালা এই সাবধান হয়ে পথ চলার লোকদের ভালোবাসেন।[১০৬] ৭৭. (যারা আল্লাহর সাথে কৃত) প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের শপথ সমূহকে সামান্য (বৈষয়িক) মূল্যে বিক্রি করে দেয়[১০৭], পরকালে তাদের জন্যে (আল্লাহর নেয়ামত ও পুরস্কারের) কোনো অংশই থাকবে না। (মহা বিচারের শেষে) এই হতভাগ্য লোকদের সাথে আল্লাহ্ তায়ালা কোনো কথাবার্তা বলবেন না - এমনকি সেদিন আল্লাহ্ তাআলা তাদের দিকে তাকিয়েও দেখবেন না, আল্লাহ্ তায়ালা তাদের পাক পবিত্রও করবেন না এবং এদের জন্যে রয়েছে থাকবে কঠোর ও পীড়াদায়ক আযাব।[১০৮] ৭৮. এদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা যখন কিতাবের কোনো অংশ পড়ে তখন নিজেদের জিহ্বাকে এমন করে এদিক-সেদিক করে নেয়. যাতে তোমরা মনে করতে পারো

যে, (তারা) সত্যিই বুঝি কিতাবের কোনো অংশ (পড়ছে) কিন্তু সত্যিকার অর্থে তা কিতাবের কোনো অংশই নয়। তারা আরো বলে যে, এটা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে। কিন্তু তা আল্লাহর কাছ থেকে আসা কিছু নয়।[১০৯] (এই ভাবেই) এরা জেনে শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে চলেছে। ৭৯. (হে কিতাবধারীরা, তোমরা একবার ভেবে দেখো) কোনো মানব সন্তানের পক্ষেই এটা (শোভনীয়) হতে পারে না যে, আল্লাহ তাকে তাঁর কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুয়ত দান করবেন অতপর সে লোকদের ডেকে বলবে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে এখন আমার বান্দাহ হয়ে যাও।[১১০] বরং (এসব নিয়ামত পেলে) সে তো বলবে, তোমরা সবাই তোমাদের মালিকের অনুগত হয়ে যাও। যেমনি করে (এই কিতাবও তোমাদের সেই একই শিক্ষা দিচ্ছে যে) তোমরা এই কিতাব শেখাও এবং (যুগ যুগ ধরে) (এই কিতাবই) অধ্যয়ন করছো।[১১১] ৮০. আর আল্লাহর ফেরেশতা ও তার নবীদের প্রতিপালকরূপে স্বীকার করে নিতেও কখনো এই ব্যক্তি তোমাদের আদেশ দেবে না।[১১২] (তা ছাড়া একবার) তোমরা আল্লাহর আনুগত মুসলমান হবার পর সে কিভাবে তোমাদের পুনরায় কুফরীর আদেশ দেবে?[১১৩]

---

১০৮. এ আয়াত গুলোতে আহলে কিতাবদের চালাকী-চতুরতা এবং খেয়ানত সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। তাদের এসব চালাকী-চতুরামীর মধ্যে একটি ছিলো এ যে, তাদের কিছু লোক ভোরে বাহ্যতঃ মুসলমান সেজে তাদের সঙ্গে নামায পড়ে আর বিকালে এ বলে ইসলাম থেকে ফিরে যেতো যে, আমাদের বড় বড় আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছি যে, ইনি সে নবী নয়, যাঁর সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতা দ্বারাও তাঁর অবস্থা সত্যপন্থী বলে প্রমাণিত হয়নি। এর ফল হবে এ যে, আমাদেরকে দেখে অনেক দুর্বল ঈমান লোকেরা ইসলাম ত্যাগ করবে। তাঁরা মনে করবে যে, ইসলাম ধর্মে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি দেখতে পেয়ে এরা ইসলাম ত্যাগ করেছে। উপরন্তু আরবের জাহেলদের মধ্যে আহলে কিতাবের জ্ঞান ও শ্রেষ্টত্বের চর্চা ছিলো। এর ভিত্তিতে এ ধারণা জন্ম নেবে যে, এ ধর্ম সত্য হইলে এমন জ্ঞানী-গুণীরা তাকে প্রত্যাখ্যান করতো না। বরং সকলের আগে এরাই ইসলাম কবুল করতো।

১০৯. অর্থাৎ যারা অযথা মুসলমানদের সামনে গিয়ে মোনাফেকী করে নিজেদেরকে মুসলমান যাহির করে, তাদেরকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, সত্য সত্যই তাঁরা মুসলমান হয়ে যায়নি। বরং এরা রীতিমতো ইহুদী-ই রহেছে। যারা এদের দ্বীন অনুযায়ী চলে এবং মুসার শরীয়তের অনুসারী বলে দাবী করে, এরা মনে-প্রাণে কেবল তাদের কথা-ই মানতে পারে। আর কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন যে, বাহ্যিকভাবে ঈমান এনে নিজেদেরকে মুসলমান বলবে। এরা কেবল তাদের জন্য, যারা তোমাদের দ্বীন অনুযায়ী চলে। অর্থাৎ এ কৌশল দ্বারা নিজের স্বধর্মীদের হেফাযত উদ্দেশ্য হবে। যাতে তাঁরা মুসলমান হতে না পারে। যারা মুসলমান হয়েছে. এ কৌশলের ফলে তাঁরা ফিরে যায়।

১১০. অর্থাৎ আল্লাহ দান করলেই তো হেদায়াত পাওয়া যায়। আল্লাহ যার অন্তরে হেদায়াতের নূর সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের এহেন প্রতাঁরণাপূর্ণ চালবাজীর ফলে তাঁরা কখনোই গোমরাহ হবে না।

১১১. অর্থাৎ অন্যদেরকে কেন এ ধরণের শরীয়ত এবং নবুওয়্যাত ও রেসালাত দেওয়া হচ্ছে- যেমন ইতিপূর্বে তোমাদরকে দেয়া হয়েছিল কেবল এ হিংসার আগুনে জ্বলেই এসব চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র করছে। অথবা ধর্মীয় চেষ্টা সাধনায় অন্যরা তোমাদের ওপর বিজয়ী হয়ে কেন সামনে অগ্রসর হচ্ছে আর আল্লাহর সম্মুখে তোমাদেরকে অভিযুক্ত করছে। ইহুদীরা সব সময় এ ধারণা প্রচার করতো যে, দুনিয়ায় কেবল আমাদের জাতি শরীয়তের জ্ঞানের ইজারাদার। তাওরাত আমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, মূসা (আঃ)-এর মতো মহান পয়গম্বর আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। এ ফযীলত-মর্যাদার সঙ্গে আরবের উম্মী-নিরক্ষরদের কি সম্পর্ক? কিন্তু তাওরাত দ্বিতীয় বিবরণের মহান ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হতে পারেনা। এতে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইলের ভাইয়ের (বনী ইসমাইলের) মধ্যে মূসার মতো একজন (স্বতন্ত্র শরীয়তধারী) নবী প্রেরণ করবেন। তাঁর নিজের বাণী (কুরআন করীম) তাঁর মুখে নিক্ষেপ করবেন। 'নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের প্রতি একজন রাসূলকে সাক্ষী হিসেবে প্রেরণ করেছি, যেমন আমি ফেরাউনের প্রতি রাসূল প্রেরণ করেছি। (মুয-যাম্মিল: ১৫)। বনী ইসমাইল এ দওলত লাভ করেছে। তাঁরা জ্ঞান-মর্যাদা, যুক্তি-প্রমাণ এবং ধর্মীয় চেষ্টা-সাধনার প্রতিযোগিতাঁর ক্ষেত্রে কেবল বনী ইসরাইলদের ওপরই নয়, বরং দুনিয়ের সকল জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। এজন্য সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। এ আয়াতের ব্যাখ্যা কয়েকভাবে করা হয়েছে। আমরা তরজমা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছি।

১১২. অর্থাৎ আল্লাহর ভান্ডারে অভাব নেই। এবং তিনিই জানেন, কার কি পরিমাণ শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়া উচিৎ। নবুওয়্যাত শরীয়ত, ঈমান, ইসলাম সব রকমের বস্তুগত ও আত্মিক ফাযায়েল ও কামালাত বন্টন করা তাঁরই হাতে নিহিত। তিনি যখন যাকে যোগ্য মনে করেন, তাকে দান করেন। 'আল্লাহ ভালো জানেন, রেসালাতের দায়িত্ব কাকে অর্পণ করবেন' (আল-আনআম : ১২৪)।

১১৩. দ্বীনের ব্যাপারে আহলে কিতাবের খেয়ানত ও মোনাফেকী প্রসঙ্গে পার্থিব খেয়ানতের প্রসঙ্গও এসেছে। এ থেকে এ ব্যাপারেও জানা গেছে যে, যারা সামান্য পয়সার জন্য নিয়ত খারাব করে, আমানতদারী রক্ষা করতে পারেনা, তাঁরা দ্বীনের ব্যাপারে আমানতদার ও বিশ্বস্ত প্রমাণিত হবে--এমন আশা কি করে করা যেতে পারে? তাই দেখা যায়, তাদের এমন অনেকেই আছে, যাদের কাছে একটা আশরাফী আমানত রাখলেই পরীক্ষা হয়ে যায়। তাগাদার জন্য কেউ তাঁর মাথার ওপর দাঁড়িয়ে না থাকলে এবং পেছনে লেগে না থাকলে আমানত আদায় করেনা। অবশ্য সন্দেহ নেই যে, তাদের মধ্যে সকলেরই এ অবস্থা নয়। কেউ কেউ এমনও আছে, যার কাছে একস্তুপ স্বর্ণ রাখলেও তাতে এক রত্তি

পরিমাণও খেয়ানত করেনা। মোয়ামালাতে এসব খাটি এবং আমানতদার লোকেরাই খৃষ্টবাদ ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ। আল্লাহ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ

مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ

وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ

إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم

مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿৮১﴾ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْفَاسِقُونَ ﴿৮২﴾ أَفَغَيْرَ دِينِ اللّٰهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿৮৩﴾

قُلْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ

وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿৮৪﴾

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

রুকু ৯

৮১. (স্মরণ করো সেই সময়ের কথা) যখন আল্লাহ তাঁর নবীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। (তিনি তাদের বলেছিলেন) এই হচ্ছে কিতাব ও (তার বাস্তব) জ্ঞান কৌশল যা আমি তোমাদের দান করলাম, অতপর তোমাদের কাছে যখন (আমার পক্ষ থেকে) কোনো রসূল আসবে যে (আমার ব্যাপারে) তোমাদের কাছে রক্ষিত কিতাবের সত্যতা স্বীকার করবে। তখন তোমরা অবশ্যই তার (আনীত বিধানের) ওপর ঈমান আনবে এবং তাকে অবশ্যই সব ধরনের সাহায্য করবে। (এই বলে) আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমার সাথে (এটা মেনে চলার ব্যাপারে) অঙ্গীকার করছো? এবং এই (গুরুদায়িত্বের) বোঝা গ্রহন করছো তো? তারা বললো, হ্যাঁ (মালিক) আমরা (মেনে চলার) অঙ্গীকার করছি।[১১৩] আল্লাহ বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থেকো এবং আমিও তোমাদের সাথে (এই মহান অঙ্গীকারের দলীলে) সাক্ষী হয়ে রইলাম।[১১৪] ৮২. অতপর যারা তা ভঙ্গ করে (মূল প্রতিশ্রুতি থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারা অবশ্যই বিদ্রোহী (সীমালংঘনকারী বলে পরিগণিত) হবে।[১১৫] ৮৩. তারা কি আল্লাহর দেয়া (জীবন) ব্যবস্থার বদলে অন্য কোনো বিধানের সন্ধান করছে? অথচ এই আসমান জমীনের সব কয়টি জিনিসই-ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, আল্লাহ তায়ালার বিধানের সামনেই আত্মসমর্পণ করে আছে।[১১৬] (কারণ সব কিছু সাংগ হলে) প্রত্যেককে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।[১১৭] ৮৪. (হে নবী!) তুমি বলো, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি। ঈমান এনেছি আমাদের ওপর যা নাযিল করা হয়েছে তার ওপর। ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের অন্যান্য বংশধরদের প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপরও ঈমান এনেছি আমরা আরো ঈমান এনেছি, মুসাও ইসাকে যা দেয়া হয়েছে তার ওপর। তাদের মালিকের পক্ষ থেকে (আরো) যারা নবী (হয়ে) এসেছে, তাদের সবার তার পরও আমরা বিশ্বাস করি। (আল্লাহর) এই নবীদের মাঝে আমরা কোনো ধরনের পরখ করি না। আমরা সবাই হচ্ছি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী[১১৮] (মুসলিম)। ৮৫. যদি (তোমাদের মধ্যে) কেউ ইসলাম ছাড়া (নিজের জন্যে) অন্য কোনো জীবন বিধানের সন্ধান করে তার কাছ থেকে তার সেই (উদ্ভাবিত) ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না।[১১৯] (আর দুনিয়ায় এ বিদ্রোহমূলক আচরণের জন্যে) পরকালের কাঠগড়ায় সে হবে চরম ব্যর্থ।[১২০]

১১৪. অর্থাৎ অপরের হক খাওয়ার জন্য এ মাসআলা খাড়া করেছে যে করে, আরবের উম্মী, যারা আমাদের ধর্মে নেই, তাদের মাল যেভাবেই পাওয়া যায় বৈধ। বিধর্মীদের আমানতে খেয়ানত করলে কোন গুণাহ্ হয়না। বিশেষ করে সেসব আরব, যারা পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে গেছে। আল্লাহ তাদের মাল আমাদের জন্য হালাল করেছেন।

১১৫. অর্থাৎ জেনে-বুঝে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে। আমানতের খেয়ানত করার অনুমতি আল্লাহ কখনো দেন নি। মুসলিম হোক বা কাফের-কারো আমানতে খেয়ানত করা জায়েয নেই। ইসলামী ফেকাহ্ শাস্ত্রে আজও এ মাসালা বর্তমান।

১১৬: অর্থাৎ খেয়ানত ও অঙ্গিকার ভঙ্গ করায় গুনাহ্ হবেনা কেন? আল্লাহ্ তায়ালার সাধারণ বিধান তো এ যে, যে কেহ আল্লাহ্ এবং বান্দাদের বৈধ অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আল্লাহ্কে ভয় করে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে অর্থাৎ বাতেল চিন্তাধারা, ঘৃণ্য কর্মকান্ড এবং নীচ চরিত্র থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহ্ তাকে ভালোবাসেন। আমানতের অবহেলাও এর অন্তর্ভূক্ত।

১১৭. অর্থাৎ যারা দুনিয়ের তুচ্ছ সম্পদ গ্রহণ করে আল্লাহর অঙ্গীকার এবং নিজেদের পরস্পরের মধ্যকার কসম ভঙ্গ করে, নিজেদের মোয়ামালা ঠিক রাখেনা, আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারে অটল থাকেনা, বরং অর্থ-বিত্ত ও গদীর লোভে শরীয়তের বিধানে পরিবর্তন সাধন করে এবং আসমানী কিতাবে রদবদল করে, তাদের পরিণাম সম্পর্কে পরে বলা হচ্ছে। হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) লিখেন ঃ 'এসব ইহুদীদের গুণ। আল্লাহ্ তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদেরকে কসম দিয়েছিলেন যে, তারা সকল নবীর সাহায্যকারী হবে। কিন্তু দুনিয়ার গরজে তাঁরা সব ফিরে যায়। দুনিয়া হাসিলের জন্য যে কেউ মিথ্যা কসম খায়, তাঁর এ অবস্থা।'

১১৮. সূরা বাকারার ২১ রুকতেও এ ধরণের আয়াত ছিলো। সেখানে শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৯. এখানে আহলে কিতাবদের তাহরীফ-পরিবর্তনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আসমানী কিতাবে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু কথা হ্রাস-বৃদ্ধি করে এমন ভঙ্গিতে পাঠ করে, যাতে অনভিজ্ঞ শ্রোতা ধোকায় পড়ে মনে করে যে, এটাও বুঝি আসমানী কিতাবেরই পাঠ-কেবল এটাই নয়, বরং মুখে দাবীও করে যে, এসবই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। অথচ সে পরিবর্তিত কিতাবকেও সামগ্রিকভাবে আল্লাহর কিতাব বলা যায়না। কারণ, তাতে নানারকম হেরফের এবং জাল-জুয়া করা হয়েছে। আজ দুনিয়ায় বাইবেলের যেসব কপি বর্তমানে রয়েছে, তাতেও অনেক পরস্পর বিরোধী বক্তা দেখা যায়। এমন অনেক বিষয়ও তাতে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা আদৌ আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে পারেনা। এর কিছুটা বিবরণ তাকসীরে রুহুল মাআনীতে আছে। তাহরীফ-পরিবর্তন প্রমাণ

করার জন্য আমাদের আলেমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

১২০. নাজরান প্রতিনিধি দলের উপস্থিতিতে কোন কোন ইহুদী-খৃষ্টান বলেঃ হে মোহাম্মদ (দঃ)! খৃষ্টানরা যেমন ঈসা ইবনে মারইয়ামের পূজা করে, তুমি কি চাও যে, আমরাও তেমনি তোমার পূজা শুরু করি? মহানবী (দঃ) জবাবে বললেন: মা'আশাল্লাহ, আমরা গায়রুল্লাহর বন্দেগী করবো বা অন্যদেরকে এর দাওয়াত দেবো-এমন কাজ থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ কাজের জন্য প্রেরণ করেননি। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়। অর্থাৎ যে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা কিতাব হেকমত-প্রজ্ঞা এবং ফয়সালা করার ক্ষমতা দান করেন এবং পয়গম্বরীর মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন, এজন্য যে, তিনি যথাযথভাবে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছায়ে মানুষকে আল্লাহর বন্দেগী ও ওফাদারীর প্রতি আকৃষ্ট করবেন, তাঁর এ কাজ কখনো হতে পারেনা যে, তাদেরকে এক আল্লাহর খালেস বন্দেগী থেকে দূরে সরায়ে স্বয়ং নিজের বা অন্য লোকদের বান্দায় পরিণত করবেন। এরতো অর্থ হবে এ যে, মহান আল্লাহ যাকে সে কাজের যোগ্য মনে করে প্রেরণ করেছেন, আসলে সে ব্যক্তি তাঁর যোগ্য ছিলনা দুনিয়ার কোন সরকারও কাউকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের পূর্বে দুটি বিষয়ে চিন্তা করে। এক লোকটি সরকারের নির্দেশ মেনে চলা এবং প্রজাদেরকে ওফাদারীর পথে অটল রাখার ব্যাপারে তাঁর ওপর কি পরিমান আস্থা রাখা যায়, আশা করা যায়। কোন বাদশাহ বা পার্লামেন্ট এমন কোন লোককে সরকারের প্রতিনিধি বা দূত নিযুক্ত করতে পারেনা, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়ানো বা সরকারের নীতি ও নির্দেশের বিরোধিতা করার সামান্যতম সংশয়ও হয় যার সম্পর্কে সরকার সঠিক ধারণা করতে পারেনি। কিন্তু মহান আল্লাহ সম্পর্কে এটাও খাটেনা। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর যদি এ জ্ঞান থাকে যে, সে আমার ওফাদারী ও আনুগত্য পরায়ণতা থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হবেনা, তবে সামনে অগ্রসর হয়ে সে এর বিপরীত প্রমাণিত হবে-এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অন্যথায় আল্লাহর জ্ঞান ভুল হতে বাধ্য। নাউযুবিল্লাহ।

এখান থেকেই আম্বিয়া (আঃ) এর 'ইসমত' বা নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। আবু হাইয়্যান তাঁর তাফসীরে এবং মওলানা কাসেমুল উলুম ওয়াল খায়রাত তাঁর রচনায় এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আম্বিয়া (আঃ) যখন সামান্যতম না-ফরমানী থেকেও মুক্ত-পবিত্র, তখন শেরক এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অবাধ্যতার সম্ভাবনা কোথায় অবশিষ্ট থাকতে পারে? মাসীহর পিতা বা ইলাহ হওয়ার আকীদা আমাদেরকে স্বয়ং মাসীহ-ই শিক্ষা দিয়েছেন-এতে খৃষ্টানদের এ দাবীরও অসারতার জবাবও আছে। যেসব মুসলমান রসূলের কাছে আরয করেছিলো যে, আমরা সালামের পরিবর্তে আপনাকে সেজদা করলে তাতে দোষ কি? এতে তাদেরকেও নসীহত করা হয়েছে। আহলে কিতাবদের সম্পর্কেও ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা পাদ্রী-পুরোহিতকে খোদায়ীর স্থান দিয়ে রেখেছিলো। নাউযুবিল্লাহ।

আবু হাইয়্যানের মতে আগের আয়াতে বা অস্বীকৃতি শেষের আয়াতের মতো। আর আমার মতে এটাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

كَيْفَ يَهْدِي

اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ

الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي

الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ

عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٧﴾

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ

يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٨﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ

وَاَصْلَحُوْا ۗ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٨٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ

تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ

اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ؕ

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٩١﴾

৮৬. (বলো) যারা ঈমানের (আলো পাওয়ার) পর কুফরীর (অন্ধকার) কে বেছে নিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের কিভাবে (নতুন করে আবার আলোর) পথ প্রদর্শন করবেন। অথচ (কুফরীর পন্থা অবলম্বন করার আগে) এরাই সাক্ষ্য দিয়েছিলো যে, আল্লাহর রসূল সত্য এবং (এই রাসূলের মাধ্যমে) এদের কাছে (আল্লাহর কাছ থেকে) উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ এসেছিলো। মূলত আল্লাহ তায়ালা কখনো (এই ধরনের) সীমালংঘনকারী ব্যক্তিদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।[১২১] ৮৭. এসব (সীমালংঘনজনিত) কার্যকলাপের একমাত্র প্রতিদান হচ্ছে, তাদের ওপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা ও অন্য সব মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে।[১২২] ৮৮. (এই অভিশাপের নিকৃষ্টতম স্থান হবে জাহান্নাম) সেখানে তারা অনাদিকাল ধরে পড়ে থাকবে।[১২৩] (এক মুহূর্তের জন্যেও) তাদের ওপর জাহান্নামের কঠোর শাস্তির মাত্রা কমানো হবে না, তাদের এ আযাব থেকে (একটুখানি) বিরামও দেয়া হবেনা।[১২৪] ৮৯. (তবে) তাদের কথা আলাদা, যারা এসব (অপরাধ) করার পর তৌবা করেছে এবং তারপর নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[১২৫] ৯০. কিন্তু যারা একবার ঈমান আনার পর কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে অতপর যারা এই বেঈমানী কার্যকলাপকে দিন দিন বাড়াতেই থেকেছে, তারা যদি তৌবা করে (অনুতপ্তও হয়, আল্লাহর দরবারে) তা কখনো কবুল হবে না। কারণ এ ধরনের লোকেরা তো (চিরতরে) পথভ্রষ্ট[১২৬] (হয়ে পড়েছে)। ৯১. (এটা সুনিশ্চিত যে,) যারা আল্লাহ ও তাঁর বিধি-বিধানকে অস্বীকার করে (প্রত্যাখ্যান করেছে) এবং এ অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়েছে, তারা যদি নিজেদের (আল্লাহর কঠোর আযাব থেকে) বাঁচানোর জন্যে এক পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণও মুক্তিপণ হিসেবে খরচ করে[১২৭], তবু (তাদের কাছ থেকে) তা গ্রহণ করা হবে না। বস্তুত এরাই হচ্ছে (সে সব হতভাগ্য ব্যক্তি) যাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব, আর সেদিন (সেই কঠোর আযাব থেকে বাঁচানোর মতো সেখানে) তাদের কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না।[১২৮]

---

১২১. 'মুযেহুল কুরআনে' আছে;ঃ আল্লাহ যাকে নবী করেন এবং সে মানুষকে কুফরী ও শেরক থেকে বের করে মুসলমানীতে নিয়ে আসে, সে কি করে তাদেরকে কুফরী শিক্ষা দেবে? অবশ্য হে আহলে কিতাব! তোমাদেরকে এটা বলার আছে যে, আগে তোমাদের মধ্যে যে দ্বীনদারী ছিলো, কিতাব পড়া এবং পড়ানো ছিলো, তা আর নাই। এখন আমার সংসর্গে পুনরায় সে পূর্ণতা অর্জন কর। এবং আলেম-জ্ঞানী-হাকীম বুদ্ধিমান, ফকীহ, আরেফ-মুদাব্বের-মুত্তাকী এবং পাক্কা খোদা পন্থী হয়ে যাও। কোরআন করীম পাঠ ও শিক্ষা দান দ্বারা এখন এটা হাসিল করা যেতে পারে।

১২২. যেমন খৃষ্টানরা হযরত মাসীহ রূহুল কুদুসকে, কোন কোন ইহুদী হযরত উয়ায়রকে এবং কোন কোন মুশরেক ফেরেশতাদেরকে সাব্যস্ত করেছিল। ফেরেশতা আর পয়গম্বররা যখন খোদায়ী শরীক হতে পারেনা, তখন পাথর আর ক্রুশের কাঠ কোন্ ছার?

১২৩. অর্থাৎ প্রথমেতো-আল্লাহ ওয়ালা এবং তাওহীদবাদী মুসলিম বানাবার চেষ্টা করেছেন, যারা কবুল করার, করেছে। অতঃপর তাদেরকে কুফরী ও শেরকের দিকে নিয়ে

গিয়ে নিজেদেরকে সকল চেষ্টা-সাধনা ও উপার্জন নিজেদের হাতেই বরবাদ করবে, এটা কিছুতেই বুঝে আসতে পারেনা।

১২৪. অর্থাৎ কোন নবী নিজের বন্দেগীর শিক্ষা দিতে পারেন না। বন্দেগী কেবল এক খোদারই শিক্ষা দেয়া হয়। অবশ্য মানুষ তাদের ওপর ঈমান আনবে। এটা তো হচ্ছে মানুষের ওপর নবীদের হক। তাঁরা নবীদের কথা মানবে এবং সব রকম সাহায্য করবে। সাধারণ মানুষতো কোন্ ছার, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং পয়গম্বরদের কাছে থেকেও পাকা-পোক্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন যে, যখন তোমাদের মধ্য থেকে কোন নবীর পর অপর নবী আসেন- যিনি অবশ্যই আগের নবীদেরকে সংক্ষেপে বা বিস্তারিতভাবে স্বীকার করবেন-তখন তাঁর সত্যতা স্বীকার করা এবং তাঁর সাহায্য করা জরুরী। তাঁর যমানা পেলে নিজে ব্যক্তিগতভাবে এবং না পেলে আপন উম্মতকে পূর্ণরূপে হেদায়াত ও তাকীদ করে যাবে যে, পরে যে পয়গম্বর আসবেন, তাঁর প্রতি ঈমান এনে তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা করবে। কারণ, এ ওছিয়ত করে যাওয়াও এক ধরনের সাহায্যেরই অন্তর্ভূক্ত। এ সাধারণ নিয়ম দ্বারা প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খাতেমুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি ঈমান আনার এবং তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা করার অঙ্গীকার অতীতের সকল নবীর কাছে থেকে গৃহীত হয়ে থাকবে। এক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম নাই। আর তাঁর স্বত্তাই ছিলো সকল পূর্ণতাঁর ভান্ডার, যা অদৃশ্য জগতে সর্বপ্রথম এবং দৃশ্য জগতে সর্বশেষে দেদীপ্যমান হয় অতীত সকল নবীর শেষে। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেননা। আর তাঁর মহিমান্বিত স্বত্তাই সকল অতীতে নবী এবং সকল আসমানী কিতাবে সত্যতাঁর সীল মোহর মারতে পারে।

হযরত আলী (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমূখ থেকে বর্ণীত আছে যে, নবীদের কাছে থেকে এ ধরণের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। আল্লাহর নবী স্বয়ং এরশাদ করেন যে, আজ মূসা (আঃ) বেঁচে থাকলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর কোন গত্যন্তর ছিলনা। তিনি আরও বলেছেনঃ ঈসা (আঃ) নাযিল হয়ে কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ কোরআন মজীদ এবং তোমাদের নবীর সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। হাশরের ময়দানে মহান শাফা'আতের জন্য অগ্রসর হওয়া, তাঁর পতাকা তলে সকল বনী আদমের সমবেত হওয়া, শবে মেরাজে বায়তুল মাকদেসে সমস্ত নবীদের উপস্থিতিতে তাঁকে ইমাম নিযুক্ত করা-এসব কিছু হচ্ছে শেষ নবীর গুণ নেতৃত্ব ও মহান ইমামতির অন্যতম লক্ষণ।

১২৫. কেবল অঙ্গীকারের গুরুত্ব ও তাকীদের জন্য এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, যে অঙ্গিকার পত্রে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর নবীদের সাক্ষ্য থাকে, তাঁর চেয়ে পাকা-পোক্ত দলীল আর কি হতে পারে?

১২৬. আল্লাহ তায়ালা নবীদের কাছে থেকে এবং নবীরা নিজ নিজ উম্মতের কাছে থেকে যে জিনিষটির প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, এখন যদি দুনিয়েয় কেউ তা থেকে মুখ

ফিরায়ে নেয়, তবে সন্দেহ নেই যে, সে হবে সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী এবং না-ফরমান। বাইবেলে প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণী অধ্যায় ১৩ আয়াত ১১.এ আছে: আল্লাহ শুরু থেকে পাক নবীদের যবানী যেসব বিষয় উল্লেখ করেছেন, যত দিন তা স্বস্থানে থাকবে, ততদিন আসমান তাকে অবশ্যই গ্রহণ করবে। কারণ, মুসা পূর্ব পুরুষদের বলেছিলেন, আল্লাহ যিনি তোমাদের প্রতিপালক, তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য আমার মতো একজন নবী পাঠাবেন, তিনি তোমাদেরকে যা কিছু বলবেন সবই শুনবে।

১২৭. অর্থাৎ ইসলাম সবসময় আল্লাহর দ্বীন ছিলো। ইসলাম অর্থ আদেশ মেনে চলা। অর্থাৎ কোন সত্যাশ্রয়ী পয়গাম্বরের মাধ্যমে যখন আল্লাহর যে হুকুম তোমাদের কাছে পৌছে তা শিরোধার্য করে নেবে। আজ সাইয়্যেদুল মুরছালীন খাতেমুল আম্বিয়া (সাঃ) যে সব হেদায়াত বিধি বিধান নিয়ে এসেছেন, তাই আল্লাহর দ্বীন। তাকে বাদ দিয়ে মুক্তি ও কল্যাণের অন্য কোন পথ সন্ধান কর কি? ভালো ভাবে জেনে রাখবে যে, আল্লাহর দ্বীন ত্যাগ করে চিরন্তন মুক্তি ও সত্যিকার কল্যাণ কোথাও পাওয়া যাবেনা। আসমান-যমীনের সব কিছুই যে আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, ইচ্ছা-আগ্রহ, অভিপ্রায় দ্বারা সে আল্লাহর কর্তৃত্ব স্বীকার করে না নেয়া মানুষের জন্য শোভা পায় না। এ প্রাকৃতিক বিধান তাদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের মাধ্যমে হোক, যেমন ফেরেশতা ও অনুগত বান্দাদের আনুগত্যে, অথবা বাধ্যও নিরুপায় হলে, যেমন পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণা, সেসব ঘটনা প্রবাহ সংঘটিত হয় মানুষের ইচ্ছা অভিপ্রায় ছাড়াই। সুসংবাদ তাদের কাছে পৌছেছে, এর পরও দম্ভ অহংকার, হিংসা- পরশ্রী কাতরতা এবং গদি ও অর্থের লোভ ইসলাম গ্রহণ ও কুফরী আবাধ্যতা ত্যাগ করতে বিরত রাখে মানুষের ইচ্ছা- অভিপ্রায় ছাড়াই। এসবই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের অধীন।

১২৮. শেষ পর্যন্ত সকলকে যখন সেখানে ফিরে যেতে হবে, তখন বুদ্ধিমানের জন্য উচিৎ আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এখানে না-ফরমানী করলে সেখানে কি করে মুখ দেখাবে।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا

مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ

حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ

مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ط قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ

فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٣﴾ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ

الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩٤﴾

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ قف فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَمَا

كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾

রুকু ১০

৯২. তোমরা কখনো কোনো (যথার্থ) নেকী অর্জন করতে পারবে না, যতোক্ষণ না তোমরা তোমাদের (একান্ত) ভালোবাসার জিনিসকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। মূলত যাই তোমরা ব্যয় করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই তা জানেন।[১২৯] ৯৩. (আজ তোমাদের জন্যে যে) সব খাবার-(হালাল করা হয়েছে তা) বনী ইসরাঈলদের জন্যেও হালাল ছিলো, অবশ্য এমন দু' একটা জিনিস বাদে-যা তাওরাত নাযিল হওয়ার আগেই ইসরাঈল তার নিজের ওপর হারাম করে রেখেছিলো[১৩০] (তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তাদের) তুমি বলো, যাও, তোমরা গিয়ে তাওরাত নিয়ে এসো এবং (এ সংক্রান্ত) অংশটি পড়ে শোনাও, যদি তোমরা তোমাদের দাবীর ব্যাপারে সত্যবাদী হও![১৩১] ৯৪. এই সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও) যারা অতপর (হালাল হারামের ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে তারা নিসন্দেহে যালিম।[১৩২] ৯৫. তুমি (তাদের আরো) বলো, আল্লাহ তায়ালা (যা কিছুই বলেছেন, তিনি অবশ্যই তা) সত্য বলেছেন, তোমরা সবাই নিষ্ঠার সাথে ইবরাহীমের পদাংক অনুসরণ করো। আর ইবরাহীম (যে) আল্লাহর সাথে অংশীদারীদের দলে শামিল ছিলো না[১৩৩] (এটা তো সবাই জানে)।

১২৯. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে যমানায় যা কিছু নাযিল হয়েছে, বা কোন পয়গম্বরকে দেয়া হয়েছে, আমরা কোন রকম পার্থক্য না করে সব কিছুকে সত্য বলে স্বীকার করি। আল্লাহর কোন পয়গম্বরকে মানবে আর কোন পয়গাম্বরকে মানবেনা-এটা একজন অনুগত মুসলমানের কাজ নয়। যেমন আয়াতের শেষ দিকে ইসলামের আসল তাৎপর্য ব্যক্ত করা হয়েছে। সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, ইসলাম কোন সত্য নবী বা কোন আসমানী কিতাব অস্বীকার করার পক্ষপাতি নয়। ইসলামের মতে যেমনি ভাবে কোরআন

করীম এবং আরবের নবীকে না-মানা কুফরী, তেমনিভাবে কোন একজন নবী বা আসমানী কিতাব অস্বীকার করলেও মানুষ কাফের হয়ে যায়। সন্দেহ নেই, শেষ নবীর মর্যাদা এ হওয়া উচিৎ যে, তিনি পূর্ববর্তী সকল কিতাব এবং সকলের নবুওয়াত স্বীকার করবেন। এ ধরনের সমস্ত জাতি, যাদের কাছে স্থানীয়ভাবে 'নাযীর ও হাদী' অর্থাৎ ভীতি প্রদর্শনকারী হেদায়াতকারী আগমন করেছেন, তাদের সকলের জন্যই সকলের সেরা মহা মানবের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার উপায় বলে দিতেন। প্রথম পারার শেষ দিকেও এ ধররের আয়াত ছিলো, সেখানে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩০. অর্থাৎ পরিপূর্নরূপে যখন আল্লাহর দ্বীন ইসলাম এসে পৌছেছে, তখন কোন মিথ্যা বা অসম্পূর্ন দ্বীন কবুল করা যায় না। সূর্যাদয়ের পর মাটির দীপ জ্বালানো, গ্যাস-বিদ্যুৎ বা তাঁরকার আলো খুঁজে বেড়ানো নিছক বাতুলতা ও স্পষ্ট নিবুদ্ধিতা। স্থানীয় নবী এবং হাদীদের যুগ শেষ হয়েছে। এখন সবচেয়ে বড় সর্বশেষ এবং বিশ্বজনীন নবুওয়্যাত ও হেদায়াতের কাছ থেকে বিধান গ্রহণ করতে হবে। কারণ, এটাই সকল আলো-আধার। সকল আলো এতেই মিলিত হয়েছে।

কবির ভাষায় 'কারণ, আপনি যে সূর্য, আর অন্যরা সব তাঁরকা। যখন সূর্য উদয় হয় তখন আর কোন তাঁরকাই দেখা যায়না।'

১৩১. অর্থাৎ সওয়াব ও সাফল্য থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। পূঁজিই হারিয়ে বসেছে, এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কি হতে পারে। আল্লাহ তাআলা যে সুস্থ প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি করেছেন, নিজের কর্ম দোষে তাও ধ্বংস করে দিয়েছে।

১৩২. যারা সত্য প্রতিভাত হওয়ার পরও জেনে-শুনে কুফরী অবলম্বন করে অর্থাৎ মনে বিশ্বাস করছে এবং চোখে দেখেছে বরং নিজেদের মজলিশে স্বীকার করে যে, যে ইনি সত্য নবী, তাঁর সত্যতাঁর উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণ স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে সর্বত্র।

এমন হঠকারী জিদ্দী বৈরীদের সম্পর্কে কি করে এমন আশা করা যেতে পারে যে, এ ধরনের আচরণের পরও আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে মুক্তি, কল্যাণ এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথে নিয়ে যাবেন, বা জান্নাতে পৌছার পথ দেখাবেন। এমন বে-ইনসাফ, পক্ষপাত দোষে দুষ্ট যালেমদেরকে সত্যিকার সাফল্যের পথ প্রদশন করা স্বভাব নয়। এভাবে সে কমবখতদেরকেও কল্পনা কর, যারা অন্তরের মারেফাত এবং একীনের চেয়েও বড় দরজা অতিক্রম করে মুসলমানও হয়েছিল, অতঃপর পার্থিব স্বার্থ এবং শয়তানের প্ররোচণায় মুরতাদ গেছে। এরা পূর্ববর্তীদের চেয়েও বেশি বাঁকা এবং নিলজ্জ প্রমাণিত হয়েছে। তাই এরা ওদের চেয়েও বেশী লানত এবং শাস্তিযোগ্য হবে।

১৩৩. আল্লাহ ফেরেশতা এবং মুসলমান সকলেই এদের প্রতি লা'নত করে। বরং সকল মানুষ এমনকি তাঁরা নিজেরাও নিজেদের ওপর লা'নত করে। যখন তাঁরা বলেন, যালেম এবং মিথ্যাবাদীর ওপর আল্লাহর লা'নত। যদিও তখন বুঝতে পারে না যে, এ না'লত তাদের নিজেদের ওপর পড়ছে।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿৯৬﴾ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ
بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ إِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ
عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿৯৭﴾ قُلْ يٰٓأَهْلَ
الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ
عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿৯৮﴾ قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّأَنْتُمْ
شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿৯৯﴾ يٰٓأَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا
الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿১০০﴾
وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَأَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ
وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

৯৬. নিশ্চয়ই গোটা মানব জাতির জন্যে সর্বপ্রথম যে ঘরটির বুনিয়াদ রাখা হয়েছিলো তা এই মক্কা[১৩৪] (নগরীতে অবস্থিত) এই ঘরকে কল্যাণ মঙ্গলময় এবং (মানবকুলের) হেদায়াতের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বানানো হয়েছিলো। ৯৭. এখানে রয়েছে (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ। আরো রয়েছে সেই স্থান (যেখানে) ইবরাহীম (ইবাদতের জন্যে) দাঁড়িয়েছিলেন। (এই ঘরের এক মর্যাদা হচ্ছে যে) এখানে যেই প্রবেশ করবে সেই (দুনিয়া আখেরাত-উভয় স্থানেই) নিরাপদ[১৩৫] (হয়ে যাবে)। (দ্বিতীয় মর্যাদা হচ্ছে) মানব জাতির ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিরই এই ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ থাকবে, সে যেন এই ঘরের হজ্জ আদায় করে। আর যদি কেউ (হজ্জের এই বিধানকে) অস্বীকার করে, (তার জেনে রাখা উচিত যে,) আল্লাহ তায়ালা (নিজের সার্বভৌমত্বে) দুনিয়ার মানুষদের মোটেই মুখাপেক্ষী নন।[১৩৬] ৯৮. (হে নবী!) তুমি বলো, হে আহলে কিতাবরা, তোমরা কেন (জেনে বুঝে) আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করো, অথচ আল্লাহ তাআলা যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সাক্ষী (হয়ে আছেন) যা কিছু তোমরা করছো।[১৩৭] ৯৯. তুমি (আরো) বলো, হে আহলে কিতাবরা, তোমাদের এ কি হলো? যারা ঈমান এনেছে তোমরা কেন তাদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরাতে চেষ্টা করছো (এবং এভাবেই) তোমরা চাইছো তারা যেন (সত্য ও সোজা পথ ছেড়ে) বাকা পথে চলতে শুরু করে। অথচ (এই লোকদের সত্যপন্থী হবার ব্যাপারে) তোমরাই হচ্ছো প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এইসব (বিদ্রোহমূলক) আচরণের ব্যাপারে মোটেই উদাসীন নন।[১৩৮] ১০০. হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহ ও তাঁর বিধানের ওপর) ঈমান এনেছো, তোমরা যদি (এক্ষেত্রে) এই (ভ্রান্ত) আহলে কিতাবদের কোনো একটি দলের কথাও মেনে চলো, তাহলে (মনে রেখো) এরা তোমাদের ঈমান আনার পরও (ধীরে ধীরে) 'কাফের' বানিয়ে দেবে।[১৩৯] ১০১. আর তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করবে কি করে (তোমাদের সে অজুহাতই বা কোথায়) যখন তোমাদের সামনে (বার বার) আল্লাহর আয়াত সমূহ পেশ করা হচ্ছে। তাছাড়া (এই আয়াতের বাহক স্বয়ং আল্লাহর) রাসূল যখন তোমাদের মাঝেই মদজুত রয়েছে যে ব্যক্তিই আল্লাহকে (ও তাঁর বিধানকে) শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে, সে অবশ্যই সত্য ও নির্ভুল পথে পরিচালিত হবে।[১৪০]

---

১৩৪. অর্থাৎ এ লা'নতের প্রভাব সব সময় থাকবে। দুনিয়ায় অভিশাপ আর আখেরাতে আল্লাহর আযাব।

১৩৫. অর্থাৎ তাঁরা কখনো আযাবের তীব্রতায় হ্রাস অনুভব করবেনা, আর সামান্য মূলতবী করে একটুখানি শাস্তিও দেওয়া হবেনা।

১৩৬. এমন কঠোর নির্লজ্জ অপরাধী এবং ততোধিক কঠোর বিদ্রোহীদেরকে কোন্ বাদশাহ্ ক্ষমা করবেন? কিন্তু এটা সে গাফূরুর রাহীম এর দরবার। এমন কঠোর অপরাধ এবং বিদ্রোহের পরও যদি অপরাধী লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়ে সত্যিকার মনে প্রাণে তাওবা করে নেক চাল চলন অবলম্বন করে, তখন সব গুনাই-ই ক্ষমা করে দেওয়া হয়। 'হে আল্লাহ, তুমি আমার গুনাহ মাফ কর। কারণ, তুমি মহা ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।'

১৩৭. অর্থাৎ যারা সত্যকে বুঝে শুনে অস্বীকার করেছে এবং শেষ পযন্ত অস্বীকৃতিতে সংযোজন করেই চলছে, কখনো কুফরী থেকে সরে আসার নামও নেয়নি, সত্য এবং সত্যাশ্রয়ীদের প্রতি শত্রুতাও ত্যাগ করেনি; বরং সত্যাশ্রয়ীদের সঙ্গে বাক-বিতন্ডা এবং লড়াই-বিবাদে লিপ্ত হয়েছে, মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসে ফেরেশতা যখন জান কবয করার জন্য হাযির হয়, তখন তওবা করার কথা চিন্তা করে, অথবা কখনো কখনো সুযোগ বুঝে বাহ্যিকভাবে আনুষ্ঠানিক তাওরাব শব্দ মুখে উচ্চারণ করে, অথবা কুফরীর ওপর যথারীতি অটল থেকে অন্য কোন কোন আমল থেকে তাওবা করে, নিজের ধারণায় যেসব আমলকে গুনাহ মনে করতো -এমন তাওবা কোন কাজে আসবেনা। রব্বুল ইজ্জতের দরবারে -এমন তাওবা কবুল হওয়ার কোন আশা করবেনা। কবুল হওয়ার মতো সত্যিকার তাওবা এদের নছীব হবে না। সবসময় গোমরাহীর ময়দানে ঘুরে হাবুডুবু খাওয়াই হবে এদের কাজ।

১৩৮, অর্থাৎ দুনিয়ার রাষ্ট্রের মতো শেখানো স্বর্ণ-রৌপ্যের ঘুঁষ চলবে না। সেখানে কেবল ঈমানের দউলতই কাজে লাগতে পারে। ধরে নাও, একজন কাফেরের কাছে যদি স্বর্ণের এমন স্তুপ থাকে, যা দ্বারা সমস্ত যমীন ভরে ফেলা যায় আর সে তা সবই খয়রাত করে দেয়, আল্লাহর কাছে কাছে তাঁর কোনই মর্যাদা হবেনা। আখেরাতেও এ আমল কোন কাজে আসবেনা। কারণ, আমলের রুহে বা প্রাণ স্বত্ত্ব হচ্ছে ঈমান। আর ঈমানের রূহমুক্ত আমল মুনা। তা আখেরাতের চিরন্তন জীবনে কাছে আসতে পারেনা।

১৩৯. ধরে নাও, কাফেরের কাছে যদি সেখানে এত পরিমাণ অর্থ সম্পদ থাকে, আর নিজের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে দরখাস্ত করে তা ফিদিয়া হিসাবে পেশ করে যে, এটা গ্রহণ করে আমাকে মুক্তি দাও। তাও কবুল করা হবেনা। আর পেশ না করলে কে-ইবা জিজ্ঞাসা করে! অন্যত্র বলা হয়েছে! ' নিঃসন্দেহ যারা কুফরী অবলম্বন করেছে কিয়ামতের দিন তাঁরা যদি শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য পৃথিবীতে তাদের যা কিছু আছে, তাঁর সঙ্গে আরও সমপরিমাণ ফিদিয়া বা মুক্তিপণ হিসাবে পেশ করে, তবুও তাদের কাছে থেকে তা গ্রহণ করা হবেনা। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব' (আল-মায়েদাহঃ ৩৬)

১৪০. অর্থাৎ কেমন জিনিষ ব্যয় করেছ, কোথা এবং কার জন্য ব্যয় করেছ, তা আল্লাহর জানা আছে। যদি প্রিয় বস্তু যে ধরনের খাতে যে রকম নিষ্ঠা-আন্তরিকতা এবং ভালো নিয়তে ব্যয় করবে, সে অনুপাতে আল্লাহ তা'য়লার কাছে প্রতিদানের আশা করবে।

উন্নত স্তরের নেকী হাসিল করতে চাইলে তোমার প্রিয় বস্তুগুলোর মধ্যে কিছু আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন অর্থাৎ যে জিনিষ মনের কাছে যত প্রিয়, তা ব্যয় করার মর্যাদা তত বড়। এমনিতে সাওয়াবতো সব জিনিষেই আছে। সম্ভবতঃ ইহুদী খৃষ্টানদের প্রসঙ্গে আয়াতটি এজন্য নাযিল হয়েছে যে, তাদের কাছে নিজেদের কর্তৃত্ব বড় প্রিয় ছিলো। এটা টিকায়ে রাখার জন্যই নবীর অনুসারী হতোনা 'যতক্ষণ আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যক্ত করবেনা, ঈমানের মর্যাদা লাভ করতে পারবেনা।'

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য এ যে, সেখানে কাফেদের অর্থ ব্যয় করাকে বেকার বলা হয়েছে, এখন তাঁর বিপরীত বলে দেওয়া হয়েছে যে, মোমেন যা ব্যয় করে, তা দ্বারা নেকীতে পূর্ণতা অর্জিত হয়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا

اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَاذْكُرُوْا

نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ

قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى

شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ وَلْتَكُنْ

مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ
مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ
اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ
وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١٠٧﴾
تِلْكَ ءَايَٰتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ
يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٨﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾

রুকু ১১

১০২. হে মানুষ, যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো-ঠিক যতোটুকু (বান্দা হিসেবে তাকে) ভয় তাকে করা উচিত। আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুমুখে পতিত হয়ো না।[১৪০]

১০৩. তোমরা সবাই মিলে আল্লাহকে (ও তাঁর বিধানকে) শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[১৪১] (দলাদলিতে নিমজ্জিত হয়ো না)। তোমরা (সব সময়) তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো-যখন তোমরা ছিলে একে অপরের দুশমন। আল্লাহ তায়ালা (তাঁর দ্বীনের এ বন্ধন দিয়ে) তোমাদের একের জন্যে অপরের মনে ভালোবাসার সঞ্চার করে

দিলেন। (একদিন দেখা গেলো যুগযুগান্তরের শত্রুতা ভুলে) তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে একে অপরের 'ভাই' হয়ে গেলে।[১৪২] মূলত তোমরা ছিলে (শত্রুতা ও হানাহানির) আগুনে ভরা এ (গভীর) খাদের প্রান্তসীমায় দাঁড়ানো। (যে কোনো সময় সেখানে নিমজ্জিত হয়ে নিশ্চিত ধ্বংসে হয়ে যেতে) সেই (নিশ্চিত ধ্বংসের কবল) থেকে আল্লাহ তায়ালা (তার দ্বীনের রহমত দিয়ে) তোমাদের উদ্ধার করলেন।[১৪৩] আল্লাহ তায়ালা এভাবেই (যুগে যুগে) তাঁর (নেয়ামতের) নির্দশনসমূহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। যাতে করে (এর মাধ্যমে) তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারো।[১৪৪]

১০৪. আর তোমাদের মধ্য থেকে এমন কিছু মানুষের একটি দল অবশ্যই থাকবে, যারা (দুনিয়ার) অন্যান্য মানুষকে, সত্য ও ন্যায়ের আদেশ দেবে এবং অসত্য ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। (যারা এই দলে শামিল হবে) তারাই সত্যিকার অর্থে সাফল্যমন্ডিত হবে।[১৪৫]

১০৫. তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং (নিজেদের মধ্যে) নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। এ (ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত) ব্যক্তিদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) এক কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা।[১৪৬] ১০৬. (এ এমন এক দিন) যেদিন (নিজেদের সাফল্যময় আমল দেখে) কিছু সংখ্যক চেহারা আলোয় ঝলমল করবে। আবার কিছু সংখ্যক মানুষের চেহারা (নিজেদের ব্যর্থতার নথিপত্র দেখার পর) কালো (ও বিশ্রী) হয়ে পড়বে।[১৪৭] যাদের মুখ (হতাশায়) কালো হয়ে যাবে (জাহান্নামের প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে ঈমানের নেয়ামত পাওয়ার পরও তোমরা কি কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে?[১৪৮] (তাই যখন করে এসেছে তখন) নিজেদের কুফরীর প্রতিফল আজকের এই ভয়াবহ আযাব উপভোগ করতে থাকো।

১০৭. আর (সে সৌভাগ্যবান লোক) যাদের চেহারা আলোকিত হবে, তারা (সেদিন) আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত দয়ার আশ্রয়ে থাকবে। (এটা কোনো অস্থায়ী ব্যবস্থা নয়) বরং তারা সেখানে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করবে।[১৪৯] ১০৮. এর সব কিছুই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী, যথাযথভাবে আমি তা তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি। কেননা আল্লাহ তায়ালা (তাঁর বাণীকে গোপন রেখে এবং পরে সে জন্যে তাকে শাস্তি দিয়ে) দুনিয়াবাসীদের ওপর কোনো যুলুম করতে চান না।[১৫০] ১০৯. মূলত এই আসমান এই যমীন-এর যেখানে যা কিছু আছে সবই তো আল্লাহর জন্যে। সব কিছুকেই একদিন আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে।[১৫১] (তখন আল্লাহ অবশ্যই জানতে চাইবেন কোন্ মানুষ এর সাথে কোন্ ধরনের আচরণ করেছে)!

১৪১. ইহুদীরা প্রিয় নবী (দঃ) এবং মুসলমানদেরকে বলতো যে, তোমরা নিজেদেরকে ইবরাহীম (আঃ) এর দ্বীনের ওপর বলে কিভাবে দাবী কর? অথচ তোমরা তো সেই সব জিনিষ খাও, যা আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইবরাহীম (আঃ)- এর পরিবারের জন্য হারাম করেছিলেন, যেমন উটের গোশত ও দুধ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, এখন লোকেরা যেসব জিনিষ খায়, সবই হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সময় হালাল ছিল। যতক্ষণ তাওরাত নাযিল হয়েছে। অবশ্য তাওরাতে বনী ইসরাইলের ওপর বিশেষ বিশেষ জিনিস হারাম করা হয়েছিল, সন্দেহ নেই। কেবল একটা উট হারাম ছিলনা। তাওরাত নাযিল হওযার আগে হযরত ইসরাঈল অর্থাৎ ইয়া'কুব (আঃ) তা না খাওয়ার কসম করেছিলেন। তাঁর অনুসরনে, তাঁর সন্তানরাও উঠের গোশত খাওয়া ছেড়ে দেয়। তাঁর এ কসম খাওয়ার কারণ ছিলো এ যে, হযরত ইয়া'কুব আলাইহিস সালামের ছিল ইরকুমিমা' বা মাইটিকা গত ব্যাধি। তখন তিনি মান্নত করেছিলেন যে, সুস্থ হলে যে জিনিষের প্রতি আমার আকর্ষণ, তা ছেড়ে দিবে। উটের দুধ এবং গোশ্ত তাঁর প্রিয় ছিলো। মান্নতের ফলে তিনি তা ত্যাগ করেন। হালালকে হারাম করার এ ধরনের মানত আমাদের শরীয়তে জায়েয নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন, তুমি কেন তা হারাম করে থাকলে ছেড়ে দাও এবং কাফ্ফারা আদায় কর।(সূরা তাহরীম)

আগের আয়াতে প্রিয় বস্তু ব্যয় করার উল্লেখ ছিলো। এ আয়াতে হযরত ইয়া'কুব (আঃ) এর একটা প্রিয় বস্তকে ত্যাগ করার উল্লেখ রয়েছে। এমনিভাবে উভয় আয়াতের মধ্যে সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য হয়েছে। ওপরন্তু এ আয়াতগুলোতে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, পূর্ববতী শরীয়তেও নস্খ বা রহিতকরণ ছিল। যে জিনিষ এক সময় হালাল ছিলো, পরে তা হারাম করা হয়েছে। এমনিভাবে এখন যদি শরীয়তে মোহাম্মদিয়া এবং পূর্ববতী শরীয়তে হালাল-হারামের দিক থেকে পার্থক্য হয়, তবে অস্বীকার করার এবং তাকে অসম্ভব বলার কোন কারন নাই।

১৪২. অর্থাৎ তোমরা যদি সত্য হও যে, এসব জিনিষ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সময়ে হারাম ছিলো, তা হলে আন দেখি, স্বয়ং তোমাদের স্বীকৃত কিতাব তাওরাতে বিষয়টি দেখায়ে দাও। তা না দেখাতে পারলে তোমরা যে মিথ্যাবাদী, তাতে কি সন্দেহ থাকতে পারে! বর্ণনায় আছে যে, ইহুদীরা এ বিরাট চালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। এমনি ভাবে উম্মী নবীর সত্যতাঁর আর একটা প্রমাণ পাওয়া গেলো।

১৪৩. অর্থাৎ এখনও যদি সেই পূরাতন কাসুন্দী গাইতে থাক, তবে এটা হবে বিরাট বে-ইনসাফী। এগুলো হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর যমানা থেকেই হারাম। আমরাই তাঁর আসল অনুসারী, এমন কথা বলবেনা।

১৪৪. অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা হারাম হালাল এবং ইসলাম ও মোহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে তোমাদেরকে তিক্ত সত্য কথা শুনাচ্ছেন। কেউই এটা মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারেনা। এখন উচিৎ হচ্ছে তোমরাও ইবরাহীম (আঃ) এর মতো সত্যিকার দ্বীনে ইবরাহীমের

অনুসরন করবে। তাঁর নীতি মেনে চলবে। তাতে সবচেয়ে বড় জিনিষ ছিলো খালেছ তাওহীদ তথা নির্ভেজাল একত্ববাদ। তোমাদেরও কর্তব্য হচ্ছে উযাইর, মাসীহ এবং জীর পুরোহিতদের পূজা ত্যাগ করে সত্যিকার তাওহীদবাদী হওয়া।

১৪৫. আমরাই হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সঙ্গে সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্যশীল, তাঁর সবচেয়ে বেশী নিকটতর-মুসলমানদের এ দাবীতে ইহুদীরা আপত্তি উত্থাপন করে বলে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর আসল দেশ ইরাক ত্যাগ করে শাম দেশে হিজরত করেন, সেখানেই বসবাস এবং মৃত্যু বরণ করেন, তাঁর সন্তানরাও শাম দেশে ছিলো। এ পূণ্য ভূমিতে কত নবীর আবির্ভাব হয়েছে। বায়তুর মাকদেস ছিলো এদের সকলের কেবলা। আর তোমরা হেজাযে বসবাসকারীরা বায়তুল মাকদেস ত্যাগ করে কা'বাকে তোমাদের কেবলা করেছ। সিরিয়ার পূণ্য ভুমি থেকে দূরে এক কোণে তোমরা পড়ে আছ। কোন মুখে তোমরা দাবী করতে পার যে, ইবরাহীম এবং মিল্লাতে ইবরাহীমের সঙ্গে তোমাদের নৈকট্য ও সামঞ্জস্য বেশী? এ আয়াতে অভিযোগ কারীদেরকে বলা হয়েছে যে, বায়তুল মাকদেস ইত্যাদি পবিত্র স্থানতো পরে নির্মীত হয়েছে। দুনিয়ায় সর্ব প্রথম বরকতময় গৃহ, যা আল্লাহর প্রতি মানুষের মনোনিবেশের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যাকে করা হয়েছিল ইবাদতের স্থান এবং হেদায়াতের নিদর্শন, তা হচ্ছে এ কা'বা শরীফ। তা এ মোবারক শহর মক্কা মুয়াযযামায় অবস্থিত।

১৪৬. আল্লাহ তায়ালা শুরু থেকেই এ গৃহকে যাহেরী-বাতেনী, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় বরকতে পরিপূর্ণ করেন। তাকে গোটা বিশ্বের হেদায়াতের উৎস করেন। পৃথিবীর কোন স্থানে বরকত ও হেদায়াদ পাওয়া যায়, তাকে পূত-পবিত্র গৃহের প্রতিচ্ছবি মনে করতে হবে। 'রাসূলে সাকালাইন' অর্থাৎ জ্বিন-ইনসানের নবীকে এখান থেকেই উত্থিত করেছেন। হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য সমগ্র বিশ্বকে এখানেই আসার দাওয়াত দেয়া হয় বিশ্বজনীন ধর্ম ইসলামের অনুসারীদেরকে প্রাপ্য, প্রতীচ্যে এ গৃহের দিকে মুখ করেই নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ঘরের তাওয়াফ কারীদের ওপর কিতাবের নানা নূর সংযোজন করেন। অতীতের নবী রসুলরাও হজ্ব আদায় করার জন্য অতি আগ্রহ-উৎসাহ সহকারে লাব্বায়েক বলে এ আলো ধারার অভিসারী হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বায়তুল্লাহর বরকতে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্য নানা ধরনের নিদর্শন এ পূণ্য ভুমিতে স্থাপন করেছেন। এ কারণে সবযুগে সকল ধর্মের লোকেরা অস্বাভাবিক ভক্তি-শ্রদ্ধা করে আসছে। সেখানে আশ্রয় গ্রহণকারীকে সবসময় নিরাপদে মনে করা হয়। এর কাছেই মাকামে ইবরাহীমের অবস্থান জানায়ে দেয় যে, এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) পা পড়ে ছিলো, সকল আরবের কাছে এর সম্মত ইতিহাস বলে দেয় যে, এ সেই পাথর, যার ওপর দাড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কাবা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। আল্লাহর কুদরতে এ পাথরে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর পায়ের ছাপ পড়েছে। আর তা আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে। যেন ইতিহাসের ধারা বিবরণী ছাড়াও এ পবিত্র পাথরের অস্তিত্ব একথার স্পষ্ট প্রমাণ বহন

করছে যে, হযরত নূহ (আঃ) এর তুফানের ধ্বংসকারিতাঁর পর হযরত ইবরাহীমের পবিত্র হাতে এ গৃহ নির্মীত হয়েছে আর তাঁর সাহায্যে হযরত ইসমাঈলও (আঃ) অংশীদার ছিলেন। এথম পারার শেষ দিকেও এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৪৭. এ পবিত্র গৃহে খোদায়ী জাতির এক বিশেষ তাজ্জালী রয়েছে। সেকারণে হজ্বের অনুষ্ঠান পালনের জন্য এটাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কারণ, হজ্ব এমন এক ইবাদত, যার এক একটি অনুষ্ঠান সে মহা সৌন্দর্যের আধার 'মাহবুবে বরহক' এর ও ভালোবাসার উৎসাহ উদ্দীপনা প্রকাশ করে। সুতরাং তাঁর ভালোবাসার দাবী করে, শারীরিক এবং আর্থিক দিক থেকে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌছার সঙ্গতি যার রয়েছে, জীবনে অন্তত একবার 'মাহবুবে গৃহে' হাজিরা দেয়া তাঁর কর্তব্য। পাগল পরা হয়ে সে গৃহ প্রদক্ষিণ করবে। (হযরত মওলানা মুহাম্মদ কাসেম (রঃ) কেবলা নুমা' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে মহব্বতের দাবীদার এটুকু কষ্ট স্বীকার করতেও নারাজ, বুঝতে হবে যে সে মিথ্যা প্রেমিক। যেখানে খুশী, যে ধিকৃত হয়ে ফিরতে পারে, সে নিজে বঞ্চিত ও পরিত্যক্তই থাকবে। কেউ ইহুদী হয়ে মরবে, বা খৃষ্টান হয়ে, তাতে সে মাহবুবে কি পরোয়া! এতে তাঁর কি ক্ষতি? (হজ্বের বিস্তারিত বিধান ফিকহ এর কিতাব দেখে নেবে।

১৪৮. আগে থেকে ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে সম্বোধন করে আসা হচ্ছিলো। মাঝখানে তাদের কোন কোন সন্দেহ-সংশয়ের জবাব দেওয়া হয়েছে। এখানে পুনরায় তাদেরকে সতর্ক ও ভর্ৎসনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সত্য-ন্যায়ের স্পষ্ট প্রমাণ এবং কোরআন করীমের এমন স্পষ্ট সত্য ও ন্যায়ের বাণী শুনার পরও তোমাদের কি হয়ে যে, আহলে কিতাব বলে দাবী করলেও আল্লাহর কালাম এবং উপস্থাপনাকারীকে অস্বীকার করার কাজে জেদ ধরে রয়েছে? স্মরণ রাখবে, তোমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড কিন্তু আল্লাহর সম্মুখে রয়েছে। তোমাদের নিয়ত এব কর্মকৌশল তিনি ভালোভাবেই অবগত আছেন। তিনি যখন পাকড়াও করবেন, চুলচেরা হিসাব নেবেন।

১৪৯. অর্থাৎ কেবল যে ঈমানের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত তাই নয়, অন্যদেরকেও আল্লার পথ থেকে বিরত রাখতে চাও। যেসব পবিত্র আত্মা ঈমানে ধন্য হয়েছে, ইসলামের কল্পিত ত্রুটি নির্দেশ করে তাদেরকেও দ্বীন ইসলাম থেকে সরায়ে নিতে চাও। নিছক অজ্ঞতা, অজানাবশতঃ তোমরা এসব কাজ করছ না; বরং বুঝে-শুনে সত্যকে বক্র প্রমাণ করার চেষ্টা করছো। তোমাদের এসব কাণ্ড কারখানা সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন। উপযুক্ত সময় একই সঙ্গে শাস্তি দেবেন।

১৫০. প্রথমে আহলে কিতাবকে শাসানো হয়েছে যে, তারা জেনে-শুনে কোন মানুষকে গোমরাহ করে ফিরছে? এখানে মুসলমানদেরকে নছীহত করা হচ্ছে যে, তোমরা এসব বিপর্যয়কারীদের পাল্লায় পড়বে না। এদের ইঙ্গিতের বলে ধীরে ধীরে ঈমানের আলো থেকে বের হয়ে পুনরায় কুফরীর অন্ধকার গর্তে পতিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

১৫১. অর্থাৎ যে জাতির মধ্যে আল্লাহর মহান পয়গম্বর দেদীপ্যমান, যিনি দিবা নিশি তাদেরকে আল্লাহর চিত্তাকর্ষক কালাম এবং তার নিত্যনতুন আয়াত পাঠ করে শুনান, সে জাতির ঈমান আনার পর পনুরায় কাফের হয়ে যাবে অথবা কাফেরদের মতো কাজ করবে- এটা কিছুতেই হতে পারে না। সত্যকথা এ যে, যে ব্যক্তি সব লোকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এক আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছে, এবং তাঁর ওপর মনে প্রাণে আস্থা ও তাওয়াক্কুল করেছে, কোন শক্তিই তাকে সাফল্যের সোজা পথ থেকে এদিক-ওদিক নিয়ে যেতে পারে না।

ইসলামের পূর্বে মহীনার আনসারদের দুটি গোত্র আওস এবং খাযরাজের মধ্যে পরস্পরে ভীষণ শত্রুতা ছিলো। সমান্য সামান্য বিষয় নিয়ে যুদ্ধ ও রক্তাপাত শুরু হয়ে যেতো। আর শত বছর পর্যন্ত তা চলতো। 'বুয়াস' এর প্রসিদ্ধ যুদ্ধ একশত কুড়ি বৎসর র্যন্ত অব্যাহত ছিলো। অবশেষে পয়গম্বর (সঃ)-এর হিজরতের ফলে তাদের ভাগ্য প্রসন্ন হয়। ইসলামের শিক্ষা এবং নবী করীম (দঃ)-এর সান্নিধ্যের বরকতে উভয় গোত্র- যারা যুগ যুগ ধরে একে অপরের রক্তের পিপাসু ছিলো- পরস্পরে মিলে-মিশে দুধে চিনিতে পরিণত হয়েছিল। তাদের মধ্যে স্থাপন করেছিল অত্যন্ত দৃঢ় সৌভ্রাতৃত্বমূলক এক সম্পর্ক। কিন্তু এ দুটি প্রতিপক্ষ গোত্রের এমন মিল-মিশ এবং সম্মিলিতভাবে ইসলামের খেদমত ও সহযোগিতায় নিয়োজিত হওয়াকে মদীনার ইহুদীরা সহ্য করতে পারল না। জনৈক অন্ধ ইহুদী শাম্মাস ইবনে কায়েস কোন একজন তেনাবাজ ব্যক্তিকে প্রেরণ করে যে, যেখানে উভয় গোত্র বৈঠকে মিলিত হয়, সেখানে 'বুয়াস' যুদ্ধের আলোচনা জুড়ে দেবে। সে সুযোগ বুঝে বুয়াস যুদ্ধের কথা স্মরণ করায়-এমন কবিতা পাঠ শুরু করে। তাঁর কবিতা শুনে চাপা আগুন পুনরায় জ্বলে উঠে। বাকযুদ্ধ অতিক্রম করে অস্ত্র যুদ্ধ শুরু হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে। এমন সময় নবী করীম (দঃ) একজন আনসারকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি বলেনঃ 'হে মুসলমানের দল! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান। এসব জাহেলী কর্মকাণ্ড কি? আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়াত করেছেন। ইসলামে ধন্য করেছেন। জাহেলী যুগের অন্ধকারকে মুছে ফেলেছেন। তোমরা কি পুনরায় সেই কুফরীর দিকে ফিরে যেতে চাও? যেখানে থেকে তোমরা বের হয়ে এসেছো?'

আল্লাহর নবীর মুখে এ কথাগুলো শুনে শয়তানী জাল ছিন্ন হতে থাকে। আওস ও খায়রাজ হাতিয়ার ফেলে দেয়। একে অন্যের গলা জড়ায়ে কাঁদতে শুরু করে। সকলেই বুঝতে পারে যে, এ সবই তাদের দুশমনদের চক্রান্ত। ভবিষ্যতে এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এ ঘটনা প্রসঙ্গে আয়াত কয়টি নাযিল হয়েছে।

كُنْتُمْ خَيْرَ

أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ط وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ
الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ
وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾ لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ط
وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ قف ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١١﴾
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ
اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا
يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ط
ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾ لَيْسُوْا سَوَآءً ط
مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ
الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾

রুকু ১২

১১০. তোমরাই (এই দুনিয়ার) সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির (কল্যাণের জন্যেই) তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।[১৫৬] (শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে[১৫৩] (সর্বোপরি) নিজেরাও তোমরা আল্লাহর ওপর (পুরোপুরি) ঈমান আনবে।[১৫৪] আমি (তোমাদের আগে) যাদের কাছে কিতাব পাঠিয়েছি, তারাও যদি (তোমাদের মতো পুরোপুরি) ঈমান আনতো তাহলে এটা তাদের জন্যে কতোই না ভালো হতো! তাদের মধ্যে কিছু কিছু ঈমানদার ব্যক্তিও রয়েছে।; তবে এদের অধিকাংশ হচ্ছে খারাপ প্রকৃতির লোক।[১৫৭]

১১১. এরা কখনোই তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (এই দুনিয়ায়) সামান্য কিছু দুঃখ ছাড়া (এরা তোমাদের কিছুই করতে পারবে না) এরা যদি কখনো তোমাদের সাথে সম্মুখ-সমরে লিপ্ত হয়, এরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য হবে (পরিশেষে অবস্থা এমন হবে যে) এরা (নিজেদের জন্যে) কোনো ধরনের সাহায্যকারী পাবে না। ১১২. যেখানেই এরা (আশ্রয়ের জন্যে) গেছে, সেখানেই অপমান ও লাঞ্ছনা এদের কপালের লিখনে পরিণত হয়েছে। তবে আল্লাহ্ তায়ালার নিজের প্রতিশ্রুতি ও তার বান্দার প্রতিশ্রুতির (মাধ্যমে কোথাও যদি কিছুটা নিরাপত্তা পাওয়া যায় তা) সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। আল্লাহর (ক্রোধ ও) গযব এদের (সব দিক থেকে) ঘিরে রেখেছে। এদের ওপর দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার অভিশাপ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এই অপমান ও লাঞ্ছনার একমাত্র কারণ ছিলো যে, এরা আল্লাহ ও তার বিধানকে সব সময়ই অস্বীকার করতো, (এই বিধানের বাহক) আল্লাহর নবীদের এরা অন্যায়ভাবে হত্যা করতো, মূলত এ হচ্ছে তাদের (স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ করা ও সীমালংঘনের ফল।[১৫৮]

১১৩. এই আহলে কিতাবদের সবাই (আবার) এক রকম নয়, এদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা (ঈমান এনে) অবিচল সত্য ও ন্যায়ের ওপর অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এরা রাতের বেলায় সিজদারত অবস্থায় আল্লাহর কিতাব পাঠ করে। ১১৪. এরা আল্লাহ ও তার শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান রাখে (এই ঈমানের দাবী মোতাবেক সাধারণ মানুষদের) এরা ন্যায় কাজের আদেশ দেয় ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে। (শুধু তাই নয়) সৎকাজে এরা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে। এ (সমস্ত গুণসম্পন্ন) মানুষরাই হচ্ছে সৎ ও নেক।[১৫৯]

১৫২. অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে আল্লাহর পূর্ণ ভয় বর্তমান থাকতে হবে। যেন কোন অবস্থায়ই তাকওয়া, পরহেজগারীর পথ থেকে বিচ্যুত না হয়। আর তাঁর কাছে সব সময় দৃঢ়তা কামনা করবে। শয়তানরা চায় ইসলামের পথ থেকে তোমাদের পাক সরায়ে নিতে। তোমাদের উচিৎ শয়তানকে নিরাশ করা। মৃত্যু পর্যন্ত ইসলাম বিরোধী কোন আচরণ করবে না। তোমাদের বাঁচা-মরা সবই হতে হবে একান্তভাবে ইসলাম অনুযায়ী।

১৫৩. অর্থাৎ সকলে মিলে শক্তভাবে কোরআনকে ধারণ করবে। এটাই আল্লাহর মজবুত রশী। এ রশী ছিড়তে পারে না, অবশ্য ছুটতে পারে। সকলে মিলে দৃঢ়ভাবে যদি এ রশী ধারণ কর, কোন শয়তানই দুষ্টামীতে সফল হতে পারবে না। ব্যক্তিগত জীবনের মত মুসলিম জাতির সামষ্টিগত শক্তিও অটুট এবং দুর্ভেদ্য হবে। কোরআন করীমকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করাই হবে এমন জিনিস, যদ্বারা বিক্ষিপ্ত শক্তি পুনরায় একীভূত হতে পারে। একটা মৃত জাতি লাভ করতে পারে নবজীবন। কিন্তু কোরআনকে শক্তভাবে ধারণ করার অর্থ এ নয় যে, নিজের মন মত তার ব্যাখ্যা করবে। বরং কোরআনের সে অর্থই হবে গ্রহণীয় নির্ভরযোগ্য, যা সহীহ হাদীস ও অতীত মনীষীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী নয়।

১৫৪. অর্থাৎ যুগ যুগের শত্রুতা-বিদ্বেষ বিদূরীত করে নবী করীম (দঃ)-এর বরকতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভাই ভাই করেছেন। এর ফলে তোমাদের দ্বীন-দুনিয়ে উভয়ই সুস্থ হয়েছে, সুন্দর হয়েছে। তোমাদের এমন প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়েছে, যা দেখে তোমাদের দুশমন ভীত হয়। এ সৌভ্রাতৃত্বমূলক ঐক্য আল্লাহর এতবড় নেয়ামত, দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করেও ইহা অর্জন করা সম্ভব নয়।

১৫৫. অর্থাৎ কুফরী ও নাফরমানীর কারণে জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলো। মৃত্যু এলেই তাতে পতিত হতে। আল্লাহ তোমাদের হাত ধরে সেখান থেকে রক্ষা করেছেন। নবী করীম (দঃ) -এর বদৌলতে ঈমান-একীনের আলো তোমাদের অন্তরে প্রজ্বলিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালার এসব মহান দ্বীনী ও দুনিয়ার অনুগ্রহ স্মরণ রাখলে কখনো গোমরাহীর দিকে ফিরে যাবে না।

১৫৬. অর্থাৎ এ কথাগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট করে শুনাবার উদ্দেশ্য এ যে, তোমরা সব সময় ঠিক পথে চলবে। এমন মারাত্মকও ধ্বংসাত্মককাজের পুনরাবত্তি করবেনা এবং কোন শয়তানের প্ররোচনায় দঢ়তাঁর পথ --ত্যাগ করবে না।

১৫৭. অর্থাৎ তাকওয়া, আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ করা, জাতীয় জীবনে ঐক্য সংহতি ইসলামী সৌভ্রাতৃত্ব- এসব বিষয় এখন বর্তমান থাকতে পারে, যখন মুসলমানদের মধ্যে একটা বিশেষ দল কেবল দাওয়াত, এরশদের জন্য বিদ্যমান থাকে। এ দলের দায়িত্ব হবে নিজেদের কথা ও কাজ দ্বারা দুনিয়াকে কোরআন সুন্নাহর দিকে আহবান জানানো। মানুষকে ভালো কাজে নিয়োজিত এবং খারাপ কাজে লিপ্ত দেখে কল্যাণের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার এবং অকল্যাণ থেকে বারণ করার কাজে সর্বশক্তি নিয়োজিত করা। এ

কাজে বিন্দুমাত্র অবহেলা না করা। স্পষ্ট যে, এ কাজ কেবল তাঁরাই করতে পারে, যাদের রয়েছে 'মা'রূফ মুনকার' তথা ভালো মন্দের জ্ঞান, কোরআন, সুন্নাহ সম্পর্কেও যারা সচেতন। এতদসঙ্গে যাদের রয়েছে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান এবং পরিবেশ পরিস্থিতিও যারা বুঝে। অন্যথায় একজন জাহেল, অজ্ঞ ব্যক্তি মা'রূফকে মুনকার বা মুনকারকে মা'রূফে মনে করে সংশোধন-সংস্কারের পরিবর্তে গোটা ব্যবস্থা লন্ড ভন্ড করে দিতে পারে অথবা একটা অন্যায়কে সংশোধনের জেনে এমন পন্থা গ্রহণ করবে, যা এর চেয়েও বড় অন্যায় এর জন্ম দেবে। অথবা কোমলতার স্থলে কঠোরতা এবং কঠোরতাঁর স্থলে কোমলতা প্রদর্শন করবে। সম্ভবতঃ এ কারণেই মুসলমানদের একটা বিশেষ দলকে এ পদে আদিষ্ট করা হয়েছে। যারা সব দিক থেকে কল্যাণের প্রতি আহবান, 'আমর বিল মা'রূফ' তথা ভালো কাজের নির্দেশ এবং 'নাহি আনিল মুনকার' তথা মন্দ কাজ থেকে বরণ করার যোগ্য হবে। হাদীস শরীফে আছে যে, মানুষ যখন খারাপ কাজে জড়িয়ে যায় এবং বারণ করার মতো কেউ থাকে না। তখন গণ আযাব আসার আশংকা রয়েছে। কোন্ পরিবেশ, পরিস্থিতিতে আমর বিল মা'রূফ নাই আনিল মুনকার ত্যাগ করায় মানুষকে মা'যূর মনে করা যেতে পারে। আর কোন পরিস্থিতিতে এটা ওয়াজেব বা সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নন। আবু বকর রাযী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করেছেন। সেখানে দেখা যেতে পারে।

১৫৮. অর্থাৎ তোমরা ইহুদী-খৃষ্টানদের মতো হবেনা, যারা আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট বিধান আসার পরও নিছক মনষ্কামানার বশবর্তী হয়ে শরীয়তের মূলনীতিতে নানা দলে বিভক্ত এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে নানা মতের অনুসারী হয়ে পড়েছিলো। সব শেষে ফের্কাবন্দী তাদের ধর্ম জাতীয়তাকে ধ্বংস করে ছেড়েছে। সকলেই খোদায়ী আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

শরীয়তের স্পষ্ট বিধান সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর সেসব দল উপদল সৃষ্টি করা হয়, সৃষ্টি করা হয় যেসব মতভেদ, তা যে ঘৃণিত ও ধ্বংসকর, এ আয়াত গুলো থেকে তা জানা যায়। দুঃখের বিষয় যে, মুসলমান বলে দাবীদারদের মধ্যে শত শত ফের্কা ইসলামী শরীয়তের স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন, সর্ববাদী সম্মত এবং সুদৃঢ় মূলনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং তাতে মতভেদ সৃষ্টি করে এ আযাবের নীচে ধংসে পড়েছে। আল হামদুলিল্লাহ। এতদসত্ত্বেও এ বলগাহীন সয়লাভের মধ্যেও আল্লাহ রাসূলের ওয়াদা অনুযায়ী একটা বিরাট দল আল্লাহর রজ্জুকে অতিশয় দৃঢ়ভাবে ধারণ করে 'আমি এবং আমার সাহাবারা যেপথে আছি' এই পথে অটল রয়েছে এবং ইনশাআল্লা কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। খুঁটিনাটি নিয়ে মতবিরোধ সাহাবায়ে কেরাম এবং মোজাহিদ ইমামদের মধ্যেও ছিলো। বর্তমান আয়াতের সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) এ খুটিনাটি মতবিরোধের কারণ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ

بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۱۵﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ

اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ

اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ

فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ

اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا

ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۱۷﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ

خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ

اَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا

لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৫. আর তারা যা কিছু ভালো ও সৎকাজ করবে (এর প্রতিদানকে কখনো) অস্বীকার করা হবে না। (কারণ) আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে কতোটুকু ভয় (করার মানসে নেক কাজ) করে।১৬০ ১১৬. একথা সুনিশ্চিত যে, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে (পরকালের আযাব থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে) তাদের ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি তাদের কোনোই উপকারে আসবে না, বরং এই কুফরীর কারণে তারা হবে নিশ্চিত জাহান্নামের অধিবাসী সেখানে অনন্তকাল তারা পড়ে থাকবে।

১১৭. তারা এই দুনিয়ার জীবনে যা দান খয়রাত করে বেড়ায়, তার উদাহরণ হচ্ছে-যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছে সেই দলের শষ্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে প্রবাহমান বরফসম এক তীব্র বাতাসের মতো (তাদের শষ্যক্ষেতকে) তা বরবাদ করে দিয়ে গেলো।[১৬১] মূলত আল্লাহ্ তায়ালা তাদের ওপর কোনোই অবিচার করেননি। বরং এরা (ঈমানের বদলে কুফরীর পন্থা অবলম্বন করে) নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।[১৬২]

১১৮. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা কখনো নিজেদের (দলভুক্ত) লোকজন ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ো না। এরা তোমাদের অনিষ্ট সাধনের কোনো পথই অনুসরণ করতে দ্বিধা করবে না, তারা তো তোমাদের ক্ষতি ও ধ্বংস করাই কামনা করে, তাদের (জঘন্য) প্রতিহিংসা (ও বিদ্বেষ) তাদের মুখ থেকে (বের হওয়া কথাবার্তায়) প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, অবশ্য তাদের অন্তরে লুকানো হিংসা (ও বিদ্বেষের আগুন) বাইরের অবস্থার চাইতেও মারাত্মক, আমি (তোমাদের ভেতর বাইরের যাবতীয় অভিসন্ধি সম্পর্কে) সব ধরনের নিদর্শনকেই তোমাদের সামনে খোলাখুলি বলে দিচ্ছি। তোমাদের যদি সত্যিই জ্ঞানবুদ্ধি থাকে[১৬৩] (তাহলে তোমরা এ সম্পর্কে সতর্ক হতে পারবে)।

---

১৬০. এ কারণে যখন ইহুদীদের খারাপ কাজের প্রসঙ্গ আসে, আল্লাহ তায়ালা এদেরকে বাদ দেন। পরহেজগারী অনুযায়ী দুনিয়া আখেরাতে তাদের সঙ্গে মোয়ামালাও করা হবে- একেবারেই ভিন্ন ধরণের।

১৬১. সালেহীন-মুত্তাকীনদের বিপরীত এখানে আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদের অবস্থা ও পরিণতি বলে দিচ্ছেন। আগে বলা হয়েছে 'মুমেনদের সামন্যতম নেকীও কাজে আসবে। তাদের কোন কাজেরই না-কদরী করা হবেনা'। এর বিপরীতে কাফের দুনিয়ায় অর্থ ও শক্তি-সামর্থ ব্যয় করে, নিজের কাছে যত সাওয়াব- খায়রাতের কাজে মনে করেই করুকনা কেন, আখেরাতে তার কোন কদর হবে না, কোন মূল্য হবে না, তার কোন খবরই নেওয়া হবে না। কারণ, ঈমান এবং সহীহ জ্ঞানের প্রধান স্বত্ত্বা না থাকার কারণে তার সব আমলই প্রাণহীন, মৃত। তার বিনিময় এ নশ্বর ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায়ই পাওয়া যাবে। ঈমান ও একীনই আমলকে স্থায়ী ভাবে হেফাযত করার মতো জিনিষ। ঈমান, একীন ব্যতীত আমলের উদাহরণ এমন মনে করা যেতে পারে, যেমন কোন যালেম একটা বাগান লাগায়োছ, বা কোন ফসল বুনেছে। কিন্তু তাকে বরফ-তুষার থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থাই করেনি। কয়েকদিন পর সজীব-সতেজ এবং শষ্য শ্যামল দেখে আনন্দিত হয়ে, অনেক আশা বুকে বাঁধে। তার দুষ্টামী এবং দুর্ভাগ্যের ফলে হঠাৎ একদিন ঠান্ডা বায়ু প্রবাহিত হয়। এত বরফ এবং তুষারপাত হয় যে, নিমেষে সবুজ শ্যামল শষ্য জ্বালিয়ে দেয়। অবশেষে নিজের সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বিনাশের জন্য অনুতাপ করতে থাকে। তার আশা পূর্ণ হয়নি। আর উৎপন্ন ফসল দ্বারা উপকৃতও হতে পারেনি। আর যেহেতু এ ধ্বংস ছিলো তার যুলুম ও দুষ্টামীর শাস্তি, এ কারণে এ বিপদে পরকালীন কোন প্রতিদানও তারা লাভ

করেনি। যেমন লাভ করে থাকে মোমেনরা। ঠিক এ উদাহরণই হচ্ছে সেসব কাফেরদের, যারা কুফরী শেরেকে অটল থেকে নিজেদের ধারনায় টনেটনে দান-খয়রাত করে। যেসব হতভাগার শক্তি-সামর্থ্য এবং অর্থ বিত্ত সত্য এবং সত্যাশ্রয়ীদের শত্রুতা বা ফিসক-ফুজুর তথা পাপ ও গুনাহের কাজে ব্যয় হয়, তাদের কথা বলে কি লাভ? তারা কেবল অযথা ব্যয়ই করছেনা, বরং টাকা-পয়সা ব্যয় করে নিজেদের জন্য আরও বেশী বিপদ কিনে নিচ্ছে। তাদের মনে রাখা উচিৎ যে, অর্থ-সম্পদ হোক বা সন্তানাদী কিছুই আল্লাহর আযাব থেকে তাদের বাঁচতে পারবেনা। মোত্তাকীদের মুকাবেলায় তারা নিজেদের আশায় সফলও হবে না। কোরআন মজীদে 'রীহ' শব্দটি এক বচনে সাধারণ আযাবের স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন (তাফসীরে আবু হাইয়্যান)।

১৬২. কাফেরদের কোন নেকী গ্রহণ না করে আল্লাহ যুলুম করেছেন। নাউযুবিল্লাহ এমন মনে করা ঠিক হবেনা। তারা নিজেরাই নিজেদের ওপরে যুলুম করেছে। তাছাড়া কুফরী অবলম্বন না করলে এ খারাপ দিন তাদের দেখতে হতনা।

১৬৩ কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত গুলো ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কারণ, কোন কোন মুসলমান প্রতিবেশী এবং সোহার্দমূলক চুক্তির কারণে ইসলাম পূর্বকালে তাদের সঙ্গে যেসব সম্পর্ক রেখে আসছিল, ইসলাম পরবর্তী কালেও যথারীতি তা মেনে চলতো। তাদের বন্ধুত্বের ওপর আস্থা রেখে মুসলমানদের কারো কারো মতে এ আয়াত গুলো নাযিল হয়েছে মোনাফেকদের প্রসঙ্গে। কারণ, মানুষ তাদেরকে বাহ্যতঃ মুসলমান মনে করে তাদের ব্যাপারে পরিপূর্ণ সর্তকতা অবলম্বন করতো না। এতে ভীষণ ক্ষতি হওয়ার আশংকা ছিলো। আল্লাহ তায়ালা এখানে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, যে, মুসলমানরা তাদের মুসলিম ভাইদের ছাড়া অন্যদেরকে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে, তাদের কাছে যেন গোপন কথা প্রকাশ না করে। কারণ, ইহুদী হোক বা খৃষ্টান, মোনাফেক হোক বা মোশরেক, তাদের কেউই তোমাদের সত্যিকার শুভার্থী কল্যাণকামী নয়। বরং তারা সব সময় এ চেষ্টায় থাকে, যাতে তোমাদের ক্ষতি করতে পারে। তোমাদের দ্বীন-দুনিয়ার ক্ষতি সাধন করতে পারে। তোমরা যাতে কষ্টে থাক, কোন না কোন উপায়ে যাতে তোমাদের-দ্বীন-দুনিয়ার ক্ষতি সাধন করতে পারে, তাদের কেবল এই চেষ্টা। তাদের মনে যে, হিংসা -বিদ্বেষ শত্রুতা রয়েছে তা চরম। কিন্তু অনেক সময় শত্রুতা ও গোশশার আবেগে আপ্লুত হয়ে সরাসরি এমন সব কথা বলে বসে, যা তাদের গভীর দুশমনি সম্পর্কে স্পষ্ট জানায়ে দেয়। দুশমন আর ঈর্ষার কারণে যবানের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকেনা। যাদের দিল এতো খারাপ সে ধরনের দুশমনদের কাছে নিজেদের গোপন রহস্য ফাঁস করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কাজ নয়। আল্লাহ তায়ালা শত্রু-মিত্র সম্পর্কে বলে দিয়েছেন বন্ধুত্ব-সহযোগিতার বিষয়ও তিনি স্পষ্ট জানায়ে দিয়েছেন। যার মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, সে তা কাজে লাগবে। কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব-সহযোগিতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে এ সূরায় কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সূরা মায়েদা ইত্যাদিতেও আলোচনা করা হবে।

هَـٰٓأَنتُمْ أُولَآءِ

تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَـٰبِ كُلِّهِۦ

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ

الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا۟ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ

تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا۟ بِهَا ۖ وَإِن

تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ

اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

১১৯. এরা হচ্ছে সে সব মানুষ, যাদের তোমরা বন্ধু বলে ভালোবাসো। কিন্তু তারা তোমাদের (মোটেই) ভালোবাসে না। তোমরা তো (তোমাদের আগে আমার নাযিল করা) সব কয়টি কিতাবের ওপর ঈমান আনো,[১৬৪] (আর তারা! তারা তো তোমাদের কিতাবকে বিশ্বাসই করে না) অথচ এই (মোনাফেক) লোকগুলো যখন তোমাদের পাশে আসে তখন বলে, হ্যাঁ আমরা (তোমাদের কিতাবকে) মানি,[১৬৫] আবার যখন এরা একান্তে (নিজেদের লোকদের কাছে) চলে যায়, তখন নিজেদের ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এরা নিজেরা নিজেদের আংগুল কামড়াতে শুরু করে।[১৬৬] তুমি (তাদের) বলে, যাও নিজেদের ক্রোধের আগুনে নিজেরাই (পুড়ে) মরো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (এই মোনাফিকদের) মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা যাবতীয় (চক্রান্তমূলক) বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।[১৬৭]

১২০. (এই দেখো না তাদের অবস্থা!) তোমাদের কোন কল্যাণ হলে তাদের খারাপ লাগে। আবার তোমাদের কোনো অকল্যাণ দেখলে তারা আনন্দে ফেটে পড়ে।[১৬৮] এসব (প্রতিকূল) অবস্থায় যদি তোমরা (কঠোর) ধৈর্য ধারণ করতে পারো এবং (বুদ্ধিবৃত্তি আলোকে) নিজেরা সাবধান হয়ে চলতে পারো, তাহলে তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের যাবতীয় কর্মকান্ডই আল্লাহ পরিবেষ্টন করে আছেন।[১৬৯]

১৬৪. অর্থাৎ এ কেবল অন্যায় কথা যে, তোমরা তাদেরকে বন্ধু মনে কর, অথচ তারা তোমাদের বন্ধু নয়। বরং তারা তোমাদের জড়কাটা দুশমন। আরও মজার ব্যাপার এ যে, তোমারা সমস্ত আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করা, তা যে কোন জাতির হোক, যে কোন যমানয় যে কোন নবীর ওপরই নাযিল হোক না কেন। আল্লাহ যাদের নাম বলে দিয়েছেন। সামগ্রিকভাবে তাদের সকলের ওপর তোমরা ঈমান রাখ। পক্ষান্তরে এরা তোমাদের কিতাব এবং পয়গাম্বরকে মানে না, বরং স্বয়ং নিজেদের কিতাবের ওপরই তাদের সঠিক ঈমান নেই। এ হিসাবে তাদের উচিৎ ছিলো তোমাদেরকে কিছুটা ভালোবাসা আর তোমরা থাকবে তাদের থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। অথচ ব্যাপারতো এর সম্পূর্ণ উল্টা।

১৬৫. মোনাফেকরা তো বলত, সাধারণ ইহুদী-খৃষ্টানারাও কথায় কথায় বলত আমরা ঈমান এনেছি তারা এর এ অর্থ গ্রহণ করতো যে, আমরা নিজেদের কিতাবে বিশ্বাস করি, তা স্বীকার করি।

১৬৬. অর্থাৎ ইসলামের উথান এবং মুসলমানদের পারস্পরিক প্রীতি-ভালোবাসা দেখে এরা জ্বলে পুড়ে মরছে। আর যেহেতু এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছেনা, তাই শোকে-দুঃখে দাঁত কড়মড় করছে আর নিজেদের আঙ্গুঁল চিবায়ে খাচ্ছে।

১৬৭ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে আরও বেশী উন্নতি এবং বিজয় দান করবেন। তোমার যদি পা আছড়াতে আছড়াতে মরেও যাও, তবুও তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হবেনা। আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে বিজয়ী ও উন্নত শির করবেনই।

১৬৮. এজন্য এসব দুষ্ট লোকদের ভেতরের অবস্থা এবং মনের অভিপ্রায় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে অবহিত করেছেন আর তাদেরকে শাস্তিও দেবেন ভেতরের দুষ্টামী এবং গোপন শত্রুতার জন্য। এটাই তাদের যোগ্য পাওনা।

১৬৯. যদি তোমাদের সামান্য মঙ্গল দেখে, যেমন ঐক্য-সংহতি বা দুশমনদের ওপর বিজয়, তখন তারা হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরে। আর তোমাদের ওপর কোন বিপদ দেখতে পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। এমন নীচ জাতির কাছ থেকে সহানুভূতি সহমর্মীতার কী আশা করা যেতে পারে যে, তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করাই যাবে কিভাবে?

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ

تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿১২২﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ

بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿১২৩﴾

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ

بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿১২৪﴾ بَلٰٓى ۙ اِنْ

تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ

رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿১২৫﴾

রুকু ১৩

১২১. (হে নবী সেদিনের কথা স্মরণ করো) যখন তুমি খুব ভোর বেলায় তোমার আপনজনদের কাছ থেকে (বিদায় নিয়ে) (সাথিদের) যুদ্ধের ঘাটিসমূহে মোতায়েন করছিলে (সে কঠিন পরিস্থিতিতেও) আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই শোনেন এবং (তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে) তিনি ভালো করেই জানেন। ১২২. (বিশেষ করে সেই নাযুক পরিস্থিতিতে) যখন তোমার (একান্ত) নিজের দুটো দলই সাহস ও মনোবল হারিয়ে ফেলার উপক্রম করে ফেলছিলো (তখন) আল্লাহ তায়ালাই তাদের (সেই ভগ্ন মনোবল জোড়া লাগাবার কাজে বন্ধু ও) অভিভাবক হিসেবে মওজুত ছিলেন (আর) আল্লাহর ওপর যারা ঈমান আনে তাদের তো উচিত (সর্বাবস্থায়ই) তার ওপর ভরসা করা।

১২৩. (এই ভরসা করার কারণেই) বদরের (যুদ্ধে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বিজয় ও সাহায্য দান করেছিলেন অথচ (তোমরা ভালো করেই জানো যে তোমরা তখন কতো দুর্বল ছিলে। অতএব (সর্বাবস্থায়ই) আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা এর ফলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে সক্ষম হবে। ১২৪. (সেই মুহূর্তের কথাও স্মরণ করো) যখন তুমি (তোমার সাথী) মুমিনদের বলছিলে যে, (যুদ্ধে বিজয় লাভ করার জন্যে) তোমাদের মালিক যদি আসমান থেকে তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে (বিজয়ের জন্যে তা কি) তোমাদের যথেষ্ট হবে না?[১৭০]

১২৫. হ্যাঁ অবশ্যই, তোমরা যদি (ময়দানে) ধৈর্য ধারণ করো এবং শয়তানের চক্রান্ত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পারো এবং শত্রুবাহিনী যদি তোমাদের ওপর দ্রুতগতিতে আক্রমণ করে বসে তাহলে তোমাদের মালিক (শুধু তিন হাজার নয়, প্রয়োজনে) পাঁচ হাজার ফেরেশতা দিয়েও তোমাদের সাহায্য করবেন।১৭১

---

১৭০. কারো মনে এ ধারণা উদয় হতে পারে যে, আমরা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না রাখলে তারা অত্যধিক লিপ্ত হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, আগের চেয়ে আরও বেশী ক্ষতি করার চেষ্টা চালাবে। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, তোমরা ধৈয এবং তাকওয়া-পবিত্রতায় যথার্থভাবে অটল-অবিচল থাকলে তাদের কোন ষড়যন্ত্র চক্রান্তই তোমাদের-বিরুদ্ধে কার্যকর হবেনা, তারা যেসব কর্মকান্ড চালায়, তা সবই আল্লাহর জানা আছে, তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করার ক্ষমতা তাঁর সব সময় আছে। তোমরা আল্লাহর সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ককে মজবুত রাখবে। তাহলে তোমাদের রাস্তা থেকে সব কাঁটা অপসারণ করা হবে।

এ প্রসঙ্গে ওহোদ যুদ্ধের ঘটনা স্মরন করায়ে দেয়া হয়েছে। মোনাফেকদের বিভ্রান্তিকর আচরণে কিছু মুসলমান প্রভাবিত হয়েছিলেন। মুসলমানদের দুটা গোত্র ধৈর্য ও তাকওয়া থেকে বিচ্যুত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। এতে মোনাফেকরা খুশী হওয়ার সুযোগ পেতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হস্তধারণ পূর্বক এ গোত্রদ্বয়কে মারাত্মক হোঁচট থেকে রক্ষা করেছেন।

১৭১: এ আয়াতে ওহোদ যুদ্ধের ঘটনা স্মরন করায়ে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদর স্থানে কোরাইশ বাহিনী এবং মুসলমান মোজাহিদদের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মক্কার কাফেরদের অত্যন্ত নামকরা সত্তুর ব্যক্তি মারা যায়। অনুরূপ সংখ্যক লোক গ্রেফতার হয়। এ ধ্বংসাত্নক এবং অপমানকর পরাজয়ে কোরাইশের প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠে। যেসব সর্দার মারা পড়েছে, তাদের নিকটাত্নীয়রা গোটা আরবকে উত্তেজিত করে মক্কাবাসীদের প্রতি আবেদন জানায় যে, বাণিজ্য কাফেলা শাম থেকে (বর্তমান সিরিয়া) যেসব পণ্য সামগ্রী নিয়ে এসেছে (আর তাই ছিলো বদর যুদ্ধের কারণ) তা সবই এ অভিযানে নিয়োজিত করা হোক। যাতে আমরা মোহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের থেকে আমাদের নিহতদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি। সকলেই এটা মঞ্জুর করে।

তৃতীয় হিজরীতে কোরাইশের সঙ্গে মিলে আরও অনেক কবীলা মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বর্হিগত হয়। এমনকি নারীরাও সঙ্গে ছিলো,যাতে প্রয়োজনে পুরুষদেরকে উত্তোজিত করে পশ্চাদপসারণ থেকে বারণ করতে পারে। তিন হাজার সৈন্যের এ বাহিনী অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মদীনা থেকে তিন চার মাইল দূরে ওহোদ যুদ্ধের পাহাড়ের কাছে শিবির স্থাপন করলে নবী করীম (সঃ) মুসলমানদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত মত ছিলো এ যে, মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থান করে সহজে এবং সাফল্যের সঙ্গে দুশমনের

মোকাবিলা করা যায়। তাঁর এক স্বপ্ন থেকেও এর সমর্থন মিলে। এ প্রথম মওকা ছিলো, যখন মুনাফেকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই'র মতও গ্রহণ করা হয়। তার মতও ছিল হুযুরের মতের অনুরূপ, কিন্তু জোশ জয়বায় ভরা কোন কোন মুসলমান, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ যাদের হয়নি এবং শাহাদাতের আগ্রহ যাদেরকে অস্থির করে তুলেছিলো৷ তারা জিদ ধরে বসে যে, আমাদেরকে বাইরে গিয়ে মোকাবিলা করতে হবে, যাতে দুশমন আমাদের সম্পর্কে কাপুরুষতা এবং দুর্বলতার ধারণা করতে না পারে। অধিকাংশই ছিলেন এ মতের পক্ষে।

এ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে রসূল গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং লৌহবর্ম পরিধান পূর্বক বাইরে আসেন। এ সময় কারো কারো মনে হয় যে, নবীকে আমরা মদীনার বাইরে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছি তাঁর মতের বিরুদ্ধে। তারা আরয করেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার ইচ্ছা না হলে এখানেই অবস্থান করুন। জবাবে আল্লাহর নবী বললেনঃ লৌহবর্ম পরিধান এবং অস্ত্র হাতে নেয়ার পর যুদ্ধ না করে তা খুলে ফেলা পয়গম্বরের পক্ষে শোভা পায়না। তিনি যখন মদীনার বাইরে গমন করেন,তখন প্রায় এক হাজার লোক তার সঙ্গে ছিলো। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই প্রায় তিনশত সঙ্গীকে নিয়ে যাদের মধ্যে কিছু কিছু মুলসমানও ছিলেন। রাস্তা থেকে এ বলে ফিরে যায় যে, যেহেতু আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি , আমল করা হয়েছে অন্যদের মতামত অনুযায়ী, সুতরাং আমাদের যুদ্ধ করার কোন দরকার নেই। কেন শুধু নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলতে যাবো, অনেকে তাদেরকে বুঝালেনও। কিন্তু কোন ফল হলোনা।

সর্বশেষে আল্লাহর নবী মোট সাতশত সঙ্গীদেরকে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হন। তিনি নিজে সাময়িক কায়দায় সারী প্রস্তত করেন। প্রতিটি গ্রুপকে যথা স্থানে বসান। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলে দেন যে, আমার নির্দেশের আগে কেউ যেন যুদ্ধ শুরু না করে। এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে দুষ্ট বনু হারেসা ও বনু সালমার অন্তরে কিছুটা দুর্বলতা দেখা দেয়। মুসলমানদের ক্ষুদ্র সমাবেশ দেখে তাদের মন দুর্বল হয় এবং ধারনা হয় যে, ময়দান থেকে সরে দাঁড়াই। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের সাহায্যে করলেন, তাদের অন্তর মজবুত করলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, একমাত্র আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতার ওপরই মুসলমানদের নির্ভর করা উচিৎ। সংখ্যা এবং যুদ্ধের উপকরণ খুব একটা বড় কিছু নয়। তিনি যখন বিজয়ী করার ইচ্ছা করেন, তখন যুদ্ধের উপকরণ সব কিছুই বেকার হয়ে যায় এবং গায়বী সাহায্য দ্বারাই মহা বিজয় অর্জিত হয়, যেমনটি হয়েছে বদর যুদ্ধে। সুতরাং মুসলমানদের কেবল আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ। যাতে তাঁর তরফ থেকে আরও দান অনুগ্রহ পেতে পারে। আর সুযোগ পায় বাড়তি শোকরগুজারী। সূরা আনফালে বদর যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দুটি গোত্রের অর্থ বনু সালমা ও বনু হারেস গোত্র। এ আয়াতে তাদের প্রতি কটাক্ষ করা হলেও তাদের কোন কোন বুযুর্গ বলতেন যে, এ আয়াত নাযিল না হওয়া আমাদের

হবে। অবশ্য শর্ত এ যে, তোমাদেরকে ঈমান-একীনের পথে অবিচল থাকতে হবে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদায় পূর্ণ আস্থাবান হয়ে রাসূলের আনুগত্য এবং আল্লাহর পথে জেহাদ থেকে পিছ পা হবেনা । আল্লাহর এ আওয়াজ ভাঙ্গাঁ প্রাণে জোড়া লাগায়, নিস্তেজ-নিষ্প্রভ দেহে নব জীবনের সঞ্চার করে। ফল দাঁড়ায় এ যে, বাহ্যতঃ বিজয়ী কাফেররা আহত মোজাহিদদের জবাবী হামলার মুখে টিকতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত উর্ধশ্বাসে ছুটে ময়দান ত্যাগ করে।

১৮৯. মুসলমানদেরকে যুদ্ধে যে বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, তাতে তাদের মন ভীষণভাবে ভেঙ্গেঁ পড়েছিল। উপরন্তু মোনাফেক এবং দুশমনদের ভৎসনা শ্রবন করে আরও বেশী কষ্ট পায়। কারণ, মুনাফেকরা বলতা, মোহাম্মদ (সঃ) সত্য নবী হলে কেন এত ক্ষয়-ক্ষতি হবে? বা সামন্য সময়ের জন্যও কেন এ সাময়িক পরাজয় হবে? আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতগুলোতে মুসলমানদেরকে সান্তনা দেন যে, এ যুদ্ধে তোমরা কোন আঘাত পেয়ে থাকলে বা তোমাদের কোন কষ্ট হলে প্রতিপক্ষকেও এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। ওহোদে তোমাদের ৭৫ জন শহীদ এবং অনেকে আহত হয়েছেন। কিন্তু এক বছসর আগে বদরে তাদের ৭০ জন জাহান্নামে পৌছেছে আর অনেকে হয়েছিল আহত। আর স্বয়ং এ যুদ্ধে শুরুতে তাদের অনেকেই নিহত এবং আহত হয়েছে। আমার 'আর আল্লাহ তো তোমাদের সঙ্গে তাঁর ওয়াদাকে সত্য করে দেখায়েছেন, যখন তোমরা তাঁর হুকুমে তাদেরকে হত্যা করছিলে' এ আয়াত থেকেও একথাই প্রকাশ পায়। অতঃপর বদরে তাদের ৭০ জন লোক জিল্লতির সঙ্গে বন্দী হয়। তোমাদের একজনকেও এ জিল্লতির সম্মুখীন হতে হয়নি। যাই হোক, তাদের ক্ষতির সঙ্গে তোমাদের ক্ষতির তুলনা করলে দুঃখ-অনুতাপ করার কোন সুযোগই থাকেনা। তাদের জন্যও থাকেনা গর্ব অহংকারে মাথা উঁচু করার কোন স্থান। 'অবশ্য সব সময়ের জন্য আমার এ অভ্যাস চলে আসছে যে, কঠোরতা কোমলতা, দুঃখ-সুখ কষ্ট আরাম-এর দিনগুলোকে আমরা অদল বদল করে থাকি'। এতে অনেক রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে। অতঃপর তারা যখন কষ্ট ভোগ করে বাতেলের সহায়তায় সাহস হারা হয়নি, তবে তোমরা সত্যের সহায়তায় কি করে সাহস হারাতে পার?

১৯০. অর্থাৎ সত্যিকার ঈমানদারদেরকে মোনাফেক তেকে পৃথক করবেন। উভয়ের রং সুস্পষ্ট ও পৃথক পৃথক ভাবে দেখা যাবে।

১৯১. যালেমীন এর অর্থ যদি মোশরেকীন হয়, ওহোদে যারা ছিলো প্রতিপক্ষ তখন এর অর্থ হবে, তাদের সাময়িক সাফল্যের কারণ এ নয় যে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। বরং এর কারণ অন্য কিছু। আর যদি এর অর্থ হয় মোনাফেকীন, যারা ঠিক যুদ্ধের সময় মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তখন এতে বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা ছিলো আল্লাহর কাছে একান্ত ঘৃণীত। এজন্য ঈমান এবং শাহাদাতের স্থান থেকে তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

১৯২. অর্থাৎ জয়-পরাজয় পরিবর্তনশীল জিনিস। মুসলমানদেরকে শাহাদাতের উচ্চ স্থান দান করাই ছিলো তাঁর অভিপ্রেত। মোমেন- মোনাফেক পরখ করা, মুসলমানদেরকে শুদ্ধ করা বা গুনাহ হতে পাক করা আর কাফেরদেরকে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন করাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। কারণ, তারা যখন সাময়িক বিজয় আর অস্থায়ী সাফল্যে কুশী হয়ে কুফরীতে আগের চেয়েও ডুবে যাবে তখন তারা আল্লাহ তাআলার ক্রোধ-অভিশাপের আরও বেশী ভাগী হবে। এজন্য মুসলমানদের এ সাময়িক পরাজয় হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ কাফেরদের ওপরে সন্তুষ্ট নন।

১৯৩. অর্থাৎ জান্নাতের যেসব উচ্চ স্থান আর বুলুন্দ মরতবায় আল্লাহ তোমাদেরকে পৌছাতে চান, তোমরা কি ধারনা করে বসেছ যে, এমনিতেই আরামে সেখানে নিয়ে পৌছবে? আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখবেন না যে, তোমাদের মধ্যে কতজন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার আর কতজন যুদ্ধে অটল অবিচল থাকার লোক? এমন ধারনা করবেনা। উচ্চ স্থানে তাদেরকেই অধিষ্ঠিত করা হয়, যারা আল্লাহর পথে সব রকম কষ্ট স্বীকার করতে এবং সব রকম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।

কবি ঠিকই বলেছেনঃ

'এ বুলুন্দ মর্তবা যার ভাগ্যে জুটেছে সে পেয়েছে। সব দাবীদারের জন্য কোথায় পাওয়া যাবে ফাঁসীর মঞ্চ?

১৯৪. বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে যেসব সাহাবী বর্ণিত ছিলেন, বদর যুদ্ধে শহীদদের ফযীলত সম্পর্কে শুনে শুনে তাঁরা আকাংখ্যা করতেন যে, আল্লাহ আবার কোন সুযোগ করে দিলে আমরাও আল্লাহর পথে নিহত হবো, শাহাদতের মর্যদা লাভ করবো! সে সব সাহাবীরাই ওহোদ যুদ্ধে পরামর্শ দিয়েছিলেন, বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা উচিৎ তাদেরকে বলা হয়েছে যে. তোমরা আগে যে জিনিষের আকাংখ্যা করতে, তা তোমাদের চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এখন সামনে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে পেছনে হটা কেবন? হাদীস শরীফে আছে যে, 'দুশমনের মুখোমুখী হওয়ার আকাংখ্যা করবেনা। কিন্তু এমন সুযোগ এলে দৃঢ় থাকবে।'

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِن

قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ

أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ

شَيْـًٔا ؕ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾ وَمَا كَانَ

لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ

ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِىٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا

لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ؕ

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ

قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْۤ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ

اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰتٰىهُمُ

اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾

রুকু ১৫

১৪৪. মোহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই নয়, তার আগেও বহু রসূল গত হয়ে গেছে। (কোনো না কোনো ভাবে তাদের মৃত্যু হয়েছে) তাই সে যদি (আজ) মরে যায় অথবা তাকে যদি কেউ মেরে ফেলে, তাহলে তোমরা কি (তার আদর্শ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে? আর (এটা জেনে রেখো) যে ব্যক্তিই (নবীর

আদর্শ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় সে (তার একাজ দিয়ে) আল্লাহর (দ্বীনের) কোনো রকম ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তায়ালা (চিরদিনই) তাঁর (আদর্শের প্রতি অবিচল ও তার) প্রতি কৃতজ্ঞ বান্দাহদের প্রতিফল দান করেন।[১৯৫]

১৪৫. (তাছাড়া সব চাইতে বড়ো সত্য হচ্ছে) কোনো প্রাণীই আল্লাহর (সিদ্ধান্ত ও) অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না (প্রত্যেকটি প্রাণীরই মৃত্যুর) দিনক্ষণ সুনির্দিষ্ট[১৯৬] (হয়ে আছে) (এই মহাসত্যটি জানার পরও) যে ব্যক্তি এ পার্থিব পুরস্কারের প্রত্যাশ্যা করে, আমি তাকে তা (এই দুনিয়াতেই) দান করবো,[১৯৭] আর যে (এ অস্থায়ী নিবাসের বদলে স্থায়ী আবাস) আখেরাতে পুরস্কারের ইচ্ছা পোষণ করবে আমি তাকে সেই (চিরন্তন পাওনা) থেকেই এর প্রতিফল দান করবো[১৯৮] এবং অচিরেই আমি (আমার প্রতি) কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারীদের (পাওনা ও) প্রতিফল দান করবো।[১৯৯]

১৪৬. আল্লাহর পক্ষ থেকে আরো অনেক নবীই (এসে) ছিলো, যারা যুদ্ধ করেছে (আল্লাহর পথে) তাদের সাথে (কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আরো যুদ্ধ করেছে এমনও) ছিলো অনেক সাধক ও জ্ঞানবান ব্যক্তি, আল্লাহর পথে লড়াইয়ের (এই দীর্ঘ) যাত্রায় তাদের ওপর যতো বিপদ-মুসিবত এসে সে তাতে (কোনো দিনই) তারা হতাশ হয়ে পড়েনি (কোনো একটি মুহূর্তের জন্যে) তারা দুর্বলতা দেখায়নি, বাতিলের সামনে (কোনো দিনই তারা) মাথা নত করেনি (মূলত এ ধরনের ধৈর্যশীল ও সাহসী) ব্যক্তিদেরই আল্লাহ তায়ালা বেশী ভালোবাসেন।[২০০]

১৪৭. তাদের মুখে একমাত্র কথা ছিলো এইঃ হে আমাদের মালিক, (তোমার দ্বীনের পথে) আমাদের যাবতীয় গুনাহখাতা তুমি মাফ করে দাও। আমাদের কাজ-কর্মের সব বাড়াবাড়িকে তুমি ক্ষমা করে দাও। বাতিলের মোকাবিলায় তুমি আমাদের কদমকে মযবুত রাখো, (সবার শেষে) হক ও বাতিলের সম্মুখ সমরে) কাফেরদের ওপর তুমি আমাদের বিজয় দাও।[২০১] ১৪৮. পরিশেষে আল্লাহ তাআলা এই (নেক) বান্দাহদের দুনিয়ার জীবনেও ভালো প্রতিফল দিয়েছেন এবং পরকালীন (স্থায়ী) জীবনেও তিনি তাদের জন্যে অনেক সুন্দর পুরস্কারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা (সব সময়ই তার) নেককার বান্দাহকে ভালো বাসেন।

---

১৯৫. ঘটনা এই যে, ওহোদে নবী করীম (সঃ) নিজেই স্বয়ং যুদ্ধের চিত্র অংকন করেন। সমস্ত সারী ঠিক করার পর একটা পাহাড়ী পথ অবশিষ্ট থাকে। এ পাহাড়ী পথ দিয়ে শত্রুরা মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে পেছন দিক থেকে হামলা করার আশংকা ছিলো। এ পাহাড়ী পথে রসূল ৫০জন তীরন্দাজের একটি বাহিনী নিয়োজিত করে তাদেরকে তাকীদ দিয়ে বলেন যে, 'আমাদের যে অবস্থাই হোক না কেন, তোমরা এখান থেকে সরবেনা, মুসলমানরা বিজয়ী বা পরাজিত, এমন কি তোমরা যদি দেখ যে, পাখী তাদের গোশত ঠোকর মেরে খাচ্ছে, তবুও তোমরা নিজেদের স্থান ত্যাগ করবেনা।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) ছিলেন এ বাহিনীর নেতা, তোমরা যতক্ষণ এ স্থানে অটল থাকবে, ততক্ষণ আমরা বিজয়ী থাকবো।

মোটকথা, সৈন্যদেরকে সম্পূর্ণরূপে হেদায়াত দেওয়ার পর যুদ্ধ শুরু হয়। তুমুল যুদ্ধ। ইসলামের সৈন্যরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। হযরত আবু দোজানা, হযরত আলী মুরতযা এবং অন্যান্য মোজাহিদদের শৌর্য-বীর্য-বীরত্বের সম্মুখে কুরাইশের মোশরেকদের বাহু ভেঙ্গে পড়ে। পলায়নের পথ ধরা ছাড়া তাদের সম্মুখে অন্য কোন উপায় নেই। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওয়াদা পূরণ করে দেখায়েছেন। কাফের নিশ্চিত পরাজিত হয়েছে। তারা উর্ধশ্বাসে পলায়ন করছে। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে সব রমনী আগমন করেছিলো, হত বিহ্বল হয়ে তাদেরকে এদিক সেদিক ছুটে পালাতে দেখা যায়। মোজাহিদরা গনীমতের মাল কব্জা করা শুরু করে। তীরন্দাজ বাহিনী এ দৃশ্য দেখে মনে করলো, এখন বিজয় সম্পন্ন হয়েছে। শত্রুরা পালায়ন করছে। অযথা এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কি দরকার। সামনে অগ্রসর হয়ে দুশমনের পিছু ধাওয়া করি আর গনিমতের মালে অংশ নেই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর তাদেরকে রাসূলুল্লাহর কথা স্মরণ করায়ে দেন। তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহর কথার আসল তাৎপর্য আমরা পূর্ণ করেছি। এখন থাকার দরকার নেই। এ মনে করে সকলেই গনীমতের মালের প্রতি ছুটে যায়। কেবল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর এবং তাঁর ১১জন সঙ্গী পাহাড়ী পথের হেফাযতে নিয়োজিত ছিলেন। মোশরেকদের অশ্বারোহী বাহিনীর কমান্ডার ছিল খালেদ ইবনে ওয়ালীদ। সে তখনো হযরত এবং 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' হয়নি। সে পেছন দিক হতে এসে গিরীপথে হামলা চালায়। দশ বারজন তীরন্দাজ আড়াই শত অশ্বরোহী বাহিনীর আক্রমণ ঠেকায় কি করে। তবুও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর এবং তাঁর সঙ্গীরা প্রতিরোধে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করেননি। এ প্রতিরোধেই তাঁরা প্রাণ দান করেন। মুসলিম মোজাহিদরা পেছন দিক সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ মোশরেক বাহিনী তাদের ওপর ঝাপায়ে পড়ে। মুসলমানরা উভয় দিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়ে। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। অনেক মুসলমান শহীদ এবং জখম হয়। এ হুলুস্থুল অবস্থায় ইবনে কুমাইয়া রাসূলের প্রতি এক প্রকান্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করে। ফলে তার দান্দান মোবারক শহীদ এবং চেহারা মোবারক জখম হয়। ইবনে কুমাইয়া রসূলকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু হযরত মুসাআব ইবনে উমাইর প্রতিরোধ করেন। তাঁর হাতে ছিলো ইসলামের পতাকা। আঘাতের তীব্রতায় আল্লাহর নবী মাটিতে লুটে পড়েন। কোন এক শয়তান উচ্চারণ করে যে, আল্লাহর নবী নিহত হয়েছেন।

এ কথা শুনে মুসলমানরা সম্বিত হারা হয়ে যায়। তাদের পা নড়বড়ে হয়ে যায়, কোন কোন মুসলমান হাত পা ছাড়িয়ে বসে পড়েন। কোন কোন দুর্বল মুসলমান চিন্তা করে মোশরেকদের নেতা আবু সুফিয়ানের কাছে থেকে নিরাপত্তা গ্রহণ করার কথা। কোন কোন মোনাফেক বলতে শুরু করে, মোহাম্মদ (সঃ) যখন নিহতই হয়েছেন, তখন ইসলাম ত্যাগ

করে আগের ধর্মে ফিরে যাওয়াই উচিৎ। এ সময় হযরত আনাস ইবনে মালেক-এর চাচা হযরত আনাস ইবনুন নযর বললেন, মোহাম্মদ (সঃ) নিহত হলেও তাঁর পরওয়ার দেগার তো নিহত হননি। রসূলের পরে তোমাদের বেঁচে থাকা কোন্ কাজে আসবে? যে জন্য তিনি প্রাণ দান করেছেন, সে কাজে তোমাদেরকেও প্রাণ দেয়া উচিৎ। এ বলে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হামলা চালান। লড়াই করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দেন। (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। এ সময় রাসূল আওয়াজ দেনঃ 'আল্লাহর বান্দারা! এদিকে এসো। আমি আল্লাহর রাসূল। হযরত কাআব ইবনে মালেক তাঁকে চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠলেনঃ মুসলমানরা! সুসংবাদ গ্রহণ কর। রাসূলল্লাহ এখানে আছেন। আওয়াজ শুনে চতুর্দিক থেকে মুসলমানরা ছুটে আসে। তিরিশ জন সাহাবী তাঁর কাছে এসে প্রতিরোধ করে। মোশরেক বাহিনীকে হটায়ে দেয়। এ সময় হযরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, হযরত তালহা, হযরত আবু তালহা, হযরত কাতাদা ইবনুন নুমান প্রমুখ সাহাবী ভীষণ বীরত্ব আর জাঁবাজীর পরিচয় দেন। অবশেষে মোশরেকরা ময়দান ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়। এহেন পবিত্র মাটিতে আয়াতটি নাযিল হয়ঃ অর্থাৎ 'মোহাম্মদ (সঃ) তো আর আল্লাহ নন। তিনিও একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন'। তাঁদের পরেও তাঁদের অনুসারীরা দ্বীনকে ধারণ করে জান-মাল উৎসর্গ করে একে কায়েম রেখেছিলেন। এ দুনিয়া ত্যাগ করে তার চলে যাওয়া তেমন কোন বিস্ময়কর কিছু নয়। এ সময় না হোক, অন্য কোন সময় তিনি ওফাত পেলে বা শহীদ হলে তবে কি তোমরা দ্বীনের খেদমত-হেফাযতের পথ হতে ফিরে যাবে? জেহাদ কী সাবীলিল্লাহ ছেড়ে দেবে? এখন তার নিহত হওয়ার খবর শুনেই অনেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা হারায়ে বসে পড়তে উদ্যত হয়েছে। না মোনাফেকদের পরামর্শ অনুযায়ী, নাউযু বিল্লাহ একেবারে দ্বীন-ই ত্যাগ করবে? তোমাদের কাছ থেকে এমন আশা কখনো করা যায় না। কেউ এমন কাজ করলে সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তোমাদের সাহায্যের প্রত্যাশী মোটেই নন। বরং তিনি তোমাদেরকে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত করেছেন এজন্য তোমাদের উচিৎ তাঁর শোকর আদায় করা।

কবি ঠিকই বলেছেনঃ

'তুমি সুলতানের খেদমত করছ, এজন্য অনুগ্রহের খোটা দেবেনা। বরং তিনি তোমাকে খেদমতে নিয়োজিত করেছেন এজন্য তোমার উচিৎ তাঁর শুকরিয়া আদায় করা'। আর শুকরিয়া এই যে, আমরা দ্বীনের খেদমতে পূর্বের চেয়েও বেশী মজবুত এবং দৃঢ় হবে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, হযরতের ওফাতের পরে কিছু লোক দ্বীন ত্যাগ করবে। আর যারা অটল থাকবে, তারা রিবাট সওয়াব পাবে। বাস্তবে হয়েছেও তাই। হযরতের পরে কিছু লোক মুরতাদ হয়ে গেছে। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) তাদের অনেককে পুনরায় মুসলমান করেছেন। অনেকে মারাও পড়েছে।

মূল যে শব্দটি বলা হয়েছে তার অর্থ সমাপ্ত হওয়া অতিক্রান্ত হওয়া এবং ছেড়ে চলে যাওয়া। এর অর্থ 'মৃত্যু' হতে হবে এমন কোন কথা নেই। যেমন বলা হয়েছেঃ 'যখন তোমাদেরকে ত্যাগ করে পৃথক হয় তদুপরি আরবী ব্যাকরণের দিক থেকেও এটা সমার্থবোধক কারণ, দাবী প্রমাণ করার জন্য এখানে 'ইস্তিগরাক' বা সমস্ত রাসূল অর্থ গ্রহণ করার কোন আবশ্যকতা নেই। ঠিক এ ধরনের বাক্য হযরত মাসীহ (আঃ) সম্পর্কেও ব্যবহার করা হয়েছেঃ এর এ অর্থ করা হবে যে, মাসীহ (আঃ) এর আগেই সমস্ত পয়গাম্বর অতিক্রান্ত হয়েছেন, তাঁর পরে আর কোন পয়গম্বর আসবেন না। সুতরাং বাধ্য হয়ে এখানেও সে অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের মুসহাফ এবং হযরত ইবনে আব্বাসের কেরাআতে এভাবে রয়েছে। এ থেকে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। অবশ্য এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় 'মৃত্যু' বা হত্যার উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, স্বাভাবিক মৃত্যু তো যে কোন সময় আসতে পারে, আর হত্যার খবরটি একটা ভিন্ন ধরনের। আর যেহেতু মৃত্যুর ছবি বাস্তবে সংঘটিত হওয়া ছিলো নির্ধারিত, তাই হত্যার আগে তার উল্লেখ করা হয়েছে। রসূলের ওফাতের পর হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) সাহাবাদের সমাবেশে গোটা আয়াত পাঠ করেন, তখন লোকেরাও এর বৈধতা ও তা সংঘটিত হওয়া যে অসম্ভব নয়, সে ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাঃ) উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। মৃত্যু সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে হযরত ছিদ্দীকে আকবর এ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেননি। অন্য কেউ তা বুঝেওনি। এ শব্দটি যদি মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার সংবাদ দেয় তা হলে এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় অর্থাৎ ইন্তিকালের সাত বৎসর আগেই তাঁর ওফাত হয়েছে বলে ধরে নিতে হতো। এ ব্যাখ্যা দ্বারা কোন কোন বিকৃতকারীর সকল বিকৃতি দূরীভূত হয়ে যায়। অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে এ আশংকায় আর বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থেকে জ্ঞানীদের জন্য কেবল ইঙ্গিতটুকুই রেখে দিলাম।

১৯৬ . কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহর হুকুম ছাড়া মরতে পারেনা, মৃত্যুর যত কারণই সেখানে একত্রিত হোক না কেন, আর সকলের মৃত্যুইও নির্ধারিত সময়ে হওয়া অবধারিত, অসুখের কারণে হোক বা হত্যার ফলে বা অন্য কোন কারণে সুতরাং যারা আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, তাদেরকে তো ঘাবড়ানো উচিৎ নয়। কারোই মৃত্যুর খবর শুনে হতাশ বিমর্ষ হয়ে বসে থাকাও উচিৎ নয়।

১৯৭. অর্থাৎ যদি আমরা চাই। যেমন বলেছেনঃ

'আমরা তাকে দুনিয়াতেই সত্বর দান করি যাকে যে পরিমাণ চাই বনী ইসরাঈল ১৮)।

১৯৮. অর্থাৎ আখেরাতে সে নিশ্চিত বিনিময় পাবে। এ আয়াতের প্রথমাংশে ইঙ্গিতে তাদের নিন্দা করা হয়েছে, যারা গনীমতের মাল আহরণে নির্দেশ অমান্য করেছে। আর যারা সর্বদা ফর্মাবর্দারীতে অটল ছিলেন, আয়াতের শেষে তাদের উল্লেখ রয়েছে।

১৯৯. অর্থাৎ যারা অটল-অবিচল থাকবে তারা দ্বীন দুনিয়া উভয়টাই পাবে। অবশ্য যে এ নেয়মতের মর্যাদা দেয় (মূযেহুল কোরআন)।

২০০. অর্থাৎ তোমাদের আগে অনেক আল্লাহ ওয়ালারা নবীদের সঙ্গী হয়ে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। অনেক দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করেছে। কিন্তু এত সব বিপদ-মুছিবতের ফলে তাদের ইচ্ছায় ভাটা পড়েনি, তারা হীনবল হয়ে দুর্বলতাও দেখায়নি। দুশমনের সামনে নতও হয়নি। এমন দৃঢ় অবিচল ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ বিশেষভাবে ভালোবাসেন। ওহোদ যুদ্ধে যেসব মুসলমান দুর্বলতা প্রদর্শন করেছিল, এমনকি কেউ কেউতো এমন কথাও বলেছিল যে, কাকেও মধ্যস্থ করে আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভ করা হোক, এখানে তাদেরকে সতর্ক করে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। সার কথা হচ্ছে এ যে, বিগত উম্মতের সত্যাশ্রয়ীরা যখন বিপদ মুছিবতে এতটা ধৈর্যও সবরের প্রমাণ দিয়েছেন তখন তোমদের 'খাইরুল উমাম' তথা শ্রেষ্ঠ জাতিকে তার চেয়েও অগ্রসর হয়ে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে।

২০১. অর্থাৎ বিপদাপদের ভীড়ে ঘাবড়াবার মতো কোন কথা বলেনি, মুখোমুখী হওয়া থেকে সরে গিয়ে শত্রুর আনুগত্য গ্রহণ করার মতো শব্দও মুখে উচ্চারণ করেনি। বললে এটাই বলেছে; 'পরওয়ারদেগার! আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি এবং বাড়াবাড়ি ক্ষমা কর। আমাদের অন্তরকে সুদৃঢ় অবিচল রাখ। যাতে আমাদের পদযুগল সত্য পথ হতে বিচ্যুত না হয়। এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।' তাঁরা ধারনা করেছিলেন যে, কোন কোন সময় বিপদ মুছিবত আসায় মানুষের গুনাহ-ত্রুটি বিচ্যুতির ভূমিকা থাকে। আর আমাদের মধ্যে কে এমন দাবী করতে পারে যে, তার দ্বারা কখনো কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় না। যাই হোক, তাঁরা মসিবতে ঘাবড়ায়ে মানুষের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে বরং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن

تُطِيعُوا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ

وَمَأْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِیْنَ ﴿۱۵۱﴾ وَلَقَدْ

صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤی

اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِی الْاَمْرِ وَعَصَیْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ

مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ یُّرِیْدُ الدُّنْیَا

وَمِنْكُمْ مَّنْ یُّرِیْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ

لِیَبْتَلِیَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَی

الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۵۲﴾ اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰۤی اَحَدٍ

وَّالرَّسُوْلُ یَدْعُوْكُمْ فِیْۤ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّۢا

بِغَمٍّ لِّكَیْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰی مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ؕ

وَاللّٰهُ خَبِیْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵۳﴾

রুকু ১৬

১৪৯. হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছো (শুনো) তোমরা যদি (কথায় কথায়) এই অবিশ্বাসী কাফেরদের (চিন্তা ও কর্মধারার) অনুসরণ করতে শুরু করো, তাহলে এরা তোমাদের (ঈমান) পূর্ববর্তী (জাহেলিয়াতের) অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। (আর) এর ফলে (নিশ্চয়ই) তোমরা (দুনিয়া ও আখেরাতে ব্যর্থ ও) নিদারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।২০২ ১৫০. (এই ক্ষতিগ্রস্ততার বদলে বরং তোমরা আল্লাহ দিকে ফিরে এসো) কেননা আল্লাহর তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের একমাত্র রক্ষক এবং অভিভাবক এবং তিনিই হচ্ছেন তোমাদের বড়ো সাহায্যকারী।

১৫১. অচিরেই আমি এই অবিশ্বাসী কাফেরদের অন্তরে ভীতি(ও ত্রাসের) সঞ্চার করে দেবো কারণ তারা আল্লাহর সাথে আন্যদের শরীক বানিয়ে তাদের অনুসরণ করেছে, অথচ (তারা ভালো করেই জানে যে, তাদের এ কাজের সপক্ষে আল্লাহ তায়ালা কোনো দলিল প্রমাণ তাদের কাছে পাঠাননি। এদের শেষ গন্তব্যস্থল হচ্ছে-(জাহান্নামের কঠিন) আগুন। যালিমদের জন্যে নিদিষ্ট করে রাখা এই জাহান্নাম কতো নিকৃষ্টতম স্থান![২০৪]

১৫২. (কাফেরদের সাথে এই সম্মুখ লড়াইয়ে ওহুদের ময়দানে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে (সাহায্য দেয়ার) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি (অক্ষরে অক্ষরে) পালন করেছেন। (স্মরণ করো, যুদ্ধের প্রথম দিকে কিভাবে) তোমরা আল্লাহর অনুমতি (ও সাহায্য) নিয়ে তাদেরকে নির্মূল করে যাচ্ছিলে।[২০৫] পরে যখন তোমরা সাহস (ও মনোবল) হারিয়ে ফেললে এবং (আল্লাহর রসূলের) আদেশ পালনের ব্যাপারে মত পার্থক্য শুরু করে দিলে এমনকি আল্লাহর রসুল যখন তোমাদের (দৃষ্টিসীমার ভেতর) তোমাদের (ইপ্সীত) ভালোবাসার সেই জিনিস (তথা-আসন্ন বিজয়) দেখিয়ে দিলেন, তারপরও তোমরা তার কথা অমান্য করে (তার বলে দেয়া স্থান থেকে) চলে গেলে,[২০৬] তোমাদের কিছু লোক (তখন) বৈষয়িক ফায়দা হাসিলে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আবার এদৎসত্বেও তোমাদের কিছু মানুষ পরকালের কল্যাণই চাইতে থাকলো।[২০৭] এই অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (মোকাবেলা) থেকে শত্রুদের পশ্চাৎমুখী করে দিলেন, মূলত (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছ থেকে (ঈমানের দৃঢ়তার) পরীক্ষা নিতে চাইলেন।[২০৮] (এসব আচরণ সত্ত্বেও) আল্লাহ তাআলা তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন।[২০৯] আর আল্লাহ হামেশাই ঈমানদারদের ওপর অনুগ্রহ করেন।[২১০]

১৫৩. (আরো স্মরণ করো, এই ওহুদের মাঠে সম্মুখ বিপর্যয় দেখে) তোমরা যখন (যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পাহাড়ের) ওপরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিলে এবং কোনো লোকের প্রতি তাকিয়েও তোমরা দেখছিলে না, অথচ আল্লাহর রসূল তোমাদের (তখনও) পেছন থেকে ডাকছিলো[২১১] (কিন্তু তোমরা কর্ণপাত করলে না) তাই আল্লাহ তোমাদের (কাপুরুষোচিত আচরণের জন্যে দুঃখের পর দুঃখ দিলেন, যেন তোমাদের কাছ থেকে যা হারিয়ে গেছে এবং যা কিছু বিপদ তোমাদের ওপর পতিত হয়েছে এর কোনোটার ব্যাপারেই তোমরা উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত না হও[২১২] (এবং ভবিষ্যতের জন্যে এ থেকে বড়ো ধরণের একটা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে)। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সব ধরনের কর্মকান্ড সম্পর্কেই ওয়াকিফহাল রয়েছেন।[২১৩]

---

২০২. অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের বিজয়-সাফল্যের প্রভাব বিস্তার করেছি, মর্যাদা দান করে তাদেরকে গ্রহণ করে নিয়েছি। আর আখেরাতে যে উত্তম প্রতিদান পাবে, সে সম্পর্কে তো জিজ্ঞাসা না করাই ভালো। দেখ, যারা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে নিজেদের কাজ কার বার ঠিক রাখে এবং নেক কাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে এমনই ভালোবাসেন, এমনই তাদের ফল দেন।

২০৪. অর্থাৎ ওহোদ যুদ্ধে মুসমানদের মন ভেঙ্গে পড়লে কাফের মোনাফেকরা মওকা পায়। অনেকে দোষারোপ করে, বিদ্রুপ করে। অনেকে শুভ কামনার অন্তরালে এটা বুঝাতে থাকে যে, এবার পারলেনা, পরবর্তী যুদ্ধে বীরত্ব দেখাবে। আল্লাহ তায়ালা সর্তক করে দিয়ে বলেন যে, দুশমনের ফেরেবে পড়বেনা। খোদা না-করুন, পুনরায় তাদের প্রতারণায় পড়লে আল্লাহ যে, অন্ধকার থেকে বের করেছিলেন, আবার তাতেই গিয়ে পড়বে। এর পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমে আল্লাহ ওয়ালাদের পথে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। এখানে দুষ্ট লোকদের কথা মতো চলতে নিষেধ করা হচ্ছে, যাতে মুসলমানরা সতর্ক থেকে নিজেদের ক্ষতি বুঝতে পারে।

২০৫. সুতরাং তাঁর কথা মেনে চলা এবং তাঁর সাহায্যের ওপর নির্ভর করা উচিৎ। আল্লাহ যার সাহায্যে রয়েছেন, আল্লাহর দুশমনদের সাহায্যের অপেক্ষায় থাকা বা তাদের সম্মুখে মাথা নত করার কি প্রয়োজন রয়েছে তার। হাদীস শরীফে আছে ওহোদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে আবু সুফিয়ান হোবল দেবতার জয় ঘোষণা করে বলে আমাদের যে আছে ওয্যা, তোমাদের তো নাই। রাসূল বললেন, তোমরা এর জবাব দাওঃ আমাদের তো আছেন মাওলা, তোমাদের তো নেই।

২০৬. অর্থাৎ এতো ছিলো তোমাদের পরীক্ষা। এখন আমরা কাফেরদের অন্তরে এমন ভীতি সৃষ্টি করবো যে তোমাদের আহত হওয়ার ফলে দুর্বল এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া স্বত্ত্বেও তারা তোমাদের ওপর পাল্টা আক্রমণের সাহস করতে পারবেনা। আসলে হয়েছেও তাই। আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে ময়দান থেকে ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে যায়। রাস্তায় একবার তার চিন্তাও হয়েছিলো যে, ক্লান্ত-শ্রান্ত-বিপর্যস্ত বাহিনীকে আমরা এভাবে মুক্ত ছেড়ে আসলাম। চলো আর একবার ফিরে গিয়ে তাদের কাজ সাঙ্গ করে আসি। কিন্তু সত্যের প্রভাব আর ইসলামের দীপ্তির ফলে এ চিন্তা বাস্তবে রূপদানের তার সাহস হয়নি। পক্ষান্তরে মুসলিম মোজাহিদরা 'হামরা উল আসাদ' পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া করে। অতঃপর ওহোদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির সুযোগ দেয়া হয়নি আর কখনো। মোশরেকদেরকে যত সবল মনে হোক তারা যত শক্তিই প্রদর্শন করুক, তাদের মন দুর্বলই থাকে। কারণ, তারা দুর্বল 'মখলূকের' এবাদাত করে। সুতরাং যেমন তাদের মা'বুদ, তেমন আবেদ-যে চায় এবং যাকে চায়-উভয়ই তো দুর্বল (আল হজ্ব ঃ ৭৩) আর সত্যিকার শক্তি আসে আল্লাহর সাহায্য-সহায়তায়। মোশরেকরা তা থেকে নিশ্চিতই বঞ্চিত। একারণে মুসলমান যতক্ষণ মুসলমান থাকবে, ততক্ষণ কাফেররা তাদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। বরং আমরা তো আজও প্রত্যক্ষ করছি যে, মুসলমানরা শতধা বিভক্ত বিচ্ছিন্ন, দুর্বল-হীনবল আর পতম্মোখ হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার সমস্ত কাফেরী শক্তি এ সুপ্ত-আহত সিংহের ভয়ে অস্থির। এ জাতি যাতে পুনরায় জেগে উঠতে না পারে, তাদের সব সময় এ চিন্তা-বুদ্ধি বৃত্তিক এবং ধর্মীয় বিতর্কের ক্ষেত্রেও ইসলামের এ প্রভাব ও ভীতি

লক্ষণীয়। হাদীস শরীফে রাসূল (সঃ) বলেছেন, এক মাসের দূরত্বের পথ থেকে দুশমনদের অন্তরে আমার ভয় সঞ্চারিত হয়। সন্দেহ নেই, মুসলিম উম্মাহ সর্বত্র এর প্রভাবই লাভ করেছে। এজন্য আল্লাহর শুকরিয়া।

২০৭. নবী করীম (সঃ) আগেই বলেছিলেন যে, তোমারা ধৈর্য-সহকার কাজ করলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। তদনুয়ায়ী আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের শুরুতে তাঁর ওয়াদা সত্য প্রমাণ করেছিলেন। তারা আল্লাহর হুকুমে কাফেরদেরকে হত্যা করে লাশের স্তুপ করে রেখেছিলেন। সাতজন বা নয় জন, যাদের হাতে একের পর এক করে মোশরেকদের পতাকা ছিলো, সকলেই ধরাশায়ী হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত তারা উর্ধশ্বাসে ছুটে পালায়। মুসমানরা দেখলো, আমাদের বিজয় নিশ্চিত। গনীমতের মাল তাদের সামনে পড়েছিলো। হঠাৎ তীরন্দাজদের ভুলের সুযোগে গ্রহণ করে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ। চোখের পলকে যুদ্ধের চেহারা বদলে যায়।

২০৮. অর্থাৎ পয়গম্বর (আঃ) তীরন্দাজ বাহিনীকে নির্দেশ তারা তা অমান্য করেছে। তারা নিজেরা বিবাদে লিপ্ত হয়। কেউ বলে, আমাদেরকে এখানেই স্থির থাকতে হবে। অধিকাংশ বলে, এখন আর এখানে দাঁড়ায়ে থাকার দরকার নেই, ছুটে গিয়ে মালে গনীমত হাসিল করতে হবে। শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ তীরন্দাজই স্থান ছেড়ে চলে যায়। মোশরেকরা সেই পথেই অতর্কিতে হামলা চালায়। অপর দিকে রসূলের নিহত হওয়ার অপর খবর ছড়ায়ে পড়ে। এইসব কিছু মনে দুর্বলতা সৃষ্টি করে। এর ফল দেখা দেয় ভীরুতা-কাপুরুষতার আকারে। বলা যায়, ভীরুতার কারণ ছিলো বিবাদ। আর বিবাদের কারণ ছিলো নাফরমানী।

২০৯. অর্থাৎ কিছু লোক পার্থিব সম্পাদ তথা গনীমতের মালের খুশীতে স্খলিত হয়ে পড়ে। যার মারাত্মক ফল ভোগ করতে হয়েছে সকলকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়ার লোভীও আছে, এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার আগে আমি তা বুঝতে পারিনি।

২১০. অর্থাৎ তারা তোমাদের সামনে থেকে পলায়ন করছিলো। আর এখন তোমরা তাদের সামনে থেকে পলায়ন করছো। তোমাদের ভুল এবং দুর্বলতার ফলে ব্যাপারটি উল্টা হয়ে দাঁড়ায়াছে। আর এতেও ছিলো তোমাদের পরীক্ষা-যাতে পাকা-কাঁচা স্পষ্ট হয়ে যায়।

২১১. অর্থাৎ যে ভুল হয়েছিল, আল্লাহ তায়ালা তা ক্ষমা করেছেন। এখন এজন্য তাদেরকে গালমন্দ দেওয়া কারো জন্য জায়েয নেই।

২১২. কারণ, তিনি তাদের দুর্বলতা ক্ষমা করে দেন আর শাষানীতেও দয়া অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

২২৩. অর্থাৎ তোমরা পালিয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে চলে যাচ্ছিলে আর আতংকে পেছনে ফিরেও দেখছিলে না। আল্লাহ্‌র নবী তখনো যথারীতি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে তোমাদেরকে কাজ থেকে বারণ করছিলেন। নিজের দিকে ডাক ছিলেন। কিন্তু ভয় ত্রাস আর অস্থিরতায় তোমরা তাঁর আওয়াজ শুনার মতো অবস্থায় ছিলেনা'। অবশেষে হযরত কাআব ইবনে মালেক চিৎকার করলে, তখন সকলে শুনতে পায়। এবং ফিরে এসে নবীর চার পাশে জড়ো হয়।

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ

بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ

قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ

الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ

قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ مَّا

لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ

مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ

عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٥٤﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ

يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ

مَا كَسَبُوا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

১৫৪. এই (মহা বিপর্যয়ের) পর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের একদল লোকের ওপর এমন সান্তোষজনক পরিস্থিতি দিয়ে দিলেন যে, তারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো[২১৪] আর আরেক দল! যাদের কাছে নিজেদের জীবনটাই ছিলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ,[২১৫] তারা তাদের জহেলী (যুগের) ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ সম্পর্কে অন্যায় ও অসত্য কথাবার্তা বলতে থাকে,[২১৬] (এক পর্যায়ে) তারা এও বলতে শুরু করে যে, এ (সমগ্র যুদ্ধ পরিচালনার) কাজে কি আমাদের কোনো ভূমিকা নেই,[২১৭] (হে নবী!) তুমি (তাদের) বলো যে, (এ ব্যাপারে আমার নিজেরও কিছু করণীয় নেই ক্ষমতা ও) কৃর্তৃত্বের সবটুকু (চাবিকাঠি) আল্লাহর হাতেই।[২১৮] (এই শেষোক্ত দলের) লোকেরা তাদের মনের ভেতর (এ ব্যাপারে) যে সব কথাবার্তা গোপন করে রেখেছে তা তোমার সামনে (খোলাখুলি) প্রকাশ করে না। (বিপর্যয় দেখে তারা এমন কথাও বলে যে) যদি (যুদ্ধ পরিকল্পনা ও পরিচালনার) এই কাজে আমাদের কোনো ভূমিকা থাকতো, তাহলে আজ আমাদের এখানে এভাবে মরতে হতো না।[২১৯] তুমি তাদের বলে দাও, (তোমাদের এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়।) যদি আজ তোমরা সবাই ঘরের (ভেতরেও) বসে থাকতে তবু (এই মরণের জন্যে) তারা নিজ নিজ মরণ স্থানের দিকেই আজ বেরিয়ে আসতো, যাদের জন্যে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) এই মৃত্যু অবধারিত হয়েছিলো।[২২০] আর এভাবেই তোমাদের মনের (ভেতর লুকিয়ে রাখা) বিষয়সমূহের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করবেন এবং এই (সমগ্র ঘটনার মাঝ) দিয়ে তিনি তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তাও পরিশুদ্ধ করে দেন, তোমাদের মনের (গভীরে যা কিছু লুকিয়ে আছে সে) সব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সম্যক ওয়াকিবহাল রয়েছেন।[২২১]

১৫৫. যেদিন দুটি বাহিনী সম্মুখ সমরে একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিলো, সেদিন যারা (এই যুদ্ধের ময়দান থেকে) পালিয়ে গেছে তাদের অর্জিত এই (দুর্বল) কর্মের কারণ (একটাই) ছিলো যে, শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়ে দিয়েছে। অতপর (তারা যখন অনুতপ্ত হলো) আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা করে দিলেন, আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম ধৈর্যশীল।[২২২]

---

২১৪. অর্থাৎ তোমরা রাসূলকে কষ্ট দিয়েছিলে, তার ফলে তোমাদের উপর সংকীর্ণতা এসেছে। দুঃখের বিনিময়ে দুঃখ এসেছে, যাতে মনে রাখতে পার যে, সবসময় রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হবে। উপকারী কোন জিনিষ (যেমন গনীমত)হাতছাড়া হয়ে যাক বা কোন বিপদই সামনে আসুকনা কেন।

অধিকাংশ মুফাস্‌সির-এর তাফসীরে বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে দুঃখের ওপর দুঃখ দিয়েছেন অর্থাৎ একটা দুঃখ ছিলো প্রাথমিক বিজয় হাতছাড়া হওয়ার আর অপর দুঃখ ছিলো নিজেদের লোকজনের নিহত আহত হওয়ার এবং নবী করীম (সঃ) এর

শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়ার। কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেনঃ সাফল্যও বিজয় হাত ছাড়া হওয়া এবং গনীমতের মাল হারানো এবং জান-মালের ক্ষয় ক্ষতির ফলে যে দুঃখ হয়েছে-তা। তার বিনিময়ে এমন একটা বড় দুঃখ এসেছে, যা আগের সব দুঃখ ভুলায়ে দিয়েছে অর্থাৎ নবী করীম (সঃ) এর নিহত হওয়ার গুজব। এ দুঃখের তীব্রতায় আদৌ তাদের কোন হুঁশ ছিলনা। এমন কি রসূলের আওয়ায পর্যন্ত তারা শুনতে পায়নি। যেমন এক দিকে মনে প্রাণে নিদিষ্ট হওয়ার সময় অন্য দিকে অমনযোগী দেখা দেয়।

২১৫. অর্থাৎ তোমাদের অবস্থা এবং নিয়ত সম্পর্কে জানেন এবং তদনুযায়ী কাজ করেন।

২১৬. অর্থাৎ সে যুদ্ধে যাদের শহীদ হওয়ার ছিলো, তারা হয়েছে। আর যাদের হটে যাওয়ার ছিলো,তারা হটে গেছে। আর যুদ্ধের ময়দানে টিকে ছিলো, তাদের মধ্যে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের ওপর আল্লাহ তায়ালা তন্দ্রাভাব আরোপ করেছেন। তারা দাঁড়িয়েও পড়লে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় হযরত তালহা (রাঃ) এর হাত থেকে কয়েকবার তরবারী পড়ে যায়। এটা ছিলো সে আভ্যন্তরীণ শান্তি-নিরাপত্তার একটা বাহ্যিক ক্রিয়া, যা কেবল আল্লাহর রহমতে একটা তুমুল তুলকালাম কান্ডের মুহূর্তেও আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের মনে সৃষ্টি করেছিলেন। অতঃপর দুশমনের ভয়-ভীতি সবই উড়ে যায়। এ বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয় ঠিক সে মুহূর্তে, যখন মোজাহিদ বাহিনীতে কোন শৃংখলা ছিলনা। গন্ডায় গন্ডায় লাশ রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলো। যোদ্ধারা আঘাতে ছটফট করছিলো । রসূলের নিহত হওয়ার সংবাদ অবশিষ্ট সম্বিতও বিলীন করে দিয়েছিলো। এ ঘুমানো যেন জাগ্রত হওয়ার পয়গাম ছিলো। তন্দ্রাভাবে আচ্ছন্ন করে তাদের সমস্ত অপসাদ দুর করে দেয়া হয়েছিলো। জানায়ে দেয়া হয়েছিলো যে, ভয়ভীতি আর অস্থিরতার সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন নিরাপদ নিশ্চিত হয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন কর। সাহাবায়ে কেরাম তৎক্ষণাত রসূলের চার পার্শে সমবেত হয়ে যুদ্ধের ব্যূহ রচনা করেন। একটু পরই পরিবেশ সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে উঠে এবং শত্রুদেরকে সম্মুখ থেকে পলায়ন করতে দেখা যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, ঠিক যুদ্ধের সময় তন্দ্রাভাব সৃষ্টি হওয়া আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয়েরই লক্ষণ। সিফফীন যুদ্ধে হযরত আলীর (রাঃ) বাহিনীর ও এ অবস্থা হয়েছিল।

২১৭. এরা হচ্ছে ভীরু-বুযদিল মোনাফেক। এদের ইসলাম সম্পর্কে কোন মাথাব্যথা ছিলোনা, চিন্তা ছিলোনা নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে। এদের কেবল চিন্তা ছিলো নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার। তারা ভাবতো, আবু সুফিয়ানের বাহিনী পুনরায় হামলা করে বসলে আমাদের কি দশা হবে। এ ভয় ও চিন্তায় তাদের নিদ্রা তন্দ্রা কোথায়।

২১৮. অর্থাৎ কোথায় গিয়েছে আল্লাহর সে ওয়াদা? মনে হয়, ইসলামের কাজ এখানেই শেষ হয়ে গেছে। পয়গম্বর আর মুসলমানরা এখন আর নিজেদের গৃহে ফিরে যেতে পারবেনা। সব এখানেই শেষ হয়ে যাবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে 'বরং তোমরা

ধারনা করে বসেছিলে যে, রাসূল (সঃ) এবং মোমেনরা আর কখনো স্বজনদের কাছে ফিরে যাবেনা' (সূরা আল ফাত্‌হ্ ঃ ১২)

২২৯. অর্থাৎ আমাদের যা কিছু কাজ হয় বা একেবারে কিছুই না হয়, অথবা, মোহম্মিদ (সঃ) এর সঙ্গী-সাথীদের হাতে কিছু বিজয় অর্জিত হয়। অথবা এ অর্থ যে, আল্লাহ যা খুশী, তাই করেছেন। আমাদের বা অন্য কারো এতে কি হাত রয়েছে? এতো শব্দের বাহ্যিক অর্থ মাত্র। মনের যে ইচ্ছা ছিলো সে সম্পর্কে পরে বলা হচ্ছে।

২২০. অর্থাৎ মোনাফেকদের এ কথা সত্য কথা বলে তার কদর্থ করা। তোমাদের হাতে যে কিছুই নেই, এটা নিঃসন্দেহে সত্য। সব কাজ আল্লাহরই হাতে। তিনি যা ইচ্ছা, তাই করেন বা বানচাল করেন। যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করেন বা পরাজিত করেন। বিপদ দেন, বা শাস্তি। তিনি একই ঘটনাকে এক জাতির জন্য রহমত করেন, আর অপর জাতির জন্য করেন শাস্তি। সব কিছুই তাঁর মুঠির মধ্যে। কিন্তু এ কথা দ্বারা তোমরা মনে মনে যে অর্থ করছো, আল্লাহ্ তোমাদের মনের চোর সম্পর্কে অবগত আছেন। এ সম্পর্কে পরে বলা হবে।

২২১. তাদের মনের আসল চোর ছিলো এ যে, মুখে এক কথা বলে মনে মনে এর অর্থ করতো এই যে, 'হাঁ-শুরুতে আমাদের কথা রাখেনি। কতিপয় অনভিজ্ঞ উৎসাহী লোকের কথা অনুযায়ী যুদ্ধ করার জন্য মদীনার বাইরে চলে গেছে। অবশেষে মুখ কালো করতে হয়েছে। আমাদের এক্তেয়ারে যদি কোন কাজ থাকতো এবং আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী কোন যদি কাজ করা হতো তবে এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতোনা। আমাদের নিজেদের এত লোক আজ মারা পড়েছে। কেন এদেরকে মরতে হয়েছে? সত্যিকার মুসলমানদের থেকে দূরে সরে এ কথাগুলো তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে থাকবে। অধিকাংশ মোনাফেক বংশগত দিক থেকে মদীনার আনসারদের সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলো। একারণে তাদের নিহত হওয়াকে নিজেদের নিহত হওয়া বলেছে। অথবা তাদের কথার অর্থ এ যে, মোহাম্মদ (সঃ) এর কথা অনুযায়ী বিজয় যদি মুসলমানদেরই হবে, তবে আহত বা নিহত হওয়ার এ বিপদ আমাদের ঘাড়ে কেন পড়বে?

বাহ্যতঃ মোনাফেকেরা এ কথাগুলো বলেছিলো মদীনায়। কারণ, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যুদ্ধ শুরু হওযার পূর্বক্ষণে তার বাহিনী নিয়ে ফিরে যায়। একারণে-এর ইঙ্গিত নৈকট্যের কারণে ওহোদের দিকেই হবে। কিন্তু কোন কোন বর্ণনা দ্বারা মু'তাব ইবনে কাশীর নামে জনৈক মোনাফেক যুদ্ধের ময়দানেই এ কথাগুলো বলেছে বলে প্রমাণ হয়। এতে বুঝা যায়, কোন কোন মোনাফেক কোন কারণে আব্দুলাহ ইবনে উবাইর সঙ্গে চলে যায়নি। আল্লাহই ভালো জানেন।

২২২. অর্থাৎ এ আক্ষেপ অনুতাপ দ্বারা কিছুই লাভ হবেনা। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের মৃত্যুর যে স্থান কারণ এবং সময নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা টলবার নয়। কিছুই তার ব্যতিক্রম হতে পারেনা। তোমরা যদি গুহায় ঢুকে থাকতে, ধরে নাও তোমাদের মতটাই

যদি গ্রহণ করা হতো, তা হলেও ওহোদের কাছে যে ক্যাম্পে মৃত্যু যাদের কিসমতে লিখাছিলো, তারা কোন না কারণে সেখানে যেতো, সেখানেই তাদের মৃত্যু হতো। এটাতো আল্লাহর দান যে, যেখানে মারা যাওয়া ভাগ্যে লেখা ছিলো, সেখানেই মারা গেছে। কিন্তু তারা স্বেচ্ছায় -স্বানান্দে আল্লাহর পথে বাহাদূরের মতো প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছে। সুতরাং এজন্য আক্ষেপ অনুতাপ করার কি আছে? যারা মর্দে মুমেন, তাদেরকে নিজেদের ওপর অনুমান করবেনা।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا

وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا

غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ۚ لِيَجْعَلَ

اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ

مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ

لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى

اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ إِنْ يَنْصُرْكُمُ

اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللّٰهِ وَمَأْوٰهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾ هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾

রুকু ১৭

১৫৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা অবিশ্বাসী কাফেরদের মতো হয়ো না,[২২৩] (তাদের মতো করে কথা বলো না) এই কাফেরদের কোনো ভাই (বন্ধু) যখন বিদেশ (বিভুঁইয়ে) মারা যেতো কিংবা কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হতো, তখন এরা তাদের বলতো[২২৪] এরা যদি (বাইরে না গিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে) আমাদের কাছেই থাকতো, তাহলে এরা কিছুতেই মরতোনা এবং এরা অন্যের হাতে নিহতও হতোনা, এভাবেই এদের এই (মানসিকতাকে) আল্লাহ তায়ালা তাদের মনের আক্ষেপে পরিণত করে দেন[২২৫] (এদের জেনে রাখা উচিৎ যে,) আল্লাহই মানুষের জীবন দেন আল্লাহই মানুষের মৃত্যু ঘটান[২২৬] এবং তোমরা (নিত্য এই দুনিয়ায়) যা করে যাচ্ছো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখেন।[২২৭]

১৫৭. তোমরা যদি আল্লাহর পথে (সংগ্রাম করতে করতে) নিহত হও অথবা (আল্লাহর পথে থেকেই) তোমরা মৃত্যুবরণ করো,[২২৮] তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে (যে) রহমত ও ক্ষমার (নেয়ামত তোমরা লাভ করবে, তা হবে (কাফেরদের) সঞ্চিত অর্থ সামগ্রীর চাইতে অধিক পরিমাণে উত্তম। ১৫৮. (হায়াত-মওতের

ব্যাপারে তোমাদের এতো বিচলিত হবার কিছু নাই। আল্লাহর পথে) যদি তোমরা জীবন বিলিয়ে দাও, অথবা (তারই পথে) তোমাদের মৃত্যু হয়, তাহলে তোমাদের (তো কিছুই করার নেই)। কারণ তোমাদের তো একদিন আল্লাহ তায়ালার সমীপে (এমনিই) একত্রিত করা হবে।২২৯

১৫৯. এটা আল্লাহর এক অসীম দয়া যে, তুমি এদের সাথে ছিলে কোমল প্রকৃতির (লোক এর বিপরীত) যদি তুমি নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয়ের মানুষ হতে, তাহলে এসব লোকেরা তোমার আশপাশ থেকে সরে যেতো। তাই তুমি এদের অপরাধ সমূহ মাফ করে দাও। এদের জন্যে আল্লাহর কাছেও ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজকর্মের ব্যাপারে এদের সাথে পরামর্শ করো। অতপর যখন (সেই পরামর্শের ভিত্তিতে) কোনো কাজের সংকল্প নিয়ে নাও তখন (তার বাস্তবায়নে এগিয়ে যাও এবং সফলতার ব্যাপারে) আল্লাহর ওপর ভরসা করো আর আল্লাহ তায়ালা (হামেশাই তাঁর ওপর একনিষ্ঠ) নির্ভরশীল এই মানুষদের ভালোবাসেন।২৩০

১৬০. যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে (জেনে রাখবে পৃথিবীর) অন্য কোনো শক্তিই তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন তাহলে (তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে,) এখানে এমন কোন্ শক্তি আছে যে, অতপর তোমাদের কোনোরকম সাহায্য করতে পারে। কাজেই আল্লাহর ওপর যারা ঈমান আনে তাদের (উচিত) সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর (সাহায্যের ওপরই) ভরসা করা।২৩১

১৬১. (কোনো) নবীর পক্ষেই কোনো বস্তুর খেয়ানত করা সম্ভব নয়। (তবে হাঁ, সাধারণ মানুষের মধ্যে) যদি কেউ কিছু খেয়ানত করে তাহলে কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তিকে তার (খেয়ানতের) সে বস্তুসহ (আল্লাহর দরবারে) হাযির হতে হবে। অতপর (সে মোতাবেক) প্রত্যেকটি মানব সন্তানকেই তার অর্জিত (ভালো মন্দের) পাওনা সঠিকভাবে আদায় করে দেয়া হবে। (পুরস্কার ও শাস্তি দেয়ার এই বিধান প্রয়োগের সময় সেদিন) তাদের কারো ওপর বিন্দুমাত্র অবিচারও করা হবে না।২৩২

১৬২. যে ব্যক্তি (সদা সর্বদা) আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করে, তার সাথে কিভাবে সে ব্যক্তির তুলনা করা যাবে-যে আল্লাহর বিরোধী পথে চলে তার শুধু ক্রোধই অর্জন করেছে? (যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও তাঁর ক্রোধ অর্জন করেছে) জাহান্নামের আগুন হবে তার একমাত্র বাসস্থান, আর তা হবে একটি নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!২৩৩ ১৬৩. এই (নেক ও বদ) লোকেরা হবে আল্লাহর কাছে বিভিন্ন (মর্যদা ও) স্তরে (বিভক্ত) আল্লাহ তায়ালা এদের সব ধরনের কার্যকলাপের ওপরই সজাগ দৃষ্টি রাখেন।২৩৪

২২৩. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তো মনের গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত আছেন। কারো কোন অবস্থাই তাঁর কাছে গোপন নয়। তোমাদের সকলকে একটা পরীক্ষায় ফেলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, যাতে তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে, তা প্রকাশ পায়। পরীক্ষায় খাঁটি আর মেকী পৃথক হয়ে যায়। নিষ্ঠাবানরা সফলতার বিনিময় পাবে। ভবিষ্যতের জন্য তাদের অন্তর প্ররোচনা আর দুর্বলতা থেকে মুক্ত হবে। মোনাফেকদের ভেতরের কপটতা প্রকাশ পাবে। মানুষ স্পষ্টভাবে তাদের মনের শঠতা সম্পর্কে জানতে পারবে।

২২৪. মুখলেস অর্থাৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের দ্বারা কখনো কখনো কিছু ছোটখাট গুনাহ হয়ে যায়। যেমনি ভাবে এক এবাদাত দ্বারা অন্য এবাদাতের তাওফীক বৃদ্ধি পায়, তেমনি এক গুনাহর ভ্রান্তিতে অন্য ভুল ভ্রান্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করার মওকা পায় শয়তান। ওহোদ যুদ্ধেও যেসব নিষ্ঠাবান মুসলমান সরে পড়েছিলেন, অতীতের কোন গুনাহের কারণে শয়তান প্ররোচিত করে তাদের পা নড়বড়ে করে তোলে। তাই একটা গুনাহ তো ছিলো এ যে, এক বিপুল সংখ্যক তীরন্দাজ নবী করীম (সঃ)-এর হুকুম মেনে চলেনি। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ দেখ, তিনি এর শাস্তি স্বরূপ তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এজন্য তিরস্কার ভৎসনা করার অধিকার কারো নেই।

২২৫. তোমরা সেসব কাফের মোনাফেকদের মতো এমন বাতেল চিন্তা কখনো মনে স্থান দেবেনা যে, আমরা ঘরে বসে থাকলে মৃত্যু আসতো না, আমরা মারা পড়তামনা।

২২৬. যেহেতু মোনাফেকরা ওপরে ওপরে মুসলমানদের রূপ ধারন করেছিলো, অথবা একারণে যে, বংশগত দিক থেকে তারা এবং মদীনার আনসাররা ভ্রাতৃ গোত্রভূক্ত ছিলো, আর যেহেতু এ কথা বলতো সহানুভূতির ভঙ্গিতে, তাই 'ইখওয়ান' বা ভাই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

২২৭. অর্থাৎ শুধু বাইরে গিয়ে মারা পড়েছে, আমাদের কাছে নিজেদের ঘরে বসে থাকলে মরতোনা। মারা পড়তোনা, এ কথা বলেছে এ উদ্দেশ্য, যাতে শ্রোতা মুসলমানদের মনে আক্ষেপ, অনুতাপ সৃষ্টি হয় যে, তারা যেন মনে করে সত্যিই না বুঝে-শুনে বের হওয়া এবং যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ায় এ পরিণতি হয়েছে। ঘরে থাকলে এ বিপদ দেখতে হতোনা। কিন্তু মুসলমানরা এ সব কথায় বিভ্রান্ত হওয়ার মতো নয়। এ সব কথা দ্বারা উল্টা মোনাফেকদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন এ যে, মোনাফেকদের মনে মুখে এ কথাগুলো এজন্য জারী করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে সর্বদা আক্ষেপ-অনুতাপের আগুনে জ্বলতে ছেড়ে দেবেন। তাদের অপর আক্ষেপ থাকবে এ যে, মুসলমানরা তো আমাদের মতো হয়নি। আমাদের কথায় কেউই কর্ণপাত করেননি।

২২৮. অর্থাৎ জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে। এটা তাঁর কাজ। অনেকে সারা জীবন সফর করে, যুদ্ধে গমন করে, কিন্তু মৃত্যু হয় গৃহের শয্যায়। আবার অনেকেই ঘরের কোণে পড়ে থাকতে অভ্যস্ত। কিন্তু শেষ কালে আল্লাহ কিছু কারণ সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা

বাইরে যায় আর সেখানেই মৃত্যু হয় বা মারা পড়ে। কারো চেষ্টা তদবীরে এতে কোন পরিবর্তন হওয়ার নয়। হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ মৃত্যুর সময় বলেছিলেন, আমার শরীরে চার আঙুল পরিমাণ স্থান এমন নাই, যেখানে তরবারী বা বর্শার আঘাত লাগেনি কিন্তু আজ আমি একটা উটের মতো (গৃহে) মৃত্যু বরণ করছি।

'এ দেখে ভীরু কাপুরুষদের যেন চোখ খুলে যায়।'

২২৯. অর্থাৎ তিনি দেখেন যে, মোনাফেক কাফেররা কোন্ পথে যাচ্ছে আর মুসলমানরা কতটুকু তাদের সাদৃশ্য ও অনুকরন থেকে দূরে থাকছে, তিনি সকলকে তার অবস্থা অনুযায়ী উপযুক্ত বিনিময় দেবেন।

২৬০. অর্থাৎ তাঁর পথে।

২৬১. অর্থাৎ ধরে নাও, তোমরা সফরে বা জেহাদে বের হলে আর তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলে। কিন্তু কোন না কোন সময় মরতে বা মারা পড়তেই হবে এটা অবধারিত। অবশেষে সকলকে আল্লাহর সম্মুখে হাযির হতে হবে। সমবেত হতে হবে তাঁর সম্মুখে। তখন জানতে পারবে যে, ভাগ্যবান ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নেক কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেছে বা মারা পড়েছে। তারা আল্লাহ তায়ালার দান- অনুগ্রহের কত বড় অংশ লাভ করেছে। যার সামনে তোমাদের দুনিয়ার অর্জিত বা সঞ্চিত অর্থ সম্পদ সবই তুচ্ছ। সারকথা, মোনাফেকদের কথা মেনে নিলেও যে, ঘর থেকে বের না হলে মারা যেতোনা তাও ছিলো আগা গোড়া একটা ক্ষতি। কারণ, সে অবস্থায় ওই মৃত্যু হতে বঞ্চিত থাকতে, যার জন্য এমন লক্ষ লক্ষ জীবন উৎসর্গ করা যায়। বরং বাস্তবে যা মৃত্যু নয় চিরন্তন জীবন। 'আল্লাহর পথে নিজেকে বিলীন করার মধ্যে বেঁচে থাকার রহস্য নিহিত রয়েছে।' বেঁচে থাকতে চাইলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

২৬২. মুসলমানদেরকে তাদের ত্রুটির জন্য সর্তক করার এবং ক্ষমার ঘোষণা শুনবার পর নছিহত করা হয়েছিলো যে, ভবিষ্যতে এ মোনাফেক দলের কথায় বিভ্রান্ত হবেনা। এ আয়াতে তাদের ক্ষমা মার্জনার বিষয়টি পরিপুর্ণ করা হয়েছে। যেহেতু ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের দ্বারা মারাত্মক ভুল এবং বিরাট বিচ্যুতি ঘটেছিলে। সম্ভবতঃ রাসূল মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং চেয়েছিলেন যে, ভবিষ্যতে এদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবেন না। একারণে আল্লাহ তাআলা এক অভিনব ভঙ্গিতে তাদের জন্য সুপারিশ করেছেন। প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। কারণ, আল্লাহ তায়ালা জানেন, তাঁর ক্রোধ-দুঃখ সবই ছিল একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্য। অতঃপর বলেছেন! তোমার ওপর এবং তাদের ওপর আল্লাহর কত বড় রহমত যে, তিনি তোমাকে এতটা খোশ আখলাক এবং কোমল স্বভাবের করে দিয়েছেন। অন্য কেউ হলে এমন কঠোর ব্যাপারে কি পন্থা অবলম্বন করতো, তা আল্লাহ জানেন। এসব কিছুই আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী যে, তোমার মতো মেহেরবান কোমলপ্রাণ পয়গম্বর তারা লাভ করেছে। ধরে নিন যে, খোদা না করুন, তোমার অন্তর যদি কঠোর হতো, মোজাজ যদি হতে কঠিন, তবে এ

জাতি কি করে তোমার চারিপাশে জড়ো হতে পারতো? তারা কোন ভুল করলে তুমি কঠোরভাবে পাকড়াও করতে। এমতাবস্তায় লজ্জা আর ভয়ে তারা কখনো তোমার কাছে আসতে পারতোনা। এননি ভাবে এরা বিরাট কল্যাণ আর সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত আর ইসলামী সংগঠনের ঐক্য হতো বিনষ্ট। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কোমল প্রাণ আর কোমল আচরণের করেছেন। তুমি সংশোধনের সঙ্গে তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে চক্ষু ফিরায়ে নেন, সুতরাং তোমার অধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই ত্রুটি ও ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ তাঁর নিজের হক ক্ষমা করে দিলেও তাদের আরও মনকষ্ট ও-- প্রশান্তির খাতিরে আমার কাছেও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। যাতে এ ভগ্নপ্রাণ লোকগুলো তোমার সন্তুষ্টি প্রফুল্লতা উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও সংকোচ মুক্ত হয়ে যায়, দূর হযে য়ায় তাদের মনের সকল দুশ্চিন্তা। কেবল ক্ষমা করে দেওয়াই নয়, ভবিষ্যতে নানা ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে যথারীতি পরামর্শ গ্রহণ কর। পরামর্শের পর যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, পাকাপোক্ত সংকল্প করা হয়, তখন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর ইতস্তত না করে তা কার্যকর করো। যারা তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তাদেরকে পসন্দ করেন। তাদের কার্য সম্পাদন করে দেন।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে যে, রাসূল (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আয্‌ম্' কি? জবাবে তিনি বলেন, মতামত দেয়ার মতো যোগ্য লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে তা অনুসরণ করা (ইবনে কাসীর)। 'মাজমাউয যাওয়ায়েদ' গ্রন্থে হযরত আলীর একটা হাদীস আছে; 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিতাব ও সুন্নায় আমরা যা পাবোনা, সে সম্পর্কে কোন্ পন্থা অবলম্বন করবো? জবাবে বলা হয়ঃ আবেদ ফকীহ অর্থাৎ বুদ্ধিমান খোদা ভীরু লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করবে। বিশেষ কারো মতামত জারী করবেনা।'

২৩৩. ইতিপূর্বে রসূলকে বলা হয়েছে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে। আর এখানে বলা হচ্ছে যে, তাওয়াক্কুল অর্থাৎ ভরসাযোগ্য হতে পারেন এমন এক স্বত্তা, যিনি প্রবল, পরাক্রমশালী। তাঁর সাহায্যের ওপর সকল মুসলমানেরই ভরসা করা উচিৎ। যেন মুসলমানদের ত্রুটি বিচ্যুতি নিজে ক্ষমা করার এবং পয়গাম্বরকে দিয়ে ক্ষমা করানোর পর তাদেরকে নছিহত করা হচ্ছে যে, কারো কথা শুনবে না, কর্ণপাত করবেনা কারো প্রতি। একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করবে। তাঁর সাহায্য থাকলে কেউই তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবেনা। যেমন তোমরা বদর যুদ্ধে দেখেছ।আর তাঁর সাহায্য না হলে কেউই সাহায্য করতে পারেন,া,যেমন ওহোদ যুদ্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

২৩৪. রসূল এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের চিত্তকে সম্পূর্ণ রূপে শান্ত করা যাতে তাদের মনে এ ধারণা না জাগে যে, রসূল হয়তো প্রকাশ্যে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, কিন্তু মনে মনে অসন্তুষ্টই রয়েছেন। কোন সময়ে এ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন। অথচ তাদের জানা উচিৎ যে, মনে একটা আর মুখে অন্যটা এটা নবীর কাজ নয়। অথবা এর উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে এ কথা বুঝায়ে দেয়া যে, নবীর শ্রেষ্ঠত্ব নিস্কলতা এবং

আমানতদারী-বিশ্বস্ততা সব সময় স্মরণ রাখবে। তার সম্পর্কে কখনো কোন বাজে চিন্তা মনের কোণে স্থান দেবেনা। যেমন এ রকম চিন্তা করবেনা যে, তিনি গনীমতের মালের কিছু অংশ লুকিয়ে রাখবেন (নাউযু বিল্লাহ)। সম্ভবতঃ এ জন্যই বলা হয়েছে যে, সেসব তীরন্দাজরা গনীমতের জন্য ঘাঁটি ত্যাগ করে ছুটে যায়, রাসূল কি তাদেরকে অংশ দিতেন না? কিছু জিনিষ তিনি কি লুকিয়ে রাখতেন?

কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, বদর যুদ্ধে একটা জিনিষ চাদর বা তরবারী হারায়ে যায়। কেউ বললো, সম্ভবতঃ রসূল এটা নিজের জন্য রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়। যাই হোক, মুসলমানদেরকে বুঝানো হচ্ছে যে, রাসূল কোমল স্বভাব আর নেক আখলাকের কারণে তোমাদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করেন ঠিকই, তাই বলে তাঁর শ্রেষ্টত্ব-মহত্ব এবং মহান মর্যাদা তোমাদের ভুলে গেলে চলবেন, বরং সব সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। কোন প্রকার দুর্বল এবং বাজে চিন্তা যেন মুসলমানদের মনের ধারে কাছেও আসতে না পারে। অপর দিকে যেহেতু তার দয়া অনুগ্রহ এবং কোমল হৃদয়ের কথা স্মরণ করায়ে দিয়ে ওহোদ যুদ্ধ সম্পর্কে মুসলমানদের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করানো হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত অপর একটা ত্রুটিও স্মরন করায়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি কোমল স্বভাবের কারণে সে দিকেও কোন লক্ষ্য আরোপ করেননি। 'গোলুল'-এর মূল অর্থ গনীমতে খেয়ানত করা। কিন্তু কোন কোন সময় এটি শুধু খেয়ানত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বরং কোন কোন সময়তো শুধু একটা জিনিষ গোপন করা অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের মাছহাফগুলো গোসল করো লুকায়ে ফেল।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ

وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا

مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾ اَوَلَمَّاۤ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ

قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ

عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٦٥﴾ وَمَاۤ

أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ
تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ
نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ
مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي
قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

১৬৪. আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাঁর ঈমানদার বান্দাদের ওপর এই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের একজন ব্যক্তিকে (তাদের জন্যে) রসূল করে পাঠিয়েছেন,[২৩৫] যে তাদের কাছে আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ পড়ে শোনায় এবং (আয়াতের মর্ম অনুযায়ী) সে তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে। (সর্বোপরি) সে (নবী) তাদের আল্লাহর কিতাব ও (তাঁর গ্রন্থ লব্ধ দৈনন্দিন জীবনের) জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়। অথচ এই লোকগুলো ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলো।[২৩৬]

১৬৫. যখন তোমাদের ওপর (ওহুদ যুদ্ধের) এই বিপদ নেমে এলো। তখনও তোমরা বলতে লাগলে (পরাজয়ের) এই বিপদ কিভাবে এলো, কার দোষে) এলো?[২৩৭] অথচ (বদরের যুদ্ধে) এর চাইতে দ্বিগুণ (পরাজয়ের) বিপদ তো তোমরাই তাদের ঘটিয়েছিলে। (হে নবী), তুমি বলো, (আজকের এ পরাজয়ের জন্য অন্য কেউই দায়ী নয়) এটা তোমাদের নিজেদের (কর্ম দোষের) কারণেই এসেছে।[২৩৮] আর আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ের ওপর অসীম ক্ষমতায় ক্ষমতাবান।

১৬৬. (ওহুদের ময়দানে) সম্মুখ লড়াইয়ের এই দিনে যে (সাময়িক) বিপর্যয় তোমাদের ওপর এসেছিলো তা (অযথা আসেনি, তার সবকিছুই) হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছাতে। এই (বিপর্যয়) দিয়ে আল্লাহ তাআলা (ভালো করে) জেনে নিতে চান, কারা তার ওপর (সঠিক অর্থে) ঈমান এনেছে।

১৬৭. (এর মাধ্যমে) তাদের পরিচয়ও তিনি (ভালোভাবে) জেনে নেবেন, যারা (চরম পরীক্ষার এই মুহূর্তে) মুনাফেকী আচরণ করেছে।[২৩৯] এই মুনাফেকদেরই

যখন (নবীর পক্ষ থেকে) বলা হয়েছিলো যে, (সবাই এক সাথে) আল্লাহর পথে লড়াই করো অথবা (নিদেন পক্ষে নিজেদের শহরের) প্রতিরক্ষাটুকু করো,[২৪০] তখন তারা বললো (সত্যিই) যদি আমরা জানতাম যে, (আজ সত্যিই) যুদ্ধ হবে, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম।[২৪১] (এই মুনাফেকরা যখন এই অবান্তর কথাটা বলছিলো) তখন (কিন্তু) তারা ঈমানের অপেক্ষা কুফরীরই বেশী বেশী কাছাকাছি অবস্থান করছিল।[২৪২] (এই লোকদের চরিত্রই হচ্ছে) এরা মুখে এমন সব কথা বলে-যা তাদের অন্তরে নেই। আর এরা যা কিছু গোপন করে আল্লাহ তাআলা তা সম্যক অবগত আছেন।[২৪৩]

---

২৩৫. অর্থাৎ পয়গম্বর সর্বাস্থায় আল্লাহর মর্জীর অনুগত থাকেন এবং অন্যদেরকেও তাঁর মর্জীর অনুযায়ী পরিচালিত করতে চান। তার কি এমন কাজ হতে পারে, যা অন্যদের আল্লাহর গযবের নীচে এবং জাহান্নামের ভাগী করে? না, কখনো না।

২৩৬. অর্থাৎ নবী এবং অন্য লোকেরা সকলে সমান নয়। লোভ -লালসার মতো হীন তুচ্ছ নীচ ঘৃণ্য কাজ নবীর দ্বারা হতে পারেনা। আল্লাহ তায়ালা সকলকে জানেন, কে কোন স্তরের তিনি সকলের কাজ দেখেন। এমন নীচ প্রকৃতির লোকদেরকে তিনি কি নবুওয়্যাতের দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন? নাউযু বিল্লাহ।

২৩৭. অর্থাৎ তাদেরই জাতি-গোষ্ঠির মধ্য থেকে এক জনকে রাসূল করে প্রেরণ করেছেন। যাঁর কাছে বসা, কথা বলা , তাঁর কথা বুঝা এবং সব রকম ন্যায় ও বরকত অর্জন করা সহজ। তাঁর চরিত্র, জীবনের এক একটি মুহূর্ত আমানত দিয়ানত তথা বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা, আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা এবং চরিত্রের নিষ্কলংক সম্পর্কে তারা ভালো করেই জানে। আপন জাতি-গোত্রের লোক দ্বারা মোজেযা প্রকাশ পেতে দেখে বিশ্বাস করা অনেক সহজ হয়। মনে কর, কোন জিন বা ফেরেশতাকে রাসূল করে প্রেরণ করলে মুজেযা দেখে এ ধারণা করা সম্ভব হতো যে, যেহেতু এরা মানব জাতির ভিন্ন প্রকৃতির সৃষ্টি, তাই রীতি প্রকৃতি বিরুদ্ধ এসব অলৌকিক ঘটনা তাদের বিশেষ ধরনের আকৃতি এবং ফেরেশতা সুলভ ও জিন সুলভ প্রকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ। আমরা তা করতে সক্ষম নয় বলেই সেগুলো নবুওয়্যাতের প্রমাণ হতে পারেনা। যাই হোক, মোমেনদের উচিৎ আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার করা। কারণ, তিনি এমন রসূল প্রেরণ করেছেন, যার কাছ থেকে নির্দ্বিধায় নির্বিঘ্নে 'ফয়েয' হাসেল করতে পারে, পাবে আলো লাভ করতে। সবচেয়ে সম্মানজনক এবং সবচেয়ে বড় পদ-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়া স্বত্বেও তাদেরই সমাবেশে অতি কোমল স্বভাব আর হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মিলে মিশে কাটান। 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'- আল্লাহ তাঁর উপর দরূদ ও সালাম নাযিল করুন।

২৩৮. সূরা বাকারায়ও দু স্থানে এ বিষয়ের আয়াত ছিলো। আয়াতের সারকথা এ যে, এখানে নবীর (সঃ) এর চারটি শান বর্ননা করা হয়েছে। এক, তেলাওয়াতে আয়াত- আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শুনানো। তারা আরবী ভাষী বিধায় আয়াতের বাহ্য অর্থ বুঝতে

পারতো এবং সে অনুযায়ী আমল করতো। দুই, তাযকিয়ায়ে নাফস- নফসের কলুষ কালিমা এবং শেরক ও মাসিয়াতের গুনাহর সকল পর্যায় থেকে তাদেরকে পাক পবিত্র করা এবং অন্তরকে মাজা-ঘষা করে জাঙ্গাঁর মুক্ত করা। তিন, সান্নিধ্য সাহচর্য, আত্মিক লক্ষ্য আরোপ ও দৃষ্টি নিবদ্ধ ইত্যাদি দ্বারা আল্লাহর কিতাবের অর্থ বলে দেয়া। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে এর প্রয়োজন দেখা দিতো। যেমন একটা শব্দের সাধারণ অর্থ এবং ব্যবহারিক অর্থ নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম কোন সুবিধায় ও সমস্যায় পড়তেন, তখন রসূল কিতাবুল্লাহর প্রকৃত অর্থ, যা লক্ষণ দ্বারা সে স্থানে বর্নীত হয়- বলে দিয়ে তাদের সন্দেহ দূর করে দিতেন। চার, তা'লীমে হেকমাত তথা হেকমত শিক্ষা দান। যুক্তিপূর্ণ গভীর রহস্যময় বিষয় শিক্ষা দান। কোরআন করীমের গভীর সূক্ষ্মতত্ত্ব শিক্ষা দান, শরীয়তের গভীর ও সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা। এ অবহিত করা স্পষ্ট ভাবে হোক বা ইশারা-ইঙ্গিতে। রাসূল আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্যে সে জাতিকে জ্ঞান কর্মের উচ্চ স্থানে পৌছে দিয়ে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যারা সীমাহীন অজ্ঞতা অস্থিরতা এবং স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো। রসূলের অল্প দিনের শিক্ষা ও সাহচর্যের ফলে তারা সারা বিশ্বের শিক্ষক ও পথ প্রদর্শকে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এ মহান নেয়মতের কদর করা মূল্য দেয়া তাদের কর্তব্য। তিনি অন্তরে দুঃখ বোধ করতে পারেন, ভুলেও তাদের এমন কাজ করা উচিৎ নয়।

২৩৯. আলোচনা আগে থেকে ওহোদ যুদ্ধের কাহিনী চলে আসছিলো। যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছিল, মধ্য খানে তা ক্ষমা করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সঃ) এর আখলাক ও অধিকার স্মরণ করায়ে দেয়া হয়েছে। এখন পুনরায় ওহোদ প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করা হচ্ছে। অর্থাৎ ওহোদ যুদ্ধে যেসব কষ্ট এবং ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, তোমরা কি তাতে চিন্তিত হয়ে বল যে, কেন কোত্থেকে এ মুছীবত এসেছে আমরা তো মুসলমান মোজাহিদ ছিলাম। আল্লাহর রাস্তায় তাঁর দুশমনদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য বের হয়েছিলাম। আল্লাহ তায়ালা তো পয়গম্বরের যবানীতে সাহায্য-সহায়তার ওয়াদা করেছিলেন। অতঃপর কোথা থেকে কেমন করে আমাদের ওপর এ বিপদ নাযিল হলো! এমন কথা বলার সময় তোমাদের চিন্তা করা উচিৎ ছিলো যে, তোমাদের যে ধরনের কষ্ট হয়েছে, তোমাদের হাতে তাদের কষ্ট হয়েছে তার চেয়ে দ্বিগুণ বেশী। যুদ্ধে তোমাদের প্রায় সত্তুরজন লোক শহীদ হয়েছে। আর বদর যুদ্ধে তাদের সত্তর জন তোমাদের হাতে বধ হয়েছে। আর সত্তুর জন তোমাদের হাতে বন্দী হয়। এদের ওপর তোমাদের পূর্ণ কব্জা ছিলো। ইচ্ছা করলে তোমরা তাদেরকে বধ করতে পারতে। এ ছাড়া ওহোদ যুদ্ধেরও প্রথম দিকে তাদের আনুমানিক কুড়িজন বধ হয়েছিল। সামান্য সময়ের জন্য তোমাদের পরাজয় হয়েছে। কিন্তু বদর যুদ্ধে তো তাদেরকে মারাত্মক পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। ওহোদ যুদ্ধেও তোমরা যখন দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করছিলে, তখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ময়দান ছেড়ে যেতে হয়েছে।

এমতাবস্থায় তোমাদের নিজেদের কষ্টের অভিযোগ করে আরও দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়া তো ইনসাফ অনুযায়ী উচিৎ নয়। সে সুযোগও নেই।

২৪০. অর্থাৎ চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, তোমরা নিজেরাই ছিলে এ বিপদের কারণ। জোশে এসে পয়গম্বরের এবং অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত উপেক্ষা করেছ। নিজেদের পসন্দ এবং মতামত অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ত্যাগ করে কেন্দ্র খালি করেছিলে। এক বৎসর আগে বদর যুদ্ধে বন্দীদের সম্পর্কে তোমাদেরকে যখন এক্তেয়ার দেয়া হয়েছিলো যে, হয় তাদেরকে হত্যা কর অথবা ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দাও এ শর্তে যে, আগামীতে এ পরিমাণ লোক তোমাদের কাছ থেকে নেয়া হলে তোমরাও ফিদিয়াকেই পসন্দ করবে। এ শর্ত তোমরা মেনে নিয়েছিলে। এখন সে শর্ত পূরা করানো হলে অবাক হওয়ার এবং অস্বীকার করার কী থাকতে পারে! এটাতো তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলে। বদর যুদ্ধ বন্দীদের পূর্ণ ঘটনা সূরা আনফালে আলোচনা করা হবে।

২৪১. যাকে যখন খুশী তিনি বিজয়ী আবার যখন খুশী পরাজিত করেন। পরাজিত করা এজন্য নয় যে, তিনি তখন বিজয়ী করতে সক্ষম ছিলেন না। বরং এজন্য যে, তোমাদের অর্জন-এক্তেয়ারের পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়ে ছিলো যে, সর্বাত্নক বিজয় দান সমীচীন ছিলনা। মোট কথা, যা কিছু হয়েছে তাঁর ইচ্ছা এবং হুকুমেই হয়েছে আর তোমরাই ছিলে এর কারণ। এর নিগুড়তত্ব ছিলো এ যে, একদিকে নিষ্ঠাবান মোমেনদের ঈমান ও নিষ্ঠা আর অপর দিকে মোনাফেকদের মোনাফেকীয় মাত্রা যাতে জানা যায়, প্রকাশ পায়। খাঁটি আর মেকী এবং কাঁচা আর পাকার মধ্যে কারো যেন কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে।

২৪২. যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে মোনাফেকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তিনশত ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যখন ফিরে যাচ্ছিলো, তখন তাকে বলা হয় যে, ঠিক এ চরম মুহূর্তে কোথায় পলায়ন করছ? এসো, ইসলামের দাবীতে সত্য হলে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর। তা না করলে অন্ততঃ দুশমনের প্রতিরোধে অংশ নাও অর্থাৎ সমাবেশে শরীক থাক। যাতে দুশমনের ওপর অধিক সংখ্যার প্রভাব পড়ে। অথবা দ্বীনের খাতিরে ও সন্তানাদী রক্ষার খাতিরে হলেও দুশমনকে প্রতিরোধ কর। কারণ, দুশমন সফল হলে প্রতিশোধ গ্রহণে মোমেন মোনাফেকের মধ্যে কোন পার্থক্য করবেনা। সাধারণ মুসলমানের মতো তোমাদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। মোটকথা, তাদের রুচি অনুযায়ী নানা ভাবে বুঝানো হয়, যাতে তাদের মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

২৪৩. অর্থাৎ লড়াই হবে বলে মনে হয় না, শুধু 'লড়াই লড়াই' ভাব। সত্যি সত্যিই যুদ্ধ হবে বলে আমাদের জানা থাকলে অবশ্যই আমরা তোমাদের সঙ্গী হতাম, যুদ্ধ দেখলে এখনো শরীক হবো। অথবা এই অর্থ যে, শেয়ানে শেয়ানে মোকাবিলা হলে আমরা সঙ্গী হব। এক পক্ষে তিন হাজারের বাহিনী আর অপর পক্ষে কেবল এক হাজার নিরস্ত্র লোক এ কোন মোকাবিলা হলো? এটাতো নিছক নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া অথবা এটা

প্রকাশ করতো যে, ভাই! যুদ্ধের কলা- কৌশল ও কায়দা-কানুন সম্পর্কে আমরা অবহিত থাকলে অবশ্যই আপনার সঙ্গে থাকতাম। যেন এ বলে মনে মনে অভিযোগ করছে যে, আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলনি বরং অন্যদের মতামত অনুযায়ী কাজ করেছ। এতে বুঝা যায়, যুদ্ধের কলা কৌশল সম্পর্কে আমাদেরকে অনভিজ্ঞ ভেবেছ আর নিজেদেরকে ভেবেছ অভিজ্ঞ। অতঃপর কেন আমাদেরকে সঙ্গ নেবে! যাই হোক, মিথ্যা চল-চাতুরী করে তারা চলে যায়।

ٱلَّذِينَ قَالُوا۟

لِإِخْوَٰنِهِمْ وَقَعَدُوا۟ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا۟ ۗ قُلْ

فَٱدْرَءُوا۟ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٦٨﴾

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ

بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ

ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم

مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ

لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

---

১৬৮. এরা (হচ্ছে সেসব মুনাফেকের দল যারা নিজেরা যুদ্ধে শরীক হবার বদলে) ঘরে বসে থাকলো (শুধু তাই নয় যারা যুদ্ধে শরীক হয়ে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে) তারা তাদের (সে সব) ভাইদের সম্পর্কে বললো, সে সব লোকেরা যদি (তাদের মতো যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে বসে থাকতো এবং) তাদের কথা শুনতো, তাহলে তারা (আজ এভাবে অন্যদের হাতে) মারা পড়তো না।[২৪৪] (হে নবী!) তুমি

(এই সুযোগ সন্ধানী মুনাফিকদের) বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে নিজেদের (ঘরে বসে থেকে) এই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে চেষ্টা করতো![২৪৫] (দেখবে সেখানেও মৃত্যু এসে হাযির হবে),

১৬৯. যারা আল্লাহ পথে নিহত হয়েছে, তাদের কোনো অবস্থাতেই 'মৃত' মনে করো না তারা তো জীবিত, তাদের মালিকের পক্ষ থেকে তাদের (জীবিত লোকদের মতোই রীতিমতো) রিযিক দেয়া হচ্ছে। ১৭০. (এই মহান ত্যাগের বিনিময়ে) আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তাদের যা কিছু দান করেছেন, তাতেই তারা পরিতৃপ্ত এবং যারা এখনো (দুনিয়ায়) তাদের পেছনে রয়ে গেছে, যারা এখনো (এখানে) তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি, তাদের ব্যাপারেও এরা (ভয়ানক) খুশী, কেননা (বলা হয়েছে, আল্লাহর পথে প্রাণ দিয়ে এলে) এমন ধরনের লোকদের জন্যে এখানে কোনো ভয় নেই এবং তারা (সেই মহা বিচারের দিন) উৎকণ্ঠিতও হবে না। ১৭১. এই (ভাগ্যবান) মানুষরা আল্লাহর পক্ষ থেকে অফুরন্ত নিয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে অতিসয় উৎফুল্ল ও আনন্দিত। (কারণ তারা জানে যে) আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার বান্দাহদের পাওনাকে কখনো বিনষ্ট করেন না।[২৪৬]

২৪৪. মোনাফেকেরা মনে প্রাণে কাফের ছিলো, কিন্তু মুখে ইসলাম প্রকাশ করতো। আর এ মৌখিক ইসলামের ভিত্তিতে মুসলামানদের সঙ্গে মিলে থাকতো। সে দিন ঠিক যুদ্ধের মুহূর্তে পয়গম্বর (আঃ) এবং মুসলমানদেরকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার এবং মিথ্যা ফন্দী-ফিকির আঁটার ফলে মোনাফেকী ভালো ভাবে উন্মোচিত হয়েছে। এখন প্রকাশ্যেও ঈমানের তুলনায় কুফরীর অতি নিকটবর্তী হয়েছে। আর নিজেদের কাজ দ্বারা মুসলমানদের ক্ষতি এবং কাফেরদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে।

২৪৫. অর্থাৎ মুখে বলে কিন্তু মনে যা আছে, তা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করেনা। মনে ছিলো এ যে, মুসলমানরা লাঞ্ছিত-পরাজিত হয়েছে, ভালোই হয়েছে। আমরা খুশীতে বোগল বাজাবে।

২৪৬. অর্থাৎ স্বয়ং নিজেরা নপুংশক সেজে রয়েছে আর নিজেদের সমাজের ভাইদের অর্থাৎ মদীনার আনসারদের বলে যে, আমাদের কথা শুনে ঘরে বসে থাকলে মারা পড়তনা।

ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِلَّهِ

وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ

أَحْسَنُوا۟ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا۟ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ

النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾
فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾ إِنَّمَا
ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ
وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَا يَحْزُنْكَ
الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ
شَيْئًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۚ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ
بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾

রুকু ১৮

১৭২. (ওহুদের শোচনীয়) বিপর্যয় আসার পরও যারা (আবার সাথে সাথে) আল্লাহর এবং তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে আরো-যারা নেক কাজ করেছে এবং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলেছে,এদের সবার জন্যে রয়েছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে এক) মহা পুরুস্কার। ১৭৩. (এরাই হলো সে সব

সাহসী মানুষ) যাদের মানুষরা যখন বললো যে, তোমাদের বিরুদ্ধে (মক্কার কাফেরদের) এক বিশাল বাহিনী জমায়েত হয়েছে। অতএব তোমরা তাদের (বাহিনীকে) ভয় করো, (এই কথা শুনে এরা ভীতসন্ত্রস্থ হলো না বরং এতে) এদের ঈমান আরো(যেন) দৃঢ়তর হয়ে উঠলো। (কাফেরদের জবাবে) তারা (শুধু এটুকু) বললো যে,আল্লাহ তায়ালা(এবং তাঁর সাহায্যই আজ) আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই হলেন উত্তম রক্ষক।২৪৭

১৭৪. অতপর(সত্যি সত্যিই) এরা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে (এমন ভাবে) ফিরে এলো যে কোনো প্রকার অনিষ্টই তাদের স্পর্শ করতে পারলো না। এভাবে এরা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথই অনুসরণ করলো। বস্তুত,আল্লাহ তায়ালা মহা অনুগ্রহশীল।২৪৮

১৭৫. তোমাদের (প্ররোচনা দানকারী হচ্ছে) শয়তান, তোমাদের মাঝে তার যেসব বন্ধুবান্ধব আছে (শত্রুপক্ষের অতিরঞ্জিত শক্তির কথা বলে) তাদের সে ভয় দেখাচ্ছিল, তোমরা যারা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো, কোনো অবস্থায়ই তাদের (এই হুমকিকে) ভয় করবে না, যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে ঈমানদার হও-তাহলে ভয় করবে শুধু মাত্র আমাকে।২৪৯

১৭৬. (হে নবী, আজ) যারা দ্রুতগতিতে কুফরীর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের কর্মকান্ড যেন তোমাকে চিন্তান্বিত না করে, এদের এই (কুফরীর) আচরণ আল্লাহর বিন্দুমাত্রও কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। আল্লাহ পরকালে এদের জন্যে (পুরস্কারের) কোনো অংশই (নিদৃষ্ট করে) রাখতে চান না। তাদের জন্যে অবশ্যই রয়েছে (জাহান্নামের) কঠিন আযাব।২৫০ ১৭৭. যারা ঈমানের বদলে কুফরী খরিদ করে নিয়েছে, তারা কোনো অবস্থায়ই আল্লাহর (লেশমাত্র) ক্ষতি করতে পারবে না। এদের জন্যেই রয়েছে এক মর্মান্তিক শাস্তির বিধান।২৫১

---

২৪৭. অর্থাৎ ঘরে বসে থাকলে যদি প্রাণ বাঁচতো তবে দেখবো, কিভাবে মৃত্যুকে ঘরে আসতে না দাও। এখানে থাকলেও যদি মৃত্যু পিছু না ছাড়ে, তবে বাহাদূরদের মতো ময়দানে কেন সম্মানের মৃত্যুকে বরণ করে নেবেনা।

২৪৮. অর্থাৎ ঘরে বসে থাকলে মৃত্যুকে তো ঠেকাতে পারবেনা। অবশ্য এর ফলে মানুষ সে মৃত্যু থেকে বঞ্চিত হয়, যাকে চিরন্তন জীবন বলা উচিৎ। শহীদরা মৃত্যুর পর এক বিশেষ ধরনের জীবন লাভ করে। অন্যরা এ অনন্ত জীবন লাভ করেনা। শহীদরা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নৈকট্য লাভ করেন। অতি উচ্চস্থান ও মর্যাদায় অধীষ্ঠিত হন। তারা জান্নাত থেকে নির্বিঘ্নে রিযিক লাভ করেন। আমরা যেমন উন্নত মানের বিমানে আরোহন করে সামন্য সময়ে যেখানে খুশী উড়ে যাই, তেমনিভাবে শহীদদের রূহ সবুজ পাখীর পাখায় ভয় করে জান্নাতে সফর করে বেড়ায়। সেসব সবুজ পাখীর বিস্তারিত বিবরণ এবং বিশালতা প্রকান্ডতা সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। সেখানকার বিষয়গুলো

আমাদের ধারনা-কল্পনা আয়ত্বে আসতে পারে কি করে? তখন শহীদরা অত্যন্ত উৎফুল্ল-আনন্দিত হন এ জন্য যে, আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগ্রহে শাহাদাতের দওলত দান করেছেন, মহান নেয়ামতে ধন্য করেছেন তাদের আর পয়গম্বর (সঃ)-এর যবানী শহীদদের জন্য আল্লাহ তায়ালা যেসব ওয়াদা করেছেন, নিজেদের স্বপক্ষে তা প্রত্যক্ষ্য করে তারা অতি আনন্দিত হয়। তারা দেখতে পান যে, আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের পরিশ্রম নষ্ট করেন না, ব্যর্থ করেননা। বরং তিনি ধারনা কল্পনার চেয়ে বেশী বিনিময় দান করেন। তারা কেবল নিজেদের অবস্থার জন্য উৎফুল্ল-আনন্দিত নন, নিজেদের পেছনে 'জেহাদ কী সাবিলিল্লাহ' এবং অন্যান্য ভালো কাজে যাদেরকে রেখে এসেছে, সেসব মুসলমান ভাইদের কথা চিন্তা করে তারা এক বিশেষ আনন্দ লাভ করে। তারা ভাবে যে, এরাও যদি আমাদের মতো আল্লাহর পথে মারা যায়, বা অন্ততঃ ঈমান নিয়ে মারা যায় তবে নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী এমনি আনন্দময় ও ভয়-ভীতি মুক্ত জীবনের স্বাদ আস্বাদন করবে। ভবিষ্যত সম্পর্কে তাদের কোন ভয় নেই, অতীত সম্পর্কে নেই কোন দুঃখ-চিন্তা। নির্বিঘ্নে-নিশ্চিন্তে এরা সরাসরি আল্লাহর রহমতে প্রবেশ করবে।

কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে যে, ওহোদ বা 'বিয়'রে মউনার' শহীদরা আল্লাহর দরবারে পৌছে আকাংখ্যা করেন যে, কেউ যদি আমাদের এ আরাম আয়েশের জীবন সম্পর্কে আমাদের ভাইদেরকে অবহিত করতো, তবে তারা এ জীবনের দিকে আসতো, জেহাদ থেকে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতোনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি তারেদকে একথা পৌছে দেবো। এ উপলক্ষে আয়াতটি নাযিল হয়। তাদেরকে জানায়ে দেন যে, আমরা যদি তোমাদের আকাংখ্যা অনুযায়ী খবর পৌছায়ে দেই! এতে তারা আরও বেশী খুশী হয়।

২৪৯. ওহোদ যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পথে রাস্তায় তার মনে পড়ে যে, আমরা সত্যিই বিরাট একটা ভুল করেছি। পরাজিত আহত মুসলমানদেরকে আমরা এমনি ছেড়ে আসলাম। অতঃপর পরামর্শ চলে যে, পুনরায় মদীনা ফিরে গিয়ে তাদের সমাপ্তি টেনে আসি। হযরত (সঃ) এ সম্পর্কে জানতে পেরে ঘোষণা করো যে, কাল যারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে হাজির ছিলো, আজ তাদেরকে দুশমনের পেছনে ধাওয়া করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। মুসলমানদের জখমের ঘা ছিলো তাজা। তখনো শুকায়নি আঘাতের ক্ষত। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা আল্লাহ ও রাসূলের আহবানে বেরিয়ে পড়ে।

হযরত মোহাম্মদ (সঃ) মোজাহিদ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে আট মাইল দূরবর্তী ' হামরা উল আসাদ ' নামক স্থান পর্যন্ত পৌছেন। মুসলমানরা পেছন দিক হতে কাফেরদেরকে ধাওয়া করছে এ খবর শুনে আবু সুফিয়ান আরও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। পুনরায় মদীনা আক্রমণের অভিপ্রায় ত্যাগ করে মক্কায় ফিরে যায়।

আব্দুল কায়েস এর একটা বাণিজ্য কাফেলা মদীনা গমন করছিলো। আবু সুফিয়ান তাদেরকে কিছু দিয়ে এই মর্মে রাজী করায় ,তারা মদীনায় এমন সব খবর প্রচার করার

জন্য, যাতে মুসলমানরা কাফেরদের পক্ষ থেকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। এ কাফেলা মদীনায় পৌঁছে প্রচার করে যে, মক্কাবাসীরা মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন নির্মূল করার জন্য এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছে। এ খবর পেয়ে মুসলমানরা ভীত হওয়ার পরিবর্তে তাদের ঈমানের জোশ আরও বৃদ্ধি পায়। কাফের বাহিনীর প্রস্তুতি সম্পর্কে শুনে তারা বলে উঠে ঃ 'সারা দুনিয়ার মোকাবেলায় একা আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট'। এ প্রসঙ্গে আয়াত কয়টি নাযিল হয়।

কেউ কেউ বলেন, ওহোদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আবু সুফিয়ান ঘোষণা করে যে, আগামী বসর বদর প্রান্তে আবার দেখা হবে। আল্লাহর নবী আবু সুফিয়ানের এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। পর বসর উপস্থিত হলে রাসূল লোকদেরকে জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ দেন। কেউ না গেলে আল্লাহর নবী একা হলেও যাবেন। অপর দিকে আবু সুফিয়ান স্বীয় বাহিনী নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়েছে। কিছুদূর পথ চলার পর তার মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। মনে ভীতির সঞ্চার হয়। দুর্ভিক্ষের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ চাপানো যায়।

কোন এক ব্যক্তি মদীনা যাচ্ছিলো, তাকে কিছু দিয়ে রাজী করায়, সে যেন মদীনায় পৌঁছে এদিকের এমন খবর প্রচার করে, যা শুনে মুসলমানরা ভীত হয়ে যুদ্ধের জন্য বের না হয়। লোকটি মদীনায় পৌঁছে প্রচার করে যে, মক্কাবাসীরা এক বিশাল বাহিনী সজ্জিত করেছে। তাদের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ঠিক হবে না। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে নির্ভীক চিত্ততা দিয়েছেন। তারা কেবল এতটুকুই বলে যে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। অবশেষে মুসলমানরা ওয়াদা অনুযায়ী বদর পৌঁছে। সেখানে বিরাট বাজার জমতো। তিনদিন অবস্থান করে বিরাট লাভ করে মদীনা ফিরে আসে। এ যুদ্ধকে বলা হয় ছোট বদর যুদ্ধ। তখন যারা সঙ্গী হয়েছিলো, তাদেরকে এ সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, ওহোদ যুদ্ধে আহত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও এমন সাহস করেছে। মুসলমানদের এ সাহস আর প্রস্তুতির খবর শুনে কাফেররা রাস্তা থেকে ফিরে যায়। মক্কাবাসীরা এ অভিযানের নাম রেখেছে 'জায়শুস সাবীক' বা ছাতু বাহিনী। অর্থাৎ এমন এক বাহিনী যে কেবল ছাতু খাওয়ার জন্য গিয়েছিল, এবং তা খেয়ে ফিরে এসেছে। 'তাদের মধ্যে যারা নেক আমল করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে' – এতে বলা হয়েছে কেবল তাদের প্রশংসা এবং বিশিষ্ট শান প্রকাশ করার জন্য। অন্যথায় তাঁরা সকলেই ছিলো এ রকমই।

২৬০. অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ দেখ। কোন যুদ্ধ করতে হয়নি, কোন কাঁটাও বিদ্ধ হয়নি। মোফ্ত সাওয়াব লাভ করে। ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জন করে এবং দুশমনের ওপর ভীতি সঞ্চার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন পূর্বক নিরাপদে গৃহে ফিরেও এসেছে।

ক্ষুদে বদরের মতো 'হামরাউল আসাদ' যুদ্ধেও একটা বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে পন্য বিনিময় হয়। মুসলমানরা এতে বিপুল মুনাফা অর্জন করে। সম্ভবতঃ এখানে এই আর্থিক মুনাফাও বুঝানো হয়েছে।

২৬১. অর্থাৎ সে দিক থেকে এসে যে আতংকজনক খবর শুনায়, সেতো শয়তান। অথবা শয়তানের প্ররোচনায় এমন কাজ করছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকলে নিঃসন্দেহে তোমরা ঈমানদার, কার্যতঃ তোমরা এর প্রমাণও দিয়েছ। সুতরাং এ শয়তানদেরকে মোটেই ভয় করবেনা। ভয় করবে কেবল আমাকেই। কতো সুন্দর করেই না কবি বলেছেনঃ 'যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে তাক্ওয়া আবলম্বন করবে, জ্বিন ও মানুষ যে কেউ তাকে দেখে ভয় করবে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ

خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٧٨﴾ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ

عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ

يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ

وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾ وَلَا

يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا

بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

১৭৮. এই অবিশ্বাসী কাফেররা যেন এটা কখনো মনে না করে যে, আমি যে তাদের ঢিল দিয়ে রেখেছি এটা তাদের জন্যে কল্যাণকর হবে। আসলে আমি তো অবকাশ দিচ্ছি যেন, তারা তাদের গুনাহর বোঝা আরো বাড়িয়ে নিতে পারে। আর সব কিছুর শেষে তাদের জন্যে (প্রস্তুত) রয়েছে অপমানকর ও লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।[২৫২]

১৭৯. আল্লাহ কখনো তাঁর ইমানদার বান্দাহদের-তোমাদের এই বর্তমান (ভালো মন্দে মিশানো) অবস্থায় ছেড়ে দিতে চান না। যতোক্ষণ না তিনি সৎ লোকদের অসৎ লোকদের থেকে (পাক লোকদের না-পাক লোকদের কাছ থেকে) আলাদা করে দেবেন। (একই ভাবে) এটা আল্লাহ তায়ালার কাজ নয় যে, তিনি অদৃশ্য জগতের সব কিছু তোমাদের অবিহিত করবেন (তবে হাঁ এই অদৃশ্য জগতের আযাব ও পুরস্কার সম্পর্কে তোমাদের জানানের জন্যে) আল্লাহ তাঁর রসূলদের মাঝে যাকে ইচ্ছা তাকেই বেছে নেন,[২৫৩] অতপর তোমরা আল্লাহ ও রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো। (মনে রাখবে,) তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথ ভাবে ঈমান আনো এবং (সে মোতাবেক) নিজেরা (শয়তান থেকে) সাবধান হয়ে চলতে পারো, তাহলে তোমাদের জন্যে রয়েছে বিপুল পরিমাণের পুরস্কার।[২৫৪]

১৮০. আল্লাহ তায়ালা যাদের প্রাচুর্যের অনুগ্রহ দিয়ে দেন (তারা যদি তা আল্লাহর পথে ব্যয় না করে, কার্পণ্য করে) তারা যেন কখনো এটা মনে না করে যে, এই কৃপণতা তাদের জন্যে কোনো কল্যাণ (বয়ে) আনবে, না (কখনো না) এই কৃপণতা তাদের জন্যে খুবই অকল্যাণকর। (দুনিয়ার জীবনে) কার্পণ্য করে (সম্পদের পাহাড়) তারা যা জমা করেছে, অচিরেই কেয়ামতের দিন তা তাদের গলায় বেড়িতে পরিণত হবে,[২৫৫] আসমান-যমীনের একক মালিকানা তো আল্লাহ তায়ালার[২৫৬] (আর কৃপণতা ও বদান্যতার ব্যাপারে) তোমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ বিশেষভাবে অবগত রয়েছেন।

---

২৬২. অর্থাৎ শয়তানের হুমকীতে মোমেন ভীত হয়না। অবশ্য মোনাফেক শয়তানের কথা শুনে কুফরীর দিকে ছুটে যায়। অভিশপ্ত মোনাফেকদের আচরণে তুমি মোটেই দুঃখিত-চিন্তিত হবে না। এরা আল্লাহর দ্বীন এবং পয়গম্বরের কোন ক্ষতি করতে পারেবেনা, বরং তারা নিজেদেরই ক্ষতি করে। তাদের সীমাহীন মোনাফেকী ও শঠতা বলে দিচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শেষ পরিণামে সত্যিকার সাফল্য থেকে বঞ্চিত করে রাখবেন। আর তাদেরকে দেবেন কঠোর শাস্তি। সত্যের এহেন বিরোধী দুর্লভ প্রকৃতি লোকদের সঙ্গে এটাই আল্লাহর নীতি। এমন লোকদের দুঃখে নিজেদেরকে গলাবার দরকার নেই।

২৬৩. অর্থাৎ যারা ঈমানের বদলে কুফরী অবলম্বন করেছে, তারা ইহুদী খৃষ্টান হোক বা মোশরেক মোনাফেক অথবা অন্য কেউ তারা সকলে মিলেও আল্লাহর কোন ক্ষতি

করতে পারবেনা। অবশ্য এরা নিজেদের পায়ে নিজেরা কুঠারাঘাত করছে। ভয়ংকর আযাবের আকারে এর ফল ভোগ করতে হবে।

২৬৪. অর্থাৎ হতে পারে যে, কাফেররা দীর্ঘায়ু, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিত্ত বৈভবের প্রাচুর্য দেখে তাদের মনে এ ধারনা জাগতে পারে যে, আমরা যদি এতই অভিশপ্ত-বিতাড়িত হয়ে থাকবো তবে কেন আমাদেরকে এত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রাচুর্য দেয়া হবে, কেনই বা তারা থাকবে এত ভালো অবস্থায়, এত সুখে শান্তিতে ! তাদের জেনে রাখা উচিৎ, এ অবকাশ দান তাদের জন্য তেমন ভালো কথা নয়। অবকাশ দানের পরিণতি তো এ যে, যারা পাপের বোঝা ভারী করে কুফ্রীর ওপর মরতে চায়, তারাও নিজেদের ইচ্ছা আর স্বাধীনতায় প্রাণ ভরে আকাংখ্যা পুরো করুক, করুক পাপের বোঝা ভারী। তারা বুঝতে থাকুক যে, আমরা বড় ইজ্জত সম্মানে আছি। অথচ অপমানকর আযাব তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এখন ভেবে দেখ অবকাশ দান এদের জন্য ভালো হয়েছে, না মন্দ। 'না'উযু বিল্লাহি মিন শুরুরে আনফুসেনা', নাফসের দুষ্টামী থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

২৬৫. অর্থাৎ যেমনি ভাবে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং অবকাশ দান করা কাফেরদের পক্ষে আল্লাহর দরবারে মকবুল 'গৃহীত' হওয়ার প্রমাণ নয়, তেমনি নিষ্ঠাবান মুসলমানদের যদি বিপদাপদ দেখা দেয়, সম্মুখীন হতে হয় অপ্রত্যাশিত দুর্যোগের -যেমনি হয়েছিলো ওহোদ যুদ্ধে -এটাও একথা প্রমাণ নয় যে, তারা আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত। আসল কথাতো এ যে, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে এ যাবৎ চলে আসা অস্পষ্ট অবস্থায় রাখতে চাননা। অর্থাৎ অনেক কাফের মোনাফেকী করে কালেমা পাঠ করে যে ধোকা দেওয়ার জন্য তাদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকে, বাহ্যিক অবস্থায় এদেরকে মোনাফেক বলা কঠিন ছিলো। সুতরাং এমন ঘটনা এবং পরিস্থিতি সৃষ্টি করা জরুরী, যা মেকী থেকে খাঁটি এবং নাপাক থেকে পাককে স্পষ্টরূপে পৃথক করে দেয়। অবশ্য সমস্ত মুসলমানকে পরীক্ষায় না ফেলে আল্লাহ মোনাফেকদের তালিকা এবং কার্যাবলী সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করে দিতে পারতেন। কিন্তু এ রকম গায়ব সম্পর্কে সকলকে জানায়ে দেয়া তাঁর অভিপ্রেত নয়। অবশ্য তিনি রাসূলদের বাছাই করে যতটুকু গায়ব সম্পর্কে নিশ্চিত অবগত করাতে চান, তা করান। সবার কথা এই যে, সাধারণ লোকদেরকে কোন মাধ্যম ব্যতীত গায়ব সম্পর্কে সরাসরি অবহিত করা হয়না। নবীদেরকে গায়ব সম্পর্কে জানানো হয়, যতটুকু আল্লাহ জানাতে চান।

২৬৬. অর্থাৎ পয়গম্বরদের সঙ্গে আল্লাহর যে বিশেষ ব্যাপার রয়েছে। পাক নাপাক পৃথক করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার যে সাধারন নিয়ম চলে আসছে । সে ব্যাপারে তোমাদের বেশী মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তোমাদের কাজ হচ্ছে আল্লাহ রাসূলের কথা বিশ্বাস করা এবং তাক্ওয়া পরহেজগারীতে অটল থাকা। এটা করতে পারলে সবকিছুই হাসিল হবে।

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ
قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا
وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ
الْحَرِيْقِ ﴿১৮১﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ
لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿১৮২﴾ اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ
اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ
النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ
وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿১৮৩﴾
فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ
بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿১৮৪﴾ كُلُّ نَفْسٍ
ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا
الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿১৮৫﴾

রুকু ১৯

১৮১. আল্লাহ তায়ালা সেই (ইহুদী) লোকদের কথা (ভালো করেই) শুনেছেন, যখন তারা (আল্লাহকে বিদ্রুপ করে) বলেছিলো যে, হাঁ আল্লাহ অবশ্যই গরীব, আর আমরাই হচ্ছি ধনী,[২৫৭] (তাই মোহাম্মদ আল্লাহর নামে আমাদের দান করতে বলেছে) তাদের (প্রতিটি) কথা আমি (তাদের হিসাবের খাতায়) লিখে রাখবো (আমি আরো লিখে রাখবো গর্হিত কাজ) অন্যায়ভাবে তাদের নবীদের হত্যা করার বিষয়টিও। (আর সে মোতাবেক যে দিন দন্ডের রায় ঘোষিত হবে, তখন) আমি তাদের বলবো, এবার এই জাহান্নামের স্বাদ উপভোগ করো।[২৫৮]

১৮২. (এই আযাব আর কিছুই নয়) এটা হচ্ছে তোমাদেরই নিজেদেরই হাতের কামাই, যা তোমরা (এখানে আসার আগেই) পাঠিয়েছিলে। আর আল্লাহ তায়ালা কখনো তার নিজ বান্দাহদের ব্যাপারে অবিচার করেন না।[২৫৯]

১৮৩. যারা (আরো) বলে (স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালাইতো আমাদের প্রতি আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা কোনো রসূলের ওপরই ঈমান না আনি, যতোক্ষণ না সে আমাদের জন্যে এমন একটা কোরবানী এনে হাযির করবে, যাকে (গায়েব থেকে আসা এক) আগুন এসে খেয়ে ফেলবে,[২৬০] (হে মোহাম্মদ!) তুমি (তাদের বলো, হাঁ, আমার আগেও তোমাদের কাছে বহু নবী রসুল এসেছে, তারা (সবাই এসেছিলো আল্লাহর কাছ থেকে) উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়েই তোমরা (আজ কোরবানী ও তাকে আগুনে খেয়ে ফেলার) যে কথা বলছো তা সহই (তারা এসেছিলো,) তাসত্বেও তোমরা তাদের হত্যা করলে কেন? আজ যদি তোমরা এতোই সত্যবাদী হও।[২৬১] (তাহলে কোনো তাদের সাথে এ আচরণ করলে কেন?)

১৮৪. (হে মোহাম্মদ) এরা যদি(আজ) তোমাকে অস্বীকার করে (তাহলে এ নিয়ে তোমার উৎকণ্ঠার প্রয়োজন নেই কারণ) তোমার আগেও এমন বহু নবী রাসূল নবুয়তের সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ (আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল করা অন্ধকারে হেদায়াতের) আলো বিতরণকারী গ্রন্থ মালা নিয়ে (মানুষদের কাছে) এসেছিলো তাদেরও (এমনিভাবে) অস্বীকার করা হয়েছিলো।[২৬২]

১৮৫. (নবীদের অস্বীকার করে এরা কোথায় পালাবে কারন প্রত্যেকটি প্রাণীকেই (জীবনের শেষে) মরণের স্বাদ ভোগ করতে হবে (অতপর) তোমাদেরকে (জীবন ভর) কামাইর প্রতিফল কেয়ামতের দিন (কড়ায় গন্ডায়) আদায় করে দেয়া হবে[২৬৩] (আর সেদিন সত্যিকার অর্থে) সেই হবে সফল ব্যক্তি যাকে (জাহান্নামের কঠোর)আগুন থেকে দুরে রাখা হবে এবং (নেয়ামতে পরিপুর্ণ) জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। মনে রেখো এই যে পার্থিব জীবন! তা নিছক বাহ্যিক ছলনা (ও প্রতারণার জিনিস ছাড়া আর কিছুই নয়।[২৬৪]

---

২৬৭. সূরার শুরু থেকে এক বিরাট অংশ ছিলো আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী-খৃষ্টানদের সম্পর্কে। মধ্যখানে বিশেষ কারণে ওহোদ যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা শেষে এখান থেকে পুনরায় আহলে কিতাবদের

দোষক্রটি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। যেহেতু ইহুদীদের কাজ কারবার অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং কষ্টদায়ক ছিলো। মোনাফেকরাও ছিলো অধিকাংশই তাদের অন্তর্ভূক্ত। উপরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা এবার অপবিত্র থেকে পবিত্রকে পৃথক করবেন। দৈহিক জেহাদ কালে যেমনি এ পৃথকীকরণ প্রকাশ পায়, তেমনি আর্থিক জেহাদ কালে খাঁটি আর মেকী পাকা আর কাঁচা ভালোভাবে পৃথক হয়ে যায়। একারণে বলা হয়েছে যে, ইহুদী মোনাফেকরা যেমনি জেহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করে, তেমনি অর্থ ব্যয়েও কুণ্ঠিত হয়। কিন্তু যেভাবে জেহাদ থেকে দূরে সরে থেকে দুনিয়ায় কয়েক দিনের অবকাশ লাভ করা যেমন তাদের জন্য তেমন কল্যাণকর নয়, তেমনি কার্পণ্য করে অনেক অর্থ সম্পদ পুঞ্জীভূত করে নেয়াও তাদের জন্য কোন উপকারে আসবেনা। মনে কর দুনিয়ায় যদি তাদের ওপর কোন বিপদাপদ না -ই বা আসে, তবে কেয়ামতের দিন এসব সঞ্চিত সম্পদ আযাবের আকারে তাদের নিশ্চিত গলার হার হয়ে থাকবে। এখানে ইঙ্গিতে তীর্যক ভাষায় মুসমলমানদেরকেও জানায়ে দেযা হয়েছে যে, যাকাত দান এবং জরুরী কাজে ব্যয় করতে, কুণ্ঠবোধ করবেনা কখনো। অন্যথায় লোভ-লালসা কার্পণ্য ইত্যাদি ঘৃণ্য স্বভাবে যে ব্যক্তি ইহুদী মোনাফেকদের পন্থা অবলম্বন করবে। তাকে আপন মর্যাদা অনুযায়ী অনুরূপ শাস্তির জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে। অসংখ্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, যাকাত দানে অপ্রস্তুত লোকদের অর্থ সম্পদ মারাত্মক বিষাক্ত আকৃতিতে তাদের গলায় জড়ায়ে দেয়া হবে। আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

২৬৮. অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত একদিন মরে যাবে, আর সমস্ত সম্পদ তাঁরই জন্য থেকে যাবে। মূলতঃ অতীতেও তিনি ছিলেন এর মালিক। তাঁরই সম্পদ মানুষ স্বেচ্ছায় দান করলে সওয়াব পায়।

২৬৯. অর্থাৎ কার্পণ্য বদান্যতা যা কিছু যে নিয়তে করবে, আল্লাহ তায়ালা সব কিছুরই খবর রাখেন। তদনুযায়ী বিনিময় দেবেন।

. অর্থাৎ কেবল এতটুকু নয় যে, অতি কার্পণ্যের কারণে ইহুদীরা অর্থ ব্যয় করতে জানে না, বরং আল্লাহর পথে ব্যয় করার নির্দেশের কথা শুনে উপহাসও করে। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বে-আদবী মূলক কথাবার্তা বলতেও লজ্জা বোধ করে না।

এই আয়াতটি নাযিল হলে তারা বলেঃ আল্লাহ আমাদের কাছে ঋণ চাইছে। তবে আল্লাহ তো ফকীর মুহ্তাজ। আর আমরা মালদার। অথচ একজন গন্ড মূর্খও একথা বুঝতে পারে যে, ভালো খাতে ব্যয়কে ঋণ বলে আখ্যায়িত করায় আল্লাহর অতিশয় দয়া অনুগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর দেয়া সম্পদ আমাদেরই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণে আমাদেরই স্বার্থে আমাদের দ্বারা ব্যয় করান। আমাদের ব্যয় করা না করায় তাঁর কোনই লাভ-ক্ষতি নেই। যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেয়া হয় যে, এতে তাঁর কোন লাভ হয়, তবে অর্থ সম্পদ এবং সব কিছুইতো তাঁর মালিকানাধীন। সুতরাং সত্যিকার অর্থে এটাকে ঋণ বলা যায় কি করে? এতো তাঁর বিরাট

অনুগ্রহ বড় মেহেরবানী যে, এ ব্যয়ের উত্তম প্রতিদান দেয়াও নিজের যিম্মায় অবশ্য কর্তব্য করে নিয়েছেন আর এটাকে ঋণ বলে অভিহিত করে এ বাধ্যকতাকে আরও দৃঢ় করেছেন। কিন্তু ইহুদীরা নিজেদের বক্রচক্ষু আর মন অপরিস্কার হওয়ার কারণে এতে অনুগ্রহ বলে স্বীকার করার পরিবর্তে বরং উপহাস করা শুরু করে। আল্লাহ তায়ালা মহান দরবার সম্পর্কে উপহাস থেকে নিবৃত্ত হয়নি। তাদেরকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এসব কথা শুনে নিয়েছেন। এজন্য কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তার জন্য অপেক্ষা কর।

. অর্থাৎ সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এ অভিশপ্ত কথাগুলো তোমাদের পাপের বালাম বইতে অন্তর্ভূক্ত করান, যেখানে তোমাদের জাতির অন্যান্য অভিশপ্ত কার্যাবলীও অন্তর্ভূক্ত হয় ,যেমন মাসূম নবীদেরকে অন্যায়ভাবে খুন করা। যেমনিভাবে এ অযোগ্য বাক্য তোমাদের খোদাকে চিনবার একটা নমুনা, তেমনিভাবে সে অযোগ্য কার্য নমুনা হচ্ছে নবীদের প্রতি তোমাদের সম্মান প্রদর্শনের। এ পূর্ণ উপমা যখন সমাপ্ত হবে তখন বলা হবেঃ 'এ নাও, তোমাদের দুষ্টামীর স্বাদ গ্রহণ কর। তোমরা যেভাবে অভিযোগ আর উপহাস দ্বারা আল্লাহর ওলীদের অন্তর জ্বালিয়েছিলে, তেমনি ভাবে আজ তোমরা খোদায়ী আযাবের কুন্ডুলীতে জ্বলতে থাক।

অর্থাৎ যা কিছু উপার্জন করেছ, তাই সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। আল্লাহর আদালতে বিন্দু পরিমাণ যুলুমুক্ত হয়না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অনু পরিমাণ যুলুমও করেন না। (সূরা নিসাঃ ৪০)। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করে নেয়া হয় যে, যুলুম করা আল্লাহর সিফাত তথা অন্যতম গুণ, তা হলে তাঁর অন্যান্য সিফাতের মতো এ গুণটিও হতো কামেল তথা পরিপূর্ণ। তাই আল্লাহকে যালেম স্বীকার করলে-নাউযু বিল্লাহ-যালেম নয়, 'যাল্লাম' অর্থাৎ বড়ো যালেম বলতে হয়। তাঁর একরতী পরিমাণ যুলুমও পর্বতের চেয়ে বড়ো হতে পারো। এখানে যাল্লাম শব্দটি ব্যবহার করে যেন এ দিকেই ইঙ্গত করা হয়েছে যে, আল্লাহর দরবার সম্পর্কে সামন্যতম যুলম প্রস্তাব করা ও তাঁকে বড় সীমাহীন যালেম বলে যা কিছু বলে মহান আল্লাহ সেসব হতে অনেক উর্ধে।

২৬০. কোন কোন রসূল দ্বারা এ মুজেযা প্রকাশ পায় যে, কোরবানী বা অন্য কোন জিনিস আল্লাহর নামে নিয়ায মান্নত করলে আকাশ থেকে আগুন এসে তা খেয়ে যেতো। এটা ছিলো সে নিয়ায কবুল হওয়ার আলামত। তাই দেখা যায়,বর্তমান বাইবেলেও হযরত সুলাইমান (আঃ) সম্পর্কে এ ধরনের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এখন ইহুদীরা এ অযুহাত দাঁড় করায়ে বলছে, আমাদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে।,যা দ্বারা এমন মুজেযা দেখবোনা, তাকে মানবেনা। কিন্তু এটা ছিলো নিছক মিথ্যা অযুহাত। এ রকম কোন নির্দেশ তাদের কিতাবে আগেও ছিলনা, বর্তমানেও নেই। কোন নবীকেই এমন মুজেযা দেওয়া হয়েছে বলে প্রমাণ করা যায়না। সকল নবীকেই আল্লাহ তায়ালা অবস্থা ও পরিবেশের উপযোগী মুজেযা দান করেছেন। এ জরুরী নয় যে, প্রত্যেক নবী একই মুজেযা দেখালে তবেই তিনি সত্য বলে প্রমাণিত হবেন।

২৬১. অর্থাৎ সত্যই নিজেদের দাবীতে সত্যবাদী হলে আর এ বিশেষ মুজেযা দেখানোর ওপরই তোমাদের ঈমান আনা নির্ভরশীল হলে পূর্ববর্তী নবীদেরকে কেন হত্যা করেছিলে, যারা নিজেদের সত্যতার বিশেষ নিদর্শনসহ এ বিশেষ মুজোটিও নিয়ে এসেছিলেন? তোমাদের পূর্ববর্তীদের এ কাজ-যাতে আজ পর্যন্ত তোমরা সন্তুষ্ট- এটা কি একথারই প্রমাণ বহন করেনা যে, এসব টালবাহানা আর ছলচাতুরী আর হঠকারিতা। যতক্ষণ কোন নবী এ বিশেষ মুজেযা প্রদর্শন করবেনা, ততক্ষণ তাঁকে মানবোনা এমন কথা বলা নিছক হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়।

২৬২. রসূলকে শান্তনা দেয়া হচ্ছে যে, এসব অভিশপ্ত -বিতারিড়তদের বক্র কথা আর হঠকারিতায় তুমি বিষণ্ন হবে না। অন্য অবিশ্বাসীদেরও পরওয়া করবেনা। তোমার আগে কত রাসূলকে অবিশ্বাস করা হয়েছে, যাঁর স্পষ্ট নিদর্শন তথা মুজেযা, ছোট ছহীফা এবং বড় উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে তারা আগমন করেছিল, আম্বিয়ায়ে ছাদেকীন তথা সত্যাশ্রয়ী নবীদেরকে অস্বীকার করা সত্যের দুশমনদের চিরন্তন স্বভাব। তোমার জন্য এটা নূতন কিছু নয়।

২৬৩. অর্থাৎ সকলকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। অতঃপর কেয়ামতের দিন সত্যবাদী মিথ্যাবাদী সকলকেই স্ব-স্ব কৃত কর্মের পূর্ণ ফলভোগ করতে হবে। পূর্ণ বলার তাৎপর্য এ যে, কেয়ামতের পূর্বেই সামান্য কিছু বিনিময় দুনিয়া বা কবরেও পাওয়া যেতে পারে।

২৬৪. অর্থাৎ দুনিয়ার সাময়িক বসন্ত এবং বাহ্যিক জৌলুশ বিরাট প্রতারণায় ফেলার জিনিষ। এর পেছনে পড়ে অধিকাংশ আহম্মকই আখেরাতকে ভুলে বসে। অথচ দুনিয়া বাস করে পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করবে এবং এমন সব কাজ করবে, যা আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারে এবং নিয়ে যেতে পারে জান্নাত পানে। এর মধ্যেই মানুষের সত্যিকার সাফল্য নিহিত রয়েছে।

'যেসব বানোয়াট সূফীরা দাবী করে যে', আমরা জান্নাতও চাইল, জাহান্নামকেও ভয় করি না, এ আয়াত দ্বারা তাদের দাবীর অসারতা প্রতিপন্ন হয়। আয়াত থেকে জানা যায় যে, জাহান্নাম থেকে দূরে থাকা এবং জান্নাতে প্রবেশ করাই সত্যিকার সাফল্য। জান্নাত থেকে দূরে থেকে উন্নত সাফল্য ভাগ্যে জুটতে পারে না। হাদীস শরীফে আছেঃ আল্লাহ তায়ালা তার যে,অনুগ্রহে আমাদেরকেও সাফল্য দান করুন।

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ

اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ قف وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ۭ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٨٦﴾ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ۡ فَنَبَذُوْهُ وَرَاۗءَ ظُهُوْرِھِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّھُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَھُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨٨﴾ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨٩﴾

১৮৬. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা) নিশ্চয়ই জান মালের মাধ্যমে, এর (ক্ষতিসাধন করে) তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হবে (এই পরীক্ষা দিতে-গিয়ে) তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তি সম্প্রদায় যাদের কাছে আল্লাহর কিতাব নাজিল হয়েছিল এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করেছে তাদের (উভয়ের) কাছ থেকে অনেক কষ্ট দায়ক (গালি গালাজের) কথাবার্তা শুনবে, এ অবস্থায় তোমরা যদি (কঠোর ভাবে) ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো (তবে এই কঠিন অবস্থায়) তা হবে অত্যন্ত বড়ো ধরনের এক সাহষিকতার ব্যাপার। ২৬৫

১৮৭. (একথাও স্মরন করো) যখন আল্লাহ তায়ালা এই কেতাবধারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন (তিনি তাদের বলেছিলেন) তোমরা আমার

কেতাবকে মানুষদের কাছে বর্ণনা করবে এবং এর (কোনো) অংশকেই তোমরা গোপন করবে না, (কিন্তু তারা এর কোনো কথার তোয়াক্কাই করেনি তারা এই প্রতিশ্রুতিকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাখলো, এবং (বৈষয়িক স্বার্থের কাছে) তাকে অত্যান্ত নিম্ন মূল্যে বিক্রি করে দিলো কতই না নিকৃস্ট ছিলো তাদের এই বেচাকেনার ঘটনাটি! ২৬৬

১৮৮. এমন সব লোকদের ব্যাপারে তুমি কখনো ভেবোনা! যারা নিজেরা যা করে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে আবার নিজেরা যা কখনো করেনি তার জন্যেও প্রশংসিত হতে ভালোবাসে এদের ব্যাপারে তুমি কখনো ভেবোনা যে, এরা বুঝি আল্লাহর আযাব থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেছে, মুলতঃ এদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে।২৬৭

১৮৯. আসমান যমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব এককভাবে আল্লাহর জন্যে আল্লহ তায়ালাই হচ্ছেন সবকিছুর ওপর বিজয়ী ও ক্ষমতাবান (তার সাথে বিদ্রোহি করে কেউই বাঁচতে পারবে না) ;২৬৮

---

২৬৫ . এখানে মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, ভবিষ্যতেও তোমাদের জান-মালে পরীক্ষা হবে। তোমাদেরকে সব রকম ত্যাগ ও কোরবানী স্বীকার করতে হবে। খুন হওয়া, আহত হওয়া, বন্দী জীবনের কষ্ট ভোগ করা, রোগ-ব্যাধীতে আক্রান্ত হওয়া, ধন-সম্পদ হারানো, নিকটাত্নীয়দের বিয়োগ ব্যথা এ ধরনের অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। উপরন্তু আহলে কিতাব এবং মোশরেকদের মুখে অনেক কষ্টদায়ক কথাবার্তা শুনতে হবে। ছবর এবং তাকওয়া তথা ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং আল্লাহর ভয় হচ্ছে এ সব প্রতিরোধের উপায়। ধৈর্য ছবর এবং পরহেজগারী দ্বারা এ সবের মোকাবিলা করলে তা হবে বিরাট সাহস এবং মহানুভবতার কাজ আল্লাহ তায়ালা এ জন্য তাকীদ দিয়েছেন।

বোখারী শরীফের একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, আয়াতটি বদর যুদ্ধের পূর্বে নাযিল হয়েছে; যুদ্ধের হুকুম পরে এসেছে। অবশ্য যুদ্ধের নির্দেশ আসার পরও তাকওয়ার নিদের্শ যথারীতি বহাল রয়েছে। শেষ পর্যন্তও এ নির্দেশের ওপর আমল ছিলো। অবশ্য ধৈর্য ক্ষমা এবং কঠোরতার উপলক্ষ বুঝে নিতে হবে। শরীয়তের স্পষ্ট নির্দেশ দ্বারা এসব জানা যায়। আয়াতটিকে এখানে দেওয়ার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এ যে, তোমরা এ সব কাফের মোশরেকদের বে-আদবী এবং অনিষ্টের সীমার চেয়ে বেশী নিশ্চিত হবে না। এখনও আরও অনেক কিছু শুনতে হবে, অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে। ধৈর্য-সবর দ্বারা এসবের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তত হও। উপরন্ত দুনিয়ার জীবন তো নিছক প্রতারণার হাতিয়ার। এর পেছনে পড়ে এ কথা ভুলে যাবেনা যে, আল্লাহ তায়ালা জান-মালে তোমাদের পরীক্ষা করতে চান।

২৬৬. অর্থাৎ আহলে কিতাবের আলেমদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছিলো যে, আল্লাহর কিতাবে যেসব স্পষ্ট নির্দেশ এবং সুসংবাদ রয়েছে মানুষের কাছে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে, কোন কিছুই গোপন করবে না। হেরফের করে তার অর্থও

পরিবর্তন করবেনা। কিন্তু তারা বিন্দুমাত্রও পরওয়া করেনি। দুনিয়ার সামান্য লাভের খাতিরে সকল অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে শরীয়তের বিধানে পরিবর্তন সাধন করেছিলো। আল্লাহর আয়াতের শব্দ এবং অর্থ পরিবর্তন করেছিলো। যে জিনিষটা প্রকাশ করা সবচেয়ে বেশী জরুরী ছিলো অর্থাৎ শেষ যমানার নবীর সুসংবাদ, তাকেই তারা গোপন করেছে সবচেয়ে বেশী। অর্থ সম্পদ ব্যয় করায় যতটা কার্পণ্য করতো, তার চেয়েও বেশী কৃপণতার পরিচয় দেয় জ্ঞান খরচ করায়। আর এ কনজুসীর উদ্দেশ্যেও পার্থিব্য ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা এবং দুনিয়ার ভালোবাসা ছাড়া অন্য কিছুই ছিলনা। এখনে প্রসঙ্গত মুসলিম জ্ঞানবান ব্যক্তিদেরকে সর্তক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়ে তোমারও এরকম করবেনা।

২৬৭. ইহুদীরা ভুল মাসআলা বলতো, ঘুঁস গ্রহণ করতো জেনে-শুনে পয়গম্বর (সঃ) এর পরিচয় ও সুসংবাদ গোপন করতো। অতঃপর এ ভেবে আনন্দিত হতো যে, আমাদের চালাকী কেউ ধরতে পারেননি। এর পরও তারা আশা করতো যে, আমাদেরকে বড় দ্বীনদার আলেম এবং সত্যের পূজারী বলে মানুষ আমাদের প্রসংসা করবে। অপর পক্ষে মোনাফেকদের অবস্থাও তাদের মত ছিলো। জিহাদের সুযোগ এলে ঘরে লুকায়ে থাকতো। আর নিজেদের এ কাজের জন্য আনন্দিত হয়ে বলতো দেখ, কিভাবে আমরা প্রাণ বাঁচারেছি। রসূল (সঃ) জেহাদ থেকে ফিরে এলে নিজেদের অনুপস্থিত থাকার মিথ্যা ওযর -আপত্তিকে পেশ করে চাইতো যে, রসূল যেন তাদের প্রশংসা করেন। এদের সকলকে বলে দেয়া হয়েছে যে, এ সব আচরণ দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবেনা। প্রথমত এসব লোককে দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হতে হয়। কোন কারণে এখানে রক্ষা পেলেও সেখানে কিছুতেই রক্ষা পাবেনা। আয়াতে ইহুদী বা মোনাফেকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও মুসলমানদেরকেও শুনানো হয়েছে যে, খারাব কাজ করে খুশী হবেনা, ভালো কাজ করে গর্ববোধ করবেনা। না করা ভালো কাজের জন্য প্রশংসা দাবী করবেনা, বরং ভালো কাজ করার পরও প্রশংসার আশা করবেনা।

২৬৮. আসমান যমীনে যখন তাঁরই শাসন-কর্তৃত্ব, তখন অপরাধী পালিয়ে আশ্রয় নেবে কোথায়? যিনি সব কিছুর ওপর সর্ব শক্তিমান, তাঁর আয়ত্বের বাইরে কে যেতে পারে?

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَٰفِ

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ

يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا

مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ؕ وَمَا

لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ

لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا

ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا

وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ

اَنِّىْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ

بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ

دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ

عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

রুকু ২০

১৯০. (নিসন্দেহে আসমান যমীনের এই (নিখুঁত) সৃষ্টি (রহস্যের) এবং দিবা রাত্রির আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানবান লোকদের জন্যে রয়েছে প্রচুর নিদর্শন।[২৬৯]

১৯১. (এই জ্ঞানবান লোক হচ্ছে তারা) যারা দাঁড়িয়ে বসে এবং শুয়ে (সর্বাবস্থায়) এই সব কিছুর স্রস্টা, আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে[২৭০] এবং আসমান যমীনের এই সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে (এবং স্বতষ্ফুর্তভাবে তখন তাদের মন বলে উঠে) হে আমাদের মালিক, (মহান সৃষ্টি জগতের) এর কোনো কিছুই তুমি খামাখা বানিয়ে রাখেনি। তোমার সত্ত্বা অনেক পবিত্র, অতএব আমাদের তুমি জাহান্নামের কঠিন আগুন থেকে নিস্কৃতি দাও, (কারণ আমরা তোমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পালনে সফল হতে পারিনি।[২৭১]

১৯২. হে আমাদের মালিক, যাকেই তুমি জাহান্নামের এই কঠিন আগুনে নিক্ষেপ করবে অবশ্যই তাকে তুমি অপমানিত ও হেয় প্রতিপন্ন করবে,[২৭২] (আর সেই কঠিন দিনে) যালেমদের জন্যে কোনো রকম সাহায্য কারীই থাকবেনা।[২৭৩]

১৯৩. হে আমাদের মালিক, আমরা শুনতে পেয়েছি, একজন আহবানকারী (দুনিয়াবাসীদের) ঈমানের পথে ডাকছে (সে বলছিলো, হে মানুষরা) তোমরা তোমাদের (সৃষ্টিকর্তা) আল্লার ওপর ঈমান আনো[২৭৪] (হে মালিক,সেই আহবানকারীর কথায় তোমার ওপর) আমরা ঈমান এনেছি[২৭৫] (এই দায়িত্ব আদায় করতে গিয়ে) আমরা নিত্য যে অন্যায় ও অপরাধ করছি, তা তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও। (আমাদের হিসেবের খাতা থেকে) আমাদের দোষত্রুটি ও গুনাহ সমুহ দুর করে দাও। (পরিশেষে তোমার) নেক লোকদের দলে শামিল করে তাদের সাথে আমাদের মৃত্যু দাও।[২৭৬]

১৯৪. হে আমাদের মালিক, তুমি (যুগে যুগে) তোমার নবী রসুলদের মাধ্যমে যে সব পুরুস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা (আমাদের জন্যে) পুর্ণ করে দাও এবং শেষ বিচারের দিন (তাদের সামনে) তুমি আমাদের অপমানিত করোনা,[২৭৭] নিশ্চয়ই তুমি কখনো ওয়াদার বরখেলাপ করো না[২৭৮]।

১৯৫. (এবার) তাদের মালিক তাদের আহবানে (সাড়া দিলেন এবং) বললেন (তোমরা শুনে রেখো) আমি তোমাদের সামান্য কোনো কাজকেও কখনো বিনস্ট করবো না, নর নারী নির্বিশেষে (আমি তোমাদের কাজের যথার্থ বিনিময় দেবো) এবং তোমরা তো একে অপরেরই অংশ,[২৭৯] অতএব (তোমাদের মাঝে) যারা

-৪১

(আমার জন্যে একে অপরের মায়া ত্যাগ করে) নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে হিজরত করেছে এবং যারাই নিজেদের জন্মভুমি থেকে বিতাড়িত হয়েছে, আমারই পথে যারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়েছে, (সর্বোপরি) যারা (আমার জন্যে) লড়াই করছে এবং (আমারই জন্যে) যুদ্ধের ময়দানে জীবন দিয়েছে, অবশ্যই (এদের জীবন থেকে যাবতীয় মন্দ কাজ দূরীভূত করে) আমি এদের সব ধরনের অপরাধ মাফ করে দেবো। এবং অবশ্যই আমি এদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে (হামেশা) ঝর্ণধারা বইতে থাকবে,[২৮০] এ হচ্ছে (তাদের জন্যে তোমার মালিক, আল্লাহ তায়ালার দেয়া পুরস্কার, আর আল্লাহ তায়ালা! হাঁ, তার কাছেই তো রয়েছে উত্তম পুরস্কার! [২৮১]

---

২৬৯. অর্থাৎ জ্ঞানবান ব্যক্তি আসমান যমীনের সৃষ্টি, এদের নানা বিস্ময়কর অবস্থা ও সম্পর্ক এবং রাত্র-দিনের সুদৃঢ় সুবিন্যস্ত ব্যবস্থাপনায় চিন্তা করলে তাকে বিশ্বাস করতে হয় যে, এসব সুসংহত ব্যবস্থা অবশ্যই কোন একজন মহা পরাক্রমশালী শাসন কর্তার হস্তে নিহিত রয়েছে, যিনি তাঁর অসীম শক্তি বলে ক্ষুদ্র -বৃহৎ সব কিছুরই সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সীমিত অস্তিত্ব এবং কর্ম বৃত্তের বাইরে পা 'রাখারও সাধ্য কোন বস্তর নেই। এ বিরাট মেশিনের একটা ক্ষুদ্র অংশ বা এ কারখানার একজন শ্রমিকও যদি মহান মালিকের অসীম ক্ষমতা এক্তেয়ারের বাইরে থাকতো, তবে সারা বিশ্বের এ পরিপূর্ণ ও সুসংহত ব্যবস্থা অটল থাকতে পারতোনা কিছুতেই।

২৭০. অর্থাৎ কোন অবস্থায়ই আল্লাহকে ভুলে যায়না। সব সময় তাদের মনে এবং মুখে আল্লাহর স্মরণ জারী থাকে। যেমন হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বলেনঃ 'তিনি প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করতেন'। নামাযও আল্লাহ তায়ালার বিরাট স্মরণ। এজন্যই রসূল(সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দাঁড়ায়ে নামায না পড়তে পারে, সে বসে পড়বে। বসে না পড়তে পারলে শুয়ে পড়বে । কোন কোন বর্ণনায় আছে, যে রাত্রে আয়াত গুলো নাযিল হয়, রাসূল (সঃ) দাঁড়ায়ে, বসে, শুয়ে অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে ক্রন্দন করতে থাকেন।

২৭১. অর্থাৎ যিকির ফিকির তথা স্মরণ করণের পর বলেঃ পরওয়ারদেগার। তুমি এ বিশাল কারখানা অযথা সৃষ্টি করেনি, যার কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য নেই। নিঃসন্দেহে এ বিস্ময়কর সুনিপুন ব্যবস্থাপনার ধারা কোন মহান পরিনতিতে সমাপ্ত হবে। হতে বাধ্যও বটে। যেন এখান থেকে তাদের মন পরকালের চিন্তার দিকে ধাবিত হয়, যা বস্তুতঃ দুনিয়ার জীবনের শেষ পরিণতি। এজন্য পরে জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া করা হয়েছে। আর মধ্যখানে আল্লাহ তায়ালা তাসবীহ পবিত্রতা বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতির এ স্পষ্ট নিদর্শন দেখেও যে আহাম্মক তোমাকে চিনতে পারে না, তোমার শান-মর্যাদা বুঝতে পারে না, বিশ্ব জাহানের এ কারখানারকে নিছক অর্থহীন খেলা মনে করে, তোমার দরবার তাদের এসব ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত। এ আয়াত থেকে

জানা যায় যে, আসমান-যমীন এবং অন্যান্য খোদায়ী কারিগরী চিন্তা-গবেষনা করা তাই প্রশংসার যোগ্য হতে পারে। যার পরিণতি হয় আল্লাহর স্মরণ এবং আখেরাতের দিকে দৃষ্টি দান। যেসব বস্তুবাদী এসব শিল্প কারখানার তারের মধ্যেই জড়ায়ে থাকে, স্রষ্টার সঠিক পরিচয় পর্যন্ত পৌছাতে পারেনা, দুনিয়া তাদেরকে যত বড় বৈজ্ঞানিক গবেষক বলুক, কিন্তু কোরআনের ভাষায় তারা 'উলুল আলবাব' বা জ্ঞানী হতে পারেনা। বরং তারা নিকৃষ্ট স্তরের জাহেল, একান্ত আহাম্মক মাত্র।

২৭২. যে ব্যক্তি যত বেশী সময় জাহান্নামে থাকবে, সে ততটা লাঞ্ছিত হয়েছে মনে করবে। এ নিয়মে চিরন্তন লাঞ্ছনা রয়েছে কেবল কাফেরদের জন্য। সেসব আয়াতে সাধারণ মোমেনদের এ লাঞ্ছনা হবে না বলে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে এ অর্থ বুঝতে হবে।

২৭৩. অর্থাৎ আল্লাহ যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে চান, কেউ সহায়তা করে তাকে রক্ষা করতে পারেনা। অবশ্য যাদেরকে শুরুতে বা শেষে ছেড়ে দেওয়াই তাঁর মনযূর হবে যেমন গুনাহগার মোমেন, তাদের জন্য সুপারিশকারীকে অনুমতি দেয়া হবে সুপারিশ করে মাফ করায়ে নেওয়ার। তা এর পরিপন্থী নয়। বরং আয়াত এবং ছহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত।

২৭৪. অর্থাৎ নবী করীম (সঃ)। যিনি বিরাট উচ্চস্বরে সারা বিশ্বকে ডাক দিয়েছেন; অথবা কোরআন করীম, যার আহবান ঘরে ঘরে পৌছেছে।

২৭৫. আগে বুদ্ধিবৃত্তিক ঈমানের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে শ্রুতি নির্ভর ঈমানের কথা। রাসূল এবং কোরআনের প্রতি ঈমানও এতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

২৭৬. অর্থাৎ আমাদের বড় গুনাহ ক্ষমা করে দাও ছোট খাট খারাপ কাজ পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত কর। আর যখন দুনিয়া থেকে তুলে নাও, নেক বান্দাদের দলভূক্ত করে তুলে নেবে।

২৭৭. অর্থাৎ পয়গম্বরদের যবানীতে তাদেরকে বিশ্বাস করার জন্য তুমি যে ওয়াদা করেছ। যেমন দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দুশমনদের ওপর বিজয়ী করা এবং আখেরাতে জান্নাত ও সন্তুষ্টিতে ধন্য করা, এসব দ্বারা আমাদেরকে এমনভাবে সাফল্য মন্ডিত করবে, যাতে কেয়ামতের দিন আমাদেরকে সামান্যতম লাঞ্ছনারও সম্মুখীন হতে না হয়।

২৭৮. অর্থাৎ তোমার দরবারে তো ওয়াদা খেলাফীর সম্ভাবনা নেই। অবশ্য আমাদের মধ্যে এমন আশংকা রয়েছে, যেন এমন কোন ভুল না করে বসি, যাতে তোমার ওয়াদা দ্বারা উপকৃত হতে না পারি। এ কারণে নিবেদন করছি যে, আমাদেরকে সেসব আমলের ওপর অটল-অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন, তোমার ওয়াদা দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য যা একান্ত জরুরী।

২৭৯. অর্থাৎ পুরুষ হোক, কি নারী আমার এখানে কারো কর্ম ব্যর্থ হয়না যে কাজই করবে, তার ফল পাবে। এখানে আমলই শর্ত। নেক, আমল করে একজন নারীও তার যোগ্যতা অনুযায়ী আখেরাতে সেসব মর্যাদা লাভ করতে পারে, যা একজন পুরুষ। তোমরা নারী পুরুষ যখন একই মানব জাতির সদৃশ্য, একই আদম থেকে যখন সকলের সৃষ্টি, একই ইসলামের রিশতায় যখন সবাই গ্রথিত, একই সামাজিক জীবন এবং সমাজ ধারায় যখন সকলেই শরীক ও অংশীদার- তখন কর্ম এবং কর্ম কৌশল নিজেদেরকে একই রকম মনে করবে। বর্ণনায় আছে যে, হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) আরয করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোরআন মজীদেও কোথাও আমাদের নারীদের হিযরত ইত্যাদি ভালো কাজের বিশেষভাবে উল্লেখ নেই। এর জবাবে আয়াতটিতে এর জবার দেয়া হয়েছে।

২৮০. অর্থাৎ যখন কোন আমলকারীর ছোটখাট আমলও নষ্ট করা হয়না, তখন সে সব মর্দে খোদা সম্পর্কে তো প্রশ্নই উঠেনা, যারা কুফরী নাফরমানী ত্যাগ করার স্বজন অর্থ সম্পদ সব কিছু ত্যাগ করে দারুল ইসলাম অভিমুখে রওয়ানা হয়েছে। কাফেররা তাদের ওপর এমন সব যুলুম অত্যাচার চালায় যে, নিজেদের গৃহে বসবাস করাও তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। দেশ-খেশ এবং বাড়ী ঘর ত্যাগ করার পরও দুশমনরা তাদেরকে শান্তিতে বসবাস করতে দেয়নি। নানা কষ্ট দিয়েছে। আর এসব কিছুই করা হয়েছিল এ জন্য যে, তারা আমার নাম নিতো, আমার কালেমা পড়তোঃ 'তারা রাসূল এবং তোমাদেরকে বিতাড়িত করে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের পরওয়ার দেগার আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ কর (আল মুমতাহানা)। 'তারা এদেরকে দন্ড দিয়েছিলো এজন্য যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংশনীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে (আল বুরুজ)। শেষ পর্যন্ত তারা আমার রাস্তায় লড়াই করেছে, জীবন দিয়েছে। এরা হচ্ছে সেসব বান্দা. যাদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। জান্নাত তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

২৮১. অর্থাৎ শুভ প্রতিদান তো কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে। অন্য কোথাও আর তা পাওয়া যায়না। অথবা এ অর্থ হতে পারে যে, এর চেয়েও উত্তম প্রতিদান আল্লাহর কাছেই রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মোবারক দীদার। আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে আল্লাহ তার অংশীদার করুন।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي

الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ

الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿۱۹۸﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ

لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنْزِلَ

إِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا

قَلِيْلًا ؕ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ إِنَّ اللّٰهَ

سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹۹﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا

وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۲۰۰﴾

১৯৬. (হে মোহাম্মদ) দুনিয়ার জনপদ সমুহে যারা (স্বয়ং এর স্রষ্টাকে অস্বীকার করে) দম্ভ ভরে বিচরণকরে বেড়ায় তারা (এবং তাদের কর্মকান্ড) যেন কোনো ভাবেই তোমাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

১৯৭. তাদের এই বিচরণ ও অর্জন তো সামান্য কয়দিনের সামগ্রী মাত্র! অতপর তাদের (সবাইর অনন্ত) নিবাস হবে জাহান্নাম, আর জাহান্নাম হচ্ছে নিকৃষ্টতম আবাসস্থল।[২৮২]

১৯৮. তবে যারা আবার নিজ মালিককে ভয় করে চলে তাদের জন্যে (মালিকের পক্ষ থেকে এর পুরস্কার স্বরূপ) নির্দিষ্ট হয়ে আছে (সুরম্য) উদ্যানমালা– যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হবে (বিচিত্র ধরনের) ঝর্ণধারা– সেখানে তারা অনাদিকাল থাকবে।[২৮৩] এ হবে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের জন্যে) আতিথেয়তার স্বাগত সম্ভাষণ।[২৮৪] আর আল্লাহ তায়ালার কাছে (তাদের জন্যে) যে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে, তা অবশ্যই নেককার লোকদের জন্যে হচ্ছে অতি উত্তম জিনিস!

১৯৯. (ইতিপুর্বে আমি যাদের কাছে কিতাব পাঠিয়েছি, সে সব কিতাবধারী লোকদের মাঝেও এমন লোক অবশ্যই আছে, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে। তোমাদের এই কেতাবের ওপর তারা (যেমনি) বিশ্বাস করে (তেমনি) তারা বিশ্বাস করে তাদের ওপর প্রেরিত কিতাবের ওপরও। এরা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ ও

বিনয়ী, এরা আল্লাহর আয়াতকে (বৈষয়কি স্বার্থের বিনিময়ে) সামান্য মুল্যে বিক্রী করে না, মুলতঃ এরাই হচ্ছে সেই (সৌভাগ্যবান) ব্যক্তি যাদের জন্যে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে অগাধ পুরস্কার রয়েছে।[২৮৫] নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসাব কেতাব সম্পন্নকারী [২৮৬] (এক মহান সত্ত্বা)

২০০. হে মানুষ, তোমরা যারা (আমার ওপর) ঈমান এনেছো, তোমরা (সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় কঠোর) ধৈর্য ধারণ করো (এবং কখনো ধৈর্যকে পরিশ্রান্ত হতে দিয়ো না) বরং বাতিলের মোকাবেলায় ধৈর্যধারণের সময় একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো, (ঈমানের প্রয়োজনে) সদা সূদৃঢ় থেকো (সর্বোপরি জীবনের সর্ব কাজে) একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করো। (এই ভাবেই) তোমরা একদিন সফলকাম হতে পারবে! [২৮৭]

---

২৮২. অর্থাৎ কাফেররা যে এখানে সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্থ সম্পদ উপার্জন করে আর বিলাসিতা ও প্রাচুর্য্য দেখায়, তাদেরকে দেখে মুসলমানদের প্রতারিত-বিভ্রান্ত হওয়া উচিৎ নয়। তার তো মাত্র কয়েক দিনের চাকচিক্য। একজন লোককে যদি চার পাঁচদিন পলাও কোরমা খাওয়াবার পর ফাঁসী বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়, তবে এই চার পাচ দিনের জীবনকে সুখী স্বাচ্ছন্দ জীবন বলা যাবে? সামান্য শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে চিরন্তন সুখ শান্তির উপকরণ সংগ্রহ করাকেই বলা যায়। সুখী স্বাচ্ছন্দ জীবন।

২৮৩. এখন সে স্বল্প মেয়াদী সুখ-শান্তির সঙ্গে এ জীবন ও সাফল্যের তুলনা করে দেখ, কোনটা উত্তম? এটা, না ওটা?

২৮৪. মেহমান বলা হয়েছে এজন্য যে, মেহমানকে তার খানাপিনার জন্য কোন চিন্তা করতে হয়না। সম্মান আর আরামে বসে বসে সব কিছুই প্রস্তুত পায়।

২৮৫. উপরে সাধারণ মুত্তাকীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আহলে কিতাবের মুত্তাকীদের অবস্থা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ যেসব আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি যথাযথ ঈমান এনেছে, কোরআনকে স্বীকার করেছে, আর কোরআন যেহেতু তাওরাত ইনজীলকে স্বীকার করে, সুতরাং তাও স্বীকার করে, কিন্তু দুনিয়া পূজারী পাদ্রী পুরোহীতদের মতো নয় যে, সামান্য পার্থিব লাভের খাতিরে আল্লাহর আয়াতকে গোপন করেছে বা তাতে পরিবর্তন সাধন করেছে। বরং অনুনয় বিনয়ের সঙ্গে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহর সামনে অবনত হয়েছে, এবং যেভাবে আল্লাহ তায়ালা কিতাব নাযিল করেছেন, ঠিক সে আসল রঙ্গেঁ তাকে স্বীকার করে নিয়েছে। সুসংবাদ গোপন করেনি, বিধি বিধানে কোন পরিবর্তন সাধন করেনি। এমন পূন্যাত্ম্য সত্যাশ্রয়ী আহলে কিতাবদের জন্য আল্লাহর দরবারে রয়েছে বিশেষ প্রতিদান। কোরআন হাদীসের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এমন আহলে কিতাবরা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে।

২৮৬. অর্থাৎ হিসাব কিতাবের দিন খুব একটা দূরে নয়, অতি শীঘ্র আসবে। যখন হিসাব শুরু হবে, সারা দুনিয়ার পাইপাই হিসাব অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে।

২৮৭. উপসংহারে মুসলমাদেরকে একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ নসিহত করা হয়েছে। এ নসিহত যেন গোটা সূরার সংক্ষিপ্ত সার। অর্থাৎ সফলতা লাভ করতে এবং দুনিয়া আখেরাতে অভীষ্ট লক্ষে উপনীত হতে চাইলে কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকার করেও আনুগত্যে অটল অবিচল থাকবে। পাপ ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকবে। দুশমনদের মুকাবিলায় দৃঢ়তা ও স্থিরতা প্রদর্শন করবে। ইসলাম এবং তার পরিমন্ডলের হেফাযতে নিয়োজিত থাকবে। যেখানে দুশমনের হামলা করার আশংকা থাকে, সেখানে লৌহ প্রাচীরের মতো শক্ত হয়ে বুক পেতে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং তাদের জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্বপাল প্রস্তুত করে রাখবে। এ দ্বারা তোমার আল্লাহর দুশমন এবং তোমাদের দুশমনকে ভীতি-সন্ত্রস্ত করে তুলবে (আল আনফালঃ ৬০)। আর সকল সময়ে সকল কাজে আল্লাহ কে ভয় করে চলবে। এটা করতে পারলে বুঝবে অভীষ্ট লক্ষে উপনীত হয়েছে, হে প্রভু পরওয়ার দেগার। আমাদেরকে তোমার দয়া অনুগ্রহে দুনিয়া এবং আখেরাতে কামিয়াব ও জয়যুক্ত কর। আমীন!

হাদীস শরীফে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের জন্য উঠে আসমানের দিকে নযর করে এই সূরার শেষ এ দশটি আয়াত তেলাওয়াত করতেন।

সূরা আন নেসা

মদীনায় অবতীর্ণ

সুরা নম্বর ঃ ৪, আয়াত ঃ ১৭৬ , রুকূ ঃ ২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ

وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا

وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ① وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى

اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا

تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا

كَبِيْرًا ② وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا

مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ

خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۝٣ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ

نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ

هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ۝٤ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ

جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا

لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝٥

রহমান রাহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকু ১

১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো-- যিনি তোমাদের একটি মাত্র মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তা থেকেই (তার) এক জুড়ি পয়দা করেছেন-- এর পর তিনি তাদের (এই আদি জুড়ি) থেকে বহু সংখ্যক নর-নারী (দুনিয়ায় চারদিকে) ছড়িয়ে দিয়েছেন[১]-- (হে মানুষ) তোমরা ভয় করো আল্লাহ তায়ালাকে, যার (পবিত্র) নামে তোমরা একে অপরের অধিকার দাবী (ও পাওনা) দাবী করো, এবং সম্মান করো সেই খাকে যে তোমাকে জন্ম দিয়েছে[২], অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (কার্যকলাপের) ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলেছেন[৩]।

২. ইয়াতীমদের নিজেদের ধনসম্পদ তাদের কাছে ফেরত দিয়ে দাও তাদের ভালো জিনিসের সাথে (নিজেদের) খারাপ জিনিসের (কখনো) বদল করো না। (আবার) তাদের নিজেদের সম্পদসমূহকে কখনো নিজেদের সাথে মিলিয়ে হযম করে নিয়ো না। (জেনে রেখো) এটা একটা জঘন্য পাপ[৪]।

৩. আর যদি তোমাদের এই আশংকা থাকে যে, তোমরা ইয়াতীমদের ব্যাপারে ন্যায় বিচার করতে পারবে না, তাহলে যে সব নারীদের তোমাদের ভালো লাগে তাদের মধ্য থেকে দুইজন, তিনজন কিংবা চারজনকে বিয়ে করে নাও[৫]। কিন্তু (এখানে) যদি তোমাদের ওই ভয় হয় যে, তোমরা (একের অধিকের মাঝে) ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে (তোমাদের জন্যে) এক জনই (যথেষ্ট) কিংবা

(তাদের মধ্য থেকে কোনো নারীকে যথেষ্ট মনে করো) যারা তোমার অধিকারভুক্ত রয়েছে[৬], অবিচার থেকে বেঁচে থাকার জন্যে এটাই হচ্ছে সহজতর[৭] (পন্থা)।

৪. নারীদের (বিয়ে করার সময়) তাদের মোহ্‌রানার অংক (একান্ত সন্তুষ্টচিত্তে) তাদের স্বীয় মালিকানায় দিয়ে দাও[৮], অতপর তারা যদি নিজেদের মনের খুশীতে এর কিছু অংশ তোমাদের (ছেড়ে কিংবা) মাফ করে দেয়, তাহ্‌লে তোমরা তাকেও খুশী মনে একান্ত বৈধ সম্পদ হিসেবেই উপভোগ করতে পারো[৯]।

৫. আল্লাহ্‌ তায়ালা যে সম্পদকে (দুনিয়ায়) প্রতিষ্ঠা লাভের উপকরণ হিসেবে তোমাদের জন্যে বানিয়ে দিয়েছেন, তাকে (কোনো অবস্থায়ই) এই নির্বোধ লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়ো না। (তবে তাদের আবার নিঃসম্বলও করা যাবে না) সে সম্পদ থেকে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবে, তাদের পোশাক-আশাক সরবরাহ্‌ করবে (সর্বোপরি) তাদের ভালো কথার উপদেশ দাও[১০]।

---

১. হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত হাওয়াকে তার বাম পাঁজরের হাঁড় থেকে বের করেন। অতঃপর এদের উভয় থেকে সকল নারী-পুরুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় তাদেরকে বিস্তার করেন। মূলতঃ সমস্ত মানুষকে আল্লাহ তায়ালা এক প্রাণ এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই যখন তোমাদেরকে একই অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনিই যখন তোমাদেরকে টিকিয়ে রাখেন, তখন কেবল তাকেই ভয় করা এবং তাঁরই আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য। এর মাধ্যমে দু'টা বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এক, আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের সকলের স্রষ্টা ও উদ্ভাবনকারী। দুই, সমস্ত মানুষের অস্তিত্বের কারণ-যা থেকে আল্লাহ তায়ালা সকলকে সৃষ্টি করেছেন-এক-ই প্রাণ অর্থাৎ আদিপিতা হযরত আদম (আঃ)। এটা থেকে জানা যায় যে, আমাদের আসল সম্পর্ক আল্লাহর সঙ্গে। কারণ, আদি কার্য কারণ এবং তা থেকে উৎসারিত বস্তুর মধ্যে যে রকম সম্পর্ক, নৈকট্য এবং সম্পর্কের প্রয়োজন রয়েছে তা অন্য কিছুর মধ্যে সম্ভব নয়। এর পরই হচ্ছে সে সম্পর্ক ও নৈকট্যের স্থান, যা মানব গোষ্ঠীর একের সাথে অপরের রয়েছে। কারণ, তাদের অস্তিত্বের কারণ যা থেকে তাদের সৃষ্টি হয়েছে, তা একই বস্তু। এ থেকে জানা যায় যে, প্রথমতঃ আমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য বাধ্যতা মূলক হওয়াই উচিৎ। কারণ তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা। অতঃপর আমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত সকল সৃষ্ট জীব বিশেষ করে আপন স্বজাতির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাদের সঙ্গে সদাচরণ করা। কারণ, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সৃষ্টির আদি কারণ একই বস্তুকে নির্ণয় করেছেন যা থেকে সকলেই সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং মানব জাতির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যে নৈকট্য এবং সম্পর্ক ও ঐক্য রয়েছে তা অন্য কোন বস্তুর মধ্যে নেই।। অন্য কোন বিষয়েই তা অর্জিত হয়না, এ কারনে শরীয়ত মত এবং জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী অনুযায়ী মানুষে মানুষে পারস্পরিক সদাচরণ এতই জরুরী যে, অন্য কোন ক্ষেত্রে তা এতটা জরুরী নয়। তেমনি

মানুষের সঙ্গে অসদাচরণ ও অত্যন্ত ঘৃণীত ও নিন্দনীয়। শরীয়তের বিধানে এর বিস্তারিত বিবরণ বর্তমান রয়েছে। শেখ সাদী (রঃ) এ বিষয়টি বর্ননা করেছেন তার কবিতায় এভাবেঃ

'বনী আদম একে অপরের অংশ বিশেষ। কারণ, একই ধাতু মূল থেকে তাদের সৃষ্টি। একটা অঙ্গে ব্যথা দেখা দিলে অন্য অঙ্গের শান্তি থাকেনা। তুমি যদি অপরের দুঃখে দুঃখী না হও, তোমার নাম মানুষ পদ বাচ্য নয়'। এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টি বৈচিত্র প্রকাশ করতঃ তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বনী আদমের মৌলিক ঐক্য সম্পর্কে অবহিত করতঃ এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, সকলে পরস্পরে এক হয়ে মিলে মিশে থাকবে। আয়াতের পরবর্তী অংশে একথাই বলা হয়েছে।

২ আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকর্তা এবং প্রতিপালক। অর্থাৎ তিনিই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং তিনিই টিকিয়ে রাখেন। এ ছাড়াও তাকে ভয় করার এবং তাঁর আনুগত্য ওয়াজেব বা অত্যাবশ্যকীয় হওয়ার আর একটি কারণ এইযে, তোমরা তাঁরই দোহাই দিয়ে একে অন্যের কাছে অধিকার ও কল্যাণ তলব কর। পরস্পরে তাঁর কসম দাও। আর তাতেই মনে শান্তি বোধ কর। অর্থাৎ নিজেদের মধ্যকার পারস্পরিক কাজ কারবার, লেনদেন এবং সাময়িক প্রয়োজনেও তাঁকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ কর। অর্থাৎ কেবল অস্তিত্ব আর টিকে থাকার মধ্যেই তাঁর প্রয়োজন সীমাবদ্ধ নয়। বরং সকল কাজে সকল প্রয়োজনেই তোমরা তাঁর মুখপেক্ষী, সুতরাং তাঁর আনুগত্য যে জরুরী তা ভালো ভাবেই প্রমাণিত হয়। এরপর তোমাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে আত্নীয়তার সম্পর্ক ভয় করার। অর্থাৎ আত্নীয় স্বজনের অধিকার আদায় করবে। সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং অসদাচরণ থেকে বিরত থাকবে। সাধারণ ভাবে সকল মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা সম্পর্কে তো আয়াতের প্রথমাংশেই বলা হয়েছে। আত্নীয়-স্বজনদের সঙ্গে যেহেতু নৈকট্য ও বিশেষ ঘনিষ্টতা রয়েছে। তাই তাদের সঙ্গে অসদাচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে। কারণ, তাদের অধিকার অন্য সব মানুষের চেয়ে বেশী। হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে ঃ

'আল্লাহ তাবারক তায়ালা বলেনঃ আমিই আল্লাহ, আমিই রহমান। আত্মিয়তার সম্পর্ক আমারই সৃষ্টি। আর এ জন্য আমি আমার নাম বিদীর্ণ করে দিয়েছি। সুতরাং এ ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক মিলিত করে, আমি তাকে মিলিত করি। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ছিন্ন করে, আমি তাকে ছিন্ন করি'।

হাসীদ শরীফে আরও আছে ঃ

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি কূলকে সৃষ্টি করা শেষ করলে আত্নীয়তার সম্পর্ক উঠে আল্লাহর আরশ ধরে দাঁড়ায়। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন, কী হয়েছে? যারা তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে মুক্তি চায়, এ-তো সে স্থান। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে মিলিত হয় আমিও তার সঙ্গে মিলিত হই।

আর যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমিও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করি। সে জবাব দেয়, পরওয়ার দেগার নিশ্চয়ই আমি এতে খুশী। আল্লাহ বললেনঃ তবে এতেই খুশী থাক।

হাদীস শরীফে আরও আছে ঃ

আত্মীয়তার সম্পর্ক হচ্ছে রহমানুর রহীম আল্লাহর একটা শাখা বিশেষ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে তোমাকে মিলায়, আমি তাকে মিলাই। আর যে তা ছিন্ন করে, আমি তাকে ছিন্ন করি।

হাদীস শরীফে আরও বলা হয়েছে ঃ

আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহর আরশের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এবং সে সম্পর্ক বলে, যে আমাকে মিলায়, আল্লাহ তাকে মিলায়, আর যে আমাকে ছিন্ন করে, আল্লাহ তাকে ছিন্ন করেন।

এ সব হাদীস আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রমাণ এবং এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গীত করছে। মোদ্দাকয়া দাঁড়ায় এই যে, মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্যের কারণে সকল মানুষের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা জরুরী। অতঃপর কোন উপলক্ষে, কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে যদি প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দেয় যেমন এতীম মিসকীন ইত্যাদির ক্ষেত্রে তখন অধিকারের প্রতিও বেশী লক্ষ্য রাখতে হবে। আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তা সংরক্ষণ করার জন্য আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশের ফলে তার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ এবং সাধারণ সম্পর্ক প্রসঙ্গেই এ সূরায় অধিকাংশ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরার শুরুতে যে মৌলিক নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারই যেন বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে গোটা সূরায়।

৩. অর্থাৎ তিনি তোমাদের সকল কাজ আর সকল অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন। তাঁর নির্দেশ মেনে চললে সওয়াব পাবে, অন্যথায় আযাবের ভাগী হবে। তিনি তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক, তার বিভিন্ন পর্যায় এবং সকলের উপযুক্ত হক সম্পর্কেও ভালোভাবে জানেন। এ সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেন, তাকে সত্য জানবে এবং তদনুযায়ী আমল করবে।

৪. অর্থাৎ এতীম শিশু, যাদের পিতা মারা গেছে, তাদের ব্যাপারে তাদের অভিভাবককে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে, তারা বালেগা হলে তাদের ধন সম্পদ তাদের হাতে অর্পন করবে। অভিভাবকত্ব কালে এতীমদের কোন ভালো জিনিষ গ্রহণ করতঃ তার বিনিময়ে কোন নিকৃষ্ট জিনিষ তাদের সম্পদের সাথে মিশাবেনা। নিজেদের সম্পদের সঙ্গে তাদের সম্পদ মিশিয়ে খাবেনা। যেমন, অভিভাবকের জন্য অনুমতি আছে নিজের এবং এতীমের খাবার এক সাথে রাখা। অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এতীমের ক্ষতি না হয়। এক সঙ্গে থাকার অযুহাতে যাতে এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ না করা হয়। এমনিভাবে

এতিমের মাল খেয়ে নিজের সুবিধা আদায় করতে পারবেনা । কারণ, এতীমের মাল খাওয়া কঠোর গুনাহ। সম্ভবতঃ এজন্যই আত্মীয়তার সাথে সম্পর্কিত সম্পর্ক বিধানের ক্ষেত্রে এতীম সম্পর্কে সর্ব প্রথম আলোচনা কারা হয়েছে। কারণ, আসহায় নিরূপায় বিধায় সে সবচেয়ে বেশী অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য। আর এই গুরুত্বের কারণে তা সম্পদের সঙ্গে সম্পদ বদল করা এবং এজমালী রাখার ক্ষতি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে নির্দেশও দেয়া হয়েছে। পরবর্তী কয়েকটি আয়াতেও এতীমদের প্রসঙ্গেই আলোচনা করা হয়েছে। উপরোক্ত গুরুত্ব এ ক্ষেত্রেও সুপষ্টই প্রকাশ পায়। এসব বিধান এবং তাকীদ সবই এতীমদের সম্পর্কে নিকটাত্নীয় এতীম সম্পর্কে এ গুরুত্বে আরও বেশী হবে। এটাই এই আয়াত গুলোর সানে নুযুল এবং এদের মধ্যে যোগসূত্র। আর এটাই স্বাভাবিক। কারণ, নিকটাত্নীয়রাই এতীমের অভিভাবক হয়ে থাকে।

৫. হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে, যেসব এতীম কন্যা অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে থাকতো এবং নৈকট্যের কারণে তারা অভিভাবকের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে অংশীদারও থাকতো, এ ক্ষেত্রে দু'টি উপায় দেখা দিতো। কখনো এমন হতো যে, এতীমের সম্পদ ও রূপ- সৌন্দর্য অভিভাবকের পসন্দ হওয়ায় সামান্য মোহরানার বিনিময়ে অভিভাবক তাকে বিবাহ করে নিতো। কারণ, তার অধিকার দাবী করার মতো অন্য কেউ তো নেই। আবার কখনো এমনইতো যে, তাকে অন্যত্র বিবাহ দিলে তার সম্পদ আমার দখলের বাইরে চলে যাবে। আমার সম্পদে অন্য লোক ভাগ বসাবে। এই চিন্তা করে যেমন তেমন তাকে বিবাহ করে নিতো। কিন্তু তার প্রতি কোন আকর্ষণ থাকতোনা। এ উপলক্ষে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এতে এতীমের অভিভাবকদেরকে বলা হয় যে, তোমাদের যদি আশংকা হয় যে এতীম কন্যাদের ব্যাপারে ইনসাফ করতে পারবেনা, মোহরানা এবং সদাচরণের ব্যাপারে তোমাদের ত্রুটি হবে, তা হলে এ এতিমদেরকে তোমরা বিবাহ করবেনা। বরং অন্য যেসব নারী তোমাদের পসন্দ এক ক্ষেত্র চার পর্যন্ত তাদেরকে বিবাহ করতে পার। তোমাদের জন্য এ অনুমতি রয়েছে। শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে বিবাহ করবে। এতে এতীম কন্যাদের কোন ক্ষতি হবেনা। কারণ, তোমরা তাদের অধিকার হেফাযত করতে পারবে। তোমরা কোন গুনাহ এবং খারাব কাজে জড়াবেনা।

জেনে রাখা দরকার য়ে, একজন আযাদ মুসলমানের জন্য এক সঙ্গেঁ চারটি এবং গোলামের জন্য দুইটি বিবাহ করার অনুমতি আছে। হাদীস শরীফে স্পষ্ট ভাবে এর উল্লেখ রয়েছে। শরীয়তের ইমামরা এ ব্যাপারে একমত। সমস্ত উম্মতের জন্য এ বিধান রয়েছে। কেবল আল্লাহর রাসুল এই নির্দেশের ব্যতিক্রম। তাঁর জন্য এক সঙ্গেঁ চারের অধিক বিবাহ করার অনুমতি রয়েছে। এটা কেবল নবীর বৈশিষ্ট। এতীম কন্যাদের বিবায়ের তৃতীয় একটি সূরতও হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে। যে এতীম কন্যাদের প্রতি চেহারা সূরত এবং অর্থ -সম্পদের দিক থেকে অভিভাবকের কোন আকর্ষণ থাকতোনা, অভিভাবক তাকে অন্যত্র বিবাহ দিতো। কিন্তু এমন বিবায়ের সঙ্গে এই আয়াতের সম্পর্ক নাই, এটা সপষ্ট।

৬. অর্থাৎ তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, কয়েকজন স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ এবং সমান ব্যবহার করতে পারবেনা তবে এক বিবায়ই তুষ্ট থাকবে। অথবা এক বা একাধিক দাসীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ইচ্ছা করলে একজন স্ত্রীর সঙ্গে এক বা একাধিক দাসীও রাখতে পার।

৭. অর্থাৎ কেবল এক স্ত্রী বিবাহ করায় বা একাধিক দাসীতে তুষ্ট থাকায় বা এক বিবায়র সঙ্গে একজন বা একাধিক দাসী রাখায় আশা করা যায় যে, তাদের ব্যাপারে ইনসাফ না করলে তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবেনা। দাসীদের জন্য কোন মোহরানা নাই, তাদের সঙ্গে সামাজিক আচরনের ব্যাপারেও কোন সীমা নাই।

এক ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকলে খাওয়া দাওয়া এবং লেনদেনের ব্যাপারে সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করা ওয়াজেব। তাদের সঙ্গে রাত্রি যাপনের জন্য সমান পালা নিধকারণ করাও ওয়াজেব। সমান আচরন না করলে কেয়ামতের ছিন্ন সে পক্ষাঘতে আক্রান্ত হবে। এক পার্শ্বের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে চলবে। কারো বিবাহ বন্ধকে একজন স্ত্রী এবং একজন দাসী থাকলে দাসী স্ত্রীর অর্ধেক পালা পাবে। দাসীর পালার ব্যাপারে কোন সীমা নির্ধারিত নাই।

৮. অর্থাৎ যেসব নারীকে বিবাহ করবে, স্বেচ্ছায় সানন্দে তাদের মোহরানা পরিশোধ করবো। তাদের পক্ষে তাকাদা করার কেউ আসুক বা না আসুক নিজের আগ্রাহেই তা পরিশোদ করবে। এমন করতে পারলে এতীম কন্যাদেরকে বিবাহ করায় কোন দোষ নেই। দোষ হবে তখন, যখন মোহরানা আদায় এবং অধিকার দানে অনিহা থাকে।

৯. অর্থাৎ স্ত্রী যদি সন্তুষ্ট হয়ে মোহরানার কিছু অংশ স্বামীকে ক্ষমা করে দেয় বা গ্রহণ করে পুনরায় স্বামীকে দান করে দেয়, তবে এতেও কোন দোষ নেই। স্বামী স্বানন্দে তা খেতে পাবে। যে সুস্বাদু খাবার মন স্বানন্দে গ্রহণ করে তাকে বলা হয় 'হানী ' আর যে খাদ্য হযম হয়ে সহজেই দেহের অংশে পরিণত হয়, যা স্বাস্থ্যকর এবং বল বর্ধক তাকে বলা হয় 'মারী'।

১০. অর্থাৎ নির্বোধ বালকদের হাতে তাদের ধন সম্পদ তুলে দেবেনা। কারণ, আল্লাহ তায়ালা ধন সম্পদকে মানুষের জন্য জীবন-জীবিকার উপকরণ করেছেন। ববং এর পরিপূর্ণ হেফাযত করবে এবং ধ্বংসের আশংকা থেকে তাকে রাক্ষা করবে। যহক্ষণ তাদের লাভ-ক্ষতির জ্ঞান ফিরে না আসে ততক্ষণ তাদের সম্পদ থেকে তাদেরকে খাওয়াবে পরাবে। এমনভাবে তাদের দেখা শুনা করবে, যেন এ সব সম্পদ তোমাদের নিজেদের। আমরাতো তোমাদের কল্যাণ কামনা করি। তোমাদের হুশ জ্ঞান ফিরে এলে তোমাদের সম্পদ তোমাদেরকেই ফেরৎ দেওয়া হবে।

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا

النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ

اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا

فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ

فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا (৬) لِلرِّجَالِ

نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَلِلنِّسَآءِ

نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ

مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا (৭) وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ

اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ

وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا (৮) وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا

مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۪ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ

وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا (৯) اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ

أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ

وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ⑩

৬. ইয়াতীমদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে থাকবে- যতোক্ষণ না তারা বিয়ের বয়েস পর্যন্ত পৌঁছে, অতপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে (সম্পদ পরিচালনার) যোগ্যতা অনুভব করতে পারো- তাহলে তাদের ধন-সম্পদ তাদের হাতেই তুলে দেবে[১১], তারা বড়ো হবে এবং মাল সম্পদের দায়িত্ব নিজেরাই বুঝে নেবে। তাদের এই ধন-সম্পদ (আগে ভাগেই) তাড়াহুড়ো করে অন্যান্যভাবে হযম করে ফেলো না[১২], (ইয়াতীমদের পৃষ্ঠপোষক) যদি সম্পদশালী হয় তাহলে সে যেন— যা কিছু তার জন্যে বৈধ নয় তা থেকে বেঁচে থাকে, (তবে হাঁ) যদি (পৃষ্ঠপোষক) গরীব হয় তাহলে (সমাজের) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সে যেন (সংগত পরিমাণ অংশই) তা থেকে গ্রহণ করে[১৩]। অতপর যখন তোমরা তাদের ধন-সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেবে, তখন তার কিছু সাক্ষী বানিয়ে রেখো, (অবশ্য চূড়ান্ত) হিসাব কেতাব গ্রহণের জন্যে তো আল্লাহ্ তায়ালাই যথেষ্ট[১৪]।

৭. পুরুষদের জন্যে তাদের পিতামাতা ও আপনজনদের রেখে যাওয়া ধন-সম্পদে (সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকারের) অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্যেও একই ভাবে তাদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া ধন-সম্পদে সুনির্দিষ্ট অংশ রয়েছে (তার এই সম্পদের পরিমাণ) অল্প হোক কিংবা বেশী হোক (সর্বাবস্থায়ই কিন্তু আল্লাহর তরফ থেকে) এর অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে[১৫]।

৮. (মৃত ব্যক্তির সম্পদ) বন্টনের সময় যদি (তার) আপনজন ইয়াতীম ও মিসকীনরা (সেখানে) এসে হাযির হয়, তাহলে সেই সম্পদ থেকে তাদেরও কিছু অংশ দেবে এবং তাদের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলো[১৬]।

৯. (ইয়াতীম ও অসহায় সন্তানদের ব্যাপারে) মানুষের (এইটুকু) ভয় করা উচিত যে, যদি তারা নিজেরা (নিজেদের মৃত্যুর সময় ঠিক এভাবে) অসহায় সন্তানদের পেছনে রেখে চলে আসতো, তাহলে (তাদের ভালোমন্দের ব্যাপারেও) তারা এভাবে (চিন্তা করতো) ভীত শংকিত থাকতো, অতএব, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই (ইয়াতীম ও দুঃস্থদের ব্যাপারে) আল্লাহ্কে ভয় করে চলা উচিত এবং এদের সাথে (হামেশাই) ন্যায়-ইনসাফের কথাবার্তা বলা উচিত[১৭]।

১০. নিশ্চয়ই যে সমস্ত মানুষ অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের মাল-সম্পদ হস্তগত করে, তারা (প্রকারান্তরে এ দিয়ে যেন) আগুন দিয়েই নিজেদের পেট বোঝাই করে, অচিরেই তারা (এর শাস্তি হিসেবে) জাহান্নামের (কঠোরতম) আগুনে জ্বলতে থাকবে[১৮]।

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ⑪

রুকু ২

১১. আল্লাহ্ তায়ালা (মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারে) তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে এই মতে তোমাদের জন্যে বিধান জারী করছেনঃ দুই কন্যার অংশের সমপরিমাণ অংশ পুত্র সন্তান পাবে[১৯], কিন্তু (উত্তরাধিকারী) কন্যার সংখ্যা যদি দুয়ের বেশী হয়, তাহলে তাদের জন্যে (থাকবে) রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। আর কন্যা

সন্তান যদি হয় একজন, তাহলে তার অংশ হবে (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) অর্ধেক[২০]। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতামাতা উভয়েই রেখে যাওয়া সম্পদের ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে[২১] (অপর দিকে) মৃত ব্যক্তির যদি কোনো সন্তান না থাকে—এবং পিতামাতাই হয় একমাত্র উত্তরাধিকারী—তাহলে তার মায়ের অংশ হবে তিন ভাগের এক ভাগ[২২], যদি মৃত ব্যক্তির কোনো ভাই-বোন অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তার মায়ের অংশ হবে ছয় ভাগের এক ভাগ[২৩]- মৃত ব্যক্তির ওসীয়াত- যা সে আগেই করে গেছে এবং তার (রেখে যাওয়া) ঋণ আদায় করে দেয়ার পরই[২৪] (কিন্তু এই সব ভাগ-বাটোয়ারা করতে হবে) তোমরা জানোনা তোমাদের পিতামাতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি কে তোমাদের জন্যে উপকারের দিক থেকে বেশী নিকটবর্তী। (একারণেই এদের কাকে কি দিতে হবে, তা আল্লাহ্ তায়ালাই তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন) এ হচ্ছে আল্লাহর বিধান, অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা সকল কিছু সম্পর্কে ওয়াকেবহাল এবং তিনিই হচ্ছেন মংগলময়[২৫] (এই উত্তরাধিকার আইনের উদ্ভাবক)।

---

১১. অর্থাৎ এতীমদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাক বালেগ হওয়ার সময় পর্যন্ত। অতপর বালগ হওয়ার পর যখন দেখবে যে, নিজের লাভ-ক্ষতি ,ধন-সম্পদ রক্ষা করা এবং ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, তখন তাদের সম্পদ ফেরত দিবে। এতীমদেরকে সুধানো এবং তাদেরকে পরীক্ষা করার সর্বোত্তম পন্থা হেচ্ছে এই যে, সুক্ষ মূল্যের জিনিষ তাদের দ্বারা ক্রয় বিক্রয় করাবে। আর এই ক্রয় বিক্রয়ের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে তাদেরকে শিক্ষা দিবে। এ ক্ষেত্রে জানা যায় যে, অভিভাবকের অনুমতি ক্রমে নাবালকের ক্রয় বিক্রয় জায়েয। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এমত পোষণ করেন। বালেগ হয়েও যদি তার হুঁশ-জ্ঞান ঠিক মত না হয়, তবে ইমাম আবু হানীফার মতে ২৫ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ সময়ে তার জ্ঞান ফিরে আসুক না আসুক, ২৫ বৎসর বয়স হলে তার সম্পদ ফেরৎ দেবে।

১২. অর্থাৎ এতীমের সম্পদ প্রয়োজনের বেশী ব্যয় করা নিষেধ। যেমন, এক পয়সার স্থলে দুই পয়সা ব্যয় করা। এতীম আমাদের কাছ থেকে তার সম্পদ নিয়ে যাবে এই ভয়ে এতীমের মাল তাড়াহুড়া করে ব্যয় করাও নিষেধ। অর্থাৎ এতীমের মাল প্রয়োজন অনুপাতে যথাস্থানে ব্যয় করতে হবে।

১৩. অর্থাৎ অভিভাবক এতীমের মাল নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করবে না। এতীমের লালন পালন করা যদি অভাবী হয় তবে সেথায় বিনিময় গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে ধনী ব্যক্তির জন্য কিছুই গ্রহণ করা জায়েয নেই।

১৪. কোন শিশুর পিতা মারা গেলে কয়েকজন মুসলমানের উপস্থিতিতে এতীমের মাল লিখিত ভাবে আমানতদারের হাতে সমর্পন করা উচিৎ। এতীম শিশু সাবালক হলে লেখা অনুযায়ী তার সম্পদ তার কাছে প্রত্যর্পণ করা কর্তব্য। যা কিছু ব্যয় হয়েছে তাকে তা বুঝিয়ে দিবে। আর যা কিছু তার হাতে অর্পণ করবে, সঙ্গীদেরকে দেখায়ে করবে। কোন সময় এ নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে যাতে সহজে বিরোধ মীমাংসা থেকে পারে। আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর রক্ষক ও হিসাব গ্রহণকারী। তার কোন হিসাব বা সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। এসব কিছুই নির্ধারণ করা হয়েছে তোমাদের সুবিধার জন্য। তোমাদের নিষ্কলুষ থাকার জন্য। এতীমের সম্পদ নেয়া-দেয়ার সময় সাক্ষী করা এবং লিখিয়া নেওয়া মুস্তাহাব।

১৫. পয়গম্বর (সঃ) যমনার আগে নিয়ম ছিলো যে, কন্যা ছোট হোক কি বড়, তাদেরকে মীরাস দেওয়া হতোনা। বাচ্চা পুত্র সন্তানকেও মীরাস দেয়া হতোনা। কেবল বয়স্ক পুরুষ যারা দুশমনের সঙ্গে যুদ্ধ করার যোগ্য, তাদেরকেই ওয়ায়িস মনে করা হতো। এই নিয়মের ফলে এতীম শিশুরা মীরাসের কোন অংশ পেতোনা। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। আয়াতের সারকথা এই যে, পিতা মাতা এবং অন্যান্য নিকটাত্নীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুত্র সন্তানদের অংশ রয়েছে-তারা ছোট হোক বা বড়। তেমনি পিতা মাতা এবং এবং অন্যান্য নিকটাত্নীয়দের সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ রয়েছে, তারা ছোট হোক, কি বড়। তাদের এই নির্ধারিত অংশ দেওয়া জরুরী। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি কম-বেশী যাই হোক, তাদের এই অংশ অবশ্যই দিতে হবে। এটা দ্বারা জায়লী যুগের ঘৃণ্য প্রথা বাতিল করা হয়েছে। এতীমদের অধিকার সংরক্ষণ করে তাদের হক না দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে।

এই আয়াতে হক ওয়ালাদের হক এবং তা অতিসংক্ষিপ্ত ভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তী রুকূতে ওয়ায়িসদের হিশ্যা সম্পর্কে বিস্বারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১৬. অর্থাৎ মীরাস বন্টন কালে গোত্র পরিবারের লোকেরা একত্রিত হলে মীরাসে যেসব আত্নীয়ের অংশ নাই অথবা যারা এতীম-অভাবী, তাদেরকে কিছু দিয়ে বিদায় করবে অথবা পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে সুযোগ মতো তাদেরকেও কিছু দেবে। এটা মুস্তাহাব। মীরাসের সম্পত্তি থেকে কিছু দেওয়ার সুযোগ না থাকলে, যেমন এতীমের সম্পতি আর মৃত ব্যক্তি কোন অছিয়তও করে যায় নাই, এমতাবস্থায় তাদের সাথে ভালোকথা বলে, ভালো ব্যবহার করে বিদায় করবে। অর্থাৎ নম্রতার সঙ্গে ওযর পেশ করে বলবে যে, এটাতো এতীমের সম্পত্তি। মৃত ব্যক্তি কোন ওছিয়তও করে যায় নাই। তাই আমরা নিরুপায়। সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, সকল আত্নীয় পর্যায় অনুযায়ী ভালো ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। এতীম-মিসকীন বিশেষ করে নিকটাত্নীয় এতীম মিসকীন ইত্যাদির প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখতে হবে। তাই মীরাস বন্টনকালে তাদেরকে সাধ্য অনুযায়ী কিছু দেয়া উচিৎ। কোন কারনে তারা ওয়ারিস না হয়ে থাকলে ভালো ব্যাবহার ক্ষেত্রে যেন তারা বঞ্চিত না হয়।

১৭. মূলতঃ এ এরশাদ হচ্ছে এতীমের ওলীর জন্য। পর্যায় ক্রমে অন্যদেরকেও এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থ এইযে, মৃত্যুর পর সন্তানদের সঙ্গে কঠোর আচরণ আর খারাপ সম্পর্কে প্রত্যেকেই যেমন ভীত হয়, তেমনি তোদেরও উচিৎ হচ্ছে এতীমের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা নিজের মৃত্যুর পর আপন সন্তানদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা তোমার পসন্দ হয়। আল্লাহকে ভয় করবে এবং এতীমদের সঙ্গে সোজা এবং ভালো কথা বলবে। অর্থাৎ এমন কথা বলবে, যাতে তাদের মনে আঘাত না লাগে এবং ক্ষতি না হয়। বরং সংশোধন হয়, উপকার হয়া।

১৮. বিগত কয়েকটি আয়াতে এতীমের সম্পত্তির ব্যাপারে নানা ভাবে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের সম্পত্তিতে খেয়ানত করাকে বড় গুনাহ বলা হয়েছে। এখন শেষ পর্যায়ে এতীমের সম্পত্তিতে খেয়ানত করার জন্য কঠোর শাস্তির কথা বলে সে নির্দেশের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে কেউ এতীমের সম্পদ খায় সে নিজের পেটে জাহানামের আগুন ঢুকায়। অর্থাৎ এটাই হবে এতীমের সম্পত্তি খাওয়ার পরিণাম। শেষ বাক্যে এই কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

১৯। উপরে মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের মীরাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের অধিকার ও হিশ্যা নির্ধারণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখন নিকটবর্তীয় ও তাদের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে। পূর্ব থেকে এতীমদের হক সম্পর্কে কঠোরতা এবং নানাবিধ তাকীদ নিয়ে আলোচনা চলে আসছে। এ থেকে জানা যায় যে, মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের মধ্যে কোন এতীম থাকলে তার প্রাপ্য অংশে ব্যাপারে অনেক সতর্ক অনেক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আরব বাসীদের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী তাদেরকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা বড় যুলুম এবং বিরাট গুনাহ। অতঃপর নিকটাত্মীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম সন্তানের হিস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কোন মৃত ব্যক্তির সন্তানের মধ্যে পুত্র-কন্যা থাকলে উভয়ই তাদের মধ্যে মীরাস বন্টনের নিয়ম এই যে, একজন পুত্র দুইজন কন্যা সন্তানের সমান অংশ পাবে। যেমন একজন পুত্র ও দুইজন কন্যা থাকলে অর্ধেক সম্পত্তি পাবে পুত্র আর বাকী অর্ধেক পাবে দুইজন কন্যা। একজন পুত্র এবং একজন কন্যা থাকলে তিনভাগের দুইভাগ পাবে পুত্র এবং একভাগ পাবে কন্যা।

২০. অর্থাৎ কোন মৃত ব্যক্তি যদি সন্তানের মধ্যে কন্যাই রেখে যায় ,তখন তারা যদি দুইয়ের বেশী হয় তবুও তারা তিনভাগের দুইভাগ পাবে। মাত্র একজন কন্যা রেখে গেলে সে পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক।

একজন পুরুষের জন্য

দু'জন, নারীর সমান অংশ রয়েছে এ পর্যায়ে জানা যায় যে, একজন পুত্রের সঙ্গে একজন কন্যা পাবে এক তৃতীয়াংশ। সুতরাং একজন কন্যা অপর কন্যার সঙ্গে ভালো ভাবেই এক তৃতীয়াংশ পাবে। কারণ, পুত্রের অংশ কন্যার অংশের চেয়ে বেশী। পুত্রের কারণে যখন তার অংশ এক তৃতীয়াংশের চেয়ে কম হয়নি, সুতরাং অন্য কন্যার কারণে তা কি করে

হ্রাস পেতে পারে? সুতরাং দু'জন কন্যার হুকুম যেহেতু প্রথম আয়াত থেকেই জানা গেছে, তাই এখানে দুইজনের অধিক কন্যার হুকুম সম্পর্কে বলে দেওয়া হয়েছে। যাতে কারো মতে এ সন্দেহ না জাগে, দুইজন কন্যার হক যেহেতু একজন কন্যার চেয়ে বেশী, সুতরাং তিজন বা চারজন কন্যার অধিকার দুইজন কন্যার চেয়ে বেশী হবে। কিন্তু এটা কখনো হতে পারেনা। কন্যা একের অধিক হলে তা দুইজন থেকে, বা দশজন তারা দুই তৃতীয়াংশই পাবে।

সন্তানের ওয়ারিস হওয়ার দুইটা সূরত এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এক পুত্র এবং কন্যা উভয় প্রকার সন্তান। দুই কেবল কন্যা সন্তান। এর আবার দুই সূরত হতে পাবে কন্যা একজন হবে, বা একজনের বেশী। এখন অবশিষ্ট রয়েছে কেবল একটি সূরত অর্থাৎ কেবল পুত্র সন্তান। এই সূরতের হুকুম এই যে, সমস্ত সম্পত্তি সে-ই পাবে, তা পুত্র একজন হোক, বা একাধিক।

২১. মাতা পিতার মীরাসের তিনটি সূরত বর্নীত হয়েছে। প্রথম সূরতের সার কথা এই যে, মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র বা কন্যা সন্তান থাকে, তবে মৃত ব্যক্তির পিতা মাতা প্রত্যেকেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে।

২২. দ্বিতীয় সূরত এই যে, মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তানই না থাকে, কেবল পিতা মাতাই ওয়ারিস হয়, তখন মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ, অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ পাবে পিতা।

২৩. তৃতীয় সূরত এই যে, মৃত ব্যক্তির যদি একাধিক ভাই বোন থাকে, তারা একই পিতা মাতার পক্ষে হোক, বা শুধু মাতা বা শুধু পিতার পক্ষে, এ ছাড়া মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তানাদী না থাকে, তখন মাতা পাবে ছয় ভাগের একভাগ। অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি পিতা পাবে। ভাই-বোন কিছুই পাবে না। আর মৃত ব্যক্তির কেবল একভাই বা শুধু একবোন থাকলে তখন মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ, পিতা পাবে তিন ভাগের দুইভাগ। উপরে উল্লেখিত দ্বিতীয় সূরত অনুরূপ।

২৪. অর্থাৎ ওয়ারিসদের হিশ্যা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, এইসবই দেয়া হবে মৃত ব্যক্তির ওছিয়ত এবং তার বস্ত্র ঋণ পৃথক করার পর। ওছিয়ত পূরা করা এবং ফরয আদায় করার পর যা থাকবে, তাই ওয়ারিশদের সম্পত্তি। অর্ধেক বা তিন ভাগের এক ভাগ বলতে তাই বুঝাবে, সমস্ত সম্পত্তি নয়।প্রথমে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার দাফন কাফনে ব্যয় করা হবে। অতঃপর তার ঋণ শোধ করা হবে। এর পর যা থাকবে, তার এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওছিয়ত অনুযায়ী ব্যয় হবে। এর পর যা থাকে, তাই বন্টন করা হবে ওয়ারিশদের মধ্যে।

২৫. আয়াতে দুইটি মীরাস বর্ননা করা হয়েছে সন্তানের এবং পিতা মাতার। এখন বলা হয়েছে যে, কার দ্বারা কতো পরিমাণ তোমাদের উপকার হবে, যেহেতু এটা

তোমাদের জানা নাই। সুতরাং এ ব্যাপারে তোমাদের নাক গলানোও উচিৎ নয়। আল্লাহ তায়ালা যার যে পরিমাণ অংশ নির্ধারণ করে দিয়াছে, তা যথা রীতি মেনে চলবে। কারণ, তিনি সব কিছুর খবর রাখেন, তিনি বড় প্রজ্ঞাময়।

وَلَكُمْ نِصْفُ

مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ

وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَاۤ

اَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ

وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ

كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى

الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ

وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۲﴾ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۳﴾

وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ
نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ⑭

১২. তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তোমাদের অংশ হচ্ছে অর্ধেক- যদি তাদের কোনো সন্তানাদি না থাকে, আর যদি তাদের সন্তান-সন্তুতি থাকে, তাহলে তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তোমাদের অংশ হবে চার ভাগের এক ভাগ, তারা (আগে নিজেদের সম্পদের ব্যাপারে) যে ওসীয়াত করে গেছে কিংবা (তাদের রেখে যাওয়া) ঋণ পরিশোধ করার পরই[২৬] (এই অংশ তোমরা পাবে)। (তারা তোমাদের স্ত্রীরা) তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশের মালিক হবে- যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে, যদি তোমাদের কোনো সন্তান-সন্তুতি থাকে, তাহলে তারা পাবে রেখে যাওয়া সম্পদের আট ভাগের এক ভাগ। মৃত্যুর আগে তোমরা যা ওসীয়াত করে গেছো কিংবা যে ঋণ তোমরা রেখে গেছো তা পরিশোধ করে দেয়ার পরই[২৭] (এই বাটোয়ারা কার্যকর হবে)। যদি কোনো পুরুষ কিংবা নারী এমন হয় যে, তার কোনো সন্তানও নেই- পিতা মাতাও নেই তবে তার এক ভাই ও এক বোন যদি (তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে) বেঁচে থাকে, তাহলে তারা সবাই ছয় ভাগের এক ভাগ সম্পত্তি পাবে[২৮], তবে ভাই-বোনের সংখ্যা যদি এর চাইতে বেশী হয়, তবে (মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির) এক-তৃতীয়াংশে তারা সবাই (সমপরিমাণ অংশীদার (অবশ্য এই সম্পত্তির ওপর) মৃত ব্যক্তির যে ওসীয়াত করা আছে কিংবা কোনো ঋণ রয়ে গেছে তা পরিশোধ করার পরই (এই বাটোয়ারা কার্যকর হবে)। তবে এই ওসীয়াত ও ঋণ যেন উত্তরাধিকারীদের অধিকার পাওয়ার পথে) ক্ষতিকর হয়ে না দাঁড়ায়[২৯] (তাও জীবিতদের খেয়াল রাখতে হবে, উত্তরাধিকার বন্টনের ব্যাপারে) এই হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ, আর আল্লাহ্ তায়ালা সর্বজ্ঞানী ও পরম ধৈর্যশীল[৩০]।

১৩. (আলোচ্য বিধিবিধানের) এই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক (বলে দেয়া) সীমারেখা, যে ব্যক্তি (আল্লাহর এই সীমারেখায় থেকে) তাঁর ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ্ তাকে (আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে) এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে সে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে। মূলত এ হবে এক মহা সাফল্য।

১৪. অপরদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে এবং (জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে) তাঁর (নির্ধারিত) সীমারেখা লংঘন করে চলবে, আল্লাহ

তায়ালা (এই বিদ্রোহের শাস্তি হিসেবে তাকে (জ্বলন্ত) আগুনে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে অনন্তকাল ধরে (আগুনে জ্বলতে) থাকবে (বস্তুত এ হচ্ছে) তার জন্যে অপমান ও লাঞ্ছনামূলক শাস্তি৩১।

২৬. এখন স্বামী-স্ত্রীর মীরাস সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ পুরুষ পাবে স্ত্রীর সম্পত্তিতে অর্ধেক অংশ, যদি স্ত্রীর কোন সন্তানাদী না থাকে। যদি স্ত্রীর সন্তানাদী থাকে, তা একজন পুত্র বা কন্যাই থাকুক না কেন, আর তা সেই পুরষের পক্ষে হোক, বা অন্য কোন পক্ষে, তখন ঋণ এবং ওছিয়তের পর স্ত্রীর সম্পত্তির চার ভাগের একভাগ পাবে স্বামী।

২৭. আর এমনিভাবে স্ত্রী পাবে স্বামীর সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ যদি স্বামীর কোন সন্তানাদী না থাকে। স্বামীর সন্তানাদী থাকলে, তা সে নারীর পক্ষে হোক, বা অন্য নারীর পক্ষে, তখন স্ত্রী পাবে আটভাগের একভাগ। তারাও পাবে ওছিয়ত এবং ঋণ আদায় করার পর। নগদ টাকা পয়সা, স্বর্ণ, অস্ত্র শাস্ত্র বসত বাড়ী এবং বাগান বাড়ী, সবই সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত। অবশিষ্ট রয়েছে নারীর মোহরানা। তা মীরাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা করথের অন্তর্ভূক্ত। পুরুষের মীরাসের মতো এখানেও মোট দুটি সূরত হয়েছে।

২৮. এখান থেকে আখইয়াফী ভাই-বোনের মীরাস সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। ভাই-বোন তিা রকমের। এক, একই মাতা-পিতার ঔরসজাত। এদেরকে বলা হয় আইনী ভাই। দুই, যাদের বাপ এক মা দুই। এদেরকে বলা হয় আল্লাতী ভাই। তিাঃ যাদের মা এক, বাপ দুই। এদেরকে বলা হয় আখইয়াফী ভাই। এই আয়াতে শেষ রকমের ভাই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মৃত ব্যক্তির সে পুরুষ হোক কি স্ত্রী পিতা মাতা বা পুত্র কন্যা কিছুই থাকেনা, তার কেবল একজন আখইয়াফী ভাই বা একজন আখইয়াফী বোন থাকে, তবে তাদের দুজনের প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। আর পুরুষ বা নারী অর্থাৎ আখাইয়াফী ভাই-বোন সমান পাবে, কম বেশী হবেনা। অবশিষ্ট রয়েছে দুই রকমের ভাই-বোন অর্থাৎ আইনী এবং আল্লাতী ভাই-বোন। এই দুই রকমের হুকুম হচ্ছে সন্তানের মতো। অবশ্য এজন্য শর্ত হচ্ছে এই যে, মৃত ব্যক্তির পিতা -পুত্র কিছুই যদি না থাকে। সর্ব প্রথম আইনী ভাইয়ের স্থান। তা না থাকলে আল্লাতী ভাইয়ের স্থান। এই সূরার শেষের দিকে এই উভয়ের মীরাস সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

'কালালার' তাফসীরে বলা হয়েছে এমন মৃত ব্যক্তি, যার পিতা-পুত্র কিছুই নাই। এই তাফসীরের ব্যাপারে সকলে একমত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে যে মৃত ব্যক্তির পিতা-পুত্র ছাড়া দাদী পৌত্রীও নাই, কালালা বলতে তাকেও বুঝায়। তাঁর মতে পিতা-পুত্রের যে হুকুম,দাদী পৌত্রীরও সে হুকুম। হযরত ছাহাবায়ে কেরামের সময় শেষে এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ চলে আসছে।

২৯. অর্থাৎ আখইয়াফী ভাই-বোন যদি একজনের বেশী থাকে, তারা সকলে মীরাসে এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি পাবে। প্রথম সূরতে যে ছয় ভাগের এক ভাগ এবং দ্বিতীয় সূরতে তিন ভাগের এক ভাগ দেয়া হবে, তা দিতে হবে মৃত ব্যক্তির ওছিয়ত পূরণ করার এবং করয শোধ করার পর। ওছিয়তের স্থান মীরাসের উপরে, যখন এ ওছিয়ত দ্বারা অন্যদের ক্ষতি না হয়। এ ক্ষতি দুই রকমে হতে পারে। এক, সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশীর ওছিয়ত করা হলে। দুই যে ওয়ারিস মীরাসে অংশ পাবে, তার জন্য ওছিয়ত করে গেলে। এ ভাবে ওছিয়ত করে অপরের ক্ষতি করা জায়েয নাই। অবশ্য সকল ওয়ারিশ এই ওছিয়ত মেনে নিলে ভালো কথা, অন্যথায় এই ওছিয়ত বাতিল হবে।

যেহেতু মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের পক্ষ থেকে তার করয এবং ওছিয়ত পূরণ না করার আশংকা ছিলো, এসব আদায় না করে তারা সমস্ত সম্পত্তি নিজেদের কাছেই রেখে দিতে পারে, তাই মীরাসের সঙ্গে তাকীদ দিয়ে বারবার করয এবং ওছিয়তের কথা বলা হচ্ছে। যেহেতু ওছিয়ত করা নফল কাজ। এটা এক প্রকার ইহসান। অনেক সময় কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি এই ওছিয়তের অধিকারী হয়না, তাই এটা নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভবনা ছিলো। এ কারণে এর গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বত্র করয-এর আগে ওছিয়তের কথা বলা হয়েছে। অথচ ওছিয়তের স্থান করযের পর। এ সম্পর্কে আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। উপরন্তু ওছিয়ত হচ্ছে দাফন-কাফনের মতই ওছিয়তকারীর হক। এটা মীরাস এবং করযের বিপরীত। এ গুলি হচ্ছে অপরের হক। এই বিচারেও ওছিয়তের স্থান করযের উপরেই হওয়া উচিৎ। যদিও অন্য কারণে করযের স্থান ওছিযতের উপরে। এখানে

'যা ক্ষতিকর নয় বলে যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে।' পূর্ববর্তী স্থানেও এই শর্ত গ্রাহ্য হবে।

৩০. রুকূর শুরু থেকে এ পর্যন্ত যেসব মীরাসের আলোচনা করা হয়েছে। তা পাঁচ পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী এবং আখাইয়াফী ভাই-বোন। এই পাঁচ জন ওয়ারিসেকে বলা হয় 'যবীল ফরূয' বা অংশীদার। এই পাঁচ ধরনের মীরাস সম্পর্কে আলোচনা করে তাকীদ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এটা আল্লাহর নির্দেশ। এই নির্দেশ পালন করা জরুরী। আর আল্লাহ তাআলার সব কিছুই জানা আছে। তার আনুগত্য করে আর কে নাফরমানী করে, কে মীরাস অসিয়ত এবং কবয আদায়ে ও ইনসাফ করে, আর কে বে-ইনসাফী করে ক্ষতি করে, সব কিছুই তাঁর জানা আছে। বাকী যুলুম বে-ইনসাফীর শাস্তি দানে বিলম্ব থেকে দেখে কেউ যেন বিভ্রান্ত না হয়। কারণ আল্লাহ তাআলার ধৈর্যও অত্যন্ত পরিপূর্ণ।

জেনে রাখা ভালো যে, এ রুকুতে যে 'যবীল ফরূযদের' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, এ ছাড়া অন্য এক রকমের ওয়ারিসও রয়েছে, যাদেরকে বলা হয় আছাবা। এদের জন্য কোন নির্দিষ্ট অংশ যেমন অর্ধেক বা তিনভাগের একভাগ নির্ধারিত নাই। বরং যবীল ফরূয়কে দিয়ে যা বাঁচবে, এরা তাই পাবে। যেমন, কারো যদি আছাবা থাকে, কোন যবীল

ফরূয় না থাকে , তবে তার সমস্ত সম্পত্তি আছাবা পাবে। আর উভয়ে থাকলে যবীল ফরূয়কে স্থলে যা অবশিষ্ট থাকবে, তাই আছাবা পাবে। কিছুই অবশিষ্ট না থাকলে আছাবা কিছুই পাবেনা। মূলতঃ আছাবা হচ্ছে পুরুষ, নারী নয়। তার এবং মৃত ব্যক্তির মধ্যে নারীর মধ্যস্থতাও থাকেন। এর চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরে পুত্র এবং পৌত্র। দ্বিতীয় স্তরে পিতা এবং দাদা। তৃতীয় স্তরে ভাই এবং ভাতিজা আর চতুর্থ স্তরে রয়েছে চাচা এবং চাচার পুত্র বা তার পৌত্র। যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির নিকটতর হবে, সেই হবে অগ্রগণ্য। যেমন পৌত্রের চেয়ে পুত্র, ভাতিজার চেয়ে ভাই অগ্রগণ্য। অতঃপর সৎ ভাইয়ের চেয়ে আপন ভাই অগ্রগণ্য। এই চারজন ছাড়া সন্তানদের এবং ভাইদের মধ্যে পুরুষের সঙ্গে নারীও আছাবা হয়। অর্থাৎ পুত্রের সঙ্গে কন্যা এবং ভাইয়ের সঙ্গে বোনও আছাবা হবে। তবে এরা আসল আছাবা নয়। সন্তান এবং ভাইদের ছাড়া নারী আছাবা হবেনা। যেমন চাচার পুত্র আছাবা, কিন্তু তার সঙ্গী হলে চাচাত বোন আছাবা হতে পারেনা।

উপরে উল্লেখিত এই দুই প্রকার অর্থাৎ 'যবিল ফরূয' এবং 'আছাবা' ছাড়াও ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তৃতীয় প্রকার ওয়ারিসও রয়েছে। এদেরকে বলা হয় 'যবিল আরহাম'। অর্থাৎ এমন নিকটাত্মীয়, যাদের এবং মৃত ব্যক্তির মধ্যে নারীর মধ্যস্থতা রয়েছে এবং যারা যবিল ফরূয নয়। এবং আছাবাও নয়। যেমন নাতি ও নানা, ভাগ্নে ও মামা, খালা এবং ফুফী এবং এদের সন্তান। কোন মৃত ব্যক্তির যবিল ফরূয এবং আছাবা কিছুই না থাকলে তার মীরাস পাবে যবিল আরহাম। এ সম্পর্কে ফারায়েয গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩১. অর্থাৎ এতীম, মীরাস এবং ওছিয়ত সংক্রান্ত উপরে উল্লেখিত সমস্ত বিধান আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা। যে কেউ আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করবে- ওছিয়ত এবং মীরাসের হুকুমও যার অন্তর্ভূক্ত তার জন্য রয়েছে চিরন্তন জান্নাত। আর যে কেউ নাফরমানী করবে, আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা রেখা থেকে বের হয়ে যাবে, সে সর্বদা যিল্লতির সঙ্গে জাহান্নামের আযাবে নিক্ষিপ্ত থাকবে।

وَالّٰتِيْ

يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ

اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ

حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿١٥﴾

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا

فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾ اِنَّمَا

التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ

يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ

يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ

كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٨﴾

রুকু ৩

১৫. তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা (ব্যভিচারের মতো জঘন্য) দুষ্কর্মে লিপ্ত হবে, তাদের ব্যাপারে তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী যোগাড় করবে, অতপর সে চারজন লোক যদি (সেই নারীর ব্যাপারে হাঁ-বোধক) সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলে সে (অপরাধী) নারীদের গৃহের ভেতর অবরুদ্ধ করে রাখবে- যতোদিন না মৃত্যু এসে তাদের জবিনের সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয় অথবা আল্লাহ্ তায়ালা তাদের (শাস্তির) জন্যে অন্য কোনো পথ তোমাদের বাতলে না দেন৩২।

১৬. আর তোমাদের মধ্যে যে দু'জন (নর-নারী) এই (ব্যভিচারের) কাজ করবে, তাদের দু'জনকেই তোমরা শাস্তি দেবে৩৩, হাঁ তারা যদি তওবা করে এবং (সেই মোতাবেক নিজেদের পরবর্তী জীবনের) সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদের রেহাই দাও, অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা মহান তওবা কবুলকারী এবং বিশাল দয়ার আধার৩৪।

১৭. আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে তাদের তওবাই কবুল হবে- যারা গুনাহের কাজ করে না জেনে, অতপর (জানামাত্রই) তারা (গুনাহের কাজ থেকে) ফিরে আসে, মূলত এরাই হচ্ছে সে সব লোক-- যাদের আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমা করে দেন, আর আল্লাহ্ তায়ালাই হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত ও সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী৩৫।

১৮. আর তাদের জন্যে তওবার কোনো অবকাশই নেই, যারা (আজীবন) শুধু গুনাহ্র কাজই করে বেড়ায়। এভাবেই (গুনাহ্র কাজ করতে করতে) একদিন তাদের কারো (দুয়ারে) যখন মৃত্যু এসে হাযির হলো, তখন (মৃত্যু অবধারিত জেনে) সে বললো- (হে আল্লাহ্) আমি এখন তওবা করলাম। (আবার) তাদের জন্যেও কোনো তওবা) নয়, যারা কাফের অবস্থায় ইহলীলা সাংগ করলো, এরাই হচ্ছে সে (নরাধম) ব্যক্তি, যাদের জন্যে আমি কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছি৩৬।

---

৩২. এতীম, ওয়ারিশদের সম্পর্কে আলোচনা করার পর এখন আত্নীয়দের সম্পর্কে অন্য বিধি-বিধান আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে নারীদের সম্পর্কে কিছু কথা বলা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত সার এই যে, নারীদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষ দেওয়া এবং ভালো ভাবে গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী কাজ। তাদের প্রতি কোন প্রকার অন্যায় বাড়াবাড়ি এবং যুলুম করা যাবেনা। জাহলী যুগে নারীদের ব্যাপারে এই উভয় ক্ষেত্রে অনেক অন্যায় আচরণ করা হতো। এই আয়াতে নারীদের শাসন করা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কারো স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে বলে জানা গেলে এজন্য জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাপ্ত বয়স্ক চার জন স্বাধীন মুসলমানকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করতে হবে। ঘরের বাইরে যাওয়া এবং কাহারো সঙ্গে মেলামেশা করা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করে দিতে হবে। এই অবস্থায় সে মারা যাবে অথবা আল্লাহ তার জন্য অন্য কোন বিধান বা শাস্তি নির্ধারণ করবেন। তখন পর্যন্ত ব্যভিচারী নারীর জন্য অন্য কোন দন্ড নির্ধারিত হয় নাই। যদিও এর ওয়াদা করা হয়েছিল। পরে সূরা নূর -এ এর শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে যে, অবিবাহিতা কুমারী নারীর জন্য শত ঘা চাবুক মারতে হবে আর বিবাহিতা স্ত্রীকে করতে হবে প্রস্তর ঘাতে প্রাণবধ।

৩৩. অর্থাৎ দুইজনের মধ্যে একজন নারী এবং একজন পুরুষ হোক, বা উভয়েই পুরুষ হোক এরা যদি কুকাজ করে, তবে তাদের শাস্তি হবে কষ্ট দেওয়া এখানে সংক্ষেপে তাদের এই শাস্তিই উল্লেখ করা হয়েছে। (সমকামীতার আরবী পরিভাষা হচ্ছে লাওয়া তাত) মুখ এবং হাত দ্বারা তাদেরকে প্রয়োজনীয় শাস্তি দেয়ার হুকুম করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, তখন পর্যন্ত যেনা এবং লাওয়াতাত ব্যবিচার ও পুরুষে পুরুষে সঙ্গমের এই হুকুম ছিলো যে, হাকেম এবং কাযীর মতে তিরস্কার ও শিক্ষা দানের জন্য যতটুকু শাস্তি এবং গালিগালাজ ও মারপিট জরুরী, ততটুকুই দেয়া হবে। এর পর ওয়াদা অনুযায়ী যখন যেনা-ব্যভিচারের শাস্তির আয়াত নাযিল হবে যে, তখন লাওয়াতাত-এর

জন্য কোন স্বতন্ত্র বিধান নাযিল করা হয় নাই। যেনা এবং লাওয়াগত এর একই শাস্তি, না এর আগের শাস্তি বহাল আছে, না তরবারী দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে হত্যা করা এর শাস্তি ব্যাপারে, আলেম সমাজের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

অনেক আলেমের মতে আয়াতটি যেনা প্রসঙ্গে কারো কারে মতে লাওয়াতাত প্রসঙ্গে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, আয়াতটি উভয় প্রসঙ্গেঁ।

৩৪. অর্থাৎ অতঃপর তারা যদি কুকাজ থেকে তওবা করে ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের আমলের সংশোধন করে নেয়, তবে আর তাদের পেছনে লাগবেনা। তাদেরকে তিরস্কার ভৎসনা করা ছেড়ে দেবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, তাদের প্রতি দয়া করেন। তোমাদেরও এমনটি করা উচিৎ।

৩৫. অর্থাৎ তওবা তো নিঃসন্দেহে এমন জিনিষ, যেনা-লাওয়াতের মতো মারাত্নক অপরাধও আল্লাহ যদ্বারা ক্ষমা করে দেন, পূর্ববর্তী আয়াত থেকে এটাই জানা যায়। কিন্তু একথা অবশ্যই স্মরন রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা যে তাঁর আপন ফযল -অনুগ্রহে তওবা কবুল করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, এটা সে সব লোকদের জন্য খাছ যারা অজ্ঞতা-অসতর্ককা বশতঃ কোন ছগীরা বা কবীরা গুনাহ করে বসে। কিন্তু নিজেদের অপকর্ম সম্পর্কে জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ তওবা করে নেয়, লজ্জিত হয়। এমন লোকদের অপরাধ আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করেন। আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই জানেন। তিনি জানেন, কে অজ্ঞতা বশতঃ গুনাহ করেছে এবং এখলাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে তওবা করেছে। তিনি মহাকুশলী। যে তওবা কবুল করা তাঁর হেকমতের অনুকুল, তা কবুল করে নেন। অজ্ঞতা বশতঃ' এবং 'অবিলম্বে' দ্বারা জানা যায় যে, যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ গুনাহ করে এবং অবহিত হওয়ার পর অবিলম্বে তওবা করে নেয়, আল্লাহর আদল ও হেকমতের কায়দা অনুযায়ী তাদের তওবা কবুল হওয়ার কথা। আর যে ব্যক্তি জেনে শুনে আল্লাহর নাফরমানীতে ঔদ্ধর্ত করেছে অথবা জানতে পারার পরও তওবায় বিলম্ব করেছে এবং আগের অস্থায়ই অটল রয়েছে, তবে আল্লাহর সুবিচারের নিয়ম অনুযায়ী তার অপরাধ মূলতঃ ক্ষমার যোগ্য নয়। এটা কবুল করা নিছক আলাহ তায়ালার অনুগ্রহ। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অনুগ্রহে এই উভয় তওবা কবুল করে নেন। এটা তাঁর এহ্সান মাত্র। দায়িত্ব কেবল প্রথম সূরতে, দ্বিতীয় সূরতে নয়।

৩৬. অর্থাৎ যারা নিয়মিত গুনাহ করে যায়, তা থেকে ফিরে আসেনা ,শেষ পর্যন্ত মৃত্যু দেখতে বসে বলে, আমি এখন তওবা করছি এমন লোকদের তওবা কবুল হয়না। এমন লোকদের তওবাও কবুল হয়না যারা কুফুরী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে। অতঃপর পরকালের আযাব দেখে তওবা করে। এমন লোকদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। তওবা কবুল হওয়া না হওয়া সম্পর্কে এখানে যে দুইটি আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে আমরা অতীতের বড় বড় মুহাককেদের 'তাহকীক' অনুযায়ী আয়াত দুইটির ব্যাখ্যা করছি। আমাদের এই ব্যাখ্যার সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য এই যে, এতে 'অজ্ঞতা বশত' এবং 'অবিলম্বে'

কে বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে আর শব্দটির সহজ অর্থ করা হয়েছে। এখানে তওবা কবুল হওয়া না হাওয়া উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, যেনতেন প্রকারে তওবা করলেই কবুল হয়না। তওবা কয়েক প্রকারের আছে। এসব প্রকারের তওবা কবুলের মধ্যেও প্রার্থক্য রয়েছে। উদ্দেশ্য এইযে, যাতে তওবার উপর ভরসা করে কেউ যেন গুনায়র কাজে বাহাদুরীঔধ্যত্ব না করে। আমাদের উপরের ব্যাখ্যায় এই উদ্দেশ্যও ভালোভাবে সাধিত হয়।

কিন্তু অন্যান্য মুফাসসিররা এর ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাঁরা 'অজ্ঞতা বশত' এর শর্তকে আবশ্যিক শর্ত হিসেবে গ্রহণ না করে প্রাসঙ্গিক শর্ত হিসেবে গ্রহণ করেন। এই ব্যাখ্যা করে তাঁরা বলেন যে, গুনাহ সর্বদা অজ্ঞতা এবং বোকামী বশতঃই হয়ে থাকে। তাঁরা এর অর্থ করেন যে, মৃত্যু হাযির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যেটুকু সময় আছে, তাই কারণ, দুনিযার জীবনতো সামন্য।তাঁদের এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এর অর্থ দাঁড়ায় এইযে, যারা বোকামী এবং অপরিনাম কারণে গুনাহ করে এবং মৃত্যু আসার আগে তওবা করে লয়, আল্লাহ তাআলা তাদের তওবা কবুল করার ওয়াদা করেছেন। আর যারা মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছে এবং প্রাণ বাহির করার অবস্থায় পৌছে অথবা যারা কফুরী অবস্থায় পৌছে অথবা যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহাদের তওবা কখনো কবুল করা হবেনা। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী তওবা কারীদের দুইটি সূরতই পাশাপাশি রয়েছে। আমাদের ব্যাখ্যায়ও এই দুইটি সূরত প্রথম পর্যায় অর্থাৎ যাদের তওবা কবুল হবে, তাদের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

যখন মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে উঠে এবং অপর জগৎ দেখা যায়, সে সময়ের তওবা কবুল হয়না। পরকাল জগত দেখার আগের তওবা কবুল হয়। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সূরতে তওবা কবুল করা ইনসাফের নিয়ম অনুযায়ী হয়ে অন্যান্য সূরতে তওবা কবুল করা কেবল তাঁর অনুগ্রহ।

يَـٰٓأَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا

أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ
فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ
زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ
وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا ﴿٢١﴾ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

১৯. হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ওপর) ঈমান এনেছো তোমাদের জন্যে কখনো জোর করে (স্বামী-মৃতা) নারীদের উত্তরাধিকার হয়ে বসা বৈধ নয়, (বিয়ের সময়) মোহর হিসেবে যা তোমরা তাদের দিয়েছো- জ্বালা যন্ত্রণা ও উৎপীড়ন করে তার কোনো অংশ আত্মসাত করার চেষ্টা করো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রকাশ্য কোনো ব্যভিচারের কাজে লিপ্ত না হয়[৩৭], ততোদিন পর্যন্ত তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো- এমনকি তোমরা যদি তাদের পছন্দ নাও করো- এমনও তো হতে পারে যে, যা কিছু তোমাদের ভালো লাগে না, তার মধ্যেই আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্যে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখে দিয়েছেন[৩৮]।

২০. আর যদি তোমরা এক স্ত্রীকে (তালাক দিয়ে তার) জায়গায় আরেকজন নারী গ্রহণ করার সংকল্প করেই নাও তাহলে সেই (তালাকপ্রাপ্তার মোহর হিসেবে) বিপুল পরিমাণ সোনাদানা দিলেও তার কোনো অংশই তোমরা ফেরত নিতে পারবে না, তোমরা কি (তাদের ওপর মিথ্যা) অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট বাড়াবাড়ি করে (মোহরের সেই) অংক ফেরত নিতে চাচ্ছো[৩৯]?

২১. (তাছাড়া) তোমরা (একবার দিয়ে দেয়া মোহরানার) সেই অংশ ফেরত নেবেই বা কি করে? অথচ (বিয়ের মাধ্যমে) তোমরা একে অপরের স্বাদ গ্রহণ

করেছো এবং (এরই মাধ্যমে) তারা তোমাদের কাছ থেকে (বিয়ে বন্ধনের) পাকাপাকি প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিয়েছে[৪০]।

২২. নারীদের মধ্য থেকে যাদের তোমাদের পিতা বিয়ে করেছে- তাদের তোমরা কখনো বিয়ে করো না (হাঁ, এই নির্দেশ আসার) আগে যা হয়ে গেছে তাতো হয়েই গেছে, কিন্তু এ ছিলো এক অশ্লীল নির্লজ্জ কাজ ও খুবই পাপের পথ[৪১]।

---

৩৭. নারীদের অসচ্চরিত্রতার শাস্তি বর্ণনা করার পর এখানে জাহেলী যুগের যুলুম বাড়াবাড়ি রোধ করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। জাহেলী যুগে নারীদের প্রতি দুই ধরনে যুলুম করা হতো। এর একটি হলো, কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার স্ত্রীকে মৃত ব্যক্তির সৎপুত্র , বা ভাই বা অন্য কোন ওয়ারিশ গ্রহণ করতো। অতঃপর তাকে বিয়ে করে নেবে, অথবা বিয়ে ছাড়াই নিজের গৃহে রাখতো অথবা অন্য কারো কাছে বিয়ে দিয়ে তার সমস্ত মোহরানা বা তার অংশ বিশেষ গ্রহণ করতো। অথবা সারা জীবন তাকে নিজের অধিকারে রাখতো, এমনিভাবে তার মালের ওয়ারিস হয়ে বসতো, এই প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। আয়াতের সারকথা এই যে, কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার স্ত্রী নিজের বিয়ের ব্যাপারে স্বাধীন। জোর করে তাকে বিবাহ করার অধিকার কোন ওয়ারিসের নেই। কেউ তার বিয়ে বাধাও দিতে পারেনা, যাতে সে বাধ্য হয়ে স্বামীর সম্পত্তি থেকে ওয়ারিস সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির কিছু অংশ ফেরৎ দেয়। অবশ্য স্পষ্ট অশ্লীলতা আবলম্বন করলে তাকে বাধা দেওয়া যাবে বরং বাধা দিতে হবে।

৩৮. অর্থাৎ নারীদের সঙ্গে কথাবার্তা এবং আচরণে সচ্চরিত্রতা বজায় রাখবে। জাহেলী যুগে নারীদের সঙ্গে যে কঠোরতা এবং অসদাচরণ করা হতো, তা পরিত্যাগ কর। অতপর কোন নারীর স্বাভাব চরিত্র যদি তোমাদের পসন্দ না হয়া, তবে ধৈর্য্য ধারণ করবে। হতে পারে, তার মধ্যেও কোন কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এটাও হতে পারে যে, কোন জিনিষ তোমাদের পসন্দ হয়না, অথচ আল্লাহ তাতে তোমাদের দুনিয়া আখেরাতের কোন বড় কল্যাণ নিহিত রেখেছেন সুতরাং তোমাদের ধৈর্য ধারণ করা উচিৎ। অসচ্চরিত্রের সঙ্গেও অসদাচরণ করা উচিৎ নয়।

৩৯. ইসমালামের আগে এটাও হতো যে, কে প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করে, অন্য নারীকে বিয়ে করার ইচ্ছা করলে প্রথম স্ত্রীর চরিত্রে কলংক লেপন করতো, নানাভাবে তার ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালানো হতো, যাতে সে বাধ্য হয়ে মোহরান ছেড়ে দেয় এবং এই মোহরানা দিয়েই পুরুষ আর একটি বিয়ের কাজ সম্পন্ন করতে পারে। এরূপ করতে নিষেধ করে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করে, দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে চাইলে প্রথম নারীকে দেয়া বিপুল অর্থ ফেরৎ নেবেনা। তোমরা অপবাদ আরোপ করে স্পষ্ট যুলুম করে তার কাছে হতে অর্থ ফেরৎ নিতে চাও। এটা আদৌ জায়েয নেই।

৪০. অর্থাৎ বিয়ের পর নারী-পুরুষ যখন মিলিত হয় এবং সংসারেরও সুযোগ হয়, তবে তার বিনিময়ে সমস্ত মোহরানা দেয়া পুরুষের ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং এখন কি কারণে পুরুষ তা ফেরৎ নিতে পারে। আর আগে মোহরানা না দিয়ে থাকলে কি করে তা দাবিয়ে রাখতে পারে। এখন নারী স্বেচ্ছায় ক্ষমা করে দেয়া ছাড়া মুক্তি পাওয়ার তো কোন উপায় নেই। নারীতো তোমাদের কাছে থেকে সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলো, যার কারণে তারা তোমাদের অধিকারে এসেছিলো, আর তোমরাও তাদের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হয়েছ। অন্যথায় তাদের ওপর তোমাদের কোন অধিবকার আধিপত্যই হতনা। এ পূর্ণ অধিকার এবং ব্যবহারের পর নারীদের মোহরানা ফিরিয়ে নেওয়া বা আদৌ মোহরানা না দেয়া কি করে হতে পারে?

জেনে নেওয়া উচিৎ যে, সঙ্গমের পর নারীর সমস্ত মোহরানা আদায় করা পুরুষের ওপর কর্তব্য হয়ে যায়। তেমনিভাবে সঙ্গম না হয়ে একান্তে নিঃসঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ হলেও পূর্ণ মোহরানা আদায় করা পুরুষের ওপর ওয়াজিব। অবশ্য নিভৃতে একান্তে মিলিত হওয়ার সুযোগ যদি না হয়ে থাকে এ অবস্থায় পুরুষ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তবে অর্ধেক মোহরানা পরিশোধ করতে হবে।

করা কর্তব্য হয়ে যায়। তেমনিভাবে সঙ্গম না হয়ে একান্তে নিঃসঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ হলেও পূর্ন মোহরানা আদায় করা পুরুষের উপর ওয়াজিব। অবশ্য নিভৃতে একান্তে মিলিত হওয়ার সুযোগ যদি না হয়ে থাকে এ অবস্থায় পুরুষ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তবে অর্ধেক মোহরানা পরিশোধ করতে হবে।

৪১. জাহেলী যুগে আপন সৎমাতা এবং অন্যান্য 'মোহাররাম' নারীদেরকেও বিবাহ করা হতো। একটু আগেই এর উল্লেখ করা হয়েছে। এটা নিষেধ করে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের পিতারা যেসব নারীদেরকে বিবাহ করেছে তোমরা তাদেরকে বিবাহ করবেনা। এটা নির্লজ্জতা এবং আল্লাহর গযব ও ঘৃণার কাজ। এটা অতি খারাপ রীতি। জাহেলী যুগেও জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা এটাকে ঘৃণ্য কাজ মনে করতো। তারা এ বিবাহকে গযবের বিবাহ এবং এ বিবাহের ফলে যেসব সন্তান হতো তাদেরকে গযবের সন্তান বলতো। এমন বিবাহ যা ইতিপূর্বে হয়েছে তো হয়েছে, ভবিষ্যতে কখনো এমন বিবাহ করবেনা।

পিতার স্ত্রীর যে হুকুম দাদা-নানার স্ত্রীরও ঠিক একই হুকুম। দানা না, যত উপরেরই হোক না কেন।

أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَائِكُمْ

وَرَبَائِبُكُمُ الّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الّٰتِي دَخَلْتُم

بِهِنَّ ز فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَحَلَائِلُ

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ لا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (২৩)

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ج

كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ج وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ

أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰفِحِينَ ط فَمَا

اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ط وَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرٰضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ط

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (২৪)

রুকু ৪

২৩. (বিয়ের জন্যে) তোমাদের ওপর হারাম করে দেয়া হয়েছে, তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, তোমাদের ভাইদের মেয়ে, বোনদের মেয়ে[৪২], (আরো হারাম করা হয়েছে), যে সব মা তোমাদের বুকের দুধ খাইয়েছে, তোমাদের দুধ (খাওয়ার সাথী) বোন[৪৩], তোমাদের

স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছো তাদের আগের স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত মেয়ে- যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে বড়ো হয়েছে (অবশ্য) যদি তাদের সাথে (শুধু বিয়েই হয়ে থাকে কিন্তু) তোমরা কখনো তাদের সাথে সহবাস করোনি, তাহলে (তাদের মেয়েদের বিয়ে করা) তোমাদের জন্যে কোনো দোষ নেই। (তোমাদের জন্যে) তোমাদের নিজেদের ঔরসজাত ছেলের স্ত্রীদের (ও হারাম করা হয়েছে; উপরন্তু তোমাদের ওপর) দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করাকেও (হারাম করা হয়েছে) তবে যা (এই বিধান আসার) আগে সংঘটিত হয়েছে তা তো হয়েই গেছে, (সে ব্যাপারে) অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও একান্ত দয়াবান[৪৪]।

২৪. এবং নারীদের মাঝে সে সব নারীও (তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে) যারা (আগে থেকেই) বিয়ের দুর্গে অবস্থান করছে, তবে যে সব নারী (কোনো যুদ্ধের কারণে) তোমাদের অধিকারে এসে পড়েছে, তারা ব্যতীত। এ হচ্ছে (বিয়ের ব্যাপারে) তোমাদের ওপর আল্লাহর (নাযিল করা) বিধান[৪৫]। এর বাইরে যে সব নারী রয়েছে তোমাদের জন্যে (এই মর্মে) তাদের হালাল করা হয়েছে যে, তোমরা (বিয়ের জন্যে) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের (মোহরের) বিনিময় আদায় করে দেবে[৪৬] (এবং বিয়ে হয়ে গেলে) তোমরা অবাধ যৌনস্পৃহা পূরণে (নিয়োজিত) হবে না। অতপর তাদের মধ্যে– যাদের তোমরা এর মাধ্যমে উপভোগ করবে, তাদের যথার্থ (মোহরের) বিনিময় ফরজ হিসেবে আদায় করে দাও[৪৭], (অবশ্য একবার) এই মোহর নির্ধারিত হওয়ার পর (এর অংক ও পরিমাণের ব্যাপারে) তোমরা যদি উভয়ে একমত হও তাতে কোনো দোষের কিছু নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী[৪৮]।

---

৪২. সৎ মাতার সঙ্গে বিবাহ হারাম একথা বলার পর এখন সেসব নারীর কথা বলা হচ্ছে, যাদের সঙ্গে বিবাহ জায়েয নেই। এসব নারী কয়েক প্রকার। প্রথমে তাদের কথা আপন বোন বাপের কারণে সৎ বোন ও দুধবোন, বংশগত সম্পর্কের কারণে যারা হারাম। এরা সাতজন-মাতা, কন্যা, বোন, ফুফী, খালা, ভাতিজী, ভাগ্নী। এদের মধ্যে কারো সঙ্গে বিবাহ জায়েয নেই।

দানী-নানী এবং উপরের দিকের সকলেই মাতার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তেমনিভাবে কন্যার হুকুমে নাতীন-পুতীন সকলেই অন্তর্ভূক্ত। বোনের হুকুমে আইনী-আখইয়াফী আল্লাতী, সব রকম বোন অন্তর্ভূক্ত। আর ফুফীর হুকুমে বাপ-দাদা এবং উপরের পিঁড়ি পর্যন্ত বোন-তা আপন হউক, বা সৎ সকলেই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আর খালার হুকুমে মাতা,নানী নানীর নানী-সকলের বোন অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আর ভাতিজীর হুকুমে তিনপ্রকার

ভাইয়ের সন্তান এবং সন্তনের সন্তান সকলেই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আর ভাগ্নীর হুকুমে তিন প্রকার বোনের সন্তান এবং সন্তানের সন্তান সকলেই অন্তর্ভূক্ত।

৪৩. বংশতঃ মুহাররামাত এর পর এখন রেযায়ী বা দুধ সম্পর্কের মুহাররামাত সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এরা হচ্ছে দু'জন, মাতা এবং বোন। ইঙ্গীতে বলা হয়েছে যে, বংশগত সম্পর্কে যে সাতটি রিশতা হারাম রেযয়াতেও তারা হারাম। অর্থাৎ রেযায়ী কন্যা, ফুফী, খালা, ভাতিজী, ভাগ্নী এরাও হারাম। হাদীস শরীফে এ নির্দেশ বর্তমান রয়েছে।

৪৪. এখন অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যেসব নারীকে বিবাহ করা হারাম, তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এরা দু' প্রকার। একঃ যাদের সঙ্গে চিরতরে বিবাহ হারাম। এরা হচ্ছে স্ত্রীর মাতা এবং যে স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করা হয়েছে তার কন্যা। কিন্তু যদি সঙ্গমের পূর্বেই কোন স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয়, তবে তার জন্য সে স্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করা জায়েয। তোমাদের পুত্রবধু-এতে আরও নীচের পুত্র এবং নাতীর স্ত্রীরাও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এদের সঙ্গে কখনো তোমাদের বিবাহ হতে পারেনা। দুইঃ যাদের সঙ্গে চিরতরে বিবাহ হারাম নয়। বরং যতক্ষণ সে নারী তোমাদের বিবাহ হারাম বন্ধনে থাকে, ততক্ষণ তার এ সব নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে তোমাদের বিবাহ হারাম। সে নারীকে তালাক দেওয়া হলে অথবা সে নারী মারা গেলে এদেরকে বিবাহ করা জায়েয হবে। এরা হচ্ছে স্ত্রীর বোন। স্ত্রী বর্তমান থাকতে তার বোনকে বিবাহ করা জায়েয নেই। তার অবর্তমানে জায়েয আছে। স্ত্রীর ফুফী খালা , ভাতিজী এবং ভাগ্নীরও এ একই হুকুম।

এবং তোমাদের পুত্রদের স্ত্রীরা, যারা তোমাদের ঔরসজাত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমাদের আপন বংশজাত পুত্রের স্ত্রী, পালক পুত্র বা মুখ ডাকা পুত্রের স্ত্রী নয়। 'যা গত, তাতো গত হয়েছে' এর অর্থ এই যে, এ হুকুমের পূর্বে জাহেলী যুগে তোমরা যে এক সঙ্গে দু' বোনকে বিবাহ করতে, তা ক্ষমা করা হয়েছে। 'তোমাদের প্রতিপালনে'- এর অর্থ এই যে, তোমারা কোলে নিয়ে যাদেরকে প্রতিপালন কর অর্থাৎ যাদেরকে পুত্রের মতো প্রতিপালন কর, যেন তাদেরকে আপন পুত্রই মনে কর। তাদেরকে যে বিবাহ করা হারাম, এ ক্ষেত্রে তা আরও ভালো ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ অর্থ নয় যে, তাদের হারাম হওয়ার জন্য তাদেরকে কোলে নেয়া জরুরী।

৪৫. মুহাররামাত তথা হারাম নারীদের সম্পর্কে আলোচনা করার পর এখন সেসব নারী হারাম হওয়ার কথা বলা হচ্ছে, যারা কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। অর্থাৎ যে নারী কারো বিবাহ বন্ধনে রয়েছে, অন্য কারো সঙ্গে তার বিবাহ হতে পারেনা অন্য কেউ তাকে বিবাহ করতে পারেনা। যতক্ষণ না সে তালাক দেয় বা স্বামীর মৃত্যুর ফলে বিবাহ বন্ধন মুক্ত হয়, এবং তালাক বা স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত পূরণ না করেন ততক্ষণ কেউ তাকে বিবাহ করতে পারে না। অবশ্য কোন বিবাহিত নারী যদি তোমাদের মালিকানায় আসে, সে হারামের এ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবেনা। এমন নারী তোমাদের জন্য হালাল যদিও তার স্বামী

জীবিত আছে এবং সে স্ত্রীকে তালাকও দেয়নি। এর সূরত এই যে, কাফের নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয়েছিলো। কিন্তু মুসলমানরা 'দারুল হরবে' হামলা চালিয়ে সে নারীকে বন্দী করতঃ দারুল ইসলামে নিয়ে এসেছে। এমন নারী যে মুসলমানের হস্তগত হবে, তার জন্য হালাল যদিও তার স্বামী দারুল হরবে জীবিত আছে এবং সে তালাকও দেয়নি। সমস্ত মুহাররামাতের কথা বলার পর সবশেষ তাকীদ দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এটা আল্লাহর বিধান। এ বিধান মেনে চলা তোমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

দারুল হরব থেকে যে কাফের নারীকে পাকড়াও করে আনা হয় তার হালাল হওয়ার জন্য এক হায়েয অতিবাহিত হওয়া জরুরী। এটাও জরুরী যে, সে নারী মোশরেক-মূর্তি পূজারী হবেনা, বরং সে হবে আহলে কিতাব ভূক্ত অর্থাৎ যাদের নিকট আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে, তাদের অন্তর্ভূক্ত। এ শর্তগুলো পূরুণ না হলে সে নারী হালাল হবেনা।

৪৬. অর্থাৎ যেসব নারী হারাম বলে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের বাদে চারটি শর্তে সব নারীই হালাল। শর্ত গুলো এই এক, অর্থাৎ উভয় পক্ষ থেকে মুলে 'ইজাব-কবুল' প্রস্তাব ও তা গ্রহণ করা হতে হবে। দুই, মোহরানা দিতে হবে। তিন, তাদেরকে অধীনে আনা এবং অধিকারে রাখা উদ্দেশ্য হতে হবে, কেবল মনস্কামনা পূর্ণ করা এবং মাতলামী করাই উদ্দেশ্য হবেনা, যেমন যেনা-ব্যভিচারে হয়ে থাকে অর্থাৎ চিরদিনের জন্য তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, ছেড়ে দেয়া ছাড়া সে এ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে না। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট-নির্ধারিত সময়ের জন্য বিবাহ করলে হবে না। এ দ্বারা মুত্আ হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে। সকল সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি এ ব্যাপারে একমত। চতুর্থ শর্তটি অন্যান্য আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। তা এই যে, গোপনে দুস্তী-প্রেম-প্রণয় হলে চলবে না। অর্থাৎ অন্ততঃপক্ষে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এবং দু'জন নারীকে একাধারে স্বাক্ষী হতে হবে। দু'জন স্বাক্ষী ছাড়া ইজাব কবুল হলে তা বিবাহ হবে না, বরং তাকে যেনা-ব্যভিচারই মনে করা হবে।

৪৭. অর্থাৎ যে নারীকে বিবাহ করা হয়েছে অতঃপর তার সঙ্গে স্বামী নির্ধারিত অল্প বিস্তর সময় অতিবাহিত করেছে। অন্তত পক্ষে একবার সঙ্গম অথবা বিশদ্ধ একান্ত বাসের সুযোগ হয়েছে তবে তাকে পূর্ণ মোহরানা দিতে হবে। নারী মাফ করে দেয়া ছাড়া এ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোন উপায় নেই। অর্থাৎ নারী যদি কোন কাজেই না আসে আর এ অবস্থায় স্বামী তালাক দেয়,তখন অর্ধেক মোহরানা দিতে হবে। আর নারী যদি এমন কোন কাজ করে বসে, যার ফলে বিবাহ ছুটে যায় তখন স্বামীকে কিছুই দিতে হবে না, কিছু দেয়া তার কর্তব্য নয়। সমস্ত মোহরানা থেকে সে অব্যাহতি পাবে।

৪৮. অর্থাৎ মোহরানা নির্ধারণের পর স্বামী – স্ত্রী যদি কোন ব্যাপারে রাযী হয়, যেমন নারী স্বেচ্ছায় কিছু মোহরানা ছেড়ে দেয় অথবা পুরুষ সেচ্ছায় নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কিছু বেশি দেয় তবে এ ইখতিয়ার তাদের আছে। এ ক্ষেত্রে তাদের কোন গুনাহ হবে না। নির্ধারিত মোহরানার চেয়ে স্বামী কিছু কম দিলে স্ত্রী তা থেকে কিছু বেশী গ্রহণ করলে তা

নাজায়েয হবেনা। তবে এ ব্যাপারে পারস্পরিক সম্মতি অবশ্যই থাকতে হবে। শেষে বলা হয়েছে যে,আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সব রকম লাভ ক্ষতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন। তিনি যে হুকুম দেন তা আগাগোড়া হেকমত প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। তার নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই তোমাদের ইহকাল পরকাল উভয়ের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। আর তার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণে তোমাদের কেবল ক্ষতি আর ক্ষতিই হবে।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ

مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ

فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ط

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِكُمْ ط بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج

فَانْكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ

بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ

أَخْدَانٍ ج فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ

نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ط ذٰلِكَ لِمَنْ

خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ط وَأَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ط

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٥﴾

---

২৫. আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির কোনো স্বাধীন সম্ভ্রান্ত (আল্লাহ ও রসূলের ওপর) ঈমান আনয়নকারী নারীকে বিয়ে করার (আর্থিক ও সামাজিক) সামর্থ না থাকে, তাহলে সে যেন অেমাদের অধিকারভুক্ত কোনো ঈমানদারকে বিয়ে করে

নেয়[৪৯], তোমাদের ঈমানের অবস্থা সম্পর্কে তো আল্লাহ্ তায়ালা সম্যক অবগত আছেন, (মূলতঃ স্বাধীন হোক কিংবা পরাধীন আল্লাহ্র দরবারে) তোমরা সবাই পরস্পর এক সমান[৫০]। অতপর (অধিকারভুক্তদের) বিয়ে করতে হলে তোমরা তাদের অভিভাবকদের অনুমতি নিয়েই করো এবং ন্যায়-ইনসাফ ভিত্তিক তাদের যথার্থ মোহ্রানা দিয়ে দাও, (তাদের জন্যে এই বিয়ে ব্যবস্থা রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে) তারা যেন বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিত হয়ে যায়- স্বেচ্ছাচারিণী ও গোপনে পরপুরুষকে আনন্দ দানের (জঘন্য পাপ) কাজে নিয়োজিত না থাকে[৫১]। (এরপর) বিয়ের দুর্গে অবস্থান নেয়ার পরও যদি তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাদের ওপর আরোপিত শাস্তির পরিমাণ হবে স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত নারীদের তুলনায় অর্ধেক[৫২]। তোমাদের মধ্যে যাদের ব্যভিচারে লিপ্ত হবার আশংকা থাকবে, তাদের জন্যেই এই (অধিকারভুক্ত মেয়েদের বিয়ে করার সুযোগ) টুকু (দেয়া হয়েছে)। কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য্য ধারণ করতে পারো, অবশ্যই তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর এবং আল্লাহ্ তায়ালা একান্ত ক্ষমাপরায়ণ ও পরম দয়ালু[৫৩]।

---

৪৯. অর্থাৎ আযাদ নারীকে বিবাহ করার সামর্থ যার নেই, স্ত্রীর মোহ্রানা এবং ব্যয় নির্বাহ করার ক্ষমতা নেই যার, তার জন্য উত্তম হচ্ছে নিজেদের মধ্য থেকে কোন মুসলমান দাসীকে বিবাহ করা। কারণ, তার মোহ্রানা কম হয়ে থাকে এবং তার খোরপোশের ব্যাপারেও এ সুবিধা রয়েছে যে, মালিক যদি তাকে নিজের গৃহে রাখে যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই হয়ে থাকে, তবে স্বামী তার খোরপোশের দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকবে। আর যদি তাকে স্বামীর কাছেই দিয়ে দেয়, তা হলেও আযাদ নারীর তুলনায় তার খোরপোশ অবশ্যই হাল্কা হবে।

আযাদ নারী বিবাহ করার সামর্থ্য যার আছে, ইমাম শাফেয়ী প্রমূখের মতে তার জন্য দাসী বিবাহ্ করা হারাম। আর ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর মতে মাক্রূহ তানযীহী। যেমনিভাবে এ বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য অধিকাংশ ওলামার মতে দাসীর মুসলমান হওয়া জরুরী। আর ইমাম আবু হানীফার মতে তার মুসলমান হওয়া উত্তম। আহলে কিতাবের দাসী বিবাহ করলে ইমাম সাহেবের মতে তাও জায়েয হবে। কারো বিবাহ বন্ধনে যদি আযাদ নারী থাকে, তবে তার জন্য দাসী বিবাহ্ করা সকলের মতে হারাম।

৫০. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের সকলের ঈমানের আসল অবস্থা জানেন। তোমাদের উচিৎ হচ্ছে বাহ্যিক অবস্থার উপর যথেষ্ট করা। আল্লাহর কাছে কোন কোন দাসী নারীর ঈমান কোন কোন আযাদ নারীর ঈমানের চেয়েও উত্তম হতে পারে। সুতরাং ঈমানের বিচারে কোন দাসীকে বিবাহ করায় কোন দোষ থাকার কথা নয়, এটা করতে অস্বীকার করাও ঠিক নয়। তোমরা সকলেতো পরস্পরে এক, একই উৎস থেকে তোমাদের সৃষ্টি ও উৎপত্তি। তোমরা সকলেই একই দ্বীনের অংশীদার। সুতরাং দাসীদের

বিবাহকে কেন দোষণীয় এবং লজ্জার কাজ মনে কর? এদ্বারা দাসীদের বিবাহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তাদের প্রতি ঘৃণা বিতৃষ্ণা দূর করাই উদ্দেশ্য।

৫১. অর্থাৎ এখন উচিত হচ্ছে উপরের বক্তব্য অনুযায়ী মালিকের অনুমতি নিয়ে সে সব দাসীকে বিবাহ করা। নিয়ম-রীতি অনুযায়ী তাদের মোহরানা ও পরিশোধ করে দেবে। যদি তারা স্বেচ্ছায় বিবাহ বন্ধনে আসে, মাতলামী না করে এবং গোপন প্রণয় কারিণী যদি আদৌ না হয়ে থাকে। অর্থাৎ যদি তাদের সঙ্গে যেনা-ব্যাভিচার না হয়; যাতে কখনো মোহরানা হয়না। এ থেকে জানা যায় যে, যেনায় মোহরানা দিতে হয়না। আর বিবাহের জন্য সাক্ষী থাকা জরুরী।

৫২. অর্থাৎ যে আযাদ নারী-পুরুষ বিবাহ দ্বারা উপকৃত অর্থাৎ সঙ্গমের সুযোগ হয়েছে এর পরও সে যেনা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাকে সঙ্গেসার অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। আর যদি বিবাহ না হয়ে থাকে, বরং বিবাহের আগেই যেনা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাকে শত ঘা চাবুক মারার হুকুম দেয়া হবে। আর দাস-দাসীর জন্য সর্বাবস্থায় অর্থাৎ বিবাহের আগে বা পরে পঞ্চাশ ঘা চাবুকের হুকুম-এর বেশী নয়।

৫৩. অর্থাৎ দাসীর সঙ্গে বিবাহ করার এ নির্দেশ ও 'ইস্তিহসান' তোমাদের মধ্য থেকে সে ব্যাক্তির জন্য, যার শারীরিক কষ্টে অর্থাৎ ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। আর তোমরা যদি ধৈর্য্য ধারণ করে দাসীকে বিবাহ না কর তবে তা অতি উত্তম। কারণ এর ফলে সন্তানও আযাদ হবে। আর তোমাদের যদি ধৈর্য্য-সম্পর্কে খটকা থাকে তবে এ অবস্থায় দাসীকে বিবাহ করবে। ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য আল্লাহ ক্ষমাশীল। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন।

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ

سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ

عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۟

وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا

عَظِيْمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ

الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

রুকু ৫

২৬. আল্লাহ্ তায়ালা (তার হেদোয়াতের বাণীসমূহকে) তোমাদের কাছে খুলে খুলে বলে দিতে চান, এবং (সেই হেদোয়াত মোতাবেক) তোমাদের তিনি তোমাদের পূর্ববর্তী (পুণ্যবান) মানুষদের পথে পরিচালিত করতে চান, আর (এরই মাধ্যমে) তিনি তোমাদের তাঁর (দয়ার দিকে) ফিরিয়ে আনতে চান। আল্লাহ্ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানে গুণান্বিত[৫৪]।

২৭. আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের (গুনাহ্-খাতাসমূহ) ক্ষমা করতে চান, আর (মানুষদের মধ্যে) যারা জৈবিক কামনা-বাসনার অনুসরণ করে চলে, তারা চায় তোমরা ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ো[৫৫]।

২৮. আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের ওপর থেকে বিধিনিষেধের বোঝা লঘু করে (তোমাদের জীবনকে সহজ করে) দিতে চান, (কারণ) মানুষকে অত্যন্ত দুর্বল করেই পয়দা করা হয়েছে[৫৬]।

২৯. হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহ্ ও রসূলের ওপর) ঈমান এনেছো, তোমরা (কখনো) একে অপরের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করে না। হাঁ, ব্যাবসা-বাণিজ্য (করতে হলে পারস্পরিক সম্মতি ও সমঝোতার ভিত্তিতেই সম্পাদন করো[৫৭] এবং কখনো (এই বৈষয়িক স্বার্থের কারণে) একে অপরকে হত্যা করো না। (জেনে রেখো) অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান[৫৮]।

৫৪. অর্থাৎ হালাল-হারামের এ সব বিধান বর্ণনা দ্বারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমরা যাতে হালাল-হারাম সম্পর্কে অবগত হতে পার। পূর্ববর্তী নবীদের পথ চিনতে পার। যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও অন্যান্য নবীদের পথ। আর এসব দ্বারা তোমাদেরকে ক্ষমা করাই তো আল্লাহ্র ইচ্ছা। তোমাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালভাবে অবগত

রয়েছেন। তার সকল নির্দেশ সকল ব্যবস্থায় পূর্ণ হেকমত রয়েছে। সুতরাং এখন তার নির্দেশ না মানলে তোমরা হেদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকবে। এতে পূর্ববর্তী নবীদেরও বিরুদ্ধাচরণ হবে। ফলে তোমরা আল্লাহর রহমত এবং মাগফেরাত থেকেও বঞ্চিত থাকবে।

পূর্ব থেকে যেনা-লাওয়াতাত নিষিদ্ধ হওয়া এবং এসব থেকে তওবা করা, নবীদের সম্পর্কে কিছু বিধান, যেসব নারীদেরকে বিবাহ করা হারাম, তার উল্লেখ এবং বিবাহ প্রসঙ্গে মোহরানা ও অন্যান্য শর্ত আলোচনা করে অপ্রকর্ম নিষিদ্ধ করে তা থেকে বিরত থাকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কয়েকটি কারণে এসব হুকুম মেনে চলা মানুষের জন্য কষ্টকর। এ কারণে এ আয়াত এবং পরবর্তী দু' আয়াতে এ সম্পর্কে ভালোভাবে তাকীদ করা হয়েছে। এটা ভালো ভাবে বদ্ধমূল করতে এর বিরুদ্ধাচরণ থেকে বারণ করা হয়েছে।

৫৫. অর্থাৎ উপরে যেসব সীমা-শর্ত আরোপ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদের প্রতি দয়া-রহমত করা। এ কারনে আল্লাহ তায়ালা এসব শর্ত আরোপ করেছেন। আর যারা নিজেদের মনস্কামনায় মত্ত হয়ে আছে, তারা তো চায় তোমরা যাতে সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হও। অর্থাৎ তাদের মতো তোমরাও নিজেদের মনস্কামনায় দাসত্ব কর। তাদের মতো তোমরাও গোমরাহ হয়ে যাও। তোমরা এ সব যা কিছু করবে, বুঝে শুনে করবে।

৫৬. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তার মনস্কামনা থেকে কতটুকু ধৈর্য ধারণ করতে পারে, তা তিনি ভালো করেই জানেন। এ কারণে তিনি সব নির্দেশে হালকা করণের প্রতিও লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি এমন করেননি যে মানুষের জন্য যা কিছু কল্যাণকর তা সহজ হোক বা কঠিন তাই তার ঘাড়ে আরোপ করেছেন। যেমন নারী এবং যৌন কামনায় ধৈর্য ধারণ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাই তার ইচ্ছা পূরা করার জন্য আল্লাহ জায়েয উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেন মানুষ ন্যায়সংগতভাবে তার ইচ্ছা পূরা করতে পারে। তিনি খায়েশ পূরণ করা থেকে সম্পূর্ণ বারণ করেননি। আল্লাহ তায়ালা আপন রহমতে শরীয়তে সংকীর্ণতা কঠোরতাকে স্থান দেননি যাতে হালাল ছেড়ে হারামের পিছনে ছুটতে হয়। আয়াত গুলোর সার কথা দাঁড়িয়েছে এই যে, যৌন সংভোগ থেকে নফসকে রক্ষা করার ব্যাপারে নারীদের প্রসঙ্গে যেসব সীমা, শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে তা মেনে চলা মোটেই কঠিন কাজ নহে। এসব মেনে চলা অত্যন্ত জরুরী এবং আগাগোড়া কল্যাণকর।

৫৭. তাৎপর্য এই যে, অন্যায়ভাবে কারো অর্থ-সম্পত্তি আত্মসাৎ করা। যেমন মিথ্যা বলে প্রতারণা করে বা চুরি করে কারো টাকা-পয়সা হযম করা কিছুতেই জায়েয নেই। অবশ্য যদি ব্যবসা কর অর্থাৎ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ক্রয়-বিক্রয় কর, তবে এতে কোন

দোষ নেই। এ অর্থ তোমরা খেতে পার। সার কথা দাঁড়ায় এই যে, জায়েয পন্থায় উপার্জন করা নিষিদ্ধ নয় কারণ, অর্থ সম্পদ বাদ দিয়ে বাঁচা তোমাদের জন্য কঠিন হবে।

৫৮. অর্থাৎ একে অপরকে হত্যা করবেনা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান। এ জন্য অকারণে কারো জান-মালে হস্তক্ষেপকে তিনি নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি তোমাদের জন্য এমন সব নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আগাগোড়া তোমাদেরই মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا

وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ

يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾ اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ

عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ

مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ

مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ

اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٣٣﴾

৩০. (তবে জেনে রেখো) কেউ যদি বাড়াবাড়ি ও যুলুম করতে গিয়ে এই (হত্যার) কাজ করে অচিরেই আমি তাকে (এর শাস্তি স্বরূপ) জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে দেবো, (আর) আল্লাহ্‌র পক্ষে (যে) একাজ মোটেই কঠিন কিছু নয়[৫৯] (তা তো তোমরা জানোই)।

৩১. (তবে এটাও ঠিক যে) যদি সে সব বড়ো বড়ো গুনাহ্ থেকে তোমরা বেঁচে থাকো যার থেকে বেঁচে থাকার জন্যে তোমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাহলে তোমাদের (ছোটখাটো) গুনাহখাতা আমি (হিসাবের খাতা থেকে) বাদ দিয়ে দেবো এবং অত্যন্ত সম্মানজনক স্থানে আমি তোমাদের নিয়ে পৌছে দেবো[৬০]।

৩২. আর আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের একজনের তুলনায় আরেকজনকে যা (কিছু বেশী) দান করেছেন, তা পাওয়ার জন্যে) তোমরা তার লালসা করো না[৬১] (প্রত্যেকের জন্যেই তার নির্দিষ্ট আয়-উপার্জনের ব্যবস্থা রয়েছে) যা কিছু পুরুষরা উপার্জন করলো- তা তারই (পাওনা) অংশ, আবার নারী যা কিছু অর্জন করলো তাও (একান্তভাবে) তারই (পাওনার) অংশ। (অন্যের অংশে লোভ না করে) তোমরা সর্বদা আল্লাহ্ তায়ালার কাছ থেকেই অনুগ্রহ পাওয়ার জন্যে প্রার্থনা করো, অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেবহাল রয়েছেন[৬২]।

৩৩. পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে আমি সবার জন্যেই অংশীদার নিযুক্ত করে রেখেছি। (এছাড়াও) যাদের সাথে তোমাদের কোনো চুক্তি কিংবা অংগীকার রয়েছে তাদের পাওনা (পুরোপুরিই) আদায় করে দেবে, আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই (কাকে কাকে তোমরা পাওনা আদায় করে দিলে তার) প্রতিটি কানাকড়ি পর্যবেক্ষণ করছেন[৬৩]।

---

৫৯. অর্থাৎ যে কেউ যুলুম বাড়াবাড়ি থেকে নিবৃত্ত না হয়ে অন্যায় ভাবে কারো অর্থ আত্মসাৎ করে বা কাউকে হত্যা করে, জাহান্নাম হচ্ছে এমন লোকদের ঠিকানা। এমন মানুষদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা আল্লাহর পক্ষে মোটেই কঠিন কাজ নহে, বরং এটা তার জন্য অতি সহজ। সুতরাং কেউ যেন এ কথা মনে করে না বসে যে, আমরা তো মুসালমান, আমরা কেমন করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবো। আল্লাহ তায়ালা মালিক মোখতার-একছত্র অধিপতি। তাকে ইনসাফ, সুবিচার থেকে নিবৃত্ত করতে পারে, এমন সাধ্য কার আছে ?

৬০. আগের আয়াতে বলা হয়েছে, যে কেউ অন্যায়ভাবে কারো জান বা মালের ক্ষতি করবে, তার শাস্তি হবে জাহান্নাম। এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালার নাফারমানী বান্দার জন্য শাস্তির কারন, এখন এ আয়াতে গুনাহ থেকে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে মাগফেরাতের ওয়াদা এবং জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে। যাতে এটা জানতে পেরে সকলেই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে পারে। মানুষ যাতে জানতে পারে যে, যে

ব্যাক্তি কবীরা গুনাহ যেমন কারো অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ বা চুরি করা বা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা-থেকে বিরত থাকবে, তার সমস্ত কবীরা গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, যা করেছিলো। এসব কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার জন্য ইতিপূর্বে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রনিধান যোগ্য। কিন্তু সব কিছুর মূল কথা হচ্ছে আয়াতের সত্যিকার অর্থ ও উত্তম তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা। এর ফলে সব কথা বুঝা সহজ হয়ে যাবে। মু'তাযেলা এবং তাদের অনুগামীরা ভাসাভাসা ভাবে আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ করেছে যে, কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকলে অর্থাৎ কবীরা গুনাহ একটাও না করলে ছগীরা গুনাহ যত বেশীই হোকনা কেন, তা ক্ষমা করা হবে। ছগীরা গুনাহ্র সঙ্গে কোনভাবে দু' একটি কবীরা গুনাহও করা হলে তা মাফ করা সম্ভব নয়। বরং ছগীরা-কবীরা সকল গুনাহের শাস্তিই জরুরী হয়ে পড়ে। আর আহলু সুন্নাহ্র মতে এ উভয় অবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালার মাফ করে দেয়ার বা শাস্তি দেয়া যথারীতি অধিকার থাকে। প্রথম অবস্থায় ক্ষমা করা বাধ্যতামূলক হওয়া আর দ্বিতীয় অবস্থায় পাকড়াও করাকে ওয়াজেব মনে করা মুতাযেলাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কেবল নির্বুদ্ধিতাই নহে, বরং এটা তাদের অপব্যাখ্যা। এ আয়াতে বাহ্যিক শব্দ এবং ভাসাভাসা বিষয় থেকে মুতাযেলাদের চিন্তাধারা সঠিক বলে মনে হয়। এর জবাবে কেউ বলেছেন যে, শর্ত রহিত হলে মাশরুত বা শর্ত সাপেক্ষ বিষয়ও রহিত হবে, এটা কোন জরুরী বিষয় নহে। আবার কেউ বলেছেন যে, 'কাবায়ের' এর অর্থ হচ্ছে 'আকবারুল কাবায়ের' বা সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ অর্থাৎ শেরক। এদের মতে শেরক এর নানা ধরন বুঝাবার জন্যই কাবায়ের বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও অনেক কথার অবতারণা হয়েছে। কিন্তু আমরা এসব প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু আয়তটির উত্তম ও হৃদয়গ্রাহী ব্যখ্যা করবো, যা কোরআন-হাদীস ও জ্ঞান-বুদ্ধির অনুকূল এবং বিশেষজ্ঞদের উক্তি ও রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ। এটা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারলে সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় আপনা আপানিই সমাধান হয়ে যাবে। মু'তাযেলাদের ভ্রান্ত মতবাদ আপনা আপনি তিরোহিত হয়ে তাদের অদূরদর্শীতা ও নির্বুদ্ধিতা ভালোভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে। তাদের মতবাদের অসারতা প্রমাণ করার এবং উহার প্রতিবাদ করার কোন প্রয়োজনই পড়বেনা। আমাদের এ ব্যাখ্যা মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করুন। এখানে বলা হয়েছে, তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্য থেকে কবিরা গুনাহ থেকে তোমরা বিরত থাকলে লঘুতর গুনাহ গুলো আমি মোচন করে দেবো। আর সুরা নাজ্‌ম্ এর আয়াতে বলা হয়েছে,

'এবং যারা কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কার্য থেকে বিরত থাকে কিন্তু ছোট খাটো কাজ'। আল্লাহর এ দু'টি বাণীর অর্থ ও তাৎপর্য্য এক। কেবল শব্দে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। একটি আয়াতের যে অর্থ, অন্য আয়াতের সে অর্থই গ্রহণ করা হবে। সূরা নাজম এর আয়াত সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ)-এর উক্তি বোখারী শরীফসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

এ হাদীসটির অর্থ ভালোভাবে বুঝে নিলে উপরের দুটি আয়াতের সত্যিকার তাৎপর্যের সন্ধান পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) যাকে বলা হয়, 'লিসানুল কুরআন' অর্থাৎ কোরআনের ভাষাকে তার উক্তি থেকে জানা যায় যে, 'লামাম' এবং 'সাইয়িয়াত' এর অর্থ তার চেয়ে ভালো আর কোথায়ও পাওয়া যায়না। তার গৃহীত অর্থের মোকাবিলায় এ আয়াতের অন্য কোন অর্থকে কিভাবে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে, কি করেই তা বেশী পছন্দ হতে পারে। বিশেষ করে মু'তাযেলাদের প্রলাপোক্তি কি করে গ্রহণযোগ্য ও জবাব দানের উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে? উপরোক্ত হাদীসের অর্থ এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তা থেকে যে তাৎপর্য গ্রহণ করেছেন, বুঝে নেয়া রীতিমতো বিস্ময়কর গবেষণা। তাঁর উক্তি থেকেই উপরের দু'টি আয়াতের মূল বক্তব্য ভালোভাবে প্রতিভাত হয়ে যায়। কারণ তিনি ছিলেন উম্মতের বড় আলেম মু'তাযেলাদের আবল-তাবল উক্তির অবকাশ এবং সন্দেহবাদীদের তার প্রতিবাদের কোন প্রয়োজনই আর অবশিষ্ট থাকেনা। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সামান্য চিন্তা করলেই বিষয়টি বুঝতে পারেন। স্পষ্ট করে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য আমরাও উপরোক্ত হাদীসের সার সংক্ষেপ পেশ করছি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ

সূরা নাজম-এর আয়াতে যে 'লামাম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা ক্ষমা করার ওয়াদা করা হয়েছে, তার অর্থ নিরূপনের জন্য হযরত আবু হোরায়রার হাদীসের চেয়ে উত্তম কিছু জানা যায়নি। হযরত আবু হোরায়রার হাদীসের সার কথা এই যে, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা বনী আদমের যিম্মায় ব্যাভিচারের যে অংশ নির্ধারণ করেছেন, তা অবশ্যই সে পাবে। সুতরাং এ কাজে চোখের অংশ হচ্ছে দেখা। আর মুখের অংশ হচ্ছে এমন সব কথাবার্তা বলা, যা যেনার সহায়ক এবং কারণ হয়। আর নফসের হিস্যা হচ্ছে যেনার খাহেশ আকাংখ্যা করা। কিন্তু যেনার কার্য্য সম্পন্ন হওয়া না হওয়া মূলতঃ নির্ভর করে 'লজ্জা স্থানের' ওপর। অর্থাৎ লজ্জাস্থান দ্বারা যদি যেনা সম্পন্ন হয় তবে চোখ-মুখ সব কিছুর ব্যাভিচারী হওয়া প্রমাণিত হয়। আর যদি সকল কার্য -কারণ এবং উপায় উপকরণ হাসিল হওয়া স্বত্ত্বেও 'লজ্জাস্থানের' কার্য সম্পন্ন না হয়, বরং যেনা থেকে দূরে থাকা, বিরত থাকা নসীব হয়, তা হলে যেনার সকল উপকরণ কার্যতঃ যাকে গুনাহ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিলো, তা সবই ক্ষমার যোগ্য হয়েছে। অর্থাৎ সেসব যেনা বলে পরিগণিত হওয়া বাতেল হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মূলে পরিবর্তন সাধিত হয়ে যেনার পরিবর্তে তা এবাদাতে পরিণত হয়েছে। কারণ. মূলতঃ সে কাজগুলো এবাদাত কিছুই ছিলনা, ছিলো অন্য কিছু। তা যেনার উপায় মাধ্যম হতে পারতো-কেবল একারণে তা পাপের পর্যায়ভুক্ত হয়েছিলো। তা যখন যেনার মাধ্যম হয়নি, বরং বিরত থাকার কারণে যেনা-ই যখন বিদূরীত হয়েছে, তখন সে সব মাধ্যমের যেনার পর্যায়ভূক্ত হওয়া এবং তাকে মাছিয়াত পাপ বলে আখ্যায়িত করা ইনসাফের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যেমন এক ব্যক্তি চুরির মতলবে মসজিদে গমন করে, কিন্তু সেখানে পৌঁছে চুরি করার ঠিক পূর্বক্ষণে সতর্ক হয়ে চুরি থেকে

তওবা করতঃ সারা রাত্রি আল্লাহর ওয়াস্তে নামায পড়ে অতিবাহিত করে। স্পষ্ট যে, এমনি গতি চুরি করার উপায় হিসেবে দেখা গিয়েছিলো, এখন তা তওবা এবং নামাযের উপায়ে পরিণত হয়েছে। হযরত আবু হোরায়রার এ হাদীসটি সম্পর্কে জানতে পেরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বুঝতে পারেন যে, 'লামাম' হচ্ছে সে বিষয় মূলতঃ যা গুনাহ নয়, বরং গুনাহের কারণ হয়ে তা গুনাহে পরিণত হয়। সুতরাং আয়াতের অর্থ এ দাঁড়ায় যে, তারা বড় গুনাহ এবং স্পষ্ট গুনাহ থেকে তো বিরত থাকে, অবশ্য তাদের দ্বারা 'লামাম' সংঘটিত হয়ে যায়। কিন্তু বড় এবং আসল গুনাহ সংঘটিত হওয়ার আগেই তারা নিজেদের অপরাধ থেকে তওবা করে নিবৃত্ত হয়, বিরত থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত আবু হোরায়রার হাদীস দ্বারা সূরা নাজম-এর আয়াতের যে অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন, আমরাও তার উক্তি অনুযায়ী সূরা নিসার এ আয়াতের সে অর্থ গ্রহন করতে পারি। আল হামদু লিল্লাহ। এ অর্থ গ্রহণ করার পর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ছগীরা আর কবীরা গুনাহের সম্বন্ধে নানা উক্তির উদ্ধৃতি দেওয়ার কোন প্রয়োজন পড়েনা। মু'তাযেলারদের যুক্তি-প্রমানের জবাব দেওয়ার ও কোন চিন্তা করতে হবেনা। সাইয়্যিআত তথা ছোট খাটো গুনাহ মোচনের কারণ এবং জান্নাতে প্রবেশের কার্যকারণও যথা নিয়মে সহজে জানা যাবে। গুনাহ থেকে বিরত থাকার অর্থও স্পষ্ট হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে চিন্তা করলে খুঁটিনাটি বিষয়ও সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

হাদীস এবং হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি অনুযায়ী আয়াত দু'টির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যে সব গুনাহকে বড় এবং আসল মনে করা হয়, এসব গুনাহ থেকে যারা বিরত থাকে এবং নিজেদের নফসকে তা থেকে দূরে রাখে, এ বিরত থাকার কারণে তারা বড় গুনাহ সাধনের জন্য যেসব খারাপ কাজ করে, তা ক্ষমা করা হবে। এবং

অবশ্য যারা আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং নফসকে খাহেশাত থেকে বিরত রাখে, জান্নাত হচ্ছে তাদের আশ্রয়স্থল। আল্লাহ তা'য়লার এ ঘোষনা অনুযায়ী তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। উপরের আয়াত দু'টির এ অর্থ নয় যে, ব্যভিচার প্রসঙ্গে ছগীরা গুনাহ অন্য কোন প্রসঙ্গের বড় গুনাহ যেমন মদ্যপান ইত্যাদি না করার কারণে মাফ করে দেয়া হবে, তা ধর্তব্যই হবেনা। অথবা মদ্যপানের কারণে পাকড়াও অবশ্যম্ভাবী হবে-এ অর্থও নয়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

'মু'তাযেলা' নামের কোনো ফের্কা এখন কোথাও নেই। তাই বিষয়টিকে হাদীস ও কোরআনের আলোকে সহজ ও সাবলিল ভাবে গ্রহণ করার জন্যেই আমরা পাঠকদের অনুরোধ করবো।-অনুবাদক

৬১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে কোন ব্যাপারে কাকেও কারো ওপর যদি কিছু প্রাধান্য, অগ্রাধিকার এবং বৈশিষ্ট্য দান করে থাকেন, তোমরা সে মোহে থাকবেনা। কারন, এটাও যেন কারো জান-মালকে হস্তক্ষেপের শামিল। এটা যে হারাম. সে সম্পর্কেতো একটু আগেই উল্লেখকরা হয়েছে। তদুপরি এর ফলে পরস্পরে ঈর্ষ এবং হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি

হয়। এর কারণে আল্লাহর রহস্যর বিরুদ্ধাচরণও হয়ে পড়ে। কিছু সংখ্যক মহিলা হুযুর (দঃ) এর খেদমতে আরয করেঃ আল্লাহ তা'য়ালা সব স্থানে পুরুষদের সম্বোধন করেন, তাদেরকে নির্দেশ দান করেন, নারীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়না, মীরাসে পুরুষদেরকে নারীর দ্বিগুন অংশ দেওয়া হয়, এর কারণ কি? এ আয়াতে তাদের এসব প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে।

৬২. অর্থাৎ পুরুষ এবং নারীর জন্য অংশ নির্ধারিত রয়েছে। তারা যেমন কাজ করে তার অংশ পাবে, সার কথা এই যে, সকলেই আপন আপন আমলের পূর্ণ বিনিময় পাবে। এতে কখনো হ্রাস করা হবেনা। ফলে কারো অভিযোগ করার কোন সুযোগ থাকবেনা। অবশ্য তিনি যদি আপন হেকমত এবং রহমত অনুযায়ী কাউকে কোন বড় ফযীলত-মর্যাদা দান করেন, তা স্বতন্ত্র কথা। এ ব্যাপারে কোন লোভ বা অভিযোগ অর্থহীন। অবশ্য নিজেদের আমলের বিনিময় থেকে অতিরিক্ত সাওযাব ও ইনাম চাইলে তা-ই হবে উত্তম ও সমীচীন। এতে কোন দোষ নেই। সুতরাং এখন যে কেউ মর্যাদা দাবী করবে, তার উচিৎ হবে আমলের মাধ্যমে তা কামনা করা। ঈর্ষ বা কেবল আকাংখ্যা দ্বারা কামনা করবেনা। সব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তিনি প্রত্যেকের মর্যাদা এবং যোগ্যতা সম্পর্কে ভালো করেই জানেন। এবং সকলের সঙ্গে তার হিসাব অনুযায়ী ব্যবহার করেন। তিনি যাকে মর্যাদা দান করেন, তা তাঁর জ্ঞান ও হেকমতের সম্পূর্ণ অনুকূল। কেউ নিজ অজ্ঞতাবশতঃ তাতে কোন সন্দেহ পোষণ করবে?

৬৩. অর্থাৎ মুসলমানরা! পিতা-মাতা এবং নিকটাত্নীয়রা যেসব সম্পত্তি রেখে যায়, সে নারী পুরুষ যেই হোকনা কেন. আমরা তাদের জন্য ওয়ারিশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। কাকেরও তা থেকে বঞ্চিত রাখিনি । যাদের সঙ্গে তোমাদের চুক্তি হয়েছে, তাদেরকে অবশ্যই তাদের অংশ পৌছিয়ে দেবে। ওয়ারিশদের কত পরিমাণ অংশ হওয়া উচিৎ যাদের সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে, তাদের কি পাওয়া উচিৎ, আমাদের এ বিধান কারা মেনে চলে আর কারা নাফরমানী অবাধ্যতা করে- আল্লাহ তা'য়ালা এ সব বিষয় জানেন।

অধিকাংশ লোক রাসূলের দরবারে হাযির হয়ে একাকী ইসলাম কবুল করেছিল, তাদের গোটা বংশ-পরিবার এবং নিকটাত্নীয়রা যথারীতি কাফেরই রয়ে গিয়েছিলো। তখন হুযুর (দঃ) দু' দু'জন মুসলমানকে পরস্পরে ভাইয়ে পরিনত করে দেন। তাদেরকে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করেন। এরা দু'জন একে অপরের ওয়ারিশ হতেন। তাদের আত্নীয় স্বজনরাও ইসলাম গ্রহণ করলে এ আয়াটি নাযিল হয়। এতে বলা হয়েছে যে, মীরাস তো আত্নীয়- স্বজনের হক। মুখ ডাকা ভাইয়ের জন্য এতে কোন অংশ নেই। অবশ্য জীবদ্দশায় তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে এবং মৃত্যুর আগে তাদের জন্য কিছু 'ওছিয়ত' করে যাওয়া সমীচীন। কিন্তু মীরাসে তাদের কোন অংশ নেই।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا

فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ

اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا

حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ

وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ

اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا

كَبِيْرًا ﴿৩৪﴾ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا

مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَاۤ اِصْلَاحًا

يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿৩৫﴾

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ

اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ

وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ

بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

রুকু ৬

৩৪. পুরুষরা হচ্ছে নারীদের (কর্মকান্ডের ব্যবস্থাপক ও) পরিচালক, কারণ আল্লাহ্ তায়ালা এদের একজনকে আরেকজনের ওপর কিছু বিশেষ (বৈশিষ্ট্যের) মর্যাদা প্রদান করেছেন- (পুরুষের এই পরিচালনার দায়িত্বের) আরেকটি কারণ হচ্ছে যে, তারা (দাম্পত্য সম্পর্কের জন্যে এবং তাকে অব্যাহত রাখার জন্যে) নিজেরা নিজেদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করে[৬৪], অতএব সতি-সাধ্বী (নারীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা) হবে অনুগত, (পুরুষদের) অনুপস্থিতিতে তারা (স্বয়ং) আল্লাহর তত্ত্বাবধানে (থেকে) নিজেদের যাবতীয় অদেখা (ইজ্জত-আবরু ও অন্যান্য) কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করবে[৬৫]। আর যখন কোনো নারীর অবাধ্যতার (ও ঔদ্ধত্যের) ব্যাপারে তোমরা আশংকা করো, তখন তোমরা তাদের (ভালো কথার) উপদেশ দাও, (তা যদি কার্যকর না হয় তাহলে) তাদের সাথে একই বিছানায় থাকা ছেড়ে দাও, (তাতেও যদি তারা ভালো না হয়, তাহলে দাম্পত্য জীবনের চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে) তাদের প্রহার করো[৬৬], তবে যদি তারা (এসব কিছু ছাড়াই) অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তাদের (খামাখা কষ্ট দেয়ার) জন্যে অজুহাত খুঁজে বেড়িয়ো না, (মনে রেখো) অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবার চাইতে মহান[৬৭]!

৩৫. আর কোথায়ও যদি তোমাদের (স্বামী-স্ত্রী) দু'জনের মাঝে (বিরোধের কারণে) বিচ্ছেদের আশংকা দেখা দেয়, তাহলে তার (পুরুষটির) পক্ষ থেকে একজন সালিস এবং তার (স্ত্রীর) পক্ষ থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করো[৬৯] (মূলত স্বামী-স্ত্রী) এই দুইজন যদি নিজেদের (বিরোধের) নিষ্পত্তি চায়, তাহলে (এই সালিস দ্বারা) আল্লাহ্ তায়ালা তাদের (পুনরায় মীমাংসায় পৌঁছার) তৌফিক দেবেন। আল্লাহ্ তায়ালা নিশ্চয়ই সম্যক জ্ঞানী ও সর্ববিষয়ে জ্ঞাত আছেন[৬৯]।

৩৬. তোমরা সবাই মিলে এক আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য করো, কোনো কিছুকেই তাঁর (সার্বভৌমত্বের) সাথে অংশীদার বানিয়ো না[৭০]। (অতপর তোমাদের জন্মদাতা) পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো (আরো ভালো ব্যবহার করো) যারা (তোমাদের) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, ইয়াতীম, ফকীর, মিসকিন, প্রতিবেশী আত্মীয়, অনাত্মীয় প্রতিবেশী (তোমার) পথচারী সংগী ও তোমার অধিকারভুক্ত (চাকর-বাকর দাস-দাসী) এদের সবার প্রতি। অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা এমন মানুষকে কখনো পছন্দ করেন না, যে (এই সব লোকদের প্রতি অবজ্ঞা করে) অহংকারী ও দাম্ভিক (সেজে বসে)[৭১]।

৬৪. আগের আয়াতগুলোতে নারী-পুরুষের অংশ নির্ধারণ করে তা মেনে চলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। এক্ষেত্রে অধিকারের ব্যাপারে কোন পার্থক্য থাকলে নারীদের অভিযোগের সুযোগ হতো। বর্তমান আয়াতে নারী-পুরুষের মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এটা মেনে নিতে হবে। এটা সম্পূর্ণ হিকমত সম্মত ও যুক্তিযুক্ত। এক্ষেত্রে হিকমতের নিয়ম অনুযায়ী নারী- পুরুষ কখনো সমান থেকে পারেনা। নারীদের এ আকাংখ্যা করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। আয়াতের সার কথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা নারীদের ওপর পুরুদেরকে কর্তা এবং তত্ত্বাবধায়ক করেছেন। এর দু'টি কারণ আছে। প্রথম এবং প্রধান কারণ এই যে, প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে ইলম ও আমল তথা জ্ঞান ও কর্ম। এ জ্ঞান ও কর্মে আল্লাহ তা'য়ালা মৌলিকভাবে পুরুষকে শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রথম কারণটি সম্পূর্ণ খোদারই দান, এত মানুষের ইচ্ছা ইকতিয়ারের কোন হাত নেই। দ্বিতীয় কারণটি মানুষের অর্জিত। পুরুষরা নারীদের জন্য অর্থ ব্যয় করে। তাদের মোহরানা এবং খোরপোশের যাবতীয় ব্যয়বার বহন করে এর ফলে পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে।

'একজন মহিলা সাহাবী স্বামীর বড় নাফরমানী করলে স্বামী তাকে একটা থাপ্পড় দেন। মহিলাটি তার পিতার নিকট ফরিয়াদ করলে পিতা হুযুর (দঃ) এর দরবারে হাযির হয়ে সমস্ত বিষয় খুলে বলেন। হুযুর (দঃ) বললেন, মহিলাটি স্বামীর নিকট থেকে প্রতিশোধ নিক। ইতিমধ্যে আয়াতটি নাযিল হয়। হুযুর (দঃ) বললেন, আমরা একটা চেয়েছিলাম, আর আল্লাহ তা'য়ালা চেয়েছেন অন্যটা। আর আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই উত্তম।'

৬৫. অর্থাৎ নেককার নারীরা পুরুষের আনুগত্য করে। আর আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী নিজের স্বত্ত্বা এবং স্বামীর সম্পত্তি হেফাযত করে। নিজের স্বত্ত্বা এবং স্বামীর সম্পত্তিতে কোন প্রকার খেয়ানত করেনা।

৬৬. অর্থাৎ কোন নারী স্বামীর সঙ্গে অসদাচরণ করলে প্রথম পর্যায়ে স্বামী তাকে মুখে বুঝাবে। তাতে কাজ না হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে একই গৃহে ভিন্ন শয্যায় থাকতে দিবে। এতেও কোন ফল না হলে তৃতীয় পর্যায়ে তাকে মারবে। তবে এমন ভাবে মারবে না, যাতে মারার চিহ্ন থাকে। সকল অপরাধেরই পর্যায় ও স্তর আছে। তদনুযায়ী শাসনেরও অনুমতি আছে। আয়াতে এর তিনটি পর্যায় ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মার পিট হচ্ছে সর্বশেষ পর্যায়। সামন্য অপরাধের জন্য মারবে না। অবশ্য অপরাধ গুরতর হলে তা ভিন্ন কথা। এমন আঘাত করবেনা, যার চিহ্ন বর্তমান থাকে।

৬৭. অর্থাৎ সে নারীরা যদি তোমাদের উপদেশ-নছিহত, শয্যা পৃথক করা এবং মার-পিট ও শাসনের পর অসদাচরণ এবং নাফরমানী থেকে ফিরে আসে এবং বাহ্যত

তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তোমরা এখানে তাদের অপরাধ খুঁড়ে- খুজে বের করার পেছনে পড়বেনা। শুধু শুধু তাদেরকে অপরাধী-অভিযুক্ত সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের সকলের চেয়ে প্রবল, সকলের ওপর শাসক। নারীদের ব্যাপারে শুধু শুধু খারাপ ধারণা পোষন করবেনা । সামান্য অপরাধের জন্য শেষ পর্যায়ের শাস্তি দেওয়া শুরু করবেনা। বরং সকল অপরাধেরই একটা সীমা আছে, আছে একটা শাস্তিও।

৬৮. অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমাদের যদি আশংকা হয় যে. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে তারা নিজেরা এ বিরোধ নিস্পত্তি করতে পারবেনা, তখন তোমাদের কর্তব্য হবে পুরুষের এবং নারীর আত্নীয়দের মধ্য হতে দুইজন বিচারক নিযুক্ত করে ফয়সালা করে দেয়া। কারণ, নিকটাত্মীয়রা তাদের উভয়ের অবস্থা সম্পর্কে ভালো ভাবে জানে। তারা যে বেশী শুভাকাংখ্যী হবে এমন আশাও করা যায়। এ এরা সকল অবস্থা অনুসনন্ধান করে যার যতটুকু অপরাধ হবে, দেখবেন এবং উভয়কে বুঝায়ে সুজায়ে মিলায়ে মিশায়ে দিবেন।

৬৯. অর্থাৎ এই মধ্যস্থাকারীরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল-মিশ ও সদ্ভাবের ইচ্ছা করলে তাদের সদিচ্ছা-সদুদ্দেশ্য এবং সৎ প্রচেষ্টার ফলে আল্লাহ তা'য়ালা উভয়ের মধ্যে মিল-মিশ দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা সব বিষয়ে জানেন, সব খবর রাখেন। বিরোধ রফা এবং আপোস সাধনের কার্যকারণ ও হাল-হকিকত সম্পর্কে তিনি ভালো ভাবে জ্ঞাত আছেন। সুতরাং স্বামী স্ত্রীর বিরোধ নিস্পত্তিতে কোন অসুবিধা হবেনা ইনশাআল্লাহ।

(স্বামী স্ত্রীর অধিকার তথা বৃহত্তর সমাজে এর নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদের অধিকার ও অবস্থান ইত্যাদি জটিল সামাজিক বিষয়সমূহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে এই ক্ষুদ্র আলোচনার ওপর নির্ভর না করে আমরা পাঠকদের অনুরোধ করবো- এই বিষয়ের ওপর আরো ব্যাপক পড়াশোনা করতে -অনুবাদক)

৭০. অর্থাৎ আল্লাহর ওপর একীন করে এবং আখেরাতে সওয়াবের আশায় এবাদাত এবং নেক আমল করবে। গর্ব-অহংকার এবং লোক দেখানোর জন্য অর্থ ব্যয় করাও শেরক, যদিও এটা নিম্নমানের।

৭১. এতীম, অনাথ, নারী, ওয়ারিশ এবং স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও এবং তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করার পর এখন বলা হচ্ছে যে, স্তরে স্তরে সম্পর্ক এবং অভাবের অনুপাতে সকলের হক আদায় করবে। সকলের ওপরে আল্লাহ তা'য়ালার হক, এর পর পিতা-মাতার, পর্যায় ক্রমে সকল আত্নীয়ের হক। নিকট আর দূর প্রতিবেশীর অর্থ। বংশগত দিক থেকে দূর-নিকট অথবা অবস্থান ও বসবাসের দিক থেকে কে কতোটুকু দূর বা নিকট। প্রথম অবস্থায় এর অর্থ হবে আত্নীয় প্রতিবেশীর হক অনাত্নীয় প্রতিবেশীর চেয়ে বেশী। আর দ্বিতীয় সূরতে এর অর্থ হবে বাহের প্রতিবেশীর হক দূরের প্রতি বেশীর চেয়ে বেশী।

-পার্শ্চর সঙ্গী-সাথীর অর্থ সফর সঙ্গী। একই পেশা ও কাজের লোক। একই মুনিবের দু'জন নওকর, একই ওস্তাদের দু'জন শাগরেদ এবং বন্ধু, শাগরেদ সকলেই এর অন্তর্ভূক্ত। আর মেহমান ও অমেহমান উভয়েরই মুসাফিরের অন্তর্ভূক্ত। দাস-দাসীসহ অন্যান্য জীব জন্তুও এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। সবশেষে বলা হয়েছে, যার মেজাযে গর্ব-অহংকার তারমধ্যে একমাত্র নিজেকেই পসন্দ করার ভাব রয়েছে, যে কাউকেও তার সমান মনে করেনা অর্থের জন্য যে গর্বিত, আরাম আয়েশেই যে মত্ত, সে ব্যক্তি এসব অধিকার আদায় করবেনা। সুতরাং তোমরা এমন লোক থেকে সযত্নে দূরে থাকবে।

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ

وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ

عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ

النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ

يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ

لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ

اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ

ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ

أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ

وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ

كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿٤٢﴾

৩৭. (আল্লাহ্ তায়ালা এমন ধরনের লোকদেরও ভালোবাসেন না) যারা (অর্থনৈতিক ব্যাপারে) নিজেরা (যেমন) কার্পণ্য করে, (তেমনি) অন্যদেরও কার্পণ্য করার আদেশ (দিয়ে তাদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ) করে। (তাছাড়া) আল্লাহ্ তায়ালা তাদের যা কিছু (ধন-সম্পদের) অনুগ্রহ দান করেছেন তা (আল্লাহর ও তাঁর বান্দাহদের কাজে না লাগিয়ে) লুকিয়ে রাখে। আমি (এই শ্রেণীর অবিশ্বাসী) কাফেরদের জন্যে এক লাঞ্ছনাদায়ক (ভীষণ) শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি[৭২]।

৩৮. আর (আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরও পছন্দ করেন না) যারা (লোক দেখানোর (হীন লোভে) নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে (এই ব্যয় করার ব্যাপারে) তারা আল্লাহর ওপরও ঈমান আনে না এবং (যেদিন তাদের এ হীন কাজের জবাব দিতে হবে সেই) শেষ বিচারের দিনকেও বিশ্বাস করে না (আসলে) শয়তান যদি কোনো ব্যক্তির সাথী হয়, তাহলে (তার চিন্তা করা উচিত) সে কতোবড়ো খারাপ সাথী (পেলো)[৭৩]।

৩৯. কি (মহা ক্ষতিটা) তাদের হয়ে যেতো, যদি তারা (শয়তানকে সাথী বানানোর বদলে) আল্লাহর ওপর ঈমান আনতো এবং মেনে নিতো যে, (এই জীবনের শেষে) চূড়ান্ত হিসাব-কেতাবের একটি দিন আসবে এবং (সেই দিনের মুক্তির জন্যে) আল্লাহ্ তায়ালা তাদের যা কিছু (ধন-সম্পদ) দান করেছেন, তার কিয়দংশ (আল্লাহরই নির্দেশিত পথে) খরচ করতো। আল্লাহ্ তায়ালা তো তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে ভালোভাবেই ওয়াকেবহাল রয়েছেন[৭৪]।

৪০. আল্লাহ্ তায়ালা কখনো কারো ওপর এক বিন্দু পরিমাণও যুলুম করেন না। (এমন তো নয় যে, তারা এসব কাজ করলে আল্লাহ্ তাদের এর বিনিময় দিতেন না) পুণ্য কিংবা নেকীর কাজ যদি একটি হয় আল্লাহ্ তায়ালা তার পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেন। (আবার এর সাথে) তিনি নিজ থেকেও মহা পুরস্কার যোগ করেন (এবং এভাবেই তিনি তার অংককে আরো কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেন)[৭৫]।

৪১. (একবার ভেবে দেখো তো! সেদিনের) অবস্থাটা কেমন হবে যখন আমি প্রত্যক উম্মতের (কার্যাবলীর ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য) এক একজন সাক্ষী (হিসেবে তাদের নবীকে তাদের সামনে) এনে হাযির করবো এবং এদের (গোটা

মানব সন্তানের) কাছে (আমার দাওয়াত পৌছানোর) সাক্ষী হিসেবে তোমাকে নিয়ে আসবো[৭৬]।

৪২. (সেদিনের অবস্থা হবে এমন যে,) যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তারা সেদিন সবাই কামনা করবে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যেতে। (সেদিন) কোনো মানুষই তার জীবনের কোনো কথাই (মহা বিচারক) আল্লাহ্ তায়ালার কাছ থেকে গোপন করতে পারবে না[৭৭]।

---

৭২. অর্থাৎ যে নিজেকে পসন্দ করে. গর্ব-অহংকার করে এমন লোকদেরকে আল্লাহ ভালো বাসেন না। এরা কার্পণ্য করে, এরা নিজেদের ধন-সম্পদ এবং আল্লাহর দেয়া জ্ঞান মানুষের কাছে গোপন করে। কারো কোন উপকার করেনা। কথায় এবং কাজে অন্যদেরকেও কার্পণ্যের উৎসাহিত-অনুপ্রাণিত করে। এসব কাফেরদের জন্য আমরা অপমানকর আযাব প্রস্তুত রেখেছি।

আয়াতটি ইহুদীদের প্রসঙ্গেঁ নাযিল হয়েছে, আল্লাহর পথে ব্যয়ে যারা নিজরাও কার্পন্য করতো এবং মুসলমানদেরকেও এ ব্যাপারে করতে চাইতো। রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর যে সব বৈশিষ্ট্য তাওরাতে উল্লেখিত হয়েছে, ইসলামের সত্যতার যেসব আয়াত ছিলো, তাহা গোপন করতো, সুতরাং এসব থেকে মুসলমানদের বিরত থাকা অবশ্য করনীয়।

৭৩. যারা মানুষকে দেখানোর জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তারাই অহংকারী। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ব্যয় করায় নিজেরাও বখিলী করে এবং অন্যদেরকেও বখিলীর জন্য উৎসাহিত করে, কিন্তু মানুষকে দেখানোর জন্য অর্থ ঠিকই ব্যয় করে। আল্লাহর প্রতি এবং রোয কেয়ামতের প্রতি তাদের কোন ঈমানই নেই যে, আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি এবং পরকালের সওয়াব হাসিল করা তাদের কাম্য হবে। প্রথমে যেসব হকদারদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাদেরকে দান করাই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় ও পসন্দনীয়। এ দানে আল্লাহর সন্তটি এবং আখেরাতের সাওয়াবই হবে কাম্য। এটা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর পথে বখিলী কার্পণ্য যেমন নিন্দনীয়, তেমনি লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করাও নিন্দনীয়। আর এমন কাজ তারাই করে, শয়তান যাদের বন্ধু। শয়তান এ কাজে তাদেরকে উৎসাহিত-অনুপ্রাণিত করে।

৭৪. অর্থাৎ এসব কাফেররা কফুরী না করে আল্লাহ এবং রোয কেয়ামতের প্রতি ঈমান আনলে এবং কার্পণ্যের পরিবর্তে আল্লাহর পথে ব্যয় করলে তাদের কোন ক্ষতিই হতোনা, বরং আগাগোড়া তাদেরই উপকার হতো। তারা যে পথ অবলম্বন করেছে, তাতে তো তাদের ক্ষতি। তারা কী করছে এবং কোন নিয়তে করছে, তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। এরই বিনিময় তারা পাবে। প্রথম আয়াতে 'সম্পদ তাদের' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সুক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা অর্থ সম্পদকে নিজেদের মনে করে যে ভাবে নিজেদের মন চায়, সে ভাবে ব্যয় করে। অথবা তাদের উচিৎ ছিলো এটাকে আল্লাহর দেয়া সম্পদ মনে করে তার নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় করা।

৭৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা কারো অণু পরিমাণ হকও নষ্ট করেন না। সুতরাং এ কাফেরদের ওপর যে আযাব হবে তা সম্পূর্ণ ইনসাফ ভিত্তিক এবং তাদেরই অপকর্মের প্রতিফল। আর কারো অণু পরিমাণ ভালো কাজ থাকলে বহু গুণে তার প্রতিদান দেবেন। আর নিজের পক্ষ থেকে পুরস্কার হিসেবে বিরাট সাওয়াব দান করবেন।

৭৬. অর্থাৎ যখন আমরা প্রতিটি উম্মত এবং প্রতিটি জাতির মধ্য থেকে তাদের বর্ণনা করার জন্য সাক্ষী ডেকে নেবো, যারা তাদের সত্যিকার অবস্থা তুলে ধরবে, তখন সে সব কাফেরদের কী করুণ দশা হবে। এর অর্থ প্রত্যেক উম্মতের নবী এবং প্রত্যেক যুগের সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি. যারা কেয়ামতের দিন নাফরমানদের না ফরমানী এবং ফরমাঁবরদার অনুগতদের আনুগত্য প্রকাশ করবেন। সকলের অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন। আর হে মোহাম্মদ (দঃ) তোমাকে তাদের ওপর অর্থাৎ তোমার উম্মতের ওপর অন্যান্য নবীদের মতো অবস্থা বর্ননাকারী এবং সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করবেন। এদ্বারা অতীতের আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং উপরে উল্লেখিত কাফেরদের প্রতিও ইঙ্গিত হতে পারে। প্রথম অবস্থা এর অর্থ আম্বিয়া হলে তাৎপর্য এ হবে যে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) অতীত নবীদের সত্যতার সাক্ষী দেবেন আর এ সময় তাদের উম্মত তাদেরকে অস্বীকার করবে। আর এর অর্থ কাফের হলে তাৎপর্য এ হবে, নবী-রাসূলগরা যেমন নিজ নিজ উম্মতের কাফের ফাসেকদের কুফরী -ফেসকীর সাক্ষ্য দেবেন, তেমনি হে মোহাম্মদ (দঃ) তুমিও তাদের সকলের অপকর্মের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। এতে তাদেরকে দোষ-ত্রুটি ভালো ভাবে প্রমাণিত হবে।

৭৭. অর্থাৎ যেদিন প্রত্যেক উম্মত থেকে তাদের অবস্থা বর্ণনাকারী ডাকা হবে, সে দিন কাফের এবং নাফরমান লোকেরা আকাংখ্যা করবে, হায়! আমরা যদি মাটির সঙ্গে মিলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম ! আজ আমরা যদি জীবিত না হতাম, আমাদেরকে যদি আজ এ হিসাব-কিতাবের সম্মুখীন হতে না হতো। সে দিন তারা আল্লাহর কাছে কোন কিছুই গোপন করতে পারবেনা। তন্নতন্ন করে সে তাদের হিসাব নেয়া হবে।

সূরার শুরু থেকে মুসলমানদেরকে আত্নীয়-স্বজন এবং স্বামী স্ত্রী ও অন্যান্যের অধিকার আদায়ের তাকীদ করে কারো অধিকার হরণ এবং জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি সাধন থেকে বারণ করে পাপাচারের অপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। তারপর, অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করার এবং তার সঙ্গে কাউকে শরীক অংশীদার না করার নির্দেশ দিয়ে নিকটাত্নীয় এতীম-মিসকীন এবং প্রতিবেশী ও অন্যন্যের সঙ্গে সদাচার, ভালো ব্যবহার করার হুকুম দান করে তৎপ্রসঙ্গে গর্ব-অহংকার আত্নতুষ্টি, প্রশস্তি কৃপণতা এবং লোক দেখানো ইত্যাদি সম্পর্কে সর্তক করে দেয়া হয়েছে। এগুলো করে এমন দোষ-ত্রুটি, যা অন্যদের অধিকার আদায় এবং সদাচার, ভালো ব্যবহার করা থেকে মানুষকে বিরত রাখে। যারা মানুষকে টাকা-কড়ি দান করতে চান এবং চান মানুষের সঙ্গে সদাচার করতে, তাদের মন- মগজে শুধু শুধু এসব দোষ-ত্রুটি দেখাও দিয়ে থাকে। এসব

নির্দেশের পর এখন মুসলমানদেরকে স্পষ্টভাবে সম্বোধন করে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে। কারণ, নামায হচ্ছে সকল এবাদাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, উন্নত ও সবচেয়ে বেশী ফযীলতের কাজ। শরীয়তে নামাযের বেশী গুরুত্ব রয়েছে। নামাযের আরকান, শর্ত শরায়েত এবং আদব-কায়দা ইত্যাদি বলা হয়েছে যা বিস্তারিতভাবে অন্য কোন এবাদত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। অন্য কোন এবাদতের প্রতি এতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। নামায সংক্রান্ত ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ এবং নফসের কাছে সবচেয়ে কঠিন এবং নামাযের আরকান সুষ্ঠু সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করার জন্য দেহ- প্রাণের সমতূল্য দুইট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তাকীদ করা হয়েছে। এ বিষয় দু'টির প্রথমটি হচ্ছে এই যে, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যাবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত মুখ থেকে কি কথা বের হচ্ছে তা বুঝতে না পার। নাপাক অবস্থায়ও নামায থেকে দূরে থাকবে। গোসল করে সমস্ত শরীর পাক না করে নামাযে দাঁড়াবেনা। কারণ, নামাযে দু'টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। একটা হচ্ছে হুযুরে কলব এবং খুশু-খুযু অর্থাৎ তন-মন-ধ্যান এক করে একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে নামাযে দাঁড়াবে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে তারা নাফাসাত অর্থাৎ পবিত্রতা-পরিচ্ছনতা। আর নামায সংক্রান্ত সকল বিষয়ের মধ্যে এ দু'টি বিষয় নফসের জন্য অত্যন্ত কঠিন। নেশা হচ্ছে খুশু ও হুযুরে কলবের পরিপন্থী। আর নাপাকী অবস্থা হচ্ছে পাক-পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার বিপরীত। বরং নেশা যেহেতু নিদ্রা ও অচৈতন্যের মতো পবিত্রতা -পরিচ্ছন্নতার পরিপন্থী ওযু বিনষ্টকারী, তাই এটা পাক-পবিত্রতারও বিপরীত। অর্থ এ দাঁড়িয়েছে যে, পরিপূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে যাহেরী-বাতেনী সকল বিষয়ের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য ও যত্নসহকারে নামায় আদায় করবে। যদিও নফসের জন্য এটা কঠিন। এ বিশেষ উপলক্ষে এত গুরুত্ব ও শর্ত আরোপের ফলে দুইটি উপকারিতা সম্পর্কে জানা যায়। এক, উপরে উল্লেখিত বিধান সমূহে পারস্পরিক অধিকার কাজ কারবার এবং আর্থিক ও দৈহিক ইবাদাতের উল্লেখ করা হয়েছিলো। সেসব মেনে চলার সাথে সাথে রিয়া-কৃপণতা অর্থাৎ লোক দেখানো ও অর্থ-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ে কুণ্ঠাবোধ করা এবং আত্নতুষ্টি ও আত্নম্ভরিতা থেকে বিরত থাকায় যেহেতু নফসের পক্ষে কঠিন এবং এর ফলে শ্রোতাদের মনে শংকাও দেখা দিতে পারে- তাই এর চিকিৎসার উপায় বলে দেয়া আল্লাহ তা'য়ালা মনযুর হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত শর্ত পালন করে যাহেরী-বাতেনী সকল আদরের সঙ্গে নামায আদায় করলে উপরে উল্লেখিত সমস্ত আদেশ-নিষেধ মেনে চলা তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। কারণ, নামাযের কারণে সকল আদেশ এবাদাত সহজ হয়ে উঠে, এতে আগ্রহের সৃষ্টি হয় এবং সকল পাপাচারের কাজ ও নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি সৃষ্টি হয় ঘৃনাবোধ। অন্যান্য আয়াত এবং হাদীসে এর উল্লেখ রয়েছে এবং বিশেষজ্ঞ আলেমরাও এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এই যে. উপরোক্ত অনেক বিধানের কথা শুনে অনেক দুর্বল ও সাহসহারা লোকের আরও হিম্মত হারা হয়ে পড়া মোটেই অসম্ভব নহে। তারা

নিজদেরকে অপারগ বিবেচনা করবে এবং তাদের এ দুর্বলতা-অলসতার প্রতিক্রিয়া নামাযেও দেখা দিতে পারে। নামাযের শর্ত শারায়েত আদব কায়দ অনেক। আর এগুলো সব সময়ের জন্য। তাই নামাযের প্রতি যত্ন ও গুরুত্ব দেয়া জরুরী। সারকথা এ যে, নামায কায়েম করার প্রতি যে যত্নবান হবে, যে নিয়মিত নামায আদায় করবে, আর্থিক ও দৈহিক অন্যান্য হুকুম-আহকাম মেনে চলাও তার জন্য সহজ হবে। আর যে ব্যক্তি অন্যান্য বিধানে অবহেলা, অলসতা করে, নামায কায়েমেও তার অবহেলা-অলসতা এবং অমনোযোগিতা প্রদর্শন করা তার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নহে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ
الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا
نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ
تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾ مِنَ الَّذِينَ

هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا
وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ
وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ ۙ وَلَٰكِنْ
لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

রুকু ৭

৪৩. হে মানুষ–তোমরা যারা (আল্লাহ্ ও তাঁর পাঠানো দ্বীনের ওপর) ঈমান এনেছো- কখনো নেশা (ও মাদক জাতীয় জিনিসে মাতাল হয়ে) নামাযের (ধারে) কাছেও যেও না, যতোক্ষণ পর্যন্ত (তোমরা এতোটুকু নিশ্চিত না হবে যে) তোমরা যা কিছু বলছো- তা তোমরা (সঠিকভাবে) জানতে (ও বুঝতে) পারছো। (আবার) অপবিত্র অবস্থায়ও (নামাযের কাছে যেও) না, যতোক্ষণ না তোমরা (পুরোপুরিভাবে) গোসল সেরে নেবে[৭৮]। তবে (রাস্তাঘাটে) পথচারী অবস্থায় থাকলে তা ভিন্ন কথা। আর যদি তোমরা (শারীরিকভাবে) অসুস্থ হয়ে পড়ো, অথবা প্রবাসে থাকো কিংবা কেউ যদি পায়খানা থেকে (ফিরে) আসো- অথবা তোমরা যদি (কামাসক্ত হয়ে) নারী স্পর্শ করো (তাহলে এর সব কয়টি অবস্থায় পানি দিয়ে নিজেদের পরিষ্কার করে নেবে)। তবে যদি (এসব অবস্থায়) পানি না পাও, তাহলে তোমরা পবিত্র (একখন্ড) মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নেবে (এবং তার পদ্ধতি হচ্ছে) তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও তোমাদের হাত মুসেহ করে নেবে[৭৯]। অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা গুনাহ্ মার্জনাকারী- পরম ক্ষমাশীল[৮০]।

৪৪. (হে নবী) তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখোনি–যাদের আসমানী গ্রন্থের সামান্য একটা অংশ দেয়া হয়েছিলো? (হেদায়াত লাভের বদলে এর দ্বারা) তারা গোমরাহীর পথকেই কিনে নিচ্ছে, শুধু তাই নয়, তারা তোমাদেরও সত্য পথ থেকে সরিয়ে পথভ্রষ্ট করে দিতে চায়।

৪৫. তোমাদের এ দুশমনদের আল্লাহ্ তায়ালা ভালো করে জানেন (বলেই এদের ব্যাপারে তোমাদের তিনি সাবধান করে দিচ্ছেন এবং তোমাদের অভয় দিচ্ছেন যে) অভিভাবক হিসেবে (যেমন) আল্লাহ্ তায়ালা (তোমাদের জন্যে) যথেষ্ট, সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্যে যথেষ্ট[৮১]।

৪৬. এই ইয়াহুদী জাতির মধ্যে কিছু লোক এমন আছে (যাদের চরিত্রই হচ্ছে যে) এরা (আল্লাহ্ ও রসূলের) কথাগুলোকে মূল (অর্থাবাধক) স্থান থেকে সরিয়ে (বিকৃত করে) দেয়[৮২] এবং তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং (সাথে সাথে) অমান্য করলাম[৮৩]। (আবার বলে), আমাদের কথা শুনুন[৮৪]। ইসলামী জীবন বিধানের মাঝে বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের জিহ্বাকে কুঞ্চিত করে (আরো) বলে, (হে নবী) আপনি (আমাদের কথা) শুনুন[৮৫], (সাথে সাথেই নিজেরা বলে উঠে) আপনার শ্রবণশক্তি রহিত হয়ে যাক[৮৬]। (এসব সত্য বিকৃতির বদলে) এরা যদি বলতো (হে নবী) আমরা (আপনার কথা) শুনলাম এবং (তা) মেনে নিলাম এবং (আরো যদি বলতো) আমাদের কথা শুনুন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন—তাহলে তাদের জন্যে কতোই না ভালো কাজ হতো—(শুধু তাই নয়) তাই হতো তাদের জন্যে সংগত (পদক্ষেপ।) কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করার কারণে তাদের ওপর আল্লাহ্ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন, অতপর তাদের মাঝ থেকে সামান্য কিছু লোকই মাত্র ঈমান এনে থাকে[৮৭]।

---

৭৮. আগের আয়াতগুলোতে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিলো। এখান থেকে এ সম্বোধন শুরু হয়েছে।এ প্রসঙ্গে কাফেরদের নিন্দা করা হয়েছে, যারা উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর বিরোধিতা করতো। এরপর পুনরায় মুসলমানদেরকে নামায প্রসঙ্গে কয়েকটি বিশেষ প্রদান হেদায়াত করা হয়েছে। আগের বিষয়ের সঙ্গে এসব হেদায়াতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। সে সম্পর্কটি এই যে, ইতিপূর্বে কাফের এবং আহলে কিতাবদের দুইটি দোষ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছিলো। একটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় না করা, বরং মানুষকে দেখানোর জন্য এবং নিজেদের সম্মান বাড়ানোর জন্য অর্থ ব্যয় করা। এটা স্পষ্ট যে প্রথম দোষের কারণ হচ্ছে জ্ঞানের অভাব আর অজ্ঞতার প্রাধান্য, আর দ্বিতীয় দোষের কারণ হচ্ছে মনস্কামনা তথা খাহেশাতে নফসানী। এ থেকে জানা যায় যে, গোমরাহীর দুইটি বড় কারণ রয়েছে। এক, জাহালাত তথা অজ্ঞতা, এর ফলে হক আর বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়না। দুই, নফসের খাহেশ। এর ফলে হক এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হলেও হক অনুযায়ী আমল করা যায় না। কারণ খাহেশ দ্বারা ফেরেশতা সুলভ শক্তি দুর্বল এবং পাশবিক শক্তি সবল হয়ে পড়ে। এর পরিনতিতে ফেরেশতা থেকে দূরত্ব এবং শয়তানের নৈকট্য লাভ হয়। এটা হচ্ছে অনেক অকল্যাণ অপকর্মের মূল। এ কারণে

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে নেশার অবস্থায় নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। এটা হচ্ছে জাহালত বা মাতলামী। অতঃপর নাপাক অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ,. এটা হচ্ছে ফেরেশতা থেকে দূরত্ব এবং শয়তানের নৈকট্যের অবস্থা। হাদীস শরীফে আছে, যেখানে নাপাক লোক থাকে, সেখানে ফেরেশতা আসেনা। এখন অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে, মুসলমানরা! কুফর এবং রিয়া বা লোক দেখানোর দোষ ক্রটি সম্পর্কে তোমরা যখন জানতে পেরেছে আর এর বিপরীত কাজের কল্যাণ ও তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সুতরাং এটা দ্বারা নেশাগ্রস্ত এবং নাপাক অবস্থায় নামায় আদায় করতে দোষ কি, এটাও ভালো করে বুঝে নেবে। কারণ, এর এবং কুফরী ও রিয়ার একই কারণ, একই উৎপত্তি। সুতরাং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যাওয়া উচিৎ নয়, যতক্ষণ না তোমাদের এতটুকু হুশ জ্ঞান ফিরে আসে যে, তোমরা মুখে যা বলছে, তা বুঝতেও পারছ। তেমনি নাপাক অবস্থায় নামাযের কাছে যাওয়া উচিৎ নয়, যতক্ষণ তোমরা গোসল করে না নেবে। অবশ্য সফর অবস্থায় এর বিধান সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হচ্ছে।

এ নির্দেশ সে সময়ের-যখন নেশা হারাম করা হয়নি। কিন্তু নেশার অবস্থায় নামায পড়া হারাম-নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনেক বর্ণনায় এ কথার উল্লেখ রয়েছে যে, একবার সাহাবীদের দা'ওয়াতে অনেক লোক উপস্থিত হন। যেহেতু তখন পর্যন্ত মদ্য পান হারাম করা হয়নি। তাই তারা মদ্যপান করেন। মাগরিবের সময় উপস্থিত হলে সকলে এ অবস্থায় নামাযে দাঁড়ান। ইমাম নামাযে সূরা পাঠ করেন। তিনি বেহুঁশ অবস্থায় সূরা ভুল পড়েন। ফলে অর্থ দাঁড়ায় সম্পূর্ণ উল্টা । এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়। এখন যদি ঘুমের ঘোর বা অসুখের কারণে কারো এমন অবস্থা হয় যে, সে কি বলেছে তার কোন খবরই নেই। এমন অবস্থায় নামায পড়লে তা জায়েয হবেনা। হুঁশ ফিরে এলে এর কাযা আদায় করা জরুরী।

৭৯. অর্থাৎ নাপাক অবস্থায় গোসল না করে নামায পাড়ার এ হুকুম সে সময়ের জন্য, যখন কোন ওযর না থাকে। যদি এমন কোন ওযর দেখা দেয় যে, পানি ব্যবহার করতে অক্ষম, অথচ পবিত্রতা অর্জন করাও জরুরী এ অবস্থায় মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট। এখানে পানি ব্যবহার করতে অক্ষমতার তিনটি সূরতের উল্লেখ করা হয়েছে। এক, অসুখ যাতে পানি ব্যবহার করলে ক্ষতি হবে। দুই, দুস্কর অবস্থা। যে পরিমাণ পানি আছে, তা দিয়ে ওযু করে নিলে পিপাসায় মারা যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তিন, পানি একবারেই নেই। এ শেষ সূরতের সঙ্গে পবিত্রতা জরুরী হওয়ার দু'টি সূরতের উল্লেখ করা হয়েছে। এক, পায়খানা পেশাব সেরে এসেছে, তার ওযু করা জরুরী। দুই, স্ত্রী সঙ্গম করে এসেছে। তার জন্য গোসল করা জরুরী।

তায়াম্মুম করার নিয়ম এই যে, পাক-পবিত্র মাটির ওপর উভয় হাত স্থাপন করবে, অতঃপর গোটা মুখের ওপর ভালোভাবে হাত ফিরাবে। অতঃপর মাটিতে উভয় হাত স্থাপন করতঃ কনুই পর্যন্ত উভয় হাত মুছে নিবে। মাটি হবে পাক। কোন জিনিসের জন্য পানির

মতই মুতাহহের বা পবিত্রকারকও। যেমন- মুজা, তরবারী, আয়না ইত্যাদি। যে নাজাসাত বা নাপাক জিনিষ মাটির সঙ্গে মিশে যায়, তাও পাক হয়ে যায়। হাত এবং মুখে মাটি নেওয়ায় পরিপূর্ণ বিনয়ও সাধিত হয়। গুনাহ থেকে ক্ষমা চাওয়ার এটা একটা উত্তম উপায়। সুতরাং মাটি যখন যাহেরী বাতেনী উভয় প্রকার নাপাকী দূর করে, তাই অক্ষমতার সময় এটাকে পানির স্থলভিষিক্ত করা হয়েছে। তদুপরি ব্যাপারটি সহজ করাই তায়াম্মুমের ভিত্তি। এমন কিছুকে পানির স্থলাভিষিক্ত করা উচিৎ যা পানির চেয়েও সহজ লভ্য। মাটি যে সহজলভ্য, তা সকলেরই জানা কথা। কারণ, মাটি সর্বত্র পাওয়া যায়। তদুপরি মাটিই মানুষের মূল। মূলের প্রতি প্রত্যাবর্তনে পাপ-অপকারিতা থেকে রক্ষা হয়। কাফেররাও আকাংখ্যা করবে যে, আমরা যদি মাটির সঙ্গে মিশে যেতাম। পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের এ আকংখ্যার উল্লেখ রয়েছে।

৮০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা প্রয়োজনের সময় তায়াম্মুমের অনুমতি দিয়েছেন। মাটিকে পানির স্থলাভিষিক্ত করেছে। তা করেছেন এ জন্য যে, তিনিই সহজ করেন, ক্ষমা করে থাকেন। তিনিই তো বান্দাহদের দোষ-ক্রটি মার্জনা করেন। তিনিই তো বান্দাহদের কল্যাণ ও আরাম পসন্দ করেন। এ থেকে একথাও জানা যায় যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযে যে একটার স্থলে অন্যটা পড়েছিলো, তাও ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এর ফলে মনের এ খটকাও আর অবশিষ্ট থাকবেনা যে, ভবিষ্যতে তো এমতাবস্থায় আর নামাযে দাঁড়াবোনা, কিন্তু পূর্বে যে ভুল হয়ে গেছে, সম্ভবতঃ সে জন্য পাকড়াও করা হবে।

৮১. এ আয়াতগুলোতে ইহুদীদের কোন কোন দোষ-ক্রটি এবং তাদের প্রতারণা প্রবঞ্চনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাদের গোমরাহী সম্পর্কে স্বয়ং তাদেরকে এবং অন্যদেরকেও অবহিত করাই এই আয়াত গুলোর মূল উদ্দেশ্য, যাতে অন্যরা তাদের থেকে দূরে থাকতে পারে। এতে পর্যন্ত ইহুদীদের দোষ-ক্রটির উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্যখানে এক বিশেষ সম্পর্কের কারণে নেশাগ্রস্থ এবং নাপাক অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করতঃ পুণরায় ইহুদীদের দোষ-ক্রটি সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে। ইহুদীরা কিতাবের অংশ বিশেষ পেয়েছে অর্থাৎ পাঠ করার জন্য শব্দ পেয়েছে । কিন্তু আমল করাই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য, তারা এটা পায়নি। আর গোমরাহী ক্রয় করার অর্থ শেষ নবী (দঃ) এর অবস্থা ও গুণাবলী গোপন করে দুনিয়ার সম্মান আর ঘুষের জন্য এবং তাঁকে জেনে শুনে অস্বীকার করে। আর এরা চায় যে, মুসলমানরাও দ্বীন থেকে ফিরে গোমরাহ হয়ে যাক। মুসলমানগণ। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দুশমনদেরকে ভালো করেই জানেন। তোমরা ঠিক সেভাবে তাদেরকে জাননা। সুতরাং আল্লাহর কথায় আশ্বস্ত হও এবং তাদের থেকে দূরে থাক, তোমাদের ভালো করা এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালাই যথেষ্ট। সুতরাং দুশমনের তরফ থেকে এ ধরনের আশংকা করবেনা এবং দ্বীনের ওপর অটল অবিচল থাকবে।

৮২. অর্থাৎ ইহুদীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাওরাতে যা নাযিল করেছেন, এরা তাকে যথাস্থান থেকে অপসারণ করে অর্থাৎ তাওরাতে শব্দ এবং অর্থের পরিবর্তন ঘটায়।

৮৩. অর্থাৎ আল্লাহর নবী (সঃ) তাদেরকে কোন হুকুম শুনালে জবাবে তারা বলে, আমরা শুনে নিয়েছি। এর অর্থ দাঁড়ায় আমরা কবুল করে নিয়েছি। কিন্তু চুপি সারে বলে, 'মানি না।' অর্থাৎ আমরা কেবল কানে শুনেছি, অন্তরে মানিনি।

৮৪. অর্থাৎ ইহুদীরা যখন হুযুর (দঃ) কে সম্বোধন করে, তখন তারা দ্ব্যার্থ বোধক কথা বলে এর এক অর্থ হয় দোয়া বা তাযীম সম্মান, আর অন্য অর্থ হয় বদ দোয়া এবং অসম্মান-অপমান। অথচ বাহ্যতঃ কথাটি আশীর্বাদ জ্ঞাপক। এর অর্থ হচ্ছে তুমি সর্বদা বিজয়ী সম্মানীত হও। কেউ তোমাকে খারাপ এবং বিপরীত কথা না শুনাক। অথচঃ তাদের অন্তরে নিয়ত থাকে তুমি বধির হয়ে যাও।

৮৫. অর্থাৎ হুযুর (দঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হলে ইহুদীরা বলতো এরও দু'টি অর্থ আছে, একটা ভালো, একটা খারাপ। এ সম্পর্কে সূরা বাকারায় আলোচনা করা হয়েছে। ভালো অর্থ এই যে, আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিন; অনুগ্রহ করুণ, যাতে আপনার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারি এবং যা জিজ্ঞাসা করে যা জানতে চাই. তা জানতে পারি। আর খারাপ অর্থ এই যে, ইহুদীদের ভাষায় এ শব্দটি তুচ্ছার্থ জ্ঞাপক। অথবা তারা মুখ চাপায়ে বলতো, যার অর্থ হয় তুমি আমাদের 'রাখাল'। তারা কেবল দুষ্টামি করেই এইরূপ করতো। কারন, তারা ভালো করে জানতো যে, হযরত মূসা (আঃ) সহ অন্যান্য নবীরাও বকরী চরায়েছেন।

৮৬. অর্থাৎ ইহুদীরা তাদের ভাষার সঙ্গে মিশ্রিত করে এ শব্দগুলো এমন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করতো, যাতে শ্রোতা এর ভালো অর্থই গ্রহণ করতো, খারাপ অর্থ চিন্তাও করতোনা। কিন্তু এরা মনে মনে খারাপ অর্থ গ্রহণ করে দ্বীণ খুঁত সৃষ্টির চেষ্টা করতো। এরা বুঝাতে চেষ্টা করতো যে. এ লোকটি নবী হয়ে থাকলে আমাদের প্রতারণা অবশ্যই বুঝতে পারতো। তাইতো আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের প্রতারণা ভালো ভাবে ফাঁস করে দিয়েছেন।

৮৭. আল্লাহ তা'য়ালা ইহুদীদের তিনটি ঘৃন্য বিষয় উল্লেখ করে এখন তিরস্কার ও হেদায়াত হিসেবে বলছেন যে, ইহুদীরা যদি কথাটা ভালো ভাবে বলতো, তবে তা তাদের পক্ষে ভালো হতো । কথাটাও হতো শুদ্ধ সঠিক। ইহুদীরা এ শব্দগুলোর যে কদর্থ গ্রহণ করতো, তারও অবকাশ থাকতোনা। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাদের কুফরীর কারণে আপন রহমত হেদায়াত থেকে দূরে রেখেছেন, তাই তারা ভালো এবং সোজা কথা বুঝতে পারেনা, ঈমান আনেনা। খুব স্বল্প সংখ্যক লোক যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা। এরা এসব দুষ্টামী নষ্টামী থেকে দূরে থাকে বিধায় আল্লাহর লা'নত থেকেও হেফাযতে থাকেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا

لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى

اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ

وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٤٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ

بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ

بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿٤٨﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ

يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ

فَتِيْلًا ﴿٤٩﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ

وَكَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٠﴾

৪৭. হে মানুষরা যাদের ওপর আমার পক্ষ থেকে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তোমরা সেই গ্রন্থের ওপর ঈমান আনো- যা আজ আমি (মোহাম্মদের ওপর) নাযিল করেছি, (এ হচ্ছে এমন এক কিতাব) যা তোমাদের কাছে মজুত (আমার পাঠানো পূর্ববর্তী) কিতাবের (শিক্ষা ও বাণীর) সত্যতা স্বীকার করে, (তোমরা ঈমান আনো) সেই (কঠিন) সময় আসার আগে যখন আমি (পাপিষ্ঠদের) চেহারাসমূহকে বিকৃত করে তাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেবো অথবা (ইয়াহুদীদের পবিত্র দিন) শনিবারের অবমাননাকারীদের প্রতি আমি—যে ভাবে অভিশাপ নাযিল করেছি তেমনি (কোনো বড়ো ধরনের বিপর্যয় আসার আগেই তোমরা ঈমান আনো) আর আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম! সে তো অবধারিত[৮৮]।

৪৮. অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা কখনো (সেই গুনাহ্ মাফ করবেন না যখন তাঁর (সার্বভৌমত্বের) সাথে কাউকে শরীক করা হয় এ ছাড়া অন্য সব ধরনের গুনাহ্— যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন, মূলত যে (পাপীষ্ঠ) ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার বানালো সে সত্যিই একটা বড়ো মিথ্যা রচনা করলো এবং একটা মহা পাপে (নিজেকে) জড়ালো[৮৯]।

৪৯. (হে মোহাম্মদ) তুমি কি তাদের অবস্থা দেখোনি—যারা নিজেদের পূতপবিত্র মনে করে (বাহাদুরী করে বেড়ায়) অথচ (এদের জানা উচিত যে আসল পবিত্রতা তো আল্লাহরই হাতে) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকেই পবিত্র করেন এবং (যারা পবিত্রতার এ গন্ডির বাইরে অবস্থান করে) তাদের ওপর এক বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না[৯০]।

৫০. একবার এদের (হতভাগ্য মানুষগুলোর) প্রতি তাকিয়ে দেখো কিভাবে এরা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে যাচ্ছে, প্রকাশ্য গুনাহ্ হিসেবে এটুকুই তো (এদের জন্যে) যথেষ্ট[৯১]।

---

৮৮. আগের আয়াত গুলোতে ইহুদীদের গোমরাহী এবং নানা দোষ-ক্রটির উল্লেখ করে এখন তাদেরকে ঈমান এনে কোরআনকে স্বীকার করে নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং কোরআনের বিরুদ্ধাচরন থে বিরত থাকার জন্য বলা হচ্ছে। অর্থ এই যে, হে কিতাবধারীরা! আমরা তোমাদের চেহারার চিহ্ন চোখ নাক ইত্যাদি মুছে ফেলার আগে তোমরা ঈমান আন। অর্থাৎ চেহারা পরিবর্তন করার আগে তোমরা ঈমান। এরপর আমরা তোমাদের চেহারাকে পেছনে ফিরায়ে দেবো অর্থাৎ চেহারাকে সমান করে পেছনের দিকের মতো করে দেবো এবং পেছনের দিককে পরিণত করব সামনের দিকে। অথবা 'শনিবার ওয়ালাদের' মতো তোমাদের চেহারার পরিবর্তন করে তোমাদেরকে জন্ত জানোয়ার করে দিবে। 'শনিবার ওয়ালাদের' কাহিনী সূরা আ'রাফে উল্লেখিত হয়েছে।

৮৯. অর্থাৎ শেরকের গুনাহ কখনো মাফকরা হয়না। এর শাস্তি চিরন্তন ও অপরিবর্তীয়। অবশ্য যেসব গুনাহ শেরকের নীচে, তা ছগীরা হোক, বা কবীরা তা সবই ক্ষমার যোগ্য। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে মাফ করতে চান. তার কবীরা সব গুনাহই মাফ করে দেন। কিন্ত শাস্তি দিয়ে অথবা আদৌ কোন শাস্তি না দিয়েই তিনি মাফ করে দেন। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইহুদীরা যেহেতু কুফরী- শেরকীতে নিমজ্জিত রয়েছে, তাই তারা ক্ষমার আশা করা বৃথা।

৯০. অর্থাৎ এতসব দোষ-ক্রুটি স্বত্বেও ইহুদীরা নিজেদেরকে পাক পবিত্র মুকাদ্দাস বলে দাবী করে, এমনকি নিজেরেদরকে বলে 'আবনা উল্লাহ'। 'আহিব্বাউল্লাহ' তথা আল্লাহর সন্তান ও বন্ধু বলে দাবী করে। তাদের এসব দাবী সম্পূর্ণ অমূলক অর্থহীন। অবশ্য আল্লাহ তা'য়ালা যাকে ইচ্ছা পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দেন। ইহুদীদের দাবী করায়

কিছুই যায় আসেনা। এসব মিথ্যা দাবীদারদের প্রতি সামান্য যুলুমও করা হবেনা। অর্থাৎ তারা নিজেদর প্রপ্য শাস্তিই ভুগবে, তাদের প্রতি অন্যায় আযাব কখনো হবেনা।

ইহুদীরা বাছুর পূজা করতো এবং হযরত উযাইর আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলতো। এ আয়াতটি শুনে তারা বলে, আমারা তো মোশরেক নই; বরং আমরাতো খাছ বান্দা, পয়স্বরের সন্তান। পয়গাম্বরী তে আমাদের মীরাসী সম্পত্তি। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের এ গালভরা বুলি পসন্দ না করে। এ উপলক্ষ্যেই আয়াতটি নাযিল করেন।

৯১. অথাৎ কি বিস্ময়ের ব্যাপার, আল্লাহর প্রতি কি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়। কুফরী, শেরক অবলম্বন করেও নিজেদেরকে আল্লাহর বন্ধু বলে দাবী করে। আল্লাহর কাছে প্রিয়পাত্র হওয়ার দাবী করে। এসব কঠোর অপবাদ নিজেদের স্পষ্ট গুনাহগার হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا
نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ
آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن
يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ
الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ
النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ
إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾
فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ

بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ
نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ
جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

৮ম রুকু

৫১. তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখোনি—যাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) কেতাবের কিছু অংশ দান করা হয়েছিলো, (পরে তারা সে অংশ পরিত্যাগ করে আস্তে আস্তে) নানা ধরনের ভিত্তিহীন অমূলক জাদুমন্ত্র জাতীয় জিনিস ও (বহুতরো) মিথ্যা খোদার ওপর ঈমান আনতে শুরু করলো- এবং (এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাসী) এই কাফেরদের সম্পর্কে তারা বলতে লাগলো যে, ঈমানদারদের তুলনায় মনে হয় এরাই তো সঠিক পথের ওপর রয়েছে[৯২]।

৫২. এরাই হচ্ছে সেই (হতভাগ্য) নরাধম, যাদের ওপর আল্লাহ্ তায়ালা অভিসম্পাত করেছেন আর আল্লাহ্ যার ওপর অভিশাপ পাঠান তার জন্যে (সেই অভশাপ থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে) তুমি দ্বিতীয় কোনো সাহায্যকারী পাবে না[৯৩]।

৫৩. অথবা (এরা কি মনে করে যে) তাদের ভাগে রাজত্ব (ও তার প্রাচুর্য) সংক্রান্ত কিছু আছে? (যদি তেমন কিছু সত্যিই এদের দেয়া হতো) তাহলে এরা তো খেজুর পাতার একটি শুকনো ডালও কাউকে দিতো না[৯৪]।

৫৪. কিংবা এরা অন্যান্য মানব সন্তানদের ব্যাপারে কি হিংসা (বিদ্বেষ) পোষণ করে যাদের আল্লাহ্ তায়ালা নিজস্ব (দানের) ভান্ডার থেকে (প্রভূত পরিমাণ) দান করেছেন (এই অনুদানই যদি হিংসার কারণ হয়ে থাকে, তাহলে এদের জানা উচিত যে) আমি তো (এমনিভাবে) ইবরাহীমের বংশধরদেরও (আমার) গ্রন্থ (সেই গ্রন্থলব্ধ) জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করেছিলাম, (এর সাথে) আমি তাদের এক বিশাল পরিমাণ রাজত্বও দান করেছিলাম[৯৫]।

৫৫. কিন্তু (তারা আমার এই মহান দানের সাথে কি আচরণ করেছিলো?) তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক তার কেতাবের উপর ঈমান এনেছে আবার কেউ কেউ তার থেকে মুখ (ও) ফিরিয়ে নিয়েছে। মূলত (যারা আমার পাঠানো এই কেতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে) তাদের পুড়িয়ে দেয়ার জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট[৯৬]!

৫৬. যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তাদের (সবাইকে) অচিরেই আমি জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে দেবো[৯৭], অতপর (আগুনে পুড়ে) তাদের দেহের চামড়া যতোবার গলে যাবে ততোবার আমি তার বদলে নতুন চামড়া বানিয়ে দেবো যাতে করে তারা আযাবের কষ্ট ভালোভাবে ভোগ করতে পারে[৯৮]। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মহান পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ কৌশলী[৯৯]।

---

৯২. এ আয়াতে ইহুদীদের দুষ্টামী নষ্টামী এবং খবীসীপনার উল্লেখ করা হয়েছে। কাহিনী ছিলো এই যে, হুযুর (দঃ) এর সঙ্গে ইহুদীদের শত্রুতা বৃদ্ধি পেলে তারা মক্কার মোশরেকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঐক্যমত প্রকাশ করে এবং তাদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলে, তোমাদের ধর্ম তো মুসলমানদের ধর্মের চেয়ে উত্তম। এদের এরূপ করার কারণ ছিলো নিছক হিংসা-বিদ্বেষ। হিংসা ছিলো এই জন্য যে, ধর্মের কর্তৃত্ব আমাদের ছাড়া অন্যরা কেন পেলো। আল্লাহ তা'য়ালা এজন্য তাঁহাদেরকে ইলযাম দিচ্ছেন, অভিযুক্ত করছেন, এ আয়াতে সে কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

৯৩. অর্থাৎ এরা আহলে কিতাব হয়ে নাফসের গরজের কারণে মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে, ইসলামের নীতির চেয়ে কুফরীর নীতিকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করেছে। এদের প্রতি আল্লাহর লানত। আর আল্লাহ যাকে লা'নত করেন, দুনিয়া এবং আখেরাতে তার কোন সাহায্যকারী হতে পারেন, সুতরাং তারা নিজেদের সাহায্যের লোভে মক্কার মোশরিকদের সঙ্গে যে গাঁট -ছড়া বেঁধেছে তা কোন কাজে আসবেনা। তাই ইহুদীদেরকে দুনিয়াতেও সীমাহীন যিল্লতী ভোগ করতে হয়েছে, আর আখেরাতেও আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে।

৯৪. ইহুদীরা তাদের ধারণা অনুযায়ী জানতো যে, পয়গম্বরী এবং দ্বীনের সর্দারী আমাদের মীরাসী সম্পত্তি। আমরাই এটা পাওয়ার যোগ্য। তাই তারা আরবের পয়গম্বরের আনুগত্য করতে লজ্জা বোধ করতো। তারা বলতো যে, শেষ পযন্ত হুকুমত-বাদশাহী আমরাই লাভ করবে। কিছু দিনের জন্য অন্যরা লাভ করলে তাতে ক্ষতি কি? এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। আয়াতটির অর্থ এই যে, বাদশাহীতে কি ইহুদীদের কোন অংশ রয়েছে? না, কখনো না। এরা রাজত্ব-কর্তৃত্ব লাভ করলে মানুষকে এর বিন্দু -বিসর্গ অংশও দেবেনা। অর্থাৎ এত কৃপণ যে. বাদশাহীতে মানুষকে সামান্য অংশও দেবেনা।

৯৫. অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও ইনাম- পুরস্কার দেখে এসব ইহুদীরা কি হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরেছ? এরাতো তাদের বাজে কাজ। কারণ, আমরা হযরত ইববরাহীম (আঃ) এর কিতাব ইলম এবং মহা রাজত্ব দান করেছি। অতঃপর এরা কি করে আপনার নবুওয়্যাত এবং মান মর্যাদায় হিংসা করতে পারে? কি করে এটাকে অস্বীকার করতে পারে? আপনিও তো হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর বংশোদ্ভুত।

৯৬. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর বংশে আল্লাহ তা'য়ালা সর্বদা বুযুর্গী দান করেছে। তার বংশে এই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং যে কেউ অকারণে নিছক হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁকে আমান্য-অস্বীকার করে, তাকে জ্বালাবার জন্য জাহান্নামের দাউ দাউ করা আগুনই যথেষ্ট।

৯৭. আগের আয়াতে মোমেন এবং কাফেরের কথা বলা হয়েছিলে। এখন স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি হিসেবে মোমেনের পুরস্কার এবং কাফেরের এ শাস্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে ঈমানের প্রতি আকৃষ্ট উদ্বুদ্ধ হয় এবং কুফরীকে ভয় করে তা থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে পারে।

৯৮. অর্থাৎ কাফেরের আযাবে কোন কমতি হবেনা, তা হ্রাস করাও হবেনা। তাই তাদের এক চামড়া জ্বলে গেলে তা পরিবর্তন করে অপর চামড়া দেয়া হবে। অর্থাৎ কাফেররা সব সময় একই ধরণের আযাবে নিমজ্জিত থাকবে।

৯৯. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিঃসন্দেহে মহা পরাক্রমশালী। কাফেরদেরকে এমন শাস্তি দানে তাঁর কোন অসুবিধা হবেনা। তিনি বিজ্ঞ ও মহাকুশলী। সুতরাং কাফেদেরকে এ শাস্তি দান করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞান সম্মত হবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا

ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ

أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

৫৭. (অপর দিকে) যারা আমার আয়াতসমূহকে স্বীকার করেছে এবং (সেই মোতাবেক বাস্তব জীবনে) ভালো কাজ করেছে, তাদের অচিরেই আমি এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো—যার পাদদেশ দিয়ে (বিপুল) ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। এই জান্নাতে তাদের অবস্থান হবে চিরকালের জন্যে। (সেই জান্নাতে) তাদের জন্যে থাকবে পূতপবিত্র সঙ্গী ও সঙ্গিনীরা, (সর্বোপরি) তাদের আমি এক চির স্নিগ্ধ ছায়ায় স্থান করে দেবো[১০০]।

৫৮. (হে মানুষ, তোমরা যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করেছো) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা (তোমাদের কাছে রক্ষিত) আমানতসমূহকে তাদের (যথার্থ) মালিকের কাছে সোপর্দ করে দেবে[১০১], আর যখন মানুষের মাঝে কোনো কিছুর ব্যাপারে বিচার ফায়সালা করতে হয় তা করবে ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে। (একবার চিন্তা করে দেখো) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যা কিছু উপদেশ দেন তা কতো সুন্দর! আর আল্লাহ তায়ালা তো (তোমাদের) সব কিছুই দেখেন এবং সবকিছুই শুনেন[১০২]।

৫৯. হে মানুষ তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের এবং (রসূলের পর) সে সব লোকদের যারা তোমাদের (ঈমানদার জনগোষ্ঠীর) মাঝে (বিশ্বস্ত ও) দায়িত্বপ্রাপ্ত[১০৩]। অতপর তোমাদের মাঝে যদি কোনো ব্যাপারে (মতানৈক্য কিংবা) মতবিরোধের সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই (বিরোধপূর্ণ) বিষয়টিকে (ফয়সালার জন্যে) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও—যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর ওপর এবং শেষ

বিচারের দিনে ঈমান এনে থাকো১০৪। এই পদ্ধতিই হচ্ছে (তোমাদের মাঝে বিরোধ মীমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট (পন্থা) এবং সুষ্ঠু পরিণতির দিক থেকেও এটি হচ্ছে উত্তম পন্থা১০৫।

---

১০০. অর্থাৎ মোমেনরা সর্বদা জান্নাতে থাকবে। তাদেরকে যেসব জীবন সঙ্গিনী দেওয়া হবে, তারা মাসিক ঋতু ও অন্যান্য কষ্ট-ক্লেশ মুক্ত হবে। তাদেরকে ঘন গহীন বনে ছায়াতলে স্থান দানকরা হবে, যা হবে সূর্যের প্রখর তাপ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

১০১. ইহুদীদের অভ্যাস ছিলো, তারা আমানতের খেয়ানত করতো, বিরোধ নিষ্পত্তিতে ঘুঁশ উৎকোচ গ্রহণ করে সত্য ও ন্যায়ের বিপরীত রায় দান করতো। তাই এ আয়াতে মুসলমানদেরকে এ দু'টি বিয়ষ থেকে বারণ করা হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (দঃ) কা'বা শরীফে প্রবেশ করতে চাইলে কা'বার চাবী ধারী ওসমান ইবনে তালহা রাসূল চাবী দিতে অস্বীকার করে। হযরত আলী (রা) তাঁর কাছ থেকে চাবী ছিনিয়ে নিয়ে দরজা খুলে দেন। রাসূল (সাঃ) কে অবসর হয়ে বাইরে এলে হযরত আব্বাস (রাঃ) কা'বা শরীফের চাবী পাওয়ার আশায় তার কাছে দরখাস্ত করেন। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয় এবং চাবী ওসমান ইবনে তালহাকেই অর্পন করা হয়।

১০২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা যে তোমাদেরকে আমানত আদায় করার এবং ইনসাফ ন্যায়নীতি অনুযায়ী সুবিচার করার নির্দেশ দিচ্ছেন, তা তোমাদের জন্যই আগাগোড়া মঙ্গল জনক। তিনি তোমাদের গোপন-প্রকাশ্য এবং বর্তমান ভবিষ্যতের সব বিষয়ই ভালো ভাবে জানেন। সুতরাং তোমাদের যদি কোন ক্ষেত্রে আমানত রক্ষা করা এবং সুবিচার করা পসন্দ না হয়, তা কল্যাণকর বলে তোমাদের মনে না হয়, তবে আল্লাহর হুকুমের বিপরীত তার কোন মূল্যই নেই।

১০৩. আগের আয়াতে শাসক- বিচারকদেরকে সুবিচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। এখানে অন্যদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে হাকেম-শাসক-বিচারকদের অনুসরন করার। তা থেকে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, হাকেম- শাসকরা নিজেরা সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণ করলে কেবল তখনই তাদের আনুগত্য করা ওয়াজেব।

ইসলামী শাসক-বাদশাহ, তার সুবদার, বিচারপতি-সেনাপতি বা অন্য যারা কোন দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে, তাদের নির্দেশ মেনে চলা ততক্ষণ জরুরী, যতক্ষণ তারা আল্লাহ এবং রাসূলের নির্দেশের পরিপন্থী কোন নির্দেশ না দেয়। তারা আল্লাহ এবং রাসূলের স্পষ্ট নির্দেশ লংঘন করলে তাদের নির্দেশ কিছুতেই মানা যাবেনা।

১০৪. শাসক-বিচারকের এ নির্দেশ আল্লাহ এবং রাসূলের হুকুমের অনুকূল না প্রতিকূল এ ব্যাপারে 'উলুল আম্‌র' এর সঙ্গে তোমাদের মতবিরোধ দেখা দিলে কিতাবুল্লাহ ও রাসূলের সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। এ আলোকে ঠিক করে নেবে যে, মূলতঃই তা আল্লাহ এবং রাসূলের হুকুমের অনুকুল না প্রতিকূল। এ ব্যাপারে যা সাব্যস্ত

হবে। তাকেই মেনে নিয়ে তদনুযায়ী আমল করতে হবে। এক্ষেত্রে সকল বিরোধের অবসান ঘটানো উচিৎ, যদি আল্লাহ এবং রোজ কেয়ামতের প্রতি তোমাদের ঈমান থাকে। কারণ,আল্লাহ এবং কেয়ামতে যার ঈমান থাকবে, সে অবশ্যই বিরোধের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরনকে ভয় করব। এ থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম থেকে দূরে সরে যাবে সে মুসলমান নয়। একারণে দু'জন মুসলমান যদি পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়, তাদের একজন বলে, চল. শরীয়তের দিকে প্রত্যাবর্তন করি, অপরজন বলে,আমি শরীয়ত বুঝিনা। শরীয়ত দিয়ে আমার কোন কাজ নাই। তাকে অবশ্যই কাফের বলতে হবে।

১০৫. নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করা এবং নিজেদের মনমত ফয়সলা করার চেয়ে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত করা মঙ্গলজনক। এ প্রত্যাবর্তনের পরিণাম শুভ।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا
إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۚ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (৬০) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ
الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (৬১) فَكَيْفَ إِذَا
أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ
يَحْلِفُونَ ۖ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (৬২)
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۖ فَأَعْرِضْ

عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا ﴿٦٣﴾

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَلَوْ

اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ

وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾

রুকু ৯

৬০. তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখোনি যারা (বড়ো গলায়) দাবী করে যে, তারা সেই কেতাবের ওপর ঈমান এনেছে যা তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে এবং (সেই কেতাবের ওপরও) যা তোমার আগে (নবীদের ওপর) নাযিল করা হয়েছে। অথচ (বাস্তব জীবনের কোনো ব্যাপারে) বিচার ফায়সালা করতে চাইলে (আমার পাঠানো কিতাবের বদলে) এরা মিথ্যা খোদাদের কাছ থেকেই সেই বিচার ফায়সালা সম্পর্কিত বিধান পেতে চায়। অথচ (এরা ভালো করেই জানে যে, আমার কেতাবের মাধ্যমে) এদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তারা এসব মিথ্যা খোদাদের অস্বীকার করবে, (আসল কথা হচ্ছে) শয়তান এদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করে সত্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়[১০৬]।

৬১. এদের যখন বলা হয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর যা কিছু নাযিল করেছেন (জীবন যাপনের জন্যে) তার দিকেই চলো (সবাই আমরা ফিরে আসি) তখন তুমি এই (প্রতারক) মোনাফেকদের দেখবে, এরা তোমার কাছ থেকে একে একে মুখ ফিরিয় দূরে সরে যাচ্ছে[১০৭]।

৬২. অতপর তাদের নিজেদের কর্মফলের কারণে যখন তাদের ওপর কোনো বিপদ-মুসিবত এসে পড়ে, তখন এদের অবস্থাটা কি হয় (তুমি লক্ষ্য করেছো? তেমন অবস্থায়) তারা সবাই তোমার কাছে (ছুটে) আসে এবং আল্লাহর নামের কসম করে তোমাকে বলে, আমরা তো কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া আর কিছুই চাইনি[১০৮]।

৬৩. (আসলে) এদের মনের ভেতরে কি (অভিসন্ধি) লুকিয়ে আছে তা আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। তাই এদের কথায় তুমি গুরুত্ব দিয়ো না। (এবং) এদের তুমি ভালো উপদেশ দাও, এমন সব কথায় তাদের (উপদেশ দাও) যা তাদের অন্তর ছুঁয়ে যায়[১০৯]।

৬৪. (তাদের তুমি বলো) আমি যখনই কোনো জাতি কিংবা জনপদে) কোনো রসূল পাঠিয়েছি, তাকে এ জন্যেই পাঠিয়েছি যে, (সেই জনপদের মানুষদের পক্ষ থেকে) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার (শর্তহীন) আনুগত্য করা হবে। (তারা যদি এই আচরণটুকু করতো যে,)—যখনি তারা নিজেদের ওপর কোনো যুলুম করবে, তখনি তোমার কাছে (ছুটে) আসবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, (এই পরিস্থিতিতে) আল্লাহর রসূলও (তাদের হয়ে আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাইতো।—তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু হিসেবে (দেখতে) পেতো[১১০]।

---

১০৬. ইহুদীরা বিবোধ নিষ্পত্তিতে পক্ষপাতিত্ব এবং উৎকোচ গ্রহণে অভ্যস্ত ছিলো। এ কারণে মিথ্যাবাদী মোনাফেক এবং খেয়ানতকারীরা নিজেদের বিরোধ-মীমাংসার জন্য ইহুদী আলেমদের কাছে যাওয়া পসন্দ করতো। কারণ, তারা পক্ষপতিত্ব করবে। এমন লোকেরা রসূলের দরবারে বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য আসা পসন্দ করত না। কারণ তিনি সত্যের অনুসরণ করবেন, কারো প্রতি আদৌ পক্ষপতিত্ব করবেন না। মদীনায় একজন ইহুদী এবং একজন মোনাফেক বাহ্যতঃ একই রকমের ছিলো। কোন ব্যাপারে তাদের দু'জনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ইহুদীটি ছিলো সত্য। সে বললো, চল, মোহাম্মদ (সঃ) এর কাছে বিচারের জন্য যাই। আর মোনাফেক ছিলো মিথ্যা, সে বললো, কা'আব ইবনে আশরাফ এর কাছে চলো। তিনি ছিলেন ইহুদীদের আলেম ও সর্দার। অবশেষে তারা উভয়েই বিরোধ নিয়ে রসূলের দরবারে উপস্থিত হয়। রসূল ইহুদীর পক্ষে রায় দেন। মোনাফেক লোকটি বাইরে এসে বললো, চলো হযরত ওমরের কাছে যাই। তিনি যে ফয়সালা করবেন, তা মেনে নেবো। রসূলের ফয়সালায় সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। হয়তো সে মনে করেছিলো যে, আমি যেহেতু ইসলামের দাবীদার, তাই নবী (সঃ) ইহুদীর মোকাবিলায় আমার প্রতি পক্ষপতিত্ব করবেন। হযরত ওমর (রা) রসূলের নির্দেশক্রমে মদীনায় ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করতেন, তারা উভয়েই হযরত ওমর (রাঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়। হযরত ওমর (রাঃ) উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনলেন। ইহুদীর মুখে তিনি একথা জানতে পারলেন যে, বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য রসূলের দরবারেও পেশ করা হয়েছিলো। তিনি এ ব্যাপারে ইহুদীর পক্ষে রায়ও দিয়েছিলেন। একথা জানতে পেরে হযরত ওমর বিচারপ্রার্থী মোনাফেক লোকটিকে হত্যা করেন, তিনি বললেন, রাসূলে খোদার মতো বিচারকের ফয়সালা যে ব্যক্তি মানে না এটাই তার উচিৎ ফয়সালা। নিহত মোনাফেকের ওয়ারিসরা হুযুর (দঃ) এর খেদমতে হাযির হয়ে ওমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে হত্যার

অভিযোগ উত্থাপন করে। তারা কসম করে বলতে লাগলো যে, হযরত ওমরের কাছে সে এজন্য গিয়েছিলো যে, হয়তো তিনি উভয়ের মধ্যে সন্ধি করে দেবেন। তার কাছে যাওয়ার অর্থ রসূলের ফয়সলা অস্বীকার করা নয়। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। এতে সত্যিকার ঘটনা প্রকাশ করা হয়েছে। এবং হযরত ওমর (রাঃ)-কে ফারুক উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

১০৭. অর্থাৎ কোন বিরোধে যদি মোনাফেকদেরকে বলা হয়যে, আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন, তোমরা সে দিকে আস। রাসূলের দরবারে তোমাদের বিরোধ পেশ কর। যেহেতু তারা ছিলো উপরে উপরে ইসলামের দাবীদার, একারণে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করতে পারতোনা। কিন্তু রসূলের দরবারে উপস্থিত হতে এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী চলা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতো, তারা ভাবতো, কোন উপায়ে যদি প্রাণ বাঁচানো যায়! রাসূলকে বাদ দিয়ে যেখানে আমাদের মন চায়, বিরোধ নিস্পত্তির জন্য সেখানে নিয়ে যাবো।

১০৮. অর্থাৎ এসব কিছুই তো করেছে ঠিক, কিন্তু যখন তাদের কর্মফল দোষে আযাব আসবে, তখন তারা কি করবে? বিরোধ-নিস্পত্তি জন্য আপনার কাছে আসতে যে বিরত থাকতো, এর ফলে তাদের ওপর যদি আযাব আসতে শুরু করে, তখন তারা কি করতে পারবে? তখন কসম খেয়ে একথা বলা ছাড়া তাদের আর কি বলার আছে যে, আমরা হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়েছিলাম কেবল এ জন্য যে, তিনি আপোষ রফা করে দেবেন। রাসূলের কথা থেকে মুখ ফিরানো প্রাণ বাঁচানো আদৌ আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো না। রাসূলের খেদমতে হাজির হয়ে এসব কথা বলা ছাড়া তাদের আর কি বলার আছে?

১০৯. এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের কসম এবং ওযর-আপত্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, মোনাফেকরা মুখে মুখে যা কিছু বলে বলুক। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের অন্তরের কথা ভালো করেই জানেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাদের মোনাফেকী এবং মিথ্যা সম্পর্কে ভালো ভাবেই অবগত আছেন। সুতরাং আপনিও আল্লাহর জ্ঞানকে যথেষ্ট মনে করে মোনাফেকদের কথায় কর্ণপাত করবেনা। তাদের কথাকে বিন্দুমাত্রও পরোওয়া করবেননা। তাই বলে তাদেরকে নছিহত করতে, কাজের কথা শুনাতে বিন্দু মাত্র ত্রুটি করবেননা কিছুতেই। তাদের হেদায়াত সম্পর্কে আপনি নিরাশও হবেনা অবশ্যই।

১১০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাহদের কাছে যে রাসূলই প্রেরণ করেন, তা করেন এ উদ্দেশ্যে যাতে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বান্দাহরা রাসূলের কথা মেনে চলে, তার আনুগত্য করে। এদেরও উচিৎ ছিলো, বিনা দ্বিধায় শুরু থেকেই রাসূলের কথা মেনে নেয়া। মনে প্রাণে তাকে স্বীকার করে নেয়া। পাপ এবং অন্যায় করার পরও যদি তারা সাবধান হয়ে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতো, আর রাসূল নিজেও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন

তা হলেও আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করে নিতেন। কিন্তু তাদের অপরাধ সীমা ছেড়ে গেছে। রাসূলের নির্দেশ তো অবিকল আল্লাহরই নির্দেশ। তারা এ নির্দেশ থেকে দূরে সরে গিয়ে। এ নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি আপতিত হতে দেখেও তারা সর্তক-সংশোধন হয়ে তওবা করেনি। বরং উল্টা মিথ্যা কসম খেয়ে নানা প্রকার ব্যাখ্যা শুরু করে দেয়। এমন লোকদেরকে কি করে ক্ষমা করা যেতে পারে?

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾ وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿٦٦﴾ وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٦٧﴾ وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٦٨﴾ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿٧٠﴾

৬৫. না, (বাস্তব ঘটনা কিন্তু তা নয়) আমি তোমার মালিকের শপথ করে বলছি, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না যতোক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফয়সালায় তোমাকে (শর্তহীনভাবে) বিচারক মেনে নেবে, অতপর তুমি যা ফায়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না বরং তোমার সিদ্ধান্তকে তারা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে[১১১]।

৬৬. আমি কি তাদের এই আদেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দাও অথবা নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে তোমরা (অন্য কোথাও চলে) যাও, (তেমন কোনো আদেশ হলে আমি জানি) তাদের মধ্যে খুব সামান্য সংখ্যক মানুষই আমার হুকুম তামিল করতো। (জীবন যাপনের জন্যে) যে সব উপদেশ তাদের দেয়া হয়েছে তা যদি তারা মেনে চলতো, তবে তা তাদের জন্যে খুবই কল্যাণকর হতো এবং আল্লাহর ওপর তাদের বিশ্বাসও (এতে) আরো মজবুত হতো!

৬৭. আর তখন আমিও আমার পক্ষ থেকে এ জন্যে তাদের বড়ো ধরনের পুরস্কার দিতাম।

৬৮. এবং দুনিয়ায় জীবন যাপনের জন্যে) আমিও তাদের সহজ ও সরল পথ দেখিয়ে দিতাম[১১২]!

৬৯. (আর এই দুনিয়ায়) আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করে (শেষ বিচারের দিন) তারা (সে সব পুণ্যবান মানুষের) সাথে থাকবে, যাদের ওপর আল্লাহ্ তায়ালা প্রচুর নেয়ামত বর্ষণ করেছেন। (এ মানুষেরা হচ্ছে) নবী-রসূল (তাদের হেদায়াতের) সত্যতা যারা স্বীকার করেছে (আল্লাহর পথে যারা জীবন দিয়েছে সেসব) শহীদ ও অন্যান্য ব্যক্তি যারা সৎকর্ম করেছে ।(ভেবে দেখো) সাথী হিসেবে এরা কতো উত্তম[১১৩]!

৭০. এসব কিছুই হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ (এই অনুগ্রহের সাথে কে কি আচরণ করলো তা) জানার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালাই যথেষ্ট[১১৪]!

---

১১১. অর্থাৎ মোনাফেকরা কেমন ভ্রান্ত ধারনায় নিমজ্জিত রয়েছে আর কি সব বাজে অপকৌশলে তারা কার্যোদ্ধার করতে চায়, তা ভালো করে বুঝে নিতে হবে। হে রাসূল! আমরা কসম করে বলছি যে, তারা যতক্ষণ তোমাকে নিজেদের ছোট-বড় সকর বিরোধ একমাত্র বিচারক বলে স্বীকার করে না নেবে, যাতে তোমার ফয়সালা এবং নির্দেশের পর তাদের অন্তরে কোন রকম সংকীর্ণতা এবং অসন্তুষ্টি বর্তমান না থাকে, যতক্ষণ তোমার নির্দেশকে স্বানন্দচিত্তে গ্রহণ করে না নেবে, ততক্ষণ তাদের ঈমান নসীব হবেনা। এখন তারা কি করবে, বুঝে-শুনে করুক।

১১২. অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা ই সকলের জীবনের মালিক, সুতরাং তার নির্দেশে জীবন বিসর্জন দানেও কারো কুণ্ঠাবোধ করা উচিৎ নয়। আল্লাহ তা'য়ালা কখনো মানুষকে জীবন কোরবান করার এবং দেশ ত্যাগ করার নির্দেশ দান করেন, যেমন তিনি বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা আল্লাহর এ নির্দেশ পালন করেনি। অবশ্য তাদের মধ্যে গুটি কতেক সাচ্চা ও পাকা ঈমানদার আল্লাহর এ নির্দেশ মেনে নিয়েছিলো। সুতরাং এ মোনাফেকরা কি করে আল্লাহর এ নির্দেশ মেনে চলবে। এখন তাদের চিন্তা করে দেখা উচিৎ যে, আমরা তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছি, তা দিয়েছি তাদের জন্য নছীহত হিসেবে, তাদের শুভ কামনা করে। তাদেরকে জীবন কোরবান করার বা দেশ ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। তারা এ সহজ নির্দেশ মেনে চললে তাদের মোনাফেকী দূর হয়ে যেতো, তারা ভালো মুসলমানে পরিণত হতে পারতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা বুঝতে পারছেনা। বর্তমান অবস্থাকে তারা অমূল্য সম্পদ বিবেচনা করতে পারছেনা। তারা বুঝতে পারছে না যে, এ একটা বিষয়েই তাদের দ্বীন-দুনিয়া উভয়ই ঠিক হয়ে যেতে পারে।

১১৩. নবী হচ্ছেন তিনি, যাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী আসে অর্থাৎ প্রকাশ্যে ফেরেশতা এসে আল্লাহর বানী পৌছিয়া দেন। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে আসা পয়গাম এবং বিধান যিনি অন্তর থেকে মেনে নেন এবং বিনা দলীলে তাকে সত্য বলে যিনি স্বীকার করেন, তিনি হচ্ছেন ছিদ্দীক। পয়গম্বরের হুকুমে যিনি জীবন দিতে প্রস্তুত। তিনি হচ্ছেন শহীদ। যাঁর প্রকৃতি সুস্থ, নেকী যাঁর স্বভাব, খারাপ কাজ থেকে যিনি দেহ-মনকে পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত করতে পেরেছেন, তিনি হচ্ছেন ছালেহ বা নেককার. নেক বখ্‌ত । সার কথা হচ্ছে এই যে, উপরে উল্লেখিত এ চার প্রকার লোক উম্মতের অন্যান্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এদের ছাড়া অন্য যেসব মুসলমান আছে, তারা মর্তবায় এদের সমান নয়, কিন্তু তারাও আল্লাহও রাসূলের আনুগত্যে নিয়োজিত, তাদেরকেও এদের কাছাকাছি গণ্য করা হবে। এদের সাহচর্যও বিরাট মর্যাদার বিষয়। কেউ যেন এটাকে তুচ্ছ মনে না করে । পূর্ব থেকে যেসব মুনাফেকের প্রসঙ্গ চলে আসছে, তারা এ সান্নিধ্য সাহচর্য থেকে বঞ্চিত, আলোচ্য আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১১৪. অর্থাৎ আল্লাহ এবং রাসূলে নির্দেশ পালনকারী 'আম্বিয়া-ছিদ্দীকীন, শুহাদা ছালেহীনের' সান্নিধ্য লাভ করা আল্লাহর এক বিরাট ইনাম, এটা নিছক তাঁর অনুগ্রহ, এটা তাঁদের আনুগত্যের বিনিময় নয়। মোনাফেকরা আল্লাহর এ নেয়ামত অনুগ্রহ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। আর সর্বজ্ঞাতা হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি মুখলেছ এবং মোনাফেককে ভালো করেই জানেন। কে কতটুকু মুখলেছ, মোনাফেক আর কে কতটুকু অনুগত, তার প্রকৃত যোগ্যতা কি, ফযীলত মর্যাদার মাপকাঠিতে তার কতটুক মূল্য আছে, এসব কিছুই বিস্তারিত ভাবে তার জানা আছে। এসব বিস্তারিত জ্ঞানের কারণে খোদার ওয়াদা পূরণ করা সম্পর্কে এখন কারো কোন সংশয় থাকা উচিৎ নহে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا

حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿৭১﴾ وَاِنَّ

مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ

قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿৭২﴾ وَلَئِنْ

اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ

وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿৭৩﴾

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ

الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ

اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿৭৪﴾ وَمَا لَكُمْ

لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ

الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ

اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا

مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚۙ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿৭৫﴾ ؕ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاۗءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۝٧٦

রুকু ১০

৭১. হে ঈমানদার মানুষেরা- (শত্রুর মোকাবেলায়) তোমরা সব সময়ই সতর্ক থেকো, অতপর হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে কিংবা একত্রিত হয়ে (শত্রুর মোকাবেলায় এগিয়ে) যাও[১১৫]।

৭২. তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমন কিছু (মোনাফেক জাতীয়) লোক থাকবে, যারা (সম্মুখ সমরে যাওয়ার ব্যাপারে) গড়িমসি করবে[১১৬], তোমাদের ওপর কোনো বিপদ-মুসিবত এলে তারা বলবে, আল্লাহ্ সত্যিই আমার ওপর বড়ো অনুগ্রহ করেছেন। কারণ, আমি তাদের সাথে ছিলাম না[১১৭]।

৭৩. আর যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (বিজয়ের) অনুগ্রহ আসে, তখন (তাদের) অবস্থা (দেখে) এমন (মনে) হয় যে, তাদের সাথে তোমাদের কোনো রকম বন্ধুত্ব সম্পর্কই (কোনো দিন) ছিলো না। সে তখন বলে, কতোই না ভালো হতো যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম। (তাদের সাথে থাকলে আজ) আমি অনেক বড়ো সফলতা অর্জন করতে পারতাম[১১৮]।

৭৪. যে সব লোক পরকালীন জীবনের বিনিময়ে এই পার্থিব জীবনের (সুখ-সমৃদ্ধিকে) বিক্রি করে দিয়েছে, সে সব (সৌভাগ্যবান) মানুষদের উচিত আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করা। কারণ, যে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করবে সে হয় (এই সংগ্রামে) বিজয়ী হবে, না হয় এ পথে জীবন বিলিয়ে দেবে- (এ উভয় অবস্থায়ই তার জন্যে সফলতা অনিবার্য)। অচিরেই আমি তাকে (এই সংগ্রামের বিনিময়ে) বিরাট রকমের একটা পুরস্কার দেবো[১১৯]।

৭৫. তোমাদের এ কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে (তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে) সে সব অসহায় নর-নারী ও (দুস্থ) শিশু সন্তানদের (বাঁচাবার) জন্যে লড়াই করবে না—যারা নির্যাতনে কাতর হয়ে) ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের মালিক, আমাদের এই যালেমের জনপদ থেকে কোনো দেশে) বের করে নাও, অতপর তুমি

আমাদের জন্যে তোমার কাছ থেকে কোনো অভিভাবক (পাঠিয়ে) দাও, তোমার কাছ থেকে কোনো জনদরদী (শাসক) পাঠিয়ে দাও১২০।

৭৬. মানুষদের মাঝে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান এনেছে, তারা সর্বদা সংগ্রাম করে আল্লাহর পথে (তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে) আর যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করেছে, তারা লড়াই করে (অন্যায়ের পথে) মিথ্যা খোদাদের সপক্ষে, অতএব (ঈমানের দাবীদার হিসেবে তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে), তোমরা সংগ্রাম করো (শয়তান ও) মিথ্যা খোদাদের চেলা-চামুন্ডাদের বিরুদ্ধে। (এই সংগ্রামে কখনো নিজেদের সাহস হারিয়ো না, কারণ) শয়তান (ও তার) চক্রের ষড়যন্ত্র হামেশাই থাকে খুব দুর্বল১২১।

---

১১৫. এখান থেকে জেহাদ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে। আগের আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে আম্বিয়া, ছিদ্দীকীন, শুহাদা-ছালেহীনের সান্নিধ্য-সাহচর্য পুরস্কার স্বরূপ লাভ করবে। আল্লাহর বিধানের মধ্যে জেহাদের হুকুম যেহেতু কঠিন, বিশেষ করে মোনাফেকদের জন্য, যাদের প্রসঙ্গেঁ পূর্ব থেকে আলোচনা চলে আসছে। একারণে এখানে জেহাদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যাতে যে কেউ আম্বিয়া ছিদ্দীকীন ইত্যাদির সান্নিধ্য আশা করে না বসে।

বর্নীত আছে যে, ইসলামের প্রথম দিকে অনেক দুর্বল ঈমানের মুসলমানও ইসলামী দাওয়াত কবুল করেছিলেন। অতঃপর জেহাদ ফরয হলে অনেকেই দোদুল্যমান হয়ে উঠে, অনেকে কাফেরদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলয়ে আল্লাহর নবীর বিরোধিতা শুরু করে। এ প্রসঙ্গেঁ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা! মোনাফেকদের অবস্থা তো আগেই জানতে পেরেছ। এখন সব দিক থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা, সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। তোমরা নিজেদের খবর রাখবে, হুঁশিয়ার থাকবে, তা হাতিয়ার দ্বারা হোক বা কৌশল দ্বারা প্রজ্ঞা-বুদ্ধিমত্তা দ্বারা হোক , বা সাজ সরঞ্জাম দ্বারা। দুশমনের সঙ্গে মোকাবিলা এবং লড়াই করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আস, বিচ্ছিন্নভাবে, বা সকলে সম্মিলিতভাবে, পরিবেশ-পরিস্থিতি যেমন হয়।

১১৬. অর্থাৎ হে মুসলমানরা! তোমাদের দলে এমন অনেক লোকও ঢুকেছে। যারা জেহাদে গমন করতে বিলম্ব করে, বিরত থাকে। তারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করেনা, বরং দুনিয়ার ফায়েদার দিকেই তারা চেয়ে থাকে। এ কথা দ্বারা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সঙ্গী সাথীদের মতো মোনাফেকদের বুঝানো হয়েছে। এরা বাহ্যত ইসলাম কবুল করেছিলো। কিন্তু সব কিছুতেই এদের মকছুদ ছিলো অন্য কিছু। এরা বাহ্যত ইসলাম কবুল করেছিলো দুনিয়া লোভ। আল্লাহ তা'য়লার আনুগত্যে তাদের কোন গরয ছিলোনা।

১১৭. আগে বলা হয়েছে যে, মোনাফেকরা ঘর থেকে জেহাদে বের হতে বিলম্ব করতো, যারা জেহাদে অংশ নিয়েছে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতো যে, দেখি অবস্থা কি দাঁড়ায়। এখন বলা হচ্ছে যে, যাওয়ার পর জেহাদে মুসলমানদের যদি কোন ক্ষতি হয়, যেমন কেউ নিহত হয় বা পরাজিত হয়, তখন এসব মুনাফেরা খুবই খুশী হয়।এরা বলে, আল্লাহর বিরাট মেহেরবানী যে, আমরা যুদ্ধে তাদের সঙ্গে ছিলামনা। তাদের সঙ্গে থাকলে আমাদেরও মঙ্গল হতোনা। আল-হামদু লিল্লাহ। বেশ রক্ষা পেয়েছি।

১১৮. অর্থাৎ আর যদি মুসলমানদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ হয়ে যায়, যেমন তারা বিজয় লাভ করে বা অনেক গনীমতের মাল হাতে আসে, তখন বড় পরিতাপ করে। দুশমনদের মতো হিংসার অভিশপ্তে বলে, আফসোস। জেহাদে আমরাও মুসলমানদের সাথে থাকলে বিরাট সাফল্য আমাদেরও নছীব হতো। লুটের মাল পেতাম। অর্থাৎ কেবল নিজেদের বঞ্চিত হওয়ার জন্যই মোনাফেকরা আফসোস করতোনা, বরং মুসলমানদের সাফল্যে তাদের হিংসা -অস্থিরতা হতো এর চেয়েও অনেক বেশী।

১১৯. অর্থাৎ মোনাফেকরা যদি জেহাদ থেকে বিরত থাকে থাকুক, পার্থিব চড়াই-উৎরাই- এর দিকে তাকিয়ে থাকে থাকুক। কিন্তু যারা আখেরাতের মোকাবিলায় দুনিয়ায় লাথি মেরেছে, আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিনা দ্বিধায় লড়াই করে যাওয়া উচিৎ। দুনিয়ার জীবন এবং ধন দওলতের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবেনা। তাদেরকে জেনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্যের মধ্যে সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে তারা জয়ী হোক বা পরাজিত, অর্থ-সম্পদ লাভ করুক, বা নিঃস্ব-নিঃসম্বল থাকুক।

১২০. অর্থাৎ দু'টি কারণে কাফেরদের সঙ্গে তোমাদের লড়াই করা জরুরী। এক, আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ ও বিজয়ী করার উদ্দেশ্য। দুইঃ যে সব মযলুম মুসলমান কাফেরদের হাতে আটকা পড়েছে, তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য। মক্কায় অনেকেই ছিলো, যারা মহানবীর সঙ্গে হিজরত করতে পারেননি। ওদিকে তাদের আত্নীয়, স্বজনরা এসে পীড়াপীড়ি শুরু করে দিয়েছে যে, তোমরা আবার কাফের হয়ে যাও। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বলতেছেন যে, দুটি কারণে কাফেরদের সঙ্গে তোমাদের লড়াই করা জরুরী হয়ে পড়েছে। যাতে আল্লাহর দ্বীন বুলন্দ হয় এবং মযলুম এবং দুর্বল মুসলমানরা যাতে মক্কায় কাফেরদের যুলুম থেকে নাজাত পায়।

১২১. অর্থাৎ এ কথাটি যখন স্পষ্ট যে, মুসলমানরা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর কাফেররা লড়াই করে শয়তানের পথে। সুতরাং শয়তানের বন্ধুদের সঙ্গে মুসলমানদের লড়াই করা তো নির্দ্বিধায় জরুরী হয়ে পড়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সহায় আছেন তাদের লড়াই করা তো নির্দ্বিধায় জরুরী হয়ে পড়েছে। তাদের কোন প্রকার ইতস্তত করা উচিৎ নয়। তোমরা জেনে রাখবে যে, শয়তানের ছাল-চাতুরী প্রতারণা অত্যন্ত দুর্বল। মুসলমানদের সঙ্গে শয়তানের এসব ছল-চাতুরী চলবে না। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জেহাদে মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করা। তাদেরকে সাহস যোগানো। পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

أَلَمْ تَرَ

إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا

الصَّلَوٰةَ وَآتُوا الزَّكَوٰةَ ج فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ

الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ

اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ج وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا

الْقِتَالَ ج لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ط قُلْ مَتَاعُ

الدُّنْيَا قَلِيلٌ ج وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ قف وَلَا

تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ

وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ط وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ

يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ج وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ

يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ط قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ط فَمَالِ

هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ مَا

أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ز وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ

فَمِنْ نَّفْسِكَ ۚ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۚ وَكَفٰى

بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٧٩﴾ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ

وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿٨٠﴾

রুকু ১১

৭৭. (হে নবী) তুমি কি তাদের অবস্থা দেখোনি, যাদের (দাওয়াতের এক পর্যায়ে) যখন বলা হয়েছিলো যে, (আপাতত) তোমরা (লড়াই থেকে) নিজেদের হাতকে গুটিয়ে রাখো—এখন শধু নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করতে থাকো[১২২] (পরে আবার) যখন তাদের ওপর (সত্যি সত্যিই) লড়াইর হুকুম নাযিল করা হলো (তখন এদের অবস্থা কেমন হয়েছিলো)! এদের একদল লোক তো (প্রতিপক্ষের) মানুষদের এমনভাবে ভয় করতে শুরু করলো যেমনি ভয় শুধু (মানুষের) আল্লাহ্ তায়ালাকেই করা (উচিত; ক্ষেত্র বিশেষে) তার চাইতেও বেশী ভয় করতে শুরু করলো)। তারা আরো বলতে শুরু করলো- হে আমাদের মালিক, কেন তুমি আমাদের ওপর যুদ্ধের এই হুকুমটি জারী করতে গেলে? তুমি কি আমাদের আরো কিছু দিনের অবকাশ দিতে পারতে না[১২৩]? (হে নবী) তুমি বলো, (পার্থিব) দুনিয়ার এই ভোগ সামগ্রী অত্যন্ত সামান্য, যে ব্যক্তি সত্যিই আল্লাহকে ভয করে, তার জন্যে পরকালীন (স্থায়ী) জীবন অনেক উত্তম, আর (সেদিন) তোমাদের ওপর কণামাত্রও অবিচার করা হবে না[১২৪]।

৭৮. তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের গ্রাস করবেই, এমনকি তোমরা যদি তোমাদের (কোনো) উঁচু ও মযবুত প্রাসাদে ঢুকিয়ে রাখো[১২৫] (তবু সেখানে মৃত্যু এসে তোমাদের সামনে হাযির হবে)। এই মানুষদের মানসিক অবস্থা হচ্ছে যে, যখন তাদের কোনো কল্যাণ (কর কিছু) হয়, তখন তারা বলে (হাঁ) এতো আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। অপরদিকে যখন তাদের কোনো ক্ষতি (ও অকল্যাণ) হয়, তখন তারা (তোমার ওপর দোষ চাপিয়ে) বলে, এ (সব) তো তোমার কারণেই হয়েছে[১২৬]। তুমি (তাদের পরিষ্কার) বলে দাও যে, (কল্যাণ-অকল্যাণ এর) সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকেই (আসে), এই মানুষদের হয়েছেটা কি, কেন এরা কোনো (এ সামান্য) কথাটি বোঝে না[১২৭]?

৭৯. (হে মানুষ) যা কিছু কল্যাণই তুমি লাভ করো (মনে রাখবে) তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে, আর যতো ক্ষতি ও অকল্যাণই তোমার ওপর আসে, তা আসে তোমার নিজের (কর্মফলের) কারণেই[১২৮]। এবং আমি তো তোমাকে মানুষদের জন্যে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি। (তোমার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে) আল্লাহ্ তায়ালার সাক্ষ্যই যথেষ্ট[১২৯]।

৮০. (তাই) যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের আনুগত্য করে সে (যেন প্রকারান্তরে) আল্লাহরই আনুগত্য করে (কারণ রসূল তো আল্লাহরই প্রেরিত)। আর যে ব্যক্তি (এই আনুগত্যের পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (তার ব্যাপারে অযথা তুমি মাথা ঘামিয়ো না। মনে রাখবে যে) তাদের ওপর আমি তোমাকে প্রহরী বানিয়ে পাঠাইনি[১৩০]।

---

১২২. হিজরতের আগে মক্কায় কাফেররা মুসলমানদেরকে নানা ভাবে উত্যক্ত করতো, তাদের ওপর যুলুম করতো মুসলমানারা রাসূলের খেদমতে হাযির হয়ে অভিযোগ করতো এবং কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করার অনুমতি চাইতো। যুলুমের প্রতিশোধ নেয়ার সংকল্প ব্যক্ত করতো। মহানবী (সঃ) তারদেরকে এ বলে বারণ করতো যে, এখনো আমাকে লড়াইয়ের হুকুম দেয়া হয়নি, বরং ধৈর্য ও ক্ষমা করার হুকুম হয়েছে। তিনি বলতেন. তোমাদেরকে নামায এবং যাকাতের যে হুকুম দেয়া হয়েছে, তোমরা নিয়মিত তা পালন করতে থাক। কারন, মানুষ যতক্ষন আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের সঙ্গে জেহাদ করতে এবং শারীরিক কষ্ট স্বীকার করতে অভ্যস্ত না হয়, ধন-সম্পদ ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে না উঠে, ততক্ষণ তার জন্য জেহাদ করা এবং জীবন দান করা অত্যন্ত কঠিন। মুসলমানরা প্রিয় নবীর (সঃ) কথা মেনে নিয়েছিল।

১২৩. অর্থাৎ হিজরতের পর মুসলমানদেরকে যখন কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করার হুকুম দেয়া হয়েছে তখন তাদের খুশী হওয়া উচিৎ ছিলো এই জন্য যে, আমাদের দরখাস্ত কবুল হয়েছে, আমাদের আকাংখ্যা পূর্ণ হয়েছে। কিছু সংখ্যক কাঁচা মুসলমান কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করাকে ভয় করতে শুরু করলো, যেমন ভয় করা উচিৎ ছিলো আল্লাহকে অথবা তার চেয়েও বেশী। তারা আকাংখ্যা করতে শুরু করেও, আরও কিছু কাল যদি লড়াইয়ের হুকুম না আসতো আরও কিছুদিন যদি আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম তবে কতইনা ভালো হতো।

১২৪. অর্থাৎ কিন্তু যেহেতু জীবন ও দুনিয়ার কল্যাণের প্রতি মোহ আকর্ষণের কারণে তাদের কাছে জেহাদের হুকুম কঠিন মনে হয়েছে। একারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে বলছেন যে, তোমরা তাদেরকে বলে দাও যে, দুনিয়ার সকল মঙ্গল কল্যাণই অতি তুচ্ছ এবং ক্ষণস্থায়ী আর পরকালের সাওয়াব সবচাইতে উত্তম। অবশ্য এটা তাদের জন্য, যারা

আল্লাহর নাফরমানী হতে বিরত থাকে। সুতরাং তোমাদের উচিৎ দুনিয়ার মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য না করে আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য কোন প্রকার ত্রুটি না করা। জেহাদ করতে ভয় না করে তোমাদের নিশ্চিত থাকা উচিৎ যে, তোমাদের শ্রম-সাধনার সাওয়াব বিন্দুমাত্রও নষ্ট করা হবেনা। সুতরাং সাহস এবং আগ্রহের সঙ্গে তোমদের জেহাদে আত্ম নিয়োগ করা উচিৎ।

১২৫. অর্থাৎ তোমরা যত দুর্ভেদ্য, সংরক্ষিত এবং নিরাপদ স্থানেই থাকনা কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে কিছুতেই ছাড়বেনা। কারণ, প্রত্যেকের জন্য মৃত্যু অবধারিত। নির্ধারিত সময়ে তা অবশ্যই হবে। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন। সুতরাং তোমারা জেহাদে গমন না করলেও মৃত্যুর হাত থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবেনা। সুতরাং জেহাদ দেখে ঘাবড়ানো, মৃত্যুকে ভয় করা এবং কাফেরদের সঙ্গে লড়াই-এ শংকিত হওয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞতা এবং ইসলামে অপরিপক্ক হওয়ার প্রমাণ।

১২৬. অর্থাৎ সেসব মোনাফেকদের আরও বিস্ময়কর অবস্থা শুন। যুদ্ধের কৌশল কার্যকর প্রমাণিত হলে, বিজয় অর্জিত এবং গনীমতের মাল হাতে এলে তারা বলে- এটাতো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে, অর্থাৎ ঘটনা চক্রে এটা হয়েছে। এতে যে রাসূলে খোদার প্রজ্ঞা এবং বিচক্ষণতাও রয়েছে, তারা সেকথা স্বীকার করেনা। কিন্তু পরাজয় ও ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হলে তারা এজন্য কৌশলকেই দায়ী করে।

১২৭. আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, হে মোহাম্মদ (সঃ)! তাদেরকে বলে দাও যে, ভালো-মন্দ সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহই সবকিছুর শ্রষ্টা। এত অন্য কারো হাত নেই। আর পয়গম্বর (সঃ)-এর কৌশল প্রজ্ঞাও আল্লাহর পক্ষ থেকে। এটা আল্লাহরই ইলহাম। এজন্য নবীকে অভিযুক্ত করা তোমাদের স্পষ্ট ভুল ও নির্বুদ্ধিতার পারিচায়ক। তোমরা কোন পরিবর্তনকেই অর্থহীন মনে করবেনা। এতে আল্লাহর হেকমত-রহস্য নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তোমাদেরকে সোজা পথ দেখান. তোমাদের পরীক্ষা করেন। মোনাফেকরেদর অভিযোগের এটা মোটা মুটি জবাব। পরবর্তী আয়াতে বিস্তারিত জবাব দেয়া হয়েছে।

১২৮. অর্থাৎ আসল কথা এই যে, সকল ভালো মন্দের স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালা কিন্তু বান্দাদের উচিৎ হচ্ছে নেকী এবং কল্যাণকে আল্লাহ তা'য়ালার দান অনুগ্রহ মনে করা আর কষ্ট-কঠোরতা এবং মন্দকে নিজেদের কর্মফল বলে স্বীকার করা। এজন্য পয়গম্বর (দঃ) কে দায়ী- অভিযুক্ত না করা। পয়গাম্বর তো এসব কাজের স্রষ্টাও নয়, কারণও নয়। এ সবের স্রষ্টাতো আল্লাহ তা'য়ালা আর কারণ হচ্ছে তোমাদের আমল।

১২৯. আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলের ওপর থেকে মোনাফেকদের ইলযাম-অভিযোগ দূর করে বলছেন যে, আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছি। আমি সব কিছু জানি। আমরা সকলের আমলের বদলা দিয়ে ছাড়বো। তুমি কারো অর্থহীন ইলযাম অস্বীকৃতির পরোওয়া না করে আপন রেসালাতের দায়িত্ব পালন করে যাও।

১৩০. মহানবীর রেসালাত প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত করার পর এখন আল্লাহ্ তা'য়ালা মহানবী সম্পর্কে এ নির্দেশ শুনাচ্ছেন যে, যে কেউ আমাদের নবীর আনুগত্য করবে, সে নিঃসন্দেহে আমার অনুগত। আর যে কেউ তোমার মুখ ফিরায়ে নেবে, তবে হে রাসূল আমি তোমাকে তাদের ওপর রক্ষক করে পাঠাইনি যে, তুমি তাদেরকে গুনাহ্ করতে দেবেনা। আমি তাদেরকে দেখে নিবো। তোমার কাজতো কেবল পয়গাম পৌছি দেওয়া, সাওয়াব বা শাস্তি দেওয়া এতো আমাদের কাজ।

وَيَقُولُونَ

طَاعَةٌ ز فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ
الَّذِي تَقُولُ ط وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ج فَأَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾ أَفَلَا
يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ
لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ
مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهٖ ط وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلٰى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهٗ مِنْهُمْ ط وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ
لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ج
لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ج عَسَى

اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ﴿٨٤﴾

৮১. তারা তো (মুখে মুখে সর্বদাই) বলে (তোমার) আনুগত্য (আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য) কিন্তু তারা যখন তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যায়, তখন তাদের একদল লোক রাতের (অন্ধকার) সময়ে একত্রিত হয়ে ঠিক তুমি যা বলো তার বিরুদ্ধেই শলাপরামর্শ করে বেড়ায়। (এ নিয়ে তোমার চিন্তার কিছু নাই) আল্লাহ তায়ালাও তাদের রাতের বেলার এই সব কর্মকান্ডই লিখে রাখছেন, তুমি এদের উপেক্ষা করে চলো এবং সর্ব বিষয়ে শুধু আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখো। সার্বিক ভরসার জন্যে তো আল্লাহ্ তায়ালাই যথেষ্ট[১৩১]!

৮২. এরা কি আল্লাহর কোরআনের ব্যাপারে কোনো গবেষণা করে না? (এরা কি একবারও একথা ভাবে না যে,) এই (মহান) গ্রন্থ যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো, তাহলে তাতে অবশ্যই তারা অনেক গরমিল (দেখতে) পেতো[১৩২]।

৮৩. (এদের দায়িত্ব জ্ঞানের অবস্থা হচ্ছে এই যে) এদের কাছে যখনি শান্তি কিংবা ভয়ের কোনো খবর আসে, তখন (তার পরিণামের কথা না ভেবেই) তা তারা সবার কাছে প্রচার করে বেড়ায়[১৩৩], অথচ (এটা না করে) তারা যদি এই (জাতীয়) খবর আল্লাহর রসূল এবং ক্ষমতাবান (কোনো) ব্যক্তিকে জানিয়ে দিতো, তাহলে এমন সব লোকেরা তা জানতে পারতো- যারা তাদের মধ্যে থেকে সেই খবরের যথার্থতা যাচাই করতে পারতো[১৩৪] (এমতাবস্থায়) যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকতো, তাহলে (তাদের এ প্রচারণার ফলে অবস্থা এতো খারাপ হয়ে যেতো যে) হাতে গোনা কিছু লোক ছাড়া তোমাদের অধিকাংশ লোকই শয়তানের অনুসারী হয়ে যেতো[১৩৫]।

৮৪. অতএব (হে নবী) তুমি আল্লাহর পথে লড়াই করো, (চূড়ান্ত হিসেবের সময়) তোমাকে শুধু তোমার কাজকর্মের জন্যেই দায়ী করা হবে এবং (তোমার সাথী) মুমিনদের (আল্লাহর পথে লড়াই করতে) উদ্বুদ্ধ করতে থাকো (সেদিন বেশী দূরে নয় যখন) আল্লাহ্ তায়ালা হয়তো এই অবিশ্বাসী কাফেরদের শক্তি (ও দাপট) চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন[১৩৬] (কারণ) আল্লাহ্ তায়ালা শক্তি-সামর্থে পরাক্রমশালী আবার তাঁর শাস্তিও সবচাইতে কঠোর[১৩৭]।

১৩১. এসব মোনাফেকদের আরও মক্কারী শুনবে। তোমার সম্মুখে হাযির হয়ে বলে, আমরা তোমার হুকুম মেনে নিয়েছি। আর বাইরে গিয়ে পরামর্শ করে এর বিরুদ্ধে। অর্থাৎ তোমার নাফরমানী এবং বিরোধিতার পরামর্শ করে। আর আল্লাহর কাছে তো তাদেরকে সব পরামর্শ লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। লিখা হয়ে যায় তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য। সুতরাং হে নবী! তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরায়ে নাও। তুমি কোন কিছুরই পরওয়া করবে না। তোমার সব কাজ আল্লাহর কাছে সোপর্দ করো। তিনিই তো তোমার জন্য যথেষ্ট।

১৩২. আগের আয়াত গুলো থেকে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর আল্লাহর রাসূল হওয়া, তার আনুগত্য অবিকল আল্লাহর আনুগত্য হওয়া এবং তার নাফরমানীতে আল্লাহ তা'আলার আযাব আসা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু মোনাফেক এবং রাসূলের বিরোধীরা বলতে পারে যে, আল্লাহর সাক্ষ্য এবং তার বাণীকে স্বীকার করে নিতে আমাদের তো আদৌ কোন দ্বিধা নেই। কিন্তু এটা যে আল্লাহর কালাম, মানুষের রচিত নয়, তা কি করে জানা যাবে? এর জবাবে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন যে, এরা কি কোরআন সম্পর্কে চিন্তা করেনা? চিন্তা করলে তারা স্পষ্ট জানতে পারতো যে, এটা আল্লাহর কালাম, দেখ, কুরআন যদি আল্লাহর কালাম না হতো-যেমন, তোমরা ধারনা করে থাক-তবে এতে নানা স্থানে নানা রকম বৈপরিত্য দেখতে পেতে। দেখ, মানুষ সব সময় উপস্থিত অবস্থা অনুযায়ী কথা বলে। অন্য অবস্থার কথা চিন্তাও করেনা। রাগের অবস্থায় দয়া- অনুগ্রহ কথা চিন্তা করেনা। আর দয়া-অনুগ্রহের সময় রাগের কথা ধারণাও করেনা। দুনিয়ার কথা বলতেও গিয়ে আখেরাতের কথা মনে থাকেনা, আর আখেরাতের কথা বলতে গিয়ে দুনিয়ার কথা স্মরন হয়না, বেপরোওয়া হলে দয়া অনুগ্রহের কথা খেয়াল থাকেনা, আর দয়া-অনুগ্রহে ডুবে গেলে বেপরোওয়া হওয়ার কথা ভাবতে পারেনা, মোটকথা, এক অবস্থার কথা সাথে অন্য অবস্থার কথার কোন মিল থাকেনা। কিন্তু কোরআন মজীদ যেহেতু আল্লাহর কালাম। এখানে একটা বিষয়ে বলার সময় অন্য বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়। চিন্তা গবেষণা করলে জানা যায় যে, কোরআন মজীদে সর্বত্র এক বিশেষ ভঙ্গিতে সব কিছুর বর্ণনা করা হয়েছে। দেখুন, এখানে মোনাফেকদের প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছিলো, যারা ছিলো চরম দন্ডযোগ্য । এখানেও তাদের প্রসঙ্গে উপযুক্ত ইলযাম আরোপ করা হয়েছে। তাদের একটা বিশেষ দলের ওপর অভিযোগ ছিলো। তাই আরোপ করা হয়েছে তাদের ওপর। বলা হয়েছে যে, এদের মধ্যে কেউ কেউ এইরূপ করে থাকে। রাগ ইত্যাদি অবস্থায় কালাম সীমা ছাড়িয়ে যায়না। অন্য অবস্থার কালাম থেকে ভিন্নতরও দেখা যায়না। ওপরন্তু আমরা নিয়মিত দেখে আসছি যে, মানুষ দীর্ঘ কথা বললে সব কথা এক রকম হয়না। কোন বাক্য অলংকার শাস্ত্রে উত্তীর্ণ হয়, কোন বাক্য হয়না। কোন বাক্য নির্ভুল হয়, কোন বাক্য ভুল। কোন বাক্য সত্য হয়, কোন বাক্য মিথ্যা । কোন বাক্য সামঞ্জস্যপূর্ন হয়, কোন বাক্য সামঞ্জস্যহীন, বৈপরিত্যে ভরা। কোরআন এত বড় কিতাব কিন্তু তা এসব বৈপরিত্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এসব চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। এটা মানুষের শক্তি বহির্ভূত।

এতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা কোরআন মজীদ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেনা, তারা এতে সন্দেহ-সংশয় ও বৈপরিত্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারে। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান লোক, তারা এরূপ ধারণা করতে পারেনা। দেখুন এ স্থানটি সম্পর্কেও যে চিন্তা-ভাবনা করেনা, সে বলতে পারে যে, আগে বলা হয়েছে, আপনি বলে দিন যে, সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। এরপর বলা হয়েছে, আর তোমার যে ক্ষতি হয়, তা তোমার নিজের পক্ষ থেকে হয়। এখানেও তো বৈপরিত্য দেখা যাচ্ছে।

১৩৩. অর্থাৎ এসব মোনাফেক এবং স্বল্প জ্ঞানের মুসলমানদের একটা দোষ এই যে, শান্তি নিরাপত্তার কোন ব্যাপার দেখা দিলে, যেমন রাসুলে খোদা কারো সঙ্গে সন্ধির ইচ্ছা করলে বা মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের খরব শুনলে বা কোন ভয়ংকর খবর শুনলে যথা দুশমনদের কোথাও সমবেত হওয়ার খবর শুনলে অথবা মুসলমানদের পরাজয়ের খবর পেলে-সত্যাসত্য অনুসন্ধান না করেই এসব রটনা করে বেড়ায় আর এর ফলে অধিকন্তু মুসলমানদেরকেই ক্ষতি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। মোনাফেক ক্ষতি করার মতলবে আর নির্বোধ মুসলমানরা নির্বুদ্ধিতার কারণে এরূপ করে থাকে।

১৩৪. অর্থাৎ কোথাও থেকে কোন খবর আসলে প্রথমে হর্তা-কর্তা ব্যক্তি বা তার প্রতিনিধির কাছে তা নিয়ে যাওয়া উচিৎ। তারা অনুসন্ধান করে খবরের সত্যতা স্বীকার করলে তাদের বক্তব্য অনযায়ী সে খবর নিয়ে কোথাও আলোচনা করা যেতে পারে এবং তদনুযায়ী কাজ করা যেতে পারে।

মহানবী (সঃ) জনৈক ব্যক্তিকে যাকাত উসুল করার জন্য প্রেরণ করেন এক গোত্রে। উক্ত গোত্র খবর পেয়ে সে ব্যক্তিকে সাদরে বরণ করে নেয়ার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু তিনি মনে করছেন যে, এরা আমাকে মারার জন্য এগিয়ে আসছে। তিনি দ্রুত মদীনায় ফিরে এ খবর রটালেন যে, অমুক গোত্র মুর্তাদ হয়ে গিয়েছে। শহরে এ খবর ছড়িয়ে পড়লো। পরে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেলো যে, খবরটি সত্য নয়।

১৩৫. অর্থাৎ আল্লাহ যদি আপন অনুগ্রহে তোমাদের সংশোধন ও সংস্কার সাধনের জন্য বিধান নাযিল না করতো, প্রযোজন অনুযায়ী তোমাদেরকে সময়ে সময়ে হেদায়াত দিয়ে সর্তক করে না দিতেন, যেমন এ উপলক্ষে হর্তা-কর্তা এবং দূত প্রতিনিধির কাছে প্রত্যাবর্তন করার হেদায়াত করেছেন, তবে তোমরা গোমরাহ হয়ে যেতে। অবশ্য গুটিকতেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বাদে। যারা জ্ঞান-বুদ্ধি এবং ঈমান-আকীদায় পূর্ণাঙ্গ। তোমরা এ সতর্কীকরণকে আল্লাহ তায়ালা ইনাম মনে করে তারা শোকর আদায় কর এবং এটাকে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত কর।

১৩৬. যেসব মোনাফেক এবং কাঁচা মুসলমান সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হয়েছে, কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করাকে এরা যদি ভয় পায়, তবে হে নবী! তুমি একা লড়াই করতে আদৌ ইতস্তত করবেননা। আল্লাহ তায়ালা তোমার সহায় আছেন। অবশ্য তুমি গুরুত্ব সহকারে মুসলমানদেরকে জেহাদ সম্পর্কে বলে দাও। কে তোমার সাথে জেহাদে

অংশ নিয়েছে আর কে নেয়নি। তারা কোন পরোওয়া করবেন না। আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদের লড়াইকে স্তব্ধ করে দেবেন।

এ আয়াতটি নাযিল হলে মহানবী (সঃ) বলেন, একজন লোকও যদি আমার সাথে গমন না করে, তবুও আমি অবশ্যই জেহাদে গমন করবো। অবশেষে সর্বমোট সত্তুর জন সঙ্গী-সাথী নিয়ে মহানবী (দঃ) জেহাদের উদ্দেশ্যে 'বদরে ছোগরায়' (ছোট বদরে) গমন করেন। ওহোদ যুদ্ধের পর আবু সুফিয়ানের সঙ্গে এ যুদ্ধের ওয়াদা করা হয়েছিল। আবার সুরায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা আবু সুফিয়ান এবং কোরাইশ কাফেরদের অন্তরে ভয়-ভীতি আর আতংকের সঞ্চার করে দেন। তারা সম্মুখ যুদ্ধে উপস্থিত হয়নি। ওয়াদা পালনে তারা ব্যর্থ হয়ে মিথ্যা সাবাস্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা তার বাণী অনুযায়ী কাফেরদের যুদ্ধ স্তব্ধ করে দিয়েছেন। মহানবী (সঃ) তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসেন।

১৩৭. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার লড়াই এবং তার আযাব কাফেরদের সাথে লড়াই করার চেয়ে অনেক কঠোর। সুতরাং কাফেরদের সহিত লড়াই করা, তাদেরকে হত্যা করা এবং তাদের হাতে নিহত হওয়াকে যারা ভয় করে, তারা কি করে আল্লাহ্ তায়ালার গোস্বা এবং তার আযাব বরদাস্ত করবে?

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً

يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً

يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴿٨٥﴾

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ۗ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ﴿٨٦﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا

هُوَ ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ وَمَنْ

اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿٨٧﴾

৮৫. যদি তোমাদের কোনো ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করে, তাহলে (এর ফলে যে কল্যাণ আসে) তাতে অবশ্যই তার অংশ থাকবে। আবার যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় কাজের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করবে তার (ফলে সৃষ্ট অকল্যাণেও) তার অংশ থাকবে[১৩৮]। মূলত আল্লাহ্ তায়ালা (তোমাদের) সব ধরনের (ভালো-মন্দ) কাজের একক নিয়ন্ত্রণকারী[১৩৯]।

৮৬. যখন (কোনো একজন মানুষের পক্ষ থেকে) তোমাদের অভিবাদন (কিংবা সালাম) প্রদান করা হয়, তখন তোমরা তার চাইতেও উত্তম পন্থায় তার জবাব দাও, (উত্তম ভাবে না হলেও) কমপক্ষে (যতোটুকু সে দিয়েছে) ততোটুকু তো অবশ্যই ফেরত দেবে। অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা সব কিছুর (পুংখানুপুংখ) হিসাব রাখেন[১৪০]।

৮৭. আল্লাহ্ তায়ালা (এক মহান সত্তা) তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, (চূড়ান্ত বিচারের জন্যে) অবশ্যই তিনি তোমাদের কেয়ামতের দিন এক জায়গায় জড়ো করবেন। সেদিনের (আসার) ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহ নেই। আর (বিশ্ব চরাচরে) এমন কে আছে যে আল্লাহ্ তায়ালার চাইতে বেশী সত্য কথা বলতে পারে[১৪১]?

---

১৩৮. অর্থাৎ কেউ যদি নেক কাজে চেষ্টা-সাধনা করে, যেমন মহানবী (দঃ) মুসলমানদেরকে জেহাদের জন্য তাকীদ দিয়েছেন, অথবা কেউ যদি খারাপ কাজে চেষ্টা-সাধনা করে, যেমন মোনাফেক এবং অলস মুসলমানদের জেহাদকে ভয় করতঃ অন্যদেরকেও ভয় দেখানো, সে ব্যক্তি প্রথম অবস্থায় সাওয়াবের এবং দ্বিতীয় অবস্থায় গুনাহের অংশ পাবে। আর কেউ যদি কোন অভাবীর জন্য সুপারিশ করে বিত্তশালী ব্যক্তির কাছে থেকে কিছু আদায় করে দেয়, তবে সে ব্যক্তি দানের সাওয়াবে শরীক হবে। আর কেউ যদি সুপারিশ করে কাফের ফেৎনাবাজ চোর-চোটটাকে ছাড়ায়ে দেয়, পরে সে লোকটি ফেৎনা ফাসাদ আর চুরি করে, তবে চুরি এবং ফাসাদে সুফারিশকারী ব্যক্তিও শরীক হবে।

১৩৯. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। তিনি সবকিছুর অংশ বন্টনকারী। সুতরাং ভালো-মন্দের অংশ দানে তার কোন কষ্ট হবেনা।

১৪০. অর্থাৎ কোন মুসলমানকে সালাম করা, তাকে দোয়া দেওয়া মূলতঃ আল্লাহর কাছে তার জন্য শাফায়াত করা, সুপারিশ করা। মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ভালো শাফায়াতের এক একটি দিক আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন হে মুসলমানরা কেউ যদি তোমাদেরকে দোয়া করে, সালাম করে, তোমাদেরকেও অবশ্যই তার জবাব দিতে হবে। তোমরা সে বাক্যই তার জন্য ব্যবহার করবে, অথবা তার চেয়ে উত্তম। যেমন কেউ 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সালাম দিলে 'ওয়ালাইকুস সালাম' বলে

জবাব দেয়া ওয়াজিব। আর বেশী সাওয়াব চাইলে 'ওয়ারাহমাতুল্লা', বাড়াতে পার। সে এ শব্দটি বাড়ালে তোমরা 'ওয়া বারকাতুহু' বাড়াবে। আল্লাহর কাছে সব কিছুরই হিসাব হবে। সব কিছুরই বিনিময় পাওয়া যাবে। সালাম এবং তার জবাবও এর অন্তর্ভূক্ত।

এ আয়াত দ্বারা 'শাফায়াতে হাসানা' বা ভালো সুপারিশের জন্য যথারীতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, আর শাফায়াত সাইয়্যেয়া বা খারাপ, তার খারাপ ও ক্ষতিকর দিকটি প্রমাণিত হচ্ছে। কারণ, যে ব্যক্তি 'শাফায়াতে হাসানা' করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সাওয়াব দেবেন। আর যার জন্য সুপারিশ করে, তার সঙ্গে সদাচার ও উত্তম প্রতিদানের নির্দেশ দিয়েছেন। শাফায়াতে সাইয়্যেয়া এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ জন্য গুনাহ আর বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবেনা।

১৪১. অর্থাৎ কেয়ামত সংঘটিত হওয়া, সাওয়াব ও শাস্তির সকল ওয়াদা পূরণ হওয়া এসব কিছুই সত্য। এতে কোন ব্যক্তিক্রম হবেনা। এরা কোন মামুলী কথা ভাববেনা।

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ

فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ

تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ

لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٨﴾ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ

سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ

وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٨٩﴾

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ

أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ

أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ

فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا

إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (৯০)

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ

وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا

فِيهَا ۚ فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ

وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ

ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (৯১)

রুকু ১২

৮৮. এ কি হলো তোমাদের যে, তোমরা মোনাফেকদের ব্যাপারে (কি পন্থা গ্রহণ করতে হবে এ নিয়ে) দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলে? (বিশেষ করে) যখন স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালাই তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদের ওপর অভিশাপ নাযিল করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা যাদের পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন তুমি কি তাদের সঠিক পথে আনতে চাও? বস্তুত আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার (হেদায়াতের) জন্যে তুমি কোনো পথই (খুঁজে) পাবে না[১৪২]।

৮৯. (এদের অভিসন্ধি তো তোমরা জানো) এরা তো এটাই চায় যে, তাদের মতো তোমরাও (আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে) অস্বীকার করো এবং এভাবেই তোমরা

উভয়েই (চিন্তা ও চারিত্রের দিক) একই রকম হয়ে যাও। কাজেই (এখন থেকে) তুমি তাদের মধ্য থেকে কাউকেও নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না—(হাঁ) যদি এরা আল্লাহর জন্যে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে (ঈমানের প্রমাণ) দেয় (তবে তা ভিন্ন কথা)। আর যদি তারা এই কাজ না করে (বিদ্রোহীদের দলে শামিল হয়), তাহলে তোমরা তাদের যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে এবং (যুদ্ধরত শত্রুদের সহযোগিতা করার জন্যে) তাদের হত্যা করবে। আর কোনো অবস্থায়ই তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না[১৪৩]।

৯০. অবশ্য (সে সব মোনাফেকরা এই আদেশের আওতাধীন নয়) যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো সম্প্রদায়ের সাথে এসে মিলিত হবে। আবার (তাদের ব্যাপারেও এই আদেশ নয়) যারা তোমাদের সামনে এমন (মানসিক) অবস্থা নিয়ে আসে যে, (মূলত) তাদের অন্তর তোমাদের সাথে (যেমন) লড়াই করতে বাধা দেয় (তেমনি) নিজেদের জাতির বিরুদ্ধেও তাদের লড়াই করতে বাধা দেয়। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন তিনি তোমাদের ওপর এদের (বিজয়ী করে) ক্ষমতাবান করে দিতে পারতেন। তেমন অবস্থায় তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে লড়াই করতো। অতএব এরা যদি তোমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং (ময়দানে) লড়াই থেকে বিরত থাকে এবং তোমাদের কাছে শান্তি ও সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়, তাহলে (কোনো অজুহাত খাড়া করে) তাদের বিরুদ্ধে কোনো (আক্রমণাত্মক) পন্থা গ্রহণের কোনো পন্থাই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে (উন্মুক্ত) রাখেননি[১৪৪]।

৯১. (এই মোনাফেকদের মাঝে আবার) তোমরা (এমন) আরেক দল পাবে, যারা তোমাদের দিক থেকে (যেমন) শান্তি ও নিরাপত্তা পেতে চায় (তেমনি) তারা তাদের নিজেদের জাতির কাছ থেকে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা পেতে চায়। কিন্তু (এদের আভ্যন্তরীণ সঠিক অবস্থা হচ্ছে যে) এদের যখনি কোনো বিপর্যয় (ও বিশৃংখলা) সৃষ্টির কাজের দিকে ডাক দেয়া হবে, তখন সাথে সাথেই এরা তোমাদের বিরুদ্ধে (তাদের পূর্ববর্তী আচরণের দিকে) ঝাঁপিয়ে পড়বে, (এসব লোকদের ব্যাপারে আদেশ হচ্ছে যে,) এরা যদি সত্যিই তোমাদের সাথে (যুদ্ধ করা থেকে) সরে না দাঁড়ায় এবং কোনো রকম শান্তি ও সন্ধি প্রস্তাবও পেশ না করে এবং (সে প্রস্তাব মোতাবেক সত্যিই) নিজেদের অস্ত্র সংবরণ না করে, তাহলে তাদের তোমরা যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে এবং (চরম বিদ্রোহের শাস্তি হিসেবে) তাদের তোমরা হত্যা করবে। এরাই হচ্ছে সে সব লোক, যাদের ওপর (এই শাস্তিমূলক আদেশ প্রয়োগের ব্যাপারে) আমি তোমাদের পূর্ণাংগ ক্ষমতা দান করলাম[১৪৫]।

১৪২. এসব মোনাফেকদের মধ্যে সেসব লোকও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যারা বাহ্যিভাবেও ঈমান আনে। বরং যাহের বাতেন- উভয় দিক থেকেই কুফরীর ওপর অটল রয়েছে। অবশ্য মহানবী (সঃ) এবং মুসলমানদের সঙ্গে বাহ্যিক মেলামেশা এবং ভালোবাসার আচরণ করতো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিম বাহিনী আমাদের লোকজনের ওপর হামলা চালালে এ কৌশলে যেন আমাদের জান মাল রক্ষা পায়। মুসলমানরা যখন জানতে পারলো যে, তাদের যাতায়াত এ উদ্দেশ্যে-অন্তরের ভালোবাসায় নয়, তখন কোন কোন মুসলমান বললো, এ দুষ্ট লোকদের সঙ্গে মেলামেশা ত্যাগ করা উচিৎ, যাতে তারা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ বললো, তাদের সঙ্গে মেলামেশা থাকুক। হতে পারে এরা ঈমান আনতেও পারে। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়। এতে বলা হয়েছে যে, হেদায়াত আর গোমরাহী আল্লাহর কব্জায়। তোমরা এ নিয়ে কখনো মাথা ঘামাবেনা। তোমরা সকলে একমত হয়ে তাদের সঙ্গে সে আচরণই করবে, যা পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে। এ ব্যাপারে তোমরা দুটি দলে আলাদা পরিণত হবেনা।

১৪৩. অর্থাৎ এসব মোনাফেক কুফরীতে এমনই অটল-অবিচল যে, নিজেরা ইসলাম গ্রহণ করাতো দূরের কথা, তারা চায় যে, তোমরাও তাদের মতো কাফেরে পরিণত হও। সুতরাং এখন তোমাদের উচিৎ তার যতক্ষণ ঈমান এনে দেশ ত্যাগ করে তোমাদের কাছে চলে না আসবে, ততক্ষণ তোমরা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেনা, তোমাদের কোন কাজে তাদেরকে কোন স্থান দেবেনা, তাদের সাহায্য-সহায়তাও করবেনা। তারা যদি ঈমান এবং হিজরতকে গ্রহণ না করে, তবে তাদেরকে আটক করবে, হত্যা করবে, যেখানে করে তাদেরকে পাবে। কিন্তু তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভাবে দূরে থাকবে। তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখবেনা।

১৪৪. অর্থাৎ এই বাহ্যিক মেলামেশা দ্বারা তাদেরকে আটক করা এবং হত্যা করা থেকে রক্ষা করবেনা। কিন্তু মোট দু ধরনের লোকের মধ্যে এক ধরনের লোক হচ্ছে তারা, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। তাদের সঙ্গে যদি এদেরও সন্ধি চুক্তি থাকে, তবে এদেরও এই চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত থাকবে। অপর ধরনের লোক হচ্ছে যারা যুদ্ধে অপারগ হয়ে তোমাদের সঙ্গে চুক্তি করেছে এবং এই অঙ্গীকারও করেছে নিজেদের লোকদের পক্ষ অবলম্বন করে তোমার সাথে লড়াই করবেনা, আবার তোমাদের সাথী, নিজেদের লোকদের সাথেও লড়াই করবেনা, আর এই অঙ্গীকারে তারা অটলও থাকে, এমন লোকদের সঙ্গেও তোমরা লড়াই করবেনা। তোমরা তাদের আপোষ প্রস্তাব মঞ্জুর করবে আর এটাকে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ মনে করবে যে, তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রয়েছে। আল্লাহ চাইলে তাদেরকে তোমাদের ওপর বেপরোওয়া ও প্রবলতর করে দিতেন।

১৪৫. অর্থাৎ কিছু লোক এমনও আছে, যারা তোমাদের সাথে অঙ্গীকার করে যায় যে, তারা তোমাদের সাথে এবং নিজের লোকদের সাথে লড়বেনা। উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের এবং নিজেদের লোকদের থেকে নিরাপদে থাকতে পার। কিন্তু এই অঙ্গীকার রক্ষা করেন

বরং নিজেদের লোকদের জোর দেখলে তাদের মদদগার হয়ে যায়, তোমরা এমন লোকদেরকে ক্ষমা করবেন। তারা নিজেরাই যে নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এর স্পষ্ট প্রমাণ তো তোমাদের হাতে পৌছেছে।

অঙ্গীকার রক্ষা করেন বরং নিজেদের লোকদের জোর দেখলে তাদের মদদগার হয়ে যায়, তোমরা এমন লোকদেরকে ক্ষমা করবেন। তারা নিজেরাই যে নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এর স্পষ্ট প্রমাণ তো তোমাদের হাতে পৌছেছে।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ
قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ
كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ

إِلَيْكُمُ السَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

রুকু ১৩

৯২. এটা কোনো ঈমানদার ব্যক্তির (জন্যে মোটেই গ্রহণযোগ্য কাজ নয় যে, সে আরেকজন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করবে, অবশ্য ভুলবশত[১৪৬] (এটা) ঘটে গেলে (তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা)। যদি কোনো ঈমানদার ব্যক্তি আরেকজন ঈমানদার ব্যক্তিকে ভুল করেও হত্যা করে, তাহলে (তার বিনিময় হচ্ছে) সে যেন একজন দাসকে মুক্ত করে দেয়, এবং (তার সাথে সাথে) নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনকে রক্তের মূল্যও পরিশোধ করে দেবে। যদি নিহত ব্যক্তির পরিবারবর্গ এই রক্তমূল্য মাফ করে দেয় (তবে তা স্বতন্ত্র কথা)। এই (নিহত) ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রুদের মধ্যকার কেউ একজন হয়ে থাকে এবং সে যদি ঈমানদার হয় তাহলে (তার বিধান হচ্ছে তার বিনিময়ে) একজন মুমিন দাসকে মুক্তি দিতে হবে। অপরদিকে (নিহত) ব্যক্তি যদি এমন এক সম্প্রদায়ের মধ্যকার কেউ হয়ে থাকে, যার সাথে তোমাদের কোনো সন্ধি চুক্তি বলবৎ আছে—তবে নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনকে রক্তের মূল্য আদায় করতে হবে, (সাথে সাথে) একজন ঈমানদার দাসকেও মুক্ত করতে হবে। যে ব্যক্তি মুক্ত করার জন্যে কোনো দাস পাবে না, তাকে ক্রমাগত দুই মাস ধরে রোযা রাখতে হবে, (এ হচ্ছে) আল্লাহর পক্ষ থেকে (মানুষের) তৌবা (কবুল করানোর এক বিশেষ ব্যবস্থা মাত্র)। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী[১৪৭]।

৯৩. (এই তো গেলো ভুলবশত হত্যা করার বিধান)। আর যে ব্যক্তি কোনো ঈমানদার ব্যক্তিকে জেনেশুনে (পরিকল্পিত ভাবে) হত্যা করবে, তার একমাত্র শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম (ও তার কঠিন আযাব)। সেখানে সে অনন্তকাল ধরে শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ্ তার ওপর ভয়ানক ভাবে রুষ্ট হবেন, তাকে লানত দেবেন, (পরিশেষে) আল্লাহ্ তার জন্যে মহা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন[১৪৮]।

৯৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যখন আল্লাহর পথে জেহাদের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বের হবে, তখন বিচারবুদ্ধি ব্যবহার (করে নিজেদের কর্মপন্থা গ্রহণ) করবে। কোনো ব্যক্তি (কিংবা সম্প্রদায়) যখন তোমাদের সামনে শান্তি ও সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে, তখন (অবিবেচকের ন্যায়) সামান্য কিছু বৈষয়িক ধন-সম্পদের প্রত্যাশায় বলো না যে —তুমি ঈমানদার নও। (দুনিয়ার ধনসম্পদের লালসা করার আগে জেনে রেখো যে,) আল্লাহ তায়ালার কাছে পরিত্যক্ত সম্পদের প্রচুর ভান্ডার পড়ে আছে[১৪৯], (হেদায়াত আসার আগে) তোমাদের মধ্যেও (এক সময় লোভ-লালসার) এই (নিয়মনীতি চালু) ছিলো, অতপর আল্লাহ তোমাদের ওপর অনুগ্রহ (করে তোমাদের অন্তরকে পবিত্র) করেছেন। কাজেই (নিজেদের অতীতের কথা স্মরণ করে, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনায়) বিবেক-বিবেচনা খাটিয়ে চলো[১৫০] আর তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন[১৫১]।

---

১৪৬. এখানে 'ভুল করে' হত্যা করার বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে। ইসলামের কালেমা উচ্চারণকারীকে হত্যা করা যে মহাপাপ, সে কথাও বলা হয়েছে। অবশ্য যদি ভুল বশতঃ মারা যায়, তার বিধান এখানে বর্ণীত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গেঁ মোজাহিদদের মর্ঝাদা, দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করার প্রয়োজনীয়তা এবং সফর ও ভয়ের সময় নামায পড়ার নিয়ম বর্ণীত হয়েছে।

ভুলবশতঃ কোন মুসলমানকে হত্যা করার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে।যেমন ভুল করে কোন মুসলমানকে শিকার মনে করে হত্যা করা, অথবা তীর বা গুলী ছুঁড়েছিলো শিকারের প্রতি, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তা কোন মুসলমানের গায়ে বিদ্ধ হয়েছে। আবার এমনও হতে পারে যে, কাফেরদের ভীড়ের মধ্যে একজন মুসলমান ছিলো, ভুলবশতঃ তাকে কাফের মনে করে কোন মুসলমান গুলি করেছে। এখানে এ সূরত বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুজাহিদদের দ্বারা এমন ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটতো। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর সঙ্গে এ সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভুল বশতঃ হত্যার অন্যান্য সূরতও এর অন্তর্ভূক্ত। এগুলোর একই বিধান।

১৪৭। এ আয়াতে ভুলক্রমে হত্যার দু'টি বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এক, মুসলমান দাসকে মুক্ত করা। এর সাধ্য না থাকলে একটানা দু'মাস রোযা রাখা। এটা আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে আপন ভুলের কাফ্ফারা। দুই, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদেরকে রক্ত পন দেওয়া। এটা তাদের হক। তারা মাফ করলে মাফ হতে পারে। কিন্তু কাফ্ফারা কেউ মাফ করলেও মাফ হবেনা। এর তিনটি সূরত হতে পারে। কারণ, যে মুসলমানকে ভুল বশতঃ হত্যা করা হয়েছে তার ওয়ারিস মুসলমান হবে, বা কাফের। কাফের হলে তার সঙ্গে মুসলমানদের বন্ধুত্ব ভাব আছে, প্রথম দু'টি সূরতে নিহত ব্যাক্তির ওয়ারিসদেরকে রক্ত পন আদায় করতে হবে। তৃতীয় সূরতে রক্তপন দেয়া বাধ্যতামূলক নয়। অবশ্য কাফফারা সব সূরতেই দিতে হবে।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী রক্তপন হয় আনুমানিক দুই হাজার সাতশত চল্লিশ টাকা। এ টাকা হত্যাকারীর স্বজনরা নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদেরকে তিন বৎসর মুদ্দতে পরিশোধ করবে। (টাকার পরিমাণ ঠিক করা সব গুনে এক সমান হবে না। -অনুবাদক)

১৪৮. অর্থাৎ একজন মুসলমান যদি অন্য মুসলমানকে ভুল বশত নয় ররং ইচ্ছা করেই সে যে মুসলমান তা জেনে-শুনে হত্যা করে, তবে তার জন্য আখেরাতে জাহান্নাম, লা'নত এবং মহা শাস্তি রয়েছে। কাফ্ফারা দ্বারা তার রেহাই হবেনা। এমন হত্যাকারীর পার্থির শাস্তি সম্পর্কে সূরা বাকারায় আলোচনা করা হয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে জাহান্নামে চিরকাল বাস করবে সে ব্যক্তি, যে মুসলমানকে হত্যা করা হালাল মনে করে। কারণ কাজটি যে কুফরীর কাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথবা এর অর্থ সে ব্যক্তি এ দন্ডেরই যোগ্য। আগে আল্লাহ্ মালিক, তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন।

১৪৯. মহানবী (দঃ) একটা গোত্রের সঙ্গে জিহাদ করার জন্য একদল মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেন। সে গোত্রে ছিলো একজন মুসলমান। উক্ত মুসলিম ব্যক্তি তার মাল-সামান এবং পশু পাল পৃথক করে রেখেছেন এবং মুসলিম বাহিনী দেখে তাদেরকে সালাম জানান। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর লোকেরা তাকে কাফের মনে করলেন। ভাবলেন, হয়তোবা জান-মাল রক্ষার জন্য নিজেকে মুসলিম বলে জাহির করছে। তারা লোকটিকে হত্যা করলেন। তার মাল-সামান এবং পশুপাল সবই নিয়ে এলেন। এ উপলক্ষ্যে আয়াতটি নাযিল হয়। এতে মুসলামানদের সতর্ক করে বলা হয় যে, তোমরা যখন জিহাদের জন্য বের হবে, তখন ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে অনুসন্ধান করে কাজ করবে। চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করবে। যে তোমাদের সামনে ইসলাম প্রকাশ করে, সে যে মুসলিম, তা কখনো অস্বীকার করবেনা। আল্লাহর কাছে অনেক গণীমত রয়েছে। এসব তুচ্ছ জিনিসের প্রতি নযর দেয়া উচিৎ নয়।

১৫০. ইতিপূর্বে তোমরা তো এ রকমই ছিলে- অর্থাৎ ইসলামের আগে তোমরা দুনিয়ার গরযে অন্যায়ভাবে খুন করতে। কিন্তু এখন মুসলমান হয়ে এ রকম করা কিছুতেই উচিৎ নয়। বরং যার মুসলিম হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, তাকে হত্যা করা থেকেও বিরত থাকবে। অথবা এর অর্থ এই যে, ইতিপূর্বে ইসলামের প্রথম দিকে তোমরাও কাফেরদের শহরে বাস করতে । তোমাদের নিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-সরকার এবং স্বতন্ত্র আবাসভূমি ছিলনা। সে অবস্থায় তোমাদের ইসলামকে যেমন গ্রাহ্য গণ্য করা হতো, তোমাদের জান-মান হেফাযত করা হয়েছে, তোমাদের প্রতি বিশেষ রেয়ায়াত করা হয়েছিলো, ঠিক তেমনি রেয়ায়াত হেফাযত তোমাদেরকেও করতে হবে এমন মুসলমানদের সঙ্গে। এটা তোমাদের জন্য অবশ্য করণীয়। তথ্যানুসন্ধান না করে তাদেরকে হত্যা করেনি। সতর্কতা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে তোমাদের কাজ করা উচিৎ।

১৫১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের যাহেরী আমল এবং অন্তরের উদ্দেশ্য সব কিছু ভালো করেই অবহিত আছেন। সুতরাং তোমরা এখন যাকে হত্যা করবে, কেবল

আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী করবে। এতে যেন তোমাদের নিজেদের গরয আদৌ স্থান না পায়। আর কোন কাফের যদি নিছক জান-মালের ভয়ে তোমাদের সামনে ইসলাম যাহির করে এবং প্রতারণা করে প্রাণ বাঁচায়, তবে আল্লাহ তা'য়ালা সবকিছুই জানেন। এ সব করে তাঁর আযাব থেকে বাঁচতে পারবেনা। কিন্তু তোমরা তাকে বলবেনা। এটা তোমাদের করার কাজ নয়।

لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ

الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ

الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ

دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ

الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝٩٥ دَرَجٰتٍ

مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٩٦

৯৫. (জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে না পড়ে) যারা কোনো রকম (শারীরিক পঙ্গুত্ব ও) অক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও (নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘরে) বসে থেকেছে, আর যারা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছে-- এ দুই সম্প্রদায় (ও তাদের মর্যাদা কখনো আল্লাহর কাছে) এক নয়। আল্লাহ্ তায়ালা এই (ঘরে) বসে থাকা লোকদের তুলনায় (সংগ্রামী) মোজাহেদদের উঁচু মর্যাদা দান করেছেন। (জেহাদ তখনো সর্বাত্মকভাবে ফরজ ঘোষিত না হওয়ায়) এদের উভয়ের জন্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা (সর্বাবস্থায়ই তাঁর পথে জীন বিসর্জনকারী সংগ্রামী) মোজাহেদদের মর্যাদায় অনেক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

৯৬. এই (সম্মান ও) মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে। (এর সাথে রয়েছে তাঁর (প্রভূত) ক্ষমা ও দয়া[১৫২], মূলত আল্লাহ্ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু[১৫৩]।

১৫২. ইতিপূর্বে ভুল এবং অজ্ঞতা বশতঃ হত্যার জন্য মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়ে এজন্য শাঁসানো হয়েছে। তাই এ কারণে কারো জেহাদ হতে বিরত থাকার আশংকা ছিলো। কারণ, মুজাহিদদের জন্য এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। একারণে এখানে মোজাহিদদের মর্যাদা বয়ান করে তাদেরকে জেহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আয়াতের সার কথা এই যে, লেংড়া লুলা অন্ধ অসুস্থ এবং অচল- অক্ষমদের জন্য জেহাদের হুকুম নেই। অন্যান্য মুসলমানের মধ্যে জেহাদকারীদের বিরাট মর্যাদা রয়েছে। যারা জেহাদে অংশ নেয়না, তাদের এ মর্যাদা নেই। অবশ্য জেহাদে গমন না করলেও জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ থেকে জানা যায় যে, জেহাদ ফরযে কেফয়া, ফরযে আইন নয়। অর্থাৎ প্রয়োজন অনুপাতে মুসলমানদের যথেষ্ট সংখ্যক লোক জেহাদে অংশ গ্রহণ করলে অন্যদের কোন গুনাহ হবেনা। অন্যথায় সকলেই গুনাহগার হবে। এটা সম্মুখ সময়ের ব্যাপারে প্রযোজ্য হলেও হতে পারে। কিন্তু দ্বীনের প্রতিজ্ঞায় জেহাদ সবসময় ফরজ। -অনুবাদক।

১৫৩. কিছু মুসলমান এমনও আছে, যারা মনে প্রাণে সাচ্চা মুসলমান। কিন্তু তারা কাফের হুকুমতের অধীনে বাস করে বিধায় তারা চাপের মুখে আছে। কাফেরদের ভয়ে ইসলামের কথা মুখ খুলে বলতে পারেনা। আয়াতের সার কথা এই যে, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করে অর্থাৎ কাফেরদের সঙ্গে মিলে যারা বসবাস করে এবং হিজরত করেন, মৃত্যুর সময় ফেরেশতা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমরা কোন দ্বীনে ছিলে? তারা জবাব দেয়ঃ আমরা তো মুসলমান ছিলাম । কিন্তু দুর্বলতার কারণে ইসলামের কথা বলতে পারিনি। ফেরেশতা তাদেরকে বলবেনঃ কিন্তু আল্লাহর যমীনতো অনেক প্রশস্ত-বিস্তীর্ন ছিলো। তোমরা তো সেখান থেকে হিজরত করে যেতে পারতে। সুতরাং জাহান্নাম এমন লোকদের ঠিকানা। অবশ্য যারা দুর্বল এবং নারী ও শিশু, যারা হিজরতের কোন উপায় করতে পারেনি, আর হিজরতের পথও তাদের জানা ছিলো না, তারা ক্ষমার যোগ্য।

এ থেকে জানা যায় যে, মুসলমান যে দেশে মুসলমান হিসাবে বসবাস করতে পারেনা সে দেশ থেকে তাদের হিজরত করা ফরয। সম্পূর্ণ অক্ষম নিরুপায় ছাড়া অন্যদ্যের সে দেশে পড়ে থাকার অনুমতি নেই।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا

فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى الْأَرْضِ ۚ

قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ

فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

রুকু ১৪

৯৭. (কুফরী সমাজ ব্যবস্থার অধীনে বাস করে) যারা নিজেদের ওপর যুলুম করছিলো প্রাণ কেড়ে নেয়ার সময় (মওতের) ফেরেশতারা যখন তাদের জিজ্ঞেস করে—দুনিয়ায় তোমরা কোন কাজে ছিলে? তারা (হিজরত না করার অজুহাত দিতে গিয়ে) বলবে, আমরা ছিলাম দুনিয়ায় (কতিপয়) দুর্বল (ও অক্ষম) মানুষ। (আল্লাহর) ফেরেশতারা বলবে, কেন (তোমাদের জন্যে) আল্লাহর এ যমীন কি প্রশস্ত ছিলো না? তোমরা কি এই যমীনের অন্য কোনো দেশে চলে যেতে পারতে না? আসলে (এরা হচ্ছে অপরাধী ব্যক্তি)। এদের জন্যে জাহান্নাম হচ্ছে আবাসস্থল, আর আবাস হিসেবে জাহান্নাম হচ্ছে অত্যন্ত নিকৃষ্টতম স্থান।

৯৮. তবে যেসব নারী-পুরুষ ও শিশু সন্তান (সত্যি সত্যিই) অসহায় ও অক্ষম ছিলো, যাদের নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে যাওয়ার মতো শারীরিক শক্তি ছিলো না এবং অন্যত্র চলে যাওয়ারও কোনো উপকরণ ছিলো না—তাদের কথা আলাদা।

৯৯. সম্ভবত আল্লাহ্ তায়ালা এসব লোকদের মাফ করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা বড়ো গুনাহ্ মোচনকারী ও অনেক ক্ষমাশীল[১৫৪]।

১০০. আর যে কেউ (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে) আল্লাহর পথে (নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্য কোনো দেশে) হিজরত করবে (সে যেন নিরাশ হয়ে না পড়ে), সে আল্লাহর যমীনে আশ্রয় নেয়ার অনেক জায়গা ও অগুনতি ধনসম্পদ পেয়ে যাবে। যখনি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্ ও (তাঁর) রসূলের উদ্দেশ্যে (জন্মভূমি ছেড়ে) হিজরত করার জন্যে নিজ বাড়ি থেকে বের হয় এবং এমতাবস্থায় মৃত্যু এসে যদি তাকে গ্রাস করে নিয়ে যায়—তাহলে তার (সে অপূর্ণ হিজরতের) পুরস্কার দেয়ার ভার আল্লাহর দায়িত্বে চলে গেলো। আর আল্লাহ্ তায়ালা বাস্তবিকই বড়ো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু[১৫৫]।

---

১৫৪. এ আয়াতে হিজরতের জন্য উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত করা হয়েছে আর মুহাজিরদেরকে শান্তনা দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হিজরত করবে এবং আপন স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করবে তার বসবাসের জন্য অনেক জায়গা পাওয়া যাবে। তার জীবন জিবিকার পথ প্রশস্ত হবে। সুতরাং হিজরত করতে এজন্য ভয় করবেনা যে, কোথায় থাকবো, কি খাবো। এমন আশংকাও করবেনা যে, পথেই মৃত্যু হলে অবস্থা না এদিকের না ওদিকের হবে। কারণ, এ অবস্থায়ও হিজরতের পূর্ণ সাওয়াব লাভ করবে। আর মৃত্যুতো নির্ধারিত সময়েই আসবে। সময়ের পূর্বে আসতে পারেনা।

১৫৫. অর্থাৎ তোমরা যখন জিহাদ ইত্যাদির জন্য সফর করবে এবং তোমাদের স্পষ্ট দুশমন কাফেরদের পক্ষ থেকে আশংকা হয় যে, তারা মাওকা পেয়ে তোমাদেরকে উত্যক্ত অতীষ্ঠ করবে, তখন তোমারা নামায সংক্ষিপ্ত করবে। অর্থাৎ চার রাকাতের নামাযে দু' রাকাত পড়বে। আমাদের দেশে সফরের জন্য তিন মনযিল পথ অতিক্রম করা জরুরী। এর চেয়ে কম পথ সফর করলে কসর পড়া জায়েজ হবেনা। এ আয়াতটি নাযিল হওযার সময় কাফেরদের উত্যক্ত করার আশংকা ছিলো। কিন্তু এ আশংকা দূর হওয়ার পরও মহানবী (দঃ) সফরে দু' রাকাত নামায পড়েছেন। সাহাবীদেরকেও তিনি এজন্য তাকীদ দিয়েছেন, এখন সফরে কসর করার এ হুকুম সব সময়ের জন্য পরের উল্লেখিত আশংকা বর্তমান থাকুক বা না থাকুক। এটা আল্লাহ্ তা'য়ালার একটা অনুগ্রহ। শোকরের সঙ্গে তা গ্রহণ করা উচিৎ। হাদীস শরীফে একে আল্লাহর অনুগ্রহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ

اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿١٠١﴾ وَاِذَا كُنْتَ

فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ

وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ ۫ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا

مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۪ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا

فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ۚ

وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ

وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى

اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٠٢﴾ فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا

اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ

عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٣﴾ وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَاۤءِ
الْقَوْمِ ۗ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا
تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۗ وَكَانَ
اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٠٤﴾

রুকু ১৫

১০১. তোমরা যখন (দেশ-বিদেশে) সফরে বের হবে, তখন তোমাদের যদি এ আশংকা থাকে যে, কাফেররা তোমাদের ওপর নামাযের সময় (আক্রমণ করে) তোমাদের বিপদগ্রস্ত করে ফেলবে, তাহলে সে অবস্থায় তোমরা যদি (তোমাদের) নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে নাও তাতে কোনোই দোষ নেই। (কাফেরদের ওপর তো কোনো বিশ্বাস নেই। কারণ) নিসন্দেহে কাফেররা হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্যত দুশমন[১৫৬]।

১০২. (হে নবী) তুমি যখন মুসলমানদের মাঝে অবস্থান করবে এবং (যুদ্ধাবস্থায়) যখন তুমি তাদের জন্যে (তাদের সাথে) নামাযের ইমামতি করবে তখন (নামাযের ব্যবস্থাপনা এমন থাকবে) যেন তাদের একদল লোক তোমার সাথে (জামাতের সাথে নামাযে) দাঁড়ায় এবং (এই দল অবশ্যই) সশস্ত্র থাকবে, অতপর তারা যখন (নামাযের) সেজদা সম্পন্ন করে নেবে, তখন তারা তোমাদের পেছনে চলে যাবে, দ্বিতীয় দল- যারা তখনো নামায পড়েনি- তারা তোমার সাথে এসে নামায আদায় করবে, (কিন্তু সর্বাবস্থায়) তারা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে এবং সশস্ত্র অবস্থায় থাকে। কারণ, কাফেররা তো এ (সুযোগটুকুই চায় যে, তোমরা তোমাদের মালসামান ও অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে অসাবধান হয়ে যাও, যাতে করে তারা তোমাদের ওপর আকস্মিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে[১৫৭]। অবশ্য অতিরিক্ত বৃষ্টি বাদলের জন্যে যদি তোমাদের কষ্ট হয় কিংবা শারীরিকভাবে তোমরা যদি অসুস্থ হও, তাহলে (কিছুক্ষণের জন্যে) অস্ত্র রেখে দেয়াতে কোনো দোষ নেই; কিন্তু (অস্ত্র রেখে দিলেও) তোমরা অবশ্যই সদা হুশিয়ার থাকবে[১৫৮]। অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদের জন্যে এক অপমানকর আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছেন[১৫৯]।

১০৩. অতপর তোমরা যখন নামায শেষ করে নেবে, তখন (নামাযের শিক্ষা অনুযায়ী) দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে (তথা সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকবে। এরপর যখন তোমরা পুরোপুরি স্বস্তি বোধ করবে তখন (আবার যথারীতি নামায আদায় করবে, কারণ নামায হচ্ছে এমন (একটি কর্তব্য কাজ) যা ঈমানদারদের ওপর সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথে ফরজ করা হয়েছে[১৬০]।

১০৪. শত্রুদলের পেছনে ধাওয়া করার সময় বিন্দুমাত্রও মনোবল হারিয়ো না। (এটা মনে করো না যে, শুধু তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছো) তোমরা যদি কষ্ট পেয়ে থাকো তারাও তো তোমাদের মতো কষ্ট পেয়ে (ক্লান্ত হয়ে) গেছে; কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে তোমরা (পরকালের পুরস্কার) যা আশা করো- তারা তো তা করে না, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী[১৬১]!

---

১৫৬. আগে সফরের নামায সম্পর্কে বলা হয়েছিলো, এখানে 'সালাতুল খাওফ' বা ভয়ের নামায সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলায় কাফের বাহিনী থাকলে মুসলিম দু' গ্রুপে বিভক্ত হবে। এক গ্রুপ ইমামের সাথে অর্ধেক নামায পড়ে দুশমনের মোকাবিলায় গিয়ে দাঁড়াবে। অপর গ্রুপ এসে ইমামের সঙ্গে বাকী অর্ধেক নামাযে শরীক হবে। ইমামের সালাম ফিরাবার পর উভয় গ্রুপ অবশিষ্ট অর্ধেক নামায পৃথকভাবে সমাপ্ত করবে। মাগরিবের নামায হলে প্রথম গ্রুপ ইমামের সঙ্গে দু'রাকাত এবং দ্বিতীয় গ্রুপ এক রাকাত আদায় করবে। এ অবস্থায় নামাযের মধ্যে যাতায়াতের জন্য কোন গুনাহ হবেনা। কাফেররা যাতে মওকা পেয়ে নামায রত অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা চালাতে না পারে। এজন্য সালাতুল খাওফে নামাযরত ব্যক্তি যুদ্ধাস্ত্রও সঙ্গেঁ রাখতে পারবে।

১৫৭. অর্থাৎ বৃষ্টি, অসুস্থতা বা দুর্বলতার কারণে অস্ত্র বহন করা যদি কষ্টকর হয় তবে এমন অবস্থায় অস্ত্র খুলে রাখার অনুমতি আছে। অবশ্য নিজের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যেমন লৌহ, বর্ম, ঢাল ইত্যাদি সঙ্গেঁ রাখবে। দুশমনের ভয়ে উপরে উল্লেখিত নিয়মে নামায আদায় করা সম্ভব না হলে জামাত মওকুফ করে একাকী নামায আদায় করবে। সওয়ারী থেকে নীচে নেমে আদায় করা সম্ভব না হলে সওয়ারী পিঠে থেকেই ইশারায় নামায আদায় করবে। এরও সুযোগ না হলে নামাযের কাযা আদায় করবে।

১৫৮. অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম অনুযায়ী প্রজ্ঞা বিচক্ষণতা সতর্কতা এবং যত্ন ও গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করে যাবে এবং তাঁর অনুগ্রহের আশা রাখবে। তিনি কাফেরদেরকে তোমাদের হাতে লাঞ্ছিত অপদস্থ করবেন। তোমরা কাফেরদেরকে ভয় করবেনা।

১৫৯. অর্থাৎ ভয়ের সময় সংকীর্ণতা অস্থিরতার কারনে নামাযে যদি কোন রকম ত্রুটি হয়ে যায়, তবে নামায থেকে অবসর হয়ে সব অবস্থায় দাঁড়ায়ে শুয়ে বসে আল্লাহকে স্মরন করবে। এমনকি তুমুল সংঘর্ষ কালেও আল্লাহকে স্মরন করবে। কারণ, সময় বেধে দেয়া

এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতা ছিলো নামাযের অবস্থায়। এসব কারণে সংকীর্ণতা অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। এছাড়া কোন সময় নির্দ্দিষ্ট না করে সবসময় আল্লাহকে স্মরন করতে পার। কোন অবস্থায়ই আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হবেনা। এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেঁ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহর যিকির-স্মরণের ব্যাপারে কেউই অক্ষম নয়। এ ব্যাপারে তাদের কোন ওযর-আপত্তি গ্রাহ্য হবেনা। কেবল মাত্র যারা জ্ঞান-বুদ্ধি এবং অনুভুতি শক্তি কোন কারণে লোপ পেয়েছে। তাকেই এক্ষেত্রে অক্ষম মনে করা যেতে পারে।

১৬০. অর্থাৎ উপরে উল্লেখিত ভীতি, শংকা দূরীভূত হয়ে যখন একাগ্রচিত্ততা অর্জিত হয়, তখন যে নামাযই পড়বে, শর্ত-শরায়েত মেনে এবং আদাব কায়দা রক্ষা করে যেমন শান্ত নিরাপদ অবস্থায় পড়া উচিৎ। আর যে সব অতিরিক্ত ক্রিয়াকান্ডের অনুমতি দেয়া হয়েছে. তা বিশেষ অবস্থার জন্য। সন্দেহ নেই যে, একটা নির্ধারিত সময়ে নামায ফরয। স্ব গৃহে বা সফরে, স্থির -শাঁন্ত অবস্থা বা ভয়-ভীতি -সর্বাবস্থায়ই নির্ধারিত সময় নামায আদায় করা জরুরী। যখন খুশী তখন পড়া যাবেনা। অথবা এর অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'য়ালা নামায সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় সময় নির্ণয় করে দিয়েছেন। স্বগৃহে কেবল নামায পড়তে হবে, আর সফরে কেমন, স্বাভাবিক অবস্থায় কেমন করতে হবে, আর ভয়ের অবস্থায় কেমন। সুতরাং নির্ধারিত নিয়ম নীতি মেনে চলবে।

১৬১. অর্থাৎ কাফেরদের অনুসন্ধান এবং তাদের পশ্চদ্ধাবনে সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করবে। কোন রকম অলসতা শৈথিল্য দেখাবনা। তাদের সঙ্গে যুদ্ধে তোমরা যদি আহত হয়ে থাক তবে এক্ষেত্রে তারাও তো শরীক রয়েছে। আর আগামীতে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তোমাদের এমন সব আকাংখ্যা রয়েছে যা তাদের নেই। অর্থাৎ দুনিয়া কাফেরদের ওপর বিজয় এবং আখেরাতে বিরাট সাওয়াব লাভ করা। তোমাদের অবস্থা-কারণ এবং আমল সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা ভালো করেই জানেন। তার নির্দেশের মধ্যে তোমাদের জন্য বিরাট রহস্য নিহিত রয়েছে। আছে দ্বীন- দুনিয়ার উভয়টারই মঙ্গঁল। সুতরাং তাঁর নির্দেশ মেনে নেয়াকে বিরাট গনীমত এবং বড় নেয়ামত মনে করবে।

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ

لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰىكَ اللّٰهُ ط وَلَا تَكُنْ

لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا ﴿١٠٥﴾ وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ

أَنْفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيْمًا ﴿١٠٧﴾

يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ

مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ

اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٨﴾ هٰٓأَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ

عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۟ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١٠٩﴾ وَمَنْ

يَّعْمَلْ سُوْٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى

نَفْسِهٖ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾

রুকু ১৬

১০৫. অবশ্যই আমি একান্ত সততার সাথে তোমার ওপর এই গ্রন্থ নাযিল করেছি- যাতে করে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে যাকিছু (জ্ঞানের আলো) দেখিয়েছেন তার আলোকে মানুষদের বিচার মীমাংসা করতে পারো (তবে এই বিচার ফায়সালা করার সময়) তুমি কখনো বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ সমর্থন করো না[১৬২]।

১০৬. এবং (সর্বদাই) তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু[১৬৩]।

১০৭. যে সব মানুষ নিজেরা নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি কখনো এমন সব লোকদের পক্ষ নিয়ো না (তুমি তো জানো) আল্লাহ্ তায়ালা এই পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতকদের কখনো পছন্দ করেন না।

১০৮. (এদের চরিত্র হলো) এরা (দুনিয়ার আর দশজন) মানুষদের কাছ থেকে নিজেদের কাজ-কর্ম লুকিয়ে রাখতে চায় কিন্তু এরা আল্লাহর কাছ থেকে নিজেদের কাজকর্মের কিছুই লুকাতে পারে না। আল্লাহ্ তো হচ্ছেন সেই মহান সত্তা যিনি রাতের অন্ধকারে- তিনি যা পছন্দ করেন না, এমন সব বিষয়ে যখন এরা সলাপরামর্শ করে, তখনও তিনি তাদের সাথেই থাকেন। (এরা জানে না যে) এদের সব কয়টি ক্রিয়াকলাপ আল্লাহর জ্ঞানের পরিধির আয়ত্তাধীন[১৬৪]।

১০৯. হাঁ, এরাই হচ্ছে সে সব লোক দুনিয়ার জীবনের (সঠিক ঘটনা না জানার কারণে) তোমরা যাদের পক্ষে কথা বলেছো-। কিন্তু কেয়ামতের (চূড়ান্ত বিচারের) দিনে আল্লাহর সামনে (তার দন্ড থেকে বাঁচানোর জন্যে) কে তাদের পক্ষে কথা বলবে[১৬৫]?

১১০. যে ব্যক্তি পাপ কাজে লিপ্ত হয় অথবা (পাপের কারণে) নিজের ওপর নিজেই অবিচার করে, অতপর (এক সময় নিজের ভুল বোঝার পর) যখন সে আল্লাহর কাছে (নিজের গুনাহের জন্যে) ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন সে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালাকে পরম ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু হিসেবে পাবে[১৬৫]।

১১১. যে মানুষটি কোনো গুনাহের কাজ করলো, (তার জেনে রাখা দরকার যে এই পাপের দ্বারা) সে নিজেই নিজের ক্ষতি সাধন করলো। আল্লাহ্ তায়ালা সবকিছুই জানেন, তিনি সবকিছুর ব্যাপারেই জ্ঞাত রয়েছেন[১৬৭]।

---

১৬২. মোনাফেক এবং দুর্বলমনা মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ কোন গুনাহ বা খারাপ কাজে লিপ্ত হলে তার শাস্তি এবং বদনামী থেকে বাঁচার জন্য নানা ধরণের হিল্লা-কৌশল অবলম্বন করতো এবং মহানবী (দঃ) এর খেদমতে তা এমনভাবে ভঙ্গিতে প্রকাশ করতো, যাতে তিনি তাকে মুক্ত মনে করেন। বরং তারা মুক্ত মানুসের খাড়ে অপবাদ চাপায়ে দিয়ে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করতো। এ ব্যাপারে নানা সংমিশ্রণ আর প্রলেপ দিয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শও করতো।

একবার একটা মজার ঘটনা ঘাটলো এমনই একজন দুর্বলমনা মুসলমান অপর এক মুসলমানের ঘরে সিঁধ কেটে এক থলি আটা এবং কিছু অস্ত্রশস্ত্র চুরি করে নিয়ে যায়। ঘটনা চক্রে আটার থলিটি ছিলো ছেঁদা। চোরের গৃহ পর্যন্ত গোটা পথে আটা পড়ে থাকে। এদিকে চোর বেটা এক বুদ্ধি আঁটলো। সে আটা নিজের ঘরে না রেখে সে রাত্রেই তার পরিচিত এই ইহুদীর ঘরে আমানত রাখে। সকালে ঘরের মালিক আটার পথ ধরে চোর

খুজে বের করলেন। কিন্তু তার ঘরে তল্লাশী চালায়ে কিছুই পাওয়া গেলোনা। এ দিকে চোর কসম করে বললো, আমি কিছুই জানিনা। মালিক আটার পথ ধরে অবশেষে ইহুদীকে গিয়ে পাকড়াও করলো। ইহুদী স্বীকার করলো, আমার ঘরে মাল আছে ঠিকই, কিন্তু অমুক ব্যক্তি তা আমার কাছে আমানত রেখে গেছে, আমি চোর নই। মালিক মামলাটি মহানবী (দঃ) এর দরবারে পেশ করলেন, চোর এবং তার সঙ্গীরা ঠিক করলো, যেভাবেই হোক, তাকে চুরির অভিযোগ হতে মুক্ত হবে। বরং ইহুদীকেই চোর সাব্যস্ত করতে হবে। তারা ইহুদীর সাথে বিবাদে লিপ্ত হলো। মহানবী (দঃ) এই দরবারে কসম খেয়ে সাক্ষী দিতে শুরু করলো যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ। ইহুদী চোর প্রমাণিত হওয়ার উপক্রম । সেই অপরাধী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা কয়েকটি আয়াত নাযিল করে হযরত রাসূলে মাকবূল (দঃ) এবং অন্য সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এ মুসলমান লোকটাই আসলে চোর। ইহুদী এ ব্যাপারে নির্দোশ। ভবিষ্যতের জন্য এ ধরনের লোকদের রহস্য ফাঁস করে দিয়ে সকলকে সতর্ক করেছেন।

এ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, হে রাসূল! আমরা তোমার ওপর সত্য কিতাব নাযিল করছি এজন্য যে, যাতে আমাদের বলা- কওয়া অনুযায়ী সকল মানুষের মধ্যে- তারা নেক হোক, বা বদ, মু'মেন হোক, বা কাফের- ইনসাফ করা হয়। তদনুযায়ী হুকুম দেয়া হয়। আর যারা দাগাবাজ -প্রতারক প্রবঞ্চক, কখনো তাদের কথা বিশ্বাস করবেনা, তাদের প্রতি কিছুতেই পক্ষপাতিত্ব করবেনা। তাদের কসম আর সাক্ষী অনুযায়ী নিরপরাধকে অপরাধী সাব্যস্ত করবেনা। অর্থাৎ এসব দাগাবাজদের পক্ষ অবলম্বন করে ইহুদীর সাথে বিবাদে জড়াবেনা।

১৬৩. অর্থাৎ অনুসন্ধানের আগে কেবল বাহ্যিক অবস্থা দেখে চোরকে নির্দোষ এবং উপরোক্ত ইহুদীকে চোর মনে করা আপনার-নিষকলুষতা এবং মহান শানের পক্ষে শোভনীয় নয়। এ থেকে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ। যেসব সরল প্রাণ সাহাবী চোরের সাথে ইসলামী এবং জাতীয় সম্পর্ক ইত্যাদির কারণে তার সম্পর্কে ভালো ধারনা করে ইহুদীকে চোর সাব্যস্ত করায় সচেষ্ট ছিলেন, এখানে তাদেরকেও ভালো ভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

১৬৪. আগের আয়াতে যখন তাদের প্রতারণা ও খারাব দিক স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা হয়, তখন রাসূলে খোদা (সঃ) অতি দয়ার কারণে সম্ভবতঃ তাদের জন্য অপরাধের ক্ষমা চেয়ে থাকবেন। কারণ, সমস্ত সৃষ্টিকূল বিশেষ করে আপন উম্মতের ওপর তাঁর ছিলো অসীম দয়া ভালো বাসা। এ প্রসঙ্গে তাঁকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, তুমি এসব দাগাবাজদের পক্ষ হয়ে কেন আল্লাহর সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হন? এমন লোকেরা তো আল্লাহর মনঃপূত নয়। এরা মানুষের চোখের আড়ালে রাতে অবৈধ পরামর্শ করে। তারা তো আল্লাহ স্মরণও করেনা। অথচ আল্লাহ তো সব সময় তাদের সঙ্গে আছেন এবং তাদের সব কিছুকেই বেষ্টন করে আছেন। তুমি যদি তাদের ক্ষমা না করেও থাকো, তবে এর সমস্ত

সম্ভাবনা তো রয়েছে। দেখুন অন্যত্র হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে লুত জাতি সম্পর্কে তিনি আমাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হন। নিশ্চয়ই ইব্রাহীম অতিশয় ধৈর্যশীল, বিনয়ী এবং প্রত্যাবর্তনকারী। আগামীতে এটা বন্ধ করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা এ কথা বলে তাদের জন্য সুপারিশ করতে মহানবী (দঃ) কে বিরত রেখেছেন।

১৬৫. চোরের আপন লোকজন এবং যারা চোরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছিল, এ আয়াতে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার সব কিছু জানা আছে। এ অন্যায় সহায়তা দ্বারা কেয়ামতে তার কোন উপকার হবেনা।

১৬৬. সূ' এবং 'যুলুম' অর্থ বড় এবং ছোট গুনাহ। অথবা 'সূ' এর অর্থ এমন গুনাহ যা দ্বারা অন্যে ব্যথা পায়, যেমন, কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করা আর 'যুলুম' এমন গুনাহ, যার ক্ষতি কেবল আপন পর্যন্তই সীমাদ্ধ থাকে। আয়াতের তাৎপর্য এ যে, যেমন গুনাহই হোকনা কেন, তার চিকিৎসা হচ্ছে তওবা ইস্তেগফার আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তওবা করার পর আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই মাফ করে দেন। মানুষ যদি জেনে শুনে প্রতারণা করে কোন অপরাধীকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে বা ভুল করে বেকসূরকে দোষী মনে করে এতে তার অপরাধ হালকা হতে পারেনা। অবশ্য তওবা দ্বারা এটা একেবারেই মাফ হতে পারে। এতে চোর এবং তার সকল পক্ষপাতিকে -যারা জেনে-শুনে ইচ্ছা করে বা ভূল করে তার পক্ষপাতি হয়েছিলো, সকলকে তওবা-ইস্তিগফার করতে বলা হয়েছে। এদিকেও স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখনও কেউ যদি নিজের কথায় অটল থাকে এবং তাওবা না করে, সে আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে।

১৬৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে গুনাহ করবে, তার শাস্তি তার ওপরই বর্তাবে। কেবল সে বিশেষ গুনাহর শাস্তিই তাকে দেয়া হবে। একজনের গুনাহর জন্য অন্য জনকে শাস্তি দেয়া যায়না। কারণ, কেবল সে ব্যক্তিরই এ রকম করতে পারে, আসল ব্যাপার সম্পর্কে যার কোন খবর নেই, অথবা প্রজ্ঞা-বুদ্ধিমত্তা বলতে যার মধ্যে কিছুই নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তো কোন রকম অতিরঞ্জন ছাড়াই মহাজ্ঞানী এবং মহাবিজ্ঞ ও কুশলী- 'আলীমুন হাকীম'। তাঁর পক্ষে এর অবকাশ কোথায়? সুতরাং নিজে চুরি করে ইহুদীর ওপর দোষ-চাপালে এখন কি লাভ হবে।

وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ

لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا

أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ

فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن

نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ

بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ

مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ

مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

রুকু ১৭

১১২. যে ব্যক্তি নিজে একটি অন্যায় কিংবা পাপ কাজ করলো কিন্তু সে দোষ চাপিয়ে দিলো একজন নির্দোষ ব্যক্তির ওপর, এই জঘন্য কাজের ফলে (প্রকারান্তরে) সাংঘাতিক একটা অপবাদ ও জঘন্য গুনাহের বোঝা নিজের ঘাড়ে উঠিয়ে নিলো[১৬৮]।

১১৩. (এই ধরনের নাযুক পরিস্থিতিতে) যদি তোমার ওপর আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো, তাহলে এদের একদল লোক তো তোমাকে (প্রায়ই) ভুল পথে পরিচালিত করতে চেয়েছিলো, যদিও (তাদের এ আচরণে) তারা তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই পথভ্রষ্ট করতে পারছিলো না। (অবশ্য) তাদের এ (প্রতারণামূলক) কাজ দ্বারা তোমার কোনোই ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হতো না! (কারণ) আল্লাহ্ তায়ালা তো তার কেতাব ও (বিপুল পরিমাণ) বুদ্ধিকৌশল তোমার ওপর নাযিল করেছেন এবং (এই গ্রন্থ দ্বারা) তিনি তোমাকে এমন সব কিছুর জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, যার কিছুই তোমার জানা ছিলো না। (সত্যিই এ অবস্থায়) তোমার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ছিলো অনেক বিরাট[১৬৯]!

১১৪. এই (পথহারা) মানুষগুলোর অধিকাংশ গোপনে সলাপরামর্শের ভেতরই কোনো কল্যাণ নিহিত নেই। তবে যদি কেউ (এ গোপন পরামর্শের দ্বারা) কাউকে কোনো দান-খয়রাত, সৎ কাজ ও অন্য মানুষের মাঝে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের আদেশ দেয় (তাতে অবশ্যই কল্যাণ থাকবে) আর আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যদি কেউ এসব কাজ করে থাকে অতি শীঘ্রই আমি তাকে এক বিপুল পরিমাণ পুরস্কার দেবো[১৭০]।

১১৫. আবার যে ব্যক্তি তার কাছে প্রকৃত সত্য সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর (আমার) রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং ঈমানদারদের পথ ছেড়ে বেঈমান লোকদের নিয়ম-নীতির অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই পরিচালিত করবো যেদিকে সে নিজে চলতে চায়, আর (তবে এই উল্টো পথে চলার শাস্তি হিসেবে) তাকে আমি জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে দেবো, (জাহান্নাম হবে) অত্যন্ত নিকৃষ্ট আবাসস্থল[১৭১]।

---

১৬৮. যে কেউ ছোট বড় কোন গুনাহ করে কোন নির্দোষ ব্যক্তির ওপর দোষ চাপায়, তার যিম্মায় দুটি গুনাহ যুক্ত। একটা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার আর অপরটি মূল গুনাহ। এ থেকে প্রকাশ পায় যে, নিজে চুরি করে ইহুদীর ওপর অপবাদ আরোপ করায় শাস্তি বৃদ্ধি পেয়েছে । লাভ তো কিছুই হয়নি। আয়াত থেকে এও জানা যায় যে, গুনাহ ছোট, বা বড়, খালেছ তওবা ছাড়া তার কোন চিকিৎসা নেই।

১৬৯. এ আয়াতে মহানবী (সঃ) কে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এতে সেসব খেয়ানতকারীদের প্রতারণা প্রকাশ করা হয়েছে এবং মহানবীর শানের মহত্ব ও নিষ্পাপ নিষ্কলুষতা প্রকাশ পেয়েছে। একথাও এতে প্রকাশিত হয়েছে যে, জ্ঞানের পূর্ণতা সকল কিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এ পূর্ণতায় মহানবী (সঃ) সকলের শীর্ষে। তাঁর প্রতি আল্লাহর এত অনুগ্রহ রয়েছে, যা ভাষায় বর্ণনা করা আমাদের আয়ত্বে বাইরে, জ্ঞানের উর্ধে। এতে

এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, চোরকে নির্দোষ বলার ধারণা জেগে ছিলো, তা জেগেছিলো বাহ্যিক অবস্থা দেখে অন্যদের সাক্ষ্য ও বক্তব্য শুনে এবং সে গুলোকে সত্য মনে করেই। সত্য থেকে বিচ্যুতি বা সত্যের ব্যাপারে শৌথিল্য কিছুতেই এর কারণ ছিলনা। তার এটুকু মনে করায় কোন দোষ ছিলনা; বরং এ ছিলো স্বাভাবিক। কিন্ত আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহে যখন আসল ব্যাপার প্রকাশ পেয়েছে তখন আর তাঁর মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট ছিলনা। আর এসব কিছুর উদ্দেশ্য হচ্ছে আগামীতে এসব প্রতারক প্রবঞ্চনাকরা যাতে তোমাকে প্রবঞ্চিত করার অপচেষ্টা থেকে নিবৃত হয়, নিরাশ হয় আর আপনিও আপন শ্রেষ্ঠত্ব ও নিষ্কলুষতা অনুযায়ী পাজ্ঞা-বিচক্ষণতা এবং সতর্কতার সঙ্গে কাজ করেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

১৭০. মোনাফেক এবং হিল্লাপন্থীরা মহানবীর (দঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে মানুষের মধ্যে নিজেদের গুরুত্ববৃদ্ধির জন্য তাঁর কানে কানে কথা বলতো, মজলিসে বসেই নিজেদের মধ্যে অহেতুক কানাকানি করতো, কারো দোষ খুঁজে বের করতো, কারো, গীবত শেকায়াত করতো। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে যে,যারা নিজেদের মধ্যে কানে কানে পরামর্শ করে, তাদের এসব পরামর্শের অধিকাংশের মধ্যেই কোন কল্যাণ নিহিত থাকেনা। স্পষ্ট সত্য কথা গোপনে বলার কোন প্রয়োজন নেই। এতে নিশ্চয়ই কোন প্রতারণা প্রবঞ্চনা রয়েছে। গোপন যদি করতেই হয় তবে ছদকা–খয়রাত-দান দক্ষিনার ব্যাপারটি গোপন করবে। যাতে গ্রহীতাকে লজ্জিত হতে না হয়। অথবা কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ভুল থেকে রক্ষা করলে বা তাকে কোন ভালো কথা সঠিক বিষয়ে অবহিত করলে তা গোপন করবে, যাতে সে লজ্জা না পায়। অথবা দুই ব্যক্তির মধ্যে যদি লড়াই বেঁধে যায় এবং একজন রাগের বশবর্তী হয়ে সন্ধি স্থাপনে রাযী না হতে চায় প্রথমে কোন কৌশল অবলম্বন করে তাকে বুঝাবে, । এমনি এক্ষেত্রে সত্য ঘটনা গোপন করে মিথ্যা বলারও সাময়িক অনুমতি রয়েছে। পরিশেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে কেউ ওপরের কাজ গুলো করবে। সে তো অনেক সাওয়াব লাভ করবে। অবশ্য রিয়াকারী লোক দেখানো অথবা কোন পার্থিব গরযে এ কাজগুলো করা উচিৎ হবেনা।

১৭১. অর্থাৎ কারো কাছে সত্য প্রতিভাত-বিকশিত হওয়ার পরও যদি সে রাসূলে খোদার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং সমস্ত মুসলমানদের বাদ দিয়ে নিজে পৃথক পথ ও পন্থা অবলম্বন করে, যেমন ওপরে উল্লেখিত চোরটি করেছিলো, তবে জাহান্নাম হবে তার ঠিকানা। উক্ত চোর নিজের অপরাধ স্বীকার করে তাওবা না করে বরং হাত কাটা যাওয়ার ভয়ে মক্কায় গিয়ে মোশকেরদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। বড় বড় আলেমরা এ আয়াত থেকে এ মাসআলটিও বের করেছেন যে, উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে অস্বীকার এবং বিরুদ্ধাচরণ করে, সে ব্যক্তি জাহান্নামী। উম্মতের ইজমাকে মেনে নেওয়া ফরয। হাদীস শরীফে বলা হয়েছেঃ 'মুসলমানদের জামায়াতের ওপর আল্লাহর হাত রয়েছে। আর যে ব্যক্তি পৃথক পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছে, সে জাহান্নামে গিয়ে পড়েছে'।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ۚ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾

রুকু ১৮

১১৬. আল্লাহ্ তায়ালা কখনো তাঁর নিজের সাথে কাউকে অংশীদার করার জঘন্য গুনাহকে ক্ষমা করেন না। এই (শেরকের পাপ) ছাড়া অন্য সকল গুনাহ্ তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই ক্ষমা করে দিতে পারেন[১৭২]। যে ব্যক্তিই আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করলো, সে চরমভাবেই গোমরাহ্ হয়ে গেলো[১৭৩]।

১১৭. এরা আল্লাহকে ছাড়া (আর কাকে ডাকে!) ডাকে (এক নিকৃষ্ট) দেবীকে কিংবা ডাকে কোনো বিদ্রোহী শয়তানকে।

১১৮. যে শয়তানের ওপর আল্লাহ্ তায়ালা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন[১৭৪]। (কারণ একদিন) সে (আল্লাহ্কে) বলেছিলো, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাহ্দের এক অংশকে নিজের (দলে শামিল) করেই ছাড়বো[১৭৫]।

১১৯. (সে আরো বলেছিলো) আমি অবশ্যই তোমার বান্দাহ্দের গোমরাহ্ করে দেবো, আমি তাদের হৃদয়ে নানা প্রকারের মিথ্যা বাসনা, আশা-আকাংখা সৃষ্টি করবোই। আমি তাদের নির্দেশ দেবো যেন তারা (মিথ্যা কুসংস্কারে লিপ্ত হয়ে) জন্তু-জানোয়ারের কান ছিদ্র করে দেয়[১৭৬]। আমি তাদের আরো নির্দেশ দেবো যেন তারা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে বিকৃত করে দেয়। সত্যি কথা হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তিই আল্লাহ্র বদলে শয়তানকে নিজের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নেবে, সে এক সুস্পষ্ট ক্ষতি ও লোকসানের সম্মুখীন হবে।

১২০. সে (অভিশপ্ত শয়তান) তাদের (নানা প্রকারের) প্রতিশ্রুতি দেয়- তাদের সামনে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। আর শয়তানের সব প্রতিশ্রুতিই হচ্ছে (এক একটি ধোকা ও) প্রতারণা মাত্র।

১২১. এরাই হচ্ছে সে সব (হতভাগা) ব্যক্তি, যাদের অন্তিম পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম- যার (কঠিন আযাব) থেকে মুক্তি লাভের কোনো পন্থাই তারা (খুঁজে) পাবে না[১৭৭]।

১২২. অপরদিকে যারা (শয়তানের এসব প্রতিশ্রুতি ও লোভকে দু'পায়ে দলে) আল্লাহ্ তায়ালার ওপর ঈমান আনবে এবং (সে মোতাবেক জীবন ভর) ভালো কাজ করবে, তাদের (সবাইকে) আমি অচিরেই এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে (সুপেয় পানির) ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে। (তোমরা তো জানোই যে) আল্লাহ্র ওয়াদা অতি সত্য)। আর (আসল কথা হচ্ছে) আল্লাহ্ তায়ালার চাইতে বেশী সত্য কথা কে বলতে পারে[১৭৮]?

১৭২. অর্থাৎ শেরকের চেয়ে ছোট গুনাহ যাকে ইচ্ছা আল্লাহ মাফ দেবেন। কিন্তু শেরকের গুনাহ কখনো মাফ করবেন না। মোশরেকের জন্য তিনি শাস্তি অবধারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং চুরি করা এবং মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা যদিও কবীরা গুনাহ। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা আপন রহমত গুনে উক্ত চোরকে মাফ করে দেয়ার সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু চোর যখন রাসূলের হুকুম অমান্য করে মোশারেকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তখন আর তার মাগফেরাতের কোন সম্ভাবনেই অবশিষ্ট নেই।

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের পূজা উপাসনা করাই কেবল শেরক নয়, বরং আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে কারো হুকুমকে পসন্দ করাও শেরক।

১৭৩. দূরে গিয়ে পড়েছে এজন্য যে, সে ব্যক্তি তো আল্লাহকেই স্পষ্ট অস্বীকার ও ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর মোকাবিলায় অন্য মা'বুদ গ্রহণ করে শয়তানের পূর্ণ অনুগত হয়ে পড়েছে, আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য এবং তাঁর রহমত সব কিছু থেকে মুখ ফিরায়ে নিয়েছে। যে ব্যক্তি এতটা দূরে গিয়ে পড়েছে, সে কি করে আল্লাহর রহমত এবং মাগফেরাতের যোগ্য হতে পারে? বরং এমন লোকদের মাগফেরাত তো হেকমত-প্রজ্ঞার পরিপন্থী হওয়া উচিৎ। এ কারণে এমন লোকদের মাগফেরাত সম্পর্কে স্পষ্ট হতাশ-নিরাশ করে দেয়া হয়েছে। আর মুসলমান যত শক্ত গুনাহগারই হোক না কেন, যেহেতু তার গুনাহ আমল পর্যন্তই। তার আকীদা-বিশ্বাস, সম্পর্ক-সম্বন্ধ এবং আশা-আকাংখ্যা সব কিছু বর্তমান রয়েছে, তাই অবশ্যই তার মাগফেরাত হবে- সত্ত্বর হোক বা বিলম্বে। যখন আল্লাহর ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেবেন।

১৭৪. অর্থাৎ এসব মোশারেকরা আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে নিজেদের মা'বুদ বানায়ে নিয়েছে, সেগুলো তো নিছক বূত-মূর্তি আর সেগুলির নাম করণ করেছে নারীদের নামানুসারে, যেমন মানাত- উয্যা নায়েলা ইত্যাদি। আসল ব্যাপার তলিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মূলতঃ এসব মোশরেকরা আল্লাহর অবাধ্য-ধিকৃত-বিতাড়িত শয়তানেরই এবাদত করে। শয়তানেই বিভ্রান্ত করে তাদের দ্বারা এ কাজ করায়। মূর্তি পূজায়ই তার আনুগত্য হয় আর এতেই সে খুশী হয় সবচেয়ে বেশী, এ দ্বারা মুশরেকদের নীচ-স্তরের গোমরাহী অজ্ঞতা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। দেখুন প্রথমতঃ আল্লাহ ছাড়া কাউকে মাবূদ বানানোর চেয়ে বড় গোমরাহী আর কি হতে পারে আর মা'বূদ বানায়েছে তো পাথরকে, যার মধ্যে কোন রকম শব্দ অনুভূতি নেই। নেই কোন নড়াচড়া। তারও আবার নামকরণ করেছে নারীর নামে। মরদুদ-মলউন শয়তানের প্ররোচনায়ই এটা করেছে। এর চেয়ে বড় গোমরাহী অজ্ঞতা আর কি হতে পারে? এর কি কোন নযীর খুঁজে পাওয়া যায়? কোন নীচ স্তরের আহাম্মকও কি এটা গ্রহণ করতে পারে?

১৭৫. অর্থাৎ সেজদা না করার কারণে শয়তানকে যখন মলউন-মরদূদ অর্থাৎ অভিশপ্ত ও বিতাড়িত করা হয়েছে। তখনই সে বলে ছিলো যে, আমার তো সর্বনাশ হয়েই গেল।

কিন্তু আমি তোমার বান্দাহ বনী আদমের মধ্যে থেকে একটা নির্ধারিত বড় অংশ আমার নিজের জন্য গ্রহণ করবো অর্থাৎ তাদেরকে গোমরাহ করে আমার সঙ্গে জাহান্নামে নিয়ে যাবো। সূরা হিজর, সূর বনী ইসরাঈল ইত্যাদি সূরায় এ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়াছে এই যে, দাম্ভিক অহংকারী এবং বিতড়িত হওয়া ছাড়াও শয়তানতো প্রথম দিন থেকেই সকল বণী আদমের কঠোর দুশমন এবং অকল্যাণকামী ছিলো। সে এ দুশমনী স্পষ্ট প্রকাশও করেছিলো। শয়তান সব দিক থেকে খবীস এবং গোমরাহ হলে শুভ কামনায় কাউকে হয়তো কল্যাণ কিছু বিষয় শিখাতেও পারে-শয়তান সম্পর্কে এমন কোন সম্ভাবনেই আর অবশিষ্ট নেই। বরং তার সম্পর্কে এটাই জানা হয়ে গেছে যে, তা করবে তাদেরকে গোমরাহ করার জন্য, তাদের সর্বনাশ করার জন্য। তা হলে এমন গোমরাহ ও অকল্যাণকামীর আনুগত্য করা কত বোকামী অজ্ঞতা হতে পারে, তা নির্দ্দিষ্ট অংশগ্রহণ করার আর এক অর্থ এও হতে পারে যে, তোমার বান্দাহরা অর্থ-সম্পদে আমার জন্য অংশ নির্দিষ্ট করে রাখবে। যেমন মানুষ জিনভূত-মূর্তি ইত্যাদি গয়রুল্লাহর জন্য নযর-নিয়ায করে থাকে।

১৭৬. অর্থাৎ যারা আমার কথায় আসবে, তাদেরকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করবো। এবং তাদেরকে দুনিয়ার জীবন এবং কেয়ামতের হিসাব কিতাব ইত্যাদি পরকালীন বিষয় সংঘটিত হবেনা বলে লোভ দেখাবো। আমি তাদেরকে এটাও শিক্ষা দিবো, যাতে তারা জন্তুর কান ছেঁদা করে দেবতার নামে তাকে উৎসর্গ করে। এর ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি করা সূরত-আকৃতি এবং তাঁর নির্ধারিত বিষয়ে পরিবর্তন সাধন করবে। কাফেরদের নিয়ম ছিলো তারা গাভী-বকরী-উট ইত্যাদির বাচ্চা দেবতার নামে উৎসর্গ করতো এবং এগুলোর কান ছেঁদা করে চিহ্ন দিয়ে ছেড়ে দিতো, আর সূরত আকৃতি পরিবর্তন করার অর্থ হচ্ছে যেমন খোজ হিজড়া করে দেয়া বা দেহে সুঁচবিদ্ধ করে তিল বানানো, নীল দাগ দেয়া কারো নামে শিশুর মাথায় টিকি রাখা। এসব কাজ থেকে মুসলমানদের বিরত থাকা উচিৎ। দাঁড়ি মুন্ডন করাও এ সূরত পরিবর্তনের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহর কোন বিধানে রদবদল, পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা বিরাট গুনাহের কাজ। আল্লাহ যা হালাল করেছেন তাকে হারাম করা বা তাঁর হারাম করা জিনিসকে হালাল করাও জঘণ্য পাপ। একাজ মানুষকে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত করে দেয়। যে কেউ এসব কাজে লিপ্ত হয়, তার নিশ্চিত জেনে নেওয়া উচিৎ যে, সে শয়তানের নির্ধারিত সীমায় প্রবেশ করেছে, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭৭. অর্থাৎ যখন শয়তানের খবীসীপনা, তার দুষ্টামী-নষ্টামী এবং দুশমনীর প্রকৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পেরেছে তখন এতে আর কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ে বিন্দু মাত্র অবকাশ নেই যে, সত্য মা'বূদ কে পরিত্যাগ করে যে কেউ শয়তানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করবে, সে নিশ্চিত ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। শয়তানের সকল অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতিই নিছক প্রতারণা প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তার লোভ দেখানোতে কেবলই ফেরেব আর ফাঁকি। ফল হবে এই যে, তাদের সকলেরই ঠিকানা হবে জাহান্নাম, যেখান থেকে বের হওয়ার কোন উপায়ই থাকবেনা।

১৭৮. অর্থাৎ আর যারা শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং আল্লাহর বাণী অনুযায়ী ঈমান এনে ভালো কাজ করেছে, তারা চিরকাল গুলবাগিচায় বসবাস করবে। এটা আল্লাহর ওয়াদা, যার চেয়ে সত্য কথা আর কারো হতে পারেনা। এমন সত্য কথা ছেড়ে শয়তানের মিথ্যা কথায় পড়া কত বড় গোমরাহী এবং কত বড় বিপদ মাথা পেতে নেয়া।

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ

أَهْلِ الْكِتٰبِ ۗ مَنْ يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٥﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا ﴿١٢٦﴾

১২৩. (মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচার যেমন) তোমাদের খেয়াল-খুশীর ওপর নির্ভরশীল নয় (তেমনি তা) আহলে কেতাবদের কামনা-বাসনার ওপরও নয়। (মূল কথা হচ্ছে) যেই কোনো গুনাহের কাজ করবে, তাকেই তার (যথাযথ) প্রতিফল ভোগ করতে হবে। আর এ (পাপী) ব্যক্তিদের (জানা উচিত যে, সেদিন) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকেই নিজেদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না।

১২৪. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করবে, সে নর হোক কিংবা নারী, সে (যদি সত্যিকার অর্থেই) ঈমানদার হয়, তাহলে এ ধরনের লোকেরা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, (পুরস্কার দেয়ার সময়) তাদের ওপর বিন্দুমাত্রও অবিচার করা হবে না[১৭৯]।

১২৫. তার চাইতে উত্তম জীবন-পদ্ধতি আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর (নির্দেশের) সামনে মাথানত করে দেয় এবং একনিষ্ঠভাবে (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই) কাজ করে, তদুপরি একান্ত নিষ্ঠার সাথে ইবরাহীমের আদর্শ মেনে চলে, (কারণ) আল্লাহ্ তায়ালা ইবরাহীমকে স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন[১৮০]।

১২৬. আসমান ও যমীনের (যেখানে) যা কিছু আছে তার সবকিছুই আল্লাহর জন্যে। আর আল্লাহর (মহান ক্ষমতা) সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে[১৮১]।

---

১৭৯. আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী খৃষ্টানরা ধারনা করছে যে, আমরা আল্লাহর খাছ বান্দাহ। যেসব গুনাহর জন্য অন্যদেরকে পাকড়াও করা হবে, সে সবের জন্য আমাদেরকে পাকড়াও করা হবেনা। আমাদের পয়গম্বররা সহায়তা করে আমাদেরকে রক্ষা করবেন। অজ্ঞ মুসলমানরাও নিজেদের সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করতো। এজন্য বলা হয়েছে যে, নাজাত আর সাওয়াব কারো আশা-আকাংখ্যা ধারণা কল্পনার ওপর নির্ভর করেনা, এ সবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা। যে কেউ খারাপ কাজ করবে, সে যে কেউই হোকনা কেন, তাকে পাকড়াও করা হবে। যখন আল্লাহর আযাব আসবে তখন কারো সাহায্য সহায়তা কোন কাজে আসবেনা। আসতে পারেনা। আল্লাহ্ যাকে পাকড়াও করেন, তাকে তিনি ছাড়লে ছাড়তে পাবেন; অন্য কেউ তাকে ছাড়াতে পারেনা। তোমরা একবারের জন্য দুনিয়ার বিপদাপদ এবং রোগ শোকের কথা চিন্তা করে দেখ । যে কেউ নেক আমল করবে অবশ্য শর্ত এই যে, ঈমানও থাকতে হবে। এমন লোকেরা জান্নাতে যাবে। সেখানে নেক কাজের পূর্ন সাওয়াব পাবে। সারকথা এই যে, সাওযাব আর শাস্তির সম্পর্ক আমলের সাথে কেবল আশা-আকাংখ্যায় কিছুই হয়না। সুতরাং এসব আশা-আকাংখ্যায় পদানত করে নেক কাজে সাহস কর।

১৮০. আগেই জানা হয়ে গেছে যে, আল্লাহর কাছে আমলই গ্রহণীয়, অহেতুক আকাংখ্যা কোন ফল নেই। আহলে কিতাব ও অন্য সকলের জন্যই এ একই নিয়ম নির্ধারিত রয়েছে। এতে আহলে ইসলাম অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের প্রসংসা ফযীলত এবং আহলে কিতাবের নিন্দা তিরস্কারের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এখন স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশে মাথা নোয়ায়, মনে প্রাণে নেক কাজে নিয়োজিত হয় এবং সত্য সত্যই হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীন মেনে চলে এমন লোকের মোকাবিলা কে করতে পারে? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সকলকে এবং সব কিছুকে ত্যাগ করে আল্লাহর হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ তাঁকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। স্পষ্ট যে, এ তিনটি গুণই সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান ছিলো, আহলে কিতাবদের মধ্যে নয়। এখন আহলে কিতাবের উপরে উল্লেখিত আকাংখ্যা নিছক গাল গল্পও বাতিল প্রমাণিত হয়েছে।

১৮১. অর্থাৎ আসমান যমীনে যা কিছু আছে, সবই তাঁর সৃষ্টি। তিনি সব কিছুর মালিক, সকলেই তাঁর বান্দাহ্। সব কিছুই তাঁর মুষ্টির মধ্যে রয়েছে। আপন রহ্মত আর হেকমত অনুযায়ী তিনি যার সঙ্গে যেমন ইচ্ছা আচরণ করেন। তার প্রয়োজন নেই কারো। খলীল-বন্ধু বানানোর ফলে কেউ যেন বিভ্রান্ত না হয় এবং সকল বিশ্ববাসীর ভালো মন্দ সকল কাজের শাস্তি ও প্রতিফলের ব্যাপারে কেউ যেন ইতস্ততঃ না করে। সন্দিহান না হয় কেউ যেন।

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۙ وَمَا

يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي

لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ

بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا

بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

রুকু ১৯

১২৭. (হে নবী) তারা তোমার কাছে নারীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানতে চায়, তুমি (তাদের) বলো, আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে তোমাদের পরিষ্কার করে জানিয়ে দিচ্ছেন- আর এই গ্রন্থের মাধ্যমেও তোমাদের কাছে আল্লাহর সে সিদ্ধান্তসমূহ জানিয়ে দেয়া হয়েছে (এবং তা ছিলো) সেই ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে- যাদের ন্যায়-সংগত অধিকার তোমরা আদায় করতে চাও না, অথচ (নিজেদের প্রয়োজনে) তোমরা তাদের বিয়ে (ঠিকই) করতে চাও এবং (সেখানে আরো হুকুম ছিলো) অসহায় শিশু সন্তান সম্পর্কে, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যেন ইয়াতীমদের সাথে তোমরা সুবিচার করো[১৮২]। তোমরা (যেখানেই) যেটুকু সৎ কাজ করো আল্লাহ্ তায়ালা তার সবকিছু সম্পর্কেই সম্যক ভাবে অবহিত রয়েছেন[১৮৩]।

১২৮. কোনো স্ত্রীলোকের যদি তার স্বামীর কাছ থেকে দুর্ব্যবহার কিংবা অবহেলা-অবজ্ঞার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে (সে অবস্থায়) পারস্পরিক (কর্তব্য ও অধিকারের বিধানকে সামনে রেখে তারা কোনো) আপোস-নিষ্পত্তি করে নিলে তাতে কোনো দোষ নেই। কারণ (সর্বাবস্থায়ই) আপোস (ও মীমাংসার পন্থাই) হচ্ছে উত্তম[১৮৪]। (কিন্তু সমস্যা হচ্ছে) মানুষ আপোস (করতে গেলে) লালসার দিকেই বেশী পরিমাণে ধাবিত হয়ে পড়ে[১৮৫]। কিন্তু তোমরা যদি সততার পন্থা অবলম্বন করো এবং (সব কাজেই) শয়তানের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা (করার চেষ্টা) করো, তাহলে (তাই তোমাদের জন্যে ভালো, কারণ) আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের সব কর্মকান্ডই ভালো করে অবলোকন করে থাকেন[১৮৬]।

১২৯. তোমরা কখনো (তোমাদের) একাধিক স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ করতে পারবে না - যদিও তোমরা তা করতে চাইবে (এবং কার্যত, যেহেতু তা সম্ভব নয়) তাই তাদের একজনের দিকে তুমি এমনভাবে ঝুঁকে পড়ো না যে, আরেকজন (অবহেলায়-অবজ্ঞায়) ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে)[১৮৭]। (আসলে কথা হচ্ছে) তোমরা যদি

(ঠিক) তাই করো (যা করা তোমাদের সংশোধনের জন্যে জরুরী) এবং আল্লাহকেও এ ব্যাপারে (পুরোপুরি) ভয় করো, তাহলে তুমি দেখবে, আল্লাহ্ তায়ালা অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু[১৮৮]।

১৩০. (মীমাংসার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলে) যদি (সত্যি সত্যিই) তারা (একদিন) একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ্ তার অপরিমিত দানের ভান্ডার থেকে দান করে তাদের উভয়কেই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতা থেকে রেহাই দেবেন। আল্লাহ্ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও প্রজ্ঞাময়[১৮৯]।

---

১৮২. সূরার শুরুতে এতীমদেঁর হক আদায় করার জন্য তাকীদ করে বলা হয়েছিলো যে, এতীম কন্যার অভিভাবক যদি নিশ্চিত হয় যে, আমি তার পূর্ণ হক আদায় করতে সক্ষম হবো না, তবে সে নিজে এ এতীম কন্যাকে বিবাহ না করে বরং অন্যত্র বিবাহ দিবে এবং নিজে তার সাহায্যকারী হিসাবে থাকবে। এতে মুসলমানরা এমন কন্যাকে বিবাহ করা মওকুফ করে বসে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, অভিভাবক তাকে বিবাহ করাই তার পক্ষে উত্তম। অভিভাবক মনে করে যতটা লক্ষ্য রাখবে, অন্যলোক ততটা রাখবেনা। অতঃপর মুসলমানরা মহানবী (দঃ) এর কাছে এতীম বালিকাকে বিবাহ্ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। এ উপলক্ষে আয়াতটি নাযিল হয়। তখন মুসলমানদেরকে অনুমতি দেষা হয়। এতে বলা হয় যে, আগে যে তাদেরকে বিবাহ্ করতে নিষেধ করা হয়েছিলো, তা করা হয়েছিলো একটা বিশেষ অবস্থায়, যখন তোমরা তাদের হক পূরাপূরি আদায় করতোনা। এখানে এতীমের হক আদায় করারও তাকীদ করা হয়। এতীমদের সঙ্গে সদাচার এবং তাদের মঙ্গল বিধানের জন্য এমন বিবাহ করা হলে তার অনুমতি রয়েছে। আরবরা নারী-শিশু এবং এতীমদেরকে কোন কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত করতো। তাদেরকে মীরাস দিতোনা এবং বলতো যে, মীরাসতো তাদের হক, যারা দুশমনের সাথে লড়াই করে। এতীম কন্যাদের অভিভাবকরা তাদেরকে বিবাহ করে খোরপোশ এবং মোহরানা কম দিতো এবং তাদের সম্পদে অনধিকার হস্তক্ষেপ করতো, সূরার শুরুতে এসব বিষয়ে অনেক তাকীদের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কয়েক রুকূ পূর্ব থেকে যে কথা বলা চলে আসছে, তার সার কথা এই যে, আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলাই হচ্ছে ওয়াজেব। কারো জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ম-নীতি, কারো হুকুম আশা-আকাংখ্যা এবং ধারণা কল্পনার কোনই মূল্য নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালার হুকুমের সামনে অন্য কারো হুকুম শুনা এবং আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে অন্যের হুকুম অনুযায়ী কাজ করা কুফরী এবং গোমরাহী। এই বিষয়টি নানা প্রকার তাৎপর্য পূর্ণ তাকীদ সহকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এখন এরও পর সাবেক আয়াতের উল্লেখ করে নারী এবং এতীম কন্যাদের বিবাহ সংক্রান্ত আরও কিছু বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে এত সব তাকীদের পর নারীদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে কারো কোন কথা অবশিষ্ট না থাকে। বর্নীত আছে যে,নারীদের সম্পর্কে মহানবী

(দঃ) মীরাসের হুকুম ব্যক্ত করলে আরবের কোন কোন সর্দার তাঁর খেদমত এসে হাযির হয়ে অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেঃ আমরা জানতে পারলাম যে, আপনি বোন এবং কন্যাকেও মীরাসে অংশ দেন। অথচঃ মীরাসতো তাদের হক, যারা দুশমনের সঙ্গে লড়াই করেন গনীমতের মাল নিয়ে আসে। মহানবী (সঃ) বললো, নিঃসন্দেহে এটাই আল্লাহর বিধান তাদেরকে মীরাস দিতে হবে। এতে এ দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী সাহাবায়ে কেরাম এ আয়াতের মানদন্ডে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁরা বিবাহ মোহরানা খোরপোশ ইত্যাদি ব্যাপার অধীনস্থদের সামান্য অধিকার হরণকেও বৈধ মনে করতেন না। আল্লাহর নির্দেশের মুকাবিলায় নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ এবং স্বজাতির রসম রেওয়াজের বিন্দু মাত্র পরোওয়াও করতেন না। আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচারণের সম্ভাবনা থেকেও তারা দূরে থাকতেন। তারা যা করতেন, স্পষ্ট অনুমতি নেয়ার পরই করতেন।

১৮৩. অর্থাৎ তোমাদের সামান্যতম মঙ্গল সম্পর্কেও আল্লাহ তা'য়ালা জানেন। সুতরাং এতীম এবং নারীদের ব্যাপারে যা কিছু মঙ্গল করবে, অবশ্যই তার সাওয়াব পাবে।

১৮৪. অর্থাৎ কোন নারী যদি দেখে যে, তার প্রতি স্বামীর মন নেই, তাকে সন্তুষ্ট আকৃষ্ট করার জন্য মোহরানা খোরপোশ ইত্যাদি থেকে কিছু অংশ ত্যাগ করে তাকে রাযী করায়ে নেয়, তবে এ সমঝোতার জন্য কারো কোন গুনাহ হবেনা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা-মিলমিশ অত্যন্ত ভালো কাজ। অবশ্য অকারণে নারীকে উত্যক্ত করা এবং সন্তুষ্টি ছাড়াই তার সম্পদে হস্তক্ষেপ করা নিঃসন্দেহে গুনাহের কাজ।

১৮৫. অর্থাৎ নারীদের সাথে যদি সদাচার কর এবং অসদাচার ও লড়াই-ঝগড়া থেকে বিরত থাক। তবে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের সকল বিষয় সম্পর্কে খবর রাখেন। তিনি অবশ্যই তোমাদের এ নেকীর সাওয়াব দেবেন। এটা জানা কথা যে, এ অবস্থায় মুখ ফিরায়ে নেয়া এবং অসন্তুষ্টির সুযোগ হবেনা, রাযী করানো বা নিজের কোন হক ছেড়ে দেয়ারও প্রয়োজন পড়বেন।

১৮৬. অর্থাৎ কয়েকজন নারী যদি বিবাহে থাকে তবে মনের ভালোবাসা এবং প্রতিটি বিষয়ে পুরাপুরি সমতা বজায় রাখাতো তোমাদের দ্বারা হবেনা, তাই বলে এমন যুলুমও করবেনা, যাতে এক জনের দিকে সম্পূর্ণ ঝুকে পড়বে এবং অন্য জনকে মধ্যখানে ঝুলায়ে রাখবে। নিজেও শান্তিতে রাখবেনা আর অন্যের সঙ্গে যাতে বিবাহ হতে পারে সে সুযোগ দিয়ে-সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও করে দিবেনা।

১৮৭. অর্থাৎ যদি সংশোধন ও সমঝোতার আচরণ কর এবং সীমা লংঘন বাড়াবাড়ি ও অধিকার হরন থেকে যথা সম্ভব বিরত থাক তবে এরপর আল্লাহ ক্ষমাশীল।

১৮৮. অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী যদি বিচ্ছিন্ন হওয়াকেই পসন্দ করে এবং তালাকেরও সুযোগ ঘটে, তবে কোন দোষ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেকের কার্য সম্পাদনকারী। তিনি প্রত্যেকের অভাব পূরণকারী। এতে এদিকে ইঙ্গিতে রয়েছে যে, স্ত্রীকে আরামে রাখবে, কষ্ট দেবেনা। এতে সক্ষম না হলে তবে তালাক দেয়াই সমীচীন।

১৮৯. আলোচনা চলে আসছে। আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করা এবং তার বিরুদ্ধাচারণ থেকে বিরত থাকা সম্পর্কে। আল্লাহর নির্দেশের সামনে কারো কথায় কর্ণপাত করা কিছুতেই জায়েয নেই। মধ্যখানে এতীম এবং নারীদের সম্পর্কে কতিপয় বিধান বর্ণনা করে পুনরায় সে প্রসঙ্গ শুরু করা হয়েছে। এ দু'টি আয়াতের সার কথা এই যে, তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সকলকেই এই হুকুম শুনান হয়েছে যে, আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে চলবে এবং তাঁর নাফরমানী করবেনা। এখন এ হুকুম মানলে আল্লাহ সব কিছুর মালিক। তিনি কারো পরোওয়া করেন না। অর্থাৎ সে নিজেরই ক্ষতি করবে, তাঁর কোন ক্ষতি নেই। আর তাঁর আদেশ মেনে চলবে। জেনে রাখ, তিনিই সব কিছুই মালিক। তোমাদের এ কথাটি তিনবার বলা হয়েছে। প্রথম বারের লক্ষ্য প্রশস্ততা-বিস্তীর্ণতা। অর্থাৎ তাঁর কাছে কোন জিনিসেরই কমতি নেই, অভাব নেই। দ্বিতীয় দফা দ্বারা তিনি যে বি-নেয়ায়, বেপরোওয়া তা বলাই হচ্ছে লক্ষ্য। অর্থাৎ তিনি কারো পরোওয়া করেন না। তোমরা তাঁকে অস্বীকার করলে তাঁতে তাঁর কিছুই যায় আসে না। তৃতীয় দফা দ্বারা তাঁর রহমত এবং কার্যকারীতা প্রকাশ করা হয়েছে। অবশ্য এজন্য শর্ত হচ্ছে তোমাদের তাকওয়া।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ

اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٢﴾ اِنْ يَّشَاْ

يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰي

ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿١٣٣﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ

ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٤﴾

১৩১. এবং এই আসমান-যমীনের (যেখানে) যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ তায়ালার জন্য। তোমাদের আগেও যাদের কাছে কেতাব নাযিল করা হয়েছিল, তাদের আমি অবশ্যই এই নির্দেশ দিয়েছিলাম, যেন তারা আল্লাহকে ভয় করে, এই নির্দেশ (আজ পুনরায় আমি) তোমাদেরও দিচ্ছি। আর যদি তোমরা (আল্লাহকে ভয় করতে) অস্বীকার করো (তাতে তার সার্বভৌমত্বের কিছুই ক্ষতি হবে না, কারণ) এই আকাশ-পাতালের (যেখানে) যা কিছু আছে সব কিছুই তো তাঁর (মালিকানা স্বীকার করে, এ ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন- সব প্রশংসা একচ্ছত্রভাবে তাঁরই প্রাপ্য।

১৩২. নিশ্চয়ই আসমান-যমীনের সব কয়টি জিনিসের একক মালিকানা তাঁর। অতএব, এর যাবতীয় কর্ম সম্পাদনে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট[১৯০]।

১৩৩. হে মানুষ, এই মহান শক্তিধর আল্লাহ তায়ালা চাইলে যে কোনো সময় এই যমীনের কর্তৃত্ব ও বাহাদুরী থেকে তিনি তোমাদের অপসারণ করে, তার জায়গায় অন্য কোন (অনুগত) সম্প্রদায়কে এনে বসিয়ে দিতে পারেন, এই কাজ করার পূর্ণ ক্ষমতা তাঁর রয়েছে[১৯১]।

১৩৪. তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই দুনিয়াতেই পুরস্কার পেতে চায় (তার জেনে রাখা উচিত যে) আল্লাহর কাছে তো ইহকাল পরকাল এ উভয়কালের পুরস্কারই রয়েছে[১৯২]। (শুধু নির্বোধের মতো তোমরা ইহকালের পুরস্কারটুকুই কামনা করবে কেন? আল্লাহ তায়ালা তো সব কিছুই শুনে এবং সব কিছুই দেখেন[১৯৩]।

---

১৯০. অর্থাৎ তোমাদের বিনাস সাধন করতঃ ধরা পৃষ্ঠ থেকে তুলে নিয়ে অন্য অনুগত লোক সৃষ্টি করতে আল্লাহ তা'য়ালা পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। এতেও আল্লাহ তা'য়ালা যে বে-নেয়ায, তিনি যে কারো মুখাপেক্ষী নন, একথা ভালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে আর নাফরমানদের জন্য এতে রয়েছে পূর্ণ-ভীতি।

১৯১. অর্থাৎ তার আনুগত্য করলে তোমাদেরকে দুনিয়াতেও দেবেন, আখেরাতেও। এর পরও কেবল দুনিয়ার পেছনে পড়া এবং তাঁর নাফরমানী করে আখেরাত থেকে মাহরূম থাকা বড় অজ্ঞতা।

১৯২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের সব কাজ দেখেন, সব কথা শুনেন। যা তালাশ করবে, তা-ই পাবে।

১৯৩. অর্থাৎ সাক্ষ্য দিতে হবে সত্য এবং আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী-যদি এতে তোমাদের নিজেদের বা তোমাদের কোন প্রিয়জন-নিকটাত্নীয়ের ক্ষতিও হয়। যা সত্য তা স্পষ্ট প্রকাশ করা উচিৎ। দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য আখেরাতের ক্ষতি করবেনা।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ
وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ
غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى
اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿১৩৫﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ
اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ
وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿১৩৬﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا
كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿১৩৭﴾ بَشِّرِ
الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ﴿১৩৮﴾ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ
الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ
الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿১৩৯﴾

রুকু ২০

১৩৫. হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছো (বিচার ফয়সালা করার সময়) তোমরা (সর্বদাই) ইনসাফের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকো এবং আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে সত্যের সাক্ষী হিসেবে নিজেকে পেশ করো, যদিও (সত্যের জন্যে সাক্ষ্য প্রদানের) এই কাজটি তোমার নিজের, নিজের পিতামাতার কিংবা নিজের আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও যায়[১৯৪]। (সাক্ষ্য প্রদানের সময়) সে ব্যক্তি ধনী হোক কিংবা গরীব (এটা কখনো দেখবে না তুমি বরং খেয়াল রাখবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে) তাদের উভয়ের চাইতে আল্লাহর অধিকার অনেক বেশী। অতএব (এ জটিল ব্যাপারে) কখনো নিজের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না এবং (সর্বদাই) ন্যায়বিচার করো[১৯৫]। আর যদি কখনো তোমরা পেঁচানো কথা বলে মূল সাক্ষ্যকে বিনষ্ট করো কিংবা ইচ্ছাকৃত সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকো, তাহলে (জেনে রাখবে) তোমরা যা কিছুই করো না কেন, আল্লাহ্ তায়ালা তার যথার্থ খবর রাখেন[১৯৬]।

১৩৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা (যথার্থ ভাবে) ঈমান আনো আল্লাহর ওপর, তাঁর রসূলের ওপর, সে কেতাবের ওপর যা আল্লাহ্ তাঁর রসূলের ওপর নাযিল করেছেন এবং সে সব কেতাবের প্রতি যা ইতিপূর্বে (তিনি অন্যান্য রসূলের ওপর) নাযিল করেছেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালাকে অস্বীকার করলো, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর (পাঠানো) কেতাবসমূহ ও তার নবী রসূল (সঃ) সর্বোপরি পরকালের আগমনকে অস্বীকার করলো (বুঝতে হবে) সে সত্যিই ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে[১৯৭]।

১৩৭. আর যারা একবার ঈমান আনলো, আবার কুফরী করলো, কয়দিন পর আবার ঈমান আনলো এরপর (সুযোগ বুঝে) আবার কাফের হয়ে গেলো- এরপর এই কুফরীর পরিমাণকে তারা (দিনে দিনে) বাড়িয়ে দিলো- আল্লাহ্ তায়ালা (ঈমান নিয়ে তামাশা করার) এই লোকদের কখনো ক্ষমা করেন না- না কখনো তিনি এই (হতভাগ্য) ব্যক্তিদের সঠিক পথ দেখাবেন[১৯৮]।

১৩৮. (এই চরিত্রের) মোনাফেক ব্যক্তিদের তুমি সুসংবাদ (?) দাও যে, তাদের জন্যে রয়েছে এক কঠিন ভয়াবহ আযাব।

১৩৯. যারা (দুনিয়ার ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে) ঈমানদারদের বদলে কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা (এদের বন্ধু বানিয়ে সত্যিই কি) এদের কাছ থেকে কোনো রকম মান-সম্মানের প্রত্যাশা করে? অথচ (এদের জানা উচিত) সবটুকু মান-সম্মান একান্তভাবে আল্লাহ্ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট এবং তিনি না চাইলে কেউ কাউকে সম্মান দিতে পারবে না)[১৯৯]।

১৯৪. অর্থাৎ সাক্ষ্যদানে নিজের কোন নাফরমানী খাহেশের অনুস্মরণ করবে না। অর্থাৎ বিত্তশালী ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাত করে অথবা কোন অভাবীর প্রতি দয়া পরবশ হয়ে সত্যকে বিসর্জন দেবেন। যা সত্য, তাই বলবে। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের চেয়েও তাদের বেশী শুভাকাংখ্যী এবং তাদের অবস্থা কারণ সম্পর্কে বেশী ওয়াকেবহাল। তাঁর কাছে কি কোন জিনিষের কমতি আছে।

১৯৫. মুখ পেঁচানো অর্থাৎ পেঁচানো কথা বলা। অর্থাৎ সত্য কথাতো বলেছ ঠিক, কিন্তু মুখ দাবায়ে এবং খাটায়ে, যাতে শ্রোতা সন্দেহে পতিত হয়ে যায়। অর্থাৎ কোন এ্যাচ-প্যাঁচ না করে স্পষ্ট কথা বলবে। আর পাশ কাঁটায়ে যাওয়ার অর্থ পূরা কথা না বলা। কিছু কাজের কথা বাকী রেখে দেয়া। এ দু'টি অবস্থায় মিথ্যা বলা না হলেও সত্য কথা সুস্পষ্ট করে প্রকাশ না করার জন্য গুনাহগার হবে। সাক্ষ্য দিতে হবে সত্য-স্পষ্ট এবং পরিপূর্ণ।

১৯৬. অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে, তাকে অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালার সমস্ত হুকুম মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে। তাঁর বাণীর কোন একটিও যদি পূর্ণরূপে বিশ্বাস না করে, তবে সে ব্যক্তি মুসলমানই নয়। কেবল বাহ্যিক এবং মৌখিক কথার কোন মূল্য নেই, গুরুত্ব নেই।

১৯৭. অর্থাৎ বাহ্যিক দিক থেকে তো মুসলমান ছিলো, কিন্তু অন্তর ছিলো কখনো এ দিকে, কখনো ঐ দিকে। অবশেষে বিশ্বাস না করেই মৃত্যু বরণ করেছে। এমন লোক নাজাতের কোন পথ পাবেনা। সে তো কাফের। বাহ্যিক মুসলমানিত্ব কোন কাজেই আসবেনা। এর অর্থ মোনাফেক। আর কেউ কেউ বলেন, আয়াত ইহুদীদের প্রসঙ্গেঁ নাযিল হয়েছে। তারা আগে ঈমান এনেছিলো । পরে গো- বাছুরের পূজা করে কাফের হয়েছে। আবার তওবা করে মুমেন হয়েছে। পনুরায় ঈসা (আঃ) কে অস্বীকার করে কাফের হয়েছে। এরপর মহানবী (সঃ)-এর রেসালত অস্বীকার করে কুফরীতে আরও তরক্কী করেছে।

১৯৮. অর্থাৎ মোনাফেক লোকেরা, যারা মুসলমানদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। কাফেরদের কাছে বসে আমরা দুনিয়ার ইজ্জত লাভ করবো - তাদের এ ধারনা ভুল। সব ইজ্জত আল্লাহর জন্য যে আল্লাহকে মানবে তার আনুগত্য করবে সে ইজ্জত পাবে। সার কথা এ যে, এমন লোকেরা দুনিয়ার আখেরাত সর্বত্রই লাঞ্ছিত-অপমানিত হবে।

১৯৯. অর্থাৎ হে মুসলমানরা আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজীদে আগেই তোমাদের প্রতি হুকুম করেছেন, যে মজলিসে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করা হয়, তা নিয়ে উপহাস করা হয়, তোমরা কখনো এমন মজলিশে বসবে না। বসলে তোমাদেরকেও তেমন মনে করা হবে। অবশ্য যখন অন্য কথাবার্তায় মশগুল হয় তখন তাদের সাথে বসা নিষিদ্ধ নয়।

মোশফেকদের মজলিসে আল্লাহর আয়াত ও বিধান নিয়ে উপহাস চলতো। এ প্রসঙ্গেঁ এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে এ দ্বারা ইতিপূর্বে নাযিলকৃত আয়াত এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ আয়াত্ত থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি কোন মজলিশে বসে আপন দ্বীনের তিরস্কারও নিন্দা বাক্য শ্রবণ করে এরপরও সে উক্ত মজলিসে বসে কাঁটায় যদিও সে নিজে কিছু বলেনা, সে ব্যক্তি মুনাফেক।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي

الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا

فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ۖ

اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ

فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ﴿١٤٠﴾ الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ

لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ

لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ

مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ﴿١٤١﴾

---

১৪০. আল্লাহ তায়ালা (ইতিপূর্বেও) এই কিতাবের মাধ্যমে তোমাদের ওপর এই আদেশ নাযিল করেছিলেন যে, যখনি তোমরা দেখবে (কাফেরদের কোনো বৈঠকে) আল্লাহ তায়ালার নাযিল করা কোনো আয়াতকে অস্বকার করা হচ্ছে এবং তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তোমরা তাদের সাথে (এমন কোনো মজলিসে) বসো না- যতোক্ষণ না তারা অন্য কোনো আলোচনায় লিপ্ত হয়। তোমরাও যদি

তাদের সাথে (একই বিদ্রুপাত্মক আলোচনার বৈঠকে) শামিল হয়ে পড়ো, তাহলে তোমরাও তো তাদের মতো হয়ে গেলে! (জেনে রেখো) আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই (একদিন এই দুনিয়ার) সব কাফের ও মোনাফেকদের (কঠিন শাস্তির জায়গা) জাহান্নামে একত্রিত করে ছাড়বেন২০০।

১৪১. (এই মোনাফেকদের চরিত্র হচ্ছে) এরা সব সময়ই তোমাদের শুভ দিনের প্রতীক্ষায় থাকে, যদি আল্লাহর অনুগ্রহে তোমাদের বিজয় আসে, তখন এরা (তোমাদের কাছে এসে) বলবে, কেন, আমরা কি (এ যুদ্ধে) তোমাদের পক্ষে ছিলাম না? আবার যদি কাফেরদের কপাল ভালো হয়, তাহলে এরা (তাদের কাছে গিয়ে বলবে) আমরা কি তোমাদের তুলনায় বেশী শক্তিশালী ছিলাম না? এবং (এই শক্তি বলেই) কি আমরা তোমাদের মুসলমানদের কাছ থেকে রক্ষা করিনি২০১? (এমতাবস্থায় একমাত্র) শেষ বিচারের দিনেই আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের উভয়ের মাঝে (তাঁর নিজস্ব) ফয়সালা শুনিয়ে দেবেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা (সেদিন) মুমিনদের বিরুদ্ধে এই কাফেরদের কোনো (অজুহাত পেশ করার) পথ অবশিষ্ট রাখবেন না২০২।

---

২০০. অর্থাৎ এ মোনাফেক হচ্ছে তারা যারা নিয়মিত তোমাদের প্রতীক্ষায় লেগে থাকে। তোমাদের বিজয় দেখে বলে আমরা কি তোমাদের সঙ্গী নই? গণীমতের মেলে আমাদেরকেও শরীক কর। আর কাফেররা যদি যুদ্ধে কোন অংশ পায় অর্থাৎ তারা বিজয়া হয় তখন তাদেরকে বলে আমরা কি তোমাদেরকে পরিবেষ্টন করে ছিলামনা ,তোমাদের কি আমরা হেফাযত করিনি ? আমরা কি তোমাদেরকে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করিনি ? সম্পদে আমাদেরকেও অংশ দাও।

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, সত্য দ্বীনে থেকে গোমরাহদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাও এক ধরণের মোনাফেকী।

২০১. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এবং তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন ফলে তোমাদেরকে জান্নাত দান করবেন, আর তাদেরকে নিক্ষেপ করবেন জাহান্নামে। দুনিয়ায় তারা যা পারে, করে দেখাক। কিন্তু সত্যিকার ঈমানদারদেরকে মূল হতে উপড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হবেনা কখনো। অবশ্য তারা এটাই মনে প্রাণে কামনা করে।

২০২. অর্থাৎ মনের দিক থেকে কাফের এবং প্রকাশ্যে মুসলমান, যাতে উভয় পক্ষের ক্ষতি থেকে রক্ষা পায় আর দু' দিকেরই মজা লুটতে পারে। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের এ প্রতারণার শাস্তি দিয়েছেন। তাদের সমস্ত দুষ্টামী-নষ্টামী এবং গোপন ষড়যন্ত্র নবীর কাছে প্রকাশ করে তাদেরকে এতটা লাঞ্ছিত করেছেন যে, তারা আর কোন কিছুর যোগ্যই

থাকেনি। তাদের সমস্ত প্রতারণা মুসলমানদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আর এজন্য আখেরাতে যে শাস্তি দেয়া হবে, তাও প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের সার কথা এই যে, তাদের প্রতারণায় কিছুই হয়নি বরং আল্লাহ্ তাদেরকে এখন প্রতারণায় ফেলেছেন যে, তাদের দুনিয়া আখেরাত উভয়ই বরবাদ হয়েছে।

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا
قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ
وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (১৪২) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ ق
لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (১৪৩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ
أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (১৪৪) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ
فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (১৪৫)
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا
دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ
اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (১৪৬)

রুকু ২১

১৪২. এই মোনাফেকরা (সত্যি সত্যিই) আল্লাহ্ তায়ালাকে প্রতারিত করতে চায়, মূলত (তাদের এই হীন আচরণের ফলে) আল্লাহ্ তায়ালাই তাদের প্রতারণার (ফাঁদে) ফেলে দিচ্ছেন[২০৩]। (এই মোনাফেকদের চরিত্র হচ্ছে) এরা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন একান্ত আলস্যভরেই দাঁড়ায়, আর তাও কেবল (কোনো রকম) লোকদের দেখানোর জন্যেই। (এ ধরনের নামায দিয়ে) এরা আল্লাহ্ তায়ালাকে খুব কমই স্মরণ করে[২০৪]।

১৪৩. এরা (কুফরী ও ঈমানের) এই দোটানায় দোদুল্যমান- এরা না এদিকে না ওদিকে- তুমি সে ব্যক্তিকে কখনো সঠিক পথ দেখাতে পারবে না, যাকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই গোমরাহ্ করে দেন[২০৫]।

১৪৪. হে (আমার) ঈমানদার বান্দারা, তোমরা (কখনো) ঈমানদার ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে কাফেরদের নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি (এ কাজের মাধ্যমে) আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে (শাস্তিমূলক পন্থা গ্রহণের জন্যে) সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে দিতে চাও?

১৪৫. (অথচ তোমরা জানো যে) এই (কাফের ও) মোনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। (আর এই ফয়সালা হয়ে যাওয়ার পর সেদিন) তুমি তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্যে কাউকেও খুঁজে পাবে না[২০৬]।

১৪৬. তবে তাদের কথা অবশ্যই আলাদা, যারা (এই মোনাফেকী থেকে) তওবা করে এবং (সে মতে নিজেদের পরবর্তী জীবনের) সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ্র রশিকে শক্ত করে ধরে রাখে এবং একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে স্বীয় জীবন বিধানকে একনিষ্ঠ করে নেবে। এসব লোকেরা অবশ্যই সেদিন আল্লাহ্র বিশ্বাসী বান্দাহদের সাথে (অবস্থান) করবে, আর অচিরেই আল্লাহ্ তায়ালা তার ঈমানদার বান্দাহদের এক বড়ো ধরনের পুরস্কার দেবেন[২০৭]।

---

২০৩. অর্থাৎ নামাযের মতো নেহায়ত জরুরী এবং খালেছ ইবাদাত, যা আদায় করতে দৈহিক বা আর্থিক কোন ক্ষতি হয়না, মোনাফেকরা এ নামায় আদায় করতেও কুণ্ঠিত হয়। বাধ্য হয়ে মানুষকে দেখাবার এবং ধোকা দেওয়ার জন্য পড়ে নেয়। যাতে তাদের কুফরী সম্পর্কে কেউ জানতে না পারে এবং তাদেরকে মুসলমান বলেই মনে করে। অতঃপর এদের দ্বারা আর কি আশা করা যেতে পারে, কি করে এরা হতে পারে মুসলমান!

২০৪. অর্থাৎ মোনাফেকরা এক চরম অস্থির অবস্থায় নিপতিত। ইসলাম আর কুফর কোনোটাতেই তাদের শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, স্বততঃ অস্থির চঞ্চল। কখনো এ দিকে

ঝুঁকে, আবার কখনো ওদিকে। আল্লাহ যাকে গোমরাহ বিভ্রান্ত করতে চান সে কি করে মুক্তির পথ পাবে ?

২০৫. অর্থাৎ মুসলমানদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদের সঙ্গে-বন্ধুত্ব করাই হচ্ছে মোনাফেকীর প্রমাণ। মোনাফেকরা এটাই করে। সুতরাং তোমরা মুসলমানরা কখনো এরকম করবেনা। তোমরাও এরকম করলে মহান আল্লাহর স্পষ্ট যা পূর্ণ দলীল প্রমাণ তোমাদের বিরুদ্ধে যাবে। এতে তোমরাও মোনাফেক বলে চিহ্নিত ও চিত্রিত হবে। আর মোনাফেকদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর। সেখান থেকে তাদেরকে বের করার এবং আযাব কিছুটা হ্রাস করতে সাহায্য করার জন্য তাদের কোন সাহায্যকারীই থাকবেনা। এমন কাজ হতে মুসলমানদের দূরে থাকা উচিৎ।

২০৬. অর্থাৎ যে মোনাফেক নেফাক থেকে তওবা করে নিজের আমলের সংশোধন করে নেয়, আল্লাহর পছন্দ করা দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরে, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতঃ রিয়া লোক দেখানো ইত্যাদি দোষ ত্রুটি থেকে দ্বীনকে মুক্ত-পরিচ্ছন্ন রাখে, সে তো খালেছ মুসলমান। দ্বীন-দুনিয়ায় ঈমানদারদের সঙ্গেই থাকবে। আর ঈমানদাররা লাভ করবে বিরাট সাওয়াব। যারা মুনাফেকী থেকে সত্য সত্যই তাওবা করেছে, ঈমানদারদের সঙ্গে তারাও এ সাওয়াব পাবে।

২০৭. অর্থাৎ আল্লাহ নেক কাজের কদর করেন এবং বান্দাহদের সকল বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন। সুতরাং যে ব্যক্তি শুকরিয়া-কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর হুকুম মেনে নেয় এবং তাতে দৃঢ়বিশ্বাসও পোষণ করে তবে আল্লাহতো সুবিচারক দয়াবান। এমন লোকদেরকে আযাব দেয়ার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ এমন ব্যক্তিকে তিনি কখনো শাস্তি দেবেন না। তিনি তো আযাব দেবেন কেবল ঔদ্ধত্যপরায়ণ দাম্ভিক নাফরমানদেরকেই।

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ

إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ

وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ

أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥٢﴾

১৪৭. (তোমরাই বলো) আল্লাহ কেন (খামাখা) তোমাদের শাস্তি দেবেন যদি তোমরা তাঁর (সব কয়টি দানের) কৃতজ্ঞতা আদায় করো এবং তার (বিধি বিধানের) ওপর ঈমান এনে থাকো। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা (সর্বোচ্চ) পুরস্কারদাতা ও সর্ববিষয়ে সম্যক ওয়াকেবহাল২০৮।

১৪৮, আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্যভাবে মন্দ কথা বলাকে কখনো পছন্দ করেন না, তবে সে ব্যক্তির (যার ওপর সত্যি সত্যিই) অবিচার করা হয়েছে তার কথা আলাদা। কে তার ওপর কি পরিমাণ অবিচার করলো এবং এর জবাবে সে কতোটুকু খারাপ কথা বললো) আল্লাহ তায়ালা (তার সব কিছু) ভালোভাবেই শুনেন এবং জানেন২০৯।

১৪৯. ভালো কাজ তোমরা প্রকাশ্যে করো কিংবা গোপনে করো- অথবা (তোমাদের ওপর যে খারাপ আচরণ করা হয়েছে তা) যদি তোমরা ক্ষমা করে দাও, তাহলে (তোমরাও দেখতে পাবে যে) আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষমাশীল ও প্রচন্ড শক্তিমান২১০।

১৫০. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্ ও রসূলের মাঝে এই বলে একটা পার্থক্য-রেখা আঁকতে চায় যে, আমরা রসূলদের কয়েকজনকে স্বীকার করি এবং আবার কয়েকজন রসূলকে অস্বীকার করি এবং (এই কথা বলে) এরা (নিজেদের সুবিধার জন্যে) একটা মাঝামাঝি রাস্তা বের করে নিতে চায়।

১৫১. আসলে এরাই হচ্ছে আসল কাফের। আর আমি এই (জাতের) কাফেরদের জন্যেই নির্দিষ্ট করে রেখেছি এক চরম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি[২১১]।

১৫২. (অপরদিকে) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনে এবং তাঁর পাঠানো নবী-রসূলদের একজনের সাথে আরেকজনের কোনো রকম পার্থক্য করে না, তিনি অচিরেই এদের পুরস্কার দান করেন না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও মহাদয়ালু[২১২]।

---

২০৮. অর্থাৎ কারো মধ্যে দ্বীন বা দুনিয়ার কোন দোষ থাকলে তা প্রকাশ করা উচিৎ নয়। আল্লাহ তায়ালা সকলের কথা শুনেন এবং সকলের কাজ সম্পর্কে জানেন। সকলকে তদনুযায়ী শাস্তি দেবেন। কারো অনুপুস্থিতিতে তার দোষ, ত্রুটি সম্পর্কে কিছু বলাকে ইসলামী পরিভাষায় গীবত বলা হয়। কিন্তু মযলুমের জন্য গীবত করার অনুমতি রয়েছে। সে যালেমের যুলুম সম্পর্কে মানুষের কাছে বলতে পারে। এমন আরও অনেক ক্ষেত্রেই গীবত জায়েয। এখানে এ বিধানের উল্লেখ করা হয়েছে সম্ভবতঃ এজন্য যে, কোন মোনাফেকের নাম উল্লেখ করে মশহুর করা মুসলমানদের উচিৎ নয়। প্রকাশ্যে তার বদনাম করা ঠিক নয়। এতে হয়তো সে বিগড়ে গিয়ে আরও বেপরোওয়া হয়ে উঠতে পারে। বরং মুসলমানের উচিৎ হচ্ছে নাম উল্লেখ না করে নছিহত করা। এমনিভাবে নছিহত করলে মোনাফেক নিজেই বুঝে নেবে এবং হয়তো হেদায়াত কবুলও করবে। মহানবী (সঃ) ও এমনই করতেন। কারো নাম উল্লেখ করতেন না।

২০৯. এ আয়াতে মযলুমকে ক্ষমার জন্য উদ্বুদ্ধ করাই উদ্দেশ্য। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা অসীম কুদরতের অধিকারী মহাপরাক্রমশালী হয়েও অপরাধীদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। বান্দাহ তো তার তুলনায় অক্ষম। তাদেরতো অপরাধীর অপরাধ আরও বেশী ক্ষমা করা উচিৎ। সার কথা এ যে, যালেমের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা মযলুমের জন্য জায়েয। কিন্তু ধৈর্য ধারণ করে ক্ষমা করে দেয়া উত্তম। আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মোনাফেকদের সংশোধন চাইলে তাদের দুষ্টামী-নষ্টামী ও কষ্ট দানে ধৈর্য ধারণ করবে, কোমলভাবে আড়ালে তাদেরকে বুঝাবে। প্রকাশ্যে তিরস্কার নিন্দাবাদ থেকে বিরত থাকবে। তাদেরকে স্পষ্ট বিরোধিতাকারীতে পরিণত করবে না।

২১০. এখান থেকে ইহুদীদের প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে। ইহুদীদের মধ্যে মোনাফেকীর মাত্রা ছিলো বেশী। মহানবী (দঃ)-এর যমানায় ইহুদীরাই ছিলো মোনাফেক, অথবা

তাদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্ক রাখতো, তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতো। এ কারণে কোরআন মজীদে অধিকন্তু ইহুদী এবং মোনাফেক এ দুটি ফের্কা সম্পর্কে একই সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতের সার কথা এই যে, যারা আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলদেরকে অস্বীকার করে, তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায়, অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে কিন্তু তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, কোন কোন রাসূলকে মানে, আবার কোন কোন রাসূলকে মানেনা, এ অর্থও হতে পারে যে, ইসলাম এবং কুফর এর মাঝামাঝি একটা নূতন মতবাদ নিজেদের জন্য উদ্ভাবন করে নেয়, এরাই হচ্ছে সত্যিকার কাফের। এদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে অপমানকর আযাব।

সমকালীন নবীকে সত্য বলে স্বীকার করে তাঁর হুকুম মেনে চললে তবেই আল্লাহকে স্বীকার করা গ্রাহ্য হবে। নবীকে না মেনে আল্লাহকে মানা অর্থহীন, মূল্যহীন। বরং একজন নবীকে অস্বীকার করলে তা হবে আল্লাহকে এবং সমস্ত নবীকে অস্বীকার করা। ইহুদীরা মহানবী (সঃ) কে অস্বীকার করলে তাদেরকে আল্লাহ ও সমস্ত নবীকে অস্বীকারকরী বলে অভিহিত করা হয়। চিহ্নিত করা হয় কট্টর কাফের হিসেবে।

২১১. অর্থাৎ এবং যারা কোন নবীকে পৃথক করে না, বরং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সকল নবীর প্রতি ঈমান এনেছে। আল্লাহ আপন রহমতে তাদেরকে বিরাট সওয়াব দান করবেন। এ দ্বারা মুসলমানদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর প্রতি এবং সকল নবীর প্রতি ঈমান আনে।

২১২. কয়েকজন ইহুদী সর্দার মহানবী (দঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, তুমি সত্য নবী হয়ে থাকলে আসমান হ্তে একই সঙ্গে একটা লিখিত কিতাব এনে দেখাও। যেমন হযরত মূসা (আঃ) তাওরাত এনেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি ন্যাযিল হয়। এদের জবাবে গোটা রুকুতে সমস্ত কলর উল্লেখ করা হয়। অতঃপর সিদ্ধান্তকর জবাব দেওয়া হয়। আয়তের তাৎপর্য এই যে, হে মোহাম্মদ (দঃ)! ইহুদীরা যে বিদ্বেষ-শত্রুতা বশতঃ তোমার কাছে এ রকম কিতাব তলব করছে, তাদের এহেন স্পর্ধা-অবাধ্যতায় বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। তাদের লোকেরা। হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে এর চেয়েও বড় এবং কষ্টের বিষয় দাবী করছিলো। অর্থাৎ তারা বলেছিলো যে, তুমি আল্লাহকে এনে আমাদেরকে প্রকাশ্যে দেখাও। অন্যথায় আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবোনা । সূরা বাকারায় এ প্রসঙ্গে আলেচনা করা হয়েছে। এর পর কি হয়েছিলো ! যারা এ দাবী করছিলো, তাদের ওপর বজ্রপাত হয়। সকলেই মারা যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আঃ) এর দোয়ায় তাদেরকে জীবিত করেন। এমন আশ্চয্য নিদর্শন দেখতে পেয়েও তারা কি বলেছিলো। গো-বাছুরের পূজা করতে শুরু করে। আল্লাহ তাআলা এটাও ক্ষমা করে দেন। সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ

عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ

ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ

فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا

فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ

سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ

مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٤﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ

اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ

بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥٥﴾

وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿١٥٦﴾ وَّقَوْلِهِمْ

اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا

قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ

اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾

রুকু ২২

১৫৩. আহলে কিতাবের লোকেরা তোমার কাছে এই (অহেতুক দাবীও পেশ করে যেন তুমি সরাসরি তাদের জন্যে তাদের চোখের সামনেই) আসমান থেকে কোনো কেতাব নিয়ে এসো, (এদের এই দাবীতে তুমি বিব্রত হয়ো না) এরা তো (এক সময়) মূসার কাছে এর চাইতেও বড়ো রকমের দাবী পেশ করেছিলো, তারা তো (এতোটুকু পর্যন্ত) বলেছিলো যে, (হে মূসা,) তুমি আল্লাহকেই আমাদের কাছে প্রকাশ্যভাবে দেখিয়ে দাও, তাদের এই (ক্ষমাহীন) সীমা লংঘন ও বাড়াবাড়ির জন্যে তাদের ওপর প্রচন্ড (আযাবের) বজ্রপাত এসে নিপতিত হয়েছে। (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কিত) প্রমাণসমূহ তাদের কাছে সুস্পষ্ট হওয়ার পরও তারা (আল্লাহর পাশাপাশি) (গো-বাছুরকে (নিজেদের) উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে নিলো। তারপরও আমি তাদের এই জঘন্য অপরাধ মাফ করে দিলাম[২১৩] এবং আমি মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ (সহ আমার কেতাব) দান করলাম[২১৪]।

১৫৪. এদের মাথার ওপর তূর পাহাড়কে উঁচু করে ধরে আমি এদের কাছ থেকে (আমার আনুগত্যের) প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলাম[২১৫]। (সেই আনুগত্যের দাবী হিসেবে) আমি তাদের বলেছিলাম যে নগরের দ্বারপ্রান্ত দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার সময় তোমরা একান্ত অনুগত হয়ে ঢুকবে[২১৬]। আমি তাদের (আরো) বলেছিলাম- তোমরা শনিবারের (পবিত্র দিনে মাছ ধরে আমার আইনের) সীমালংঘন করো না, (এই সবকিছুকে মেনে চলার ব্যাপারে) আমি তাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলাম[২১৭]।

১৫৫. অতঃপর যেহেতু তারা (আল্লাহর সাথে কৃত এই) প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং অন্যায়ভাবে আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছে, আরো বলেছে যে, আমাদের হৃদয় (সত্যবিমূখী চিন্তাধারায়) আচ্ছাদিত, প্রকৃত পক্ষে তাদের (ক্রমাগত সত্য দ্বীনকে) অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তাই এদের কম সংখ্যক লোকই ঈমান আনে[২১৮]।

১৫৬. আরো যেহেতু, এরা (আল্লাহকে) অস্বীকার করতেই থাকলো, (শুধু তাই নয়) এরা (পুণ্যবতী) মরিয়মের ওপরও জঘন্য অপবাদ আনলো।

১৫৭. (এখানেই শেষ নয় এরা আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললো যে) অবশ্যই আমরা মরিয়মের পুত্র ঈসাকে হত্যা করেছি[২১৯]- (আসলে) তারা কখনোই তাকে হত্যা করেনি, তারা তাকে শুলবিদ্ধও করেনি। যদিও তাদের কাছে (গোলক ধাঁধার কারণে) এমনি একটা কিছু মনে হয়েছিলো এবং (তাদের মাঝে) যারা (সঠিক কথা না জানার কারণে) মতবিরোধ করেছিলো, তারাও মূলত সন্দেহে পড়ে গেলো। এ ব্যাপারে তাদের (নিতান্ত ধারণা ও) অনুমানের অনুসরণ করা ছাড়া (মূল ঘটনার) কোনো সঠিক জ্ঞান ছিলো না। (তবে) এটুকু নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।

---

২১৩. এই যে, হযরত মূসা (আঃ) গো-বাছুরটি জবাই করে আগুনে জ্বালায়ে তার ছাই নদীর ওপরে বাতাসে উড়ায়ে দেন এবং বাছুরকে সেজদা করছে এমন সত্তুর হাজার লোককে হত্যা করা হয়।

২১৪. অর্থাৎ যখন ইহুদীরা বলেছিলো যে, তাওরতের বিধান কঠোর, আমরা তা মানতে পারবোনা। তখন তূর পর্বতকে মাটি থেকে উপড়ে নিয়ে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা কঠোরভাবে তাওরাতের বিধান মেনে চল। অন্যথায় তোমাদের মাথায় পাহাড় ছেড়ে দেব।

২১৫. ইহুদীদেরকে হুকুম করা হয়েছিলো যে, সেজদা করে মাথা নত করে তোমরা শহরে প্রবেশ কর। তারা সেজদা করার পরিবর্তে পাছার উওপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গমন করে। শহরে পৌঁছে তারা প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয় এবং দুপুর পর্যন্ত প্রায় সত্তুর হাজার লোক মারা যায়।

২১৬. ইহুদীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে, তোমরা শনিবারে মাছ শিকার করবেনা। অন্যদিনের চেয়ে শনিবারে নদীতে বেশী মাছ দেখে ইহুদীরা একটা কৌশল অবলম্বন করলো। নদীর কাছে একটা কুয়া বানালো। শনিবারে নদী থেকে কুয়ার মাছ এসে জড়ো হলে তারা কুয়ার মুখ বন্ধ করে দেয়। অন্যদিন এ কুয়া থেকে মাছ শিকার করে। এ প্রতারণা আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য আল্লাহ তাদেরকে বানরে পরিণত করে দেন। এ বানর হচ্ছে জন্তুর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং অপদার্থ।

২১৭. অর্থাৎ ইহুদীরা এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে আল্লাহ তায়ালা তাদের এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করা, অন্যায় ভাবে নবীদেরকে হত্যা করা এবং আমাদের অন্তর তো গিলাফ-তাদের এ কথা বলার জন্য তাদের ওপর নানা ধরণের কঠোর আযাব চাপায়ে দিয়েছেন। মহানবী (দঃ) ইহুদীদেরকে হেদায়াত করলে তারা বলে, আমাদের অন্তরতো পর্দা লাগালো। তোমার কথা সেখানে পৌঁছতে পারেনা। আল্লাহ

তায়ালা বলেন, আসল ব্যাপার তো তা নয়। বরং কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। এর ফলে তাদের ঈমান নছীব হতে পারেনা। অবশ্য স্বল্প সংখ্যক লোক এর ব্যতিক্রম আছে, যেমন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও তাঁহার সঙ্গী-সাথীরা।

২১৮. অর্থাৎ উপরন্ত এ কারনেও যে, হযরত ঈসা (আঃ) কে অস্বীকার করে আর একটা কুফরী অর্জন করেছিল এবং নবীর ওপর মহা অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের এই কথার জন্যও যে, আমরা মারিয়ামের পুত্র ঈসাকেও যে ছিল আল্লাহর রসুল-হত্যা করছি আর এ কথাটা তারা বলতো গর্ব করে। এসব কারনে ইহুদীদের ওপর আযাবও বিপদ নাযিল করা হয়েছে।

২১৯. আল্লাহ তায়ালা তাদের দাবীর প্রতিবাদ করে বলছেন যে, ইহুদীরা ঈসা (আঃ) কে হত্যা করেনি, শুলীবিদ্ধও করেনি। ইহুদীরা যে এ সম্পর্কে নানা কথা বলে, তা সবই বলে অনুমান করে। আল্লাহ তাদেরকে সন্দেহে ফেলে দিয়েছেন। আসল খবর কেহ জানেনা। সত্যকথা এ যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আঃ) কে আসমানে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান, তিনি সব কিছুই পারেন। তাঁর সব কাজেই হেকমত-যৌক্তিকতা রয়েছে। ঘটনাটি ছিলো এ যে, ইহুদীরা হযরত মাসীহ (আঃ)কে হত্যার সংকল্প করলে প্রথমে তার গৃহে একজন লোক প্রবেশ করে। আল্লাহ তায়ালা হযরত মাসীহ (আঃ)কে আসমানে তুলে নেন এবং গৃহে প্রবেশ করা এ লোকটার চেহারা হযরত মাসীহ (আঃ) এর চেহারার মতো করেছেন। এ সময় অন্যরা গৃহে প্রবেশ করে এ লোকটিকে মাসীহ মনে করে হত্যা করে। অতঃপর মনে পড়লে বলে, লোকটির চেহারা মাসীহ এর মতো ঠিকই, কিন্তু শরীরের বাকী অংশতো আমাদের সঙ্গীর মতোই মনে হয়। তাদের মধ্যে একজন বললো, নিহত ব্যক্তিটি যদি মসীহ হয় তবে আমাদের সাথী লোকটি গেলো কোথায়? আর আমাদের লোকটি থাকলে মাসীহ গেলো কথায়? এখন নিছক আন্দাজ- অনুমান করে কেউ একটা বললো আর অপর জন বললো, অন্যটা। কিন্তু আসল ব্যাপারে জ্ঞান কারো নেই। সত্য কথা এ যে, হযরত মসীহ (আঃ) আসলে নিহত হননি, বরং আল্লাহ তাঁকে আসমানে তুলে নিয়েছেন। আর ইহুদীদেরকে নিমিজ্জিত করেছেন সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে।

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ

وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٥٨﴾ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ

شَهِيدًا ۝١٥٩ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
طَيِّبٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ كَثِيرًا ۝١٦٠
وَّأَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ؕ وَأَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٦١
لٰكِنِ الرّٰسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ
بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ
الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ؕ أُولٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝١٦٢

১৫৮. বরং (আসল ঘটনা ছিলো এই যে,) আল্লাহ্ তায়ালা তাকে তার নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন, (এটা আল্লাহর কাছে কিছুতেই অসম্ভব ব্যাপার ছিলো না, কারণ) আল্লাহ্ তায়ালা মহা পরাক্রমশালী ও মহা প্রজ্ঞাময়[২২০]।

১৫৯. (আজ যারা তার ব্যাপারে নানা গোলকধাঁধা সৃষ্টি করছে সেই) আহ্লে কেতাবদের মাঝে এমন একজনও থাকবে না, যে তার মৃত্যুর আগে তার ওপর ঈমান আনবে না। এবং কেয়ামতের (শেষ বিচারের) দিনে সে এদের (বাড়াবাড়ির) ব্যাপারে (আল্লাহর আদালতে) সাক্ষ্য দেবে[২২১]।

১৬০. ইহুদীদের এই বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক আচরণের জন্যে এমন অনেক পবিত্র জিনিসও আমি তাদের জন্যে হারাম করেছি যেটা তাদের জন্যে (আগে) হালাল ছিলো। এটা এই কারণে যে, এরা যুগ যুগ ধরে বহু মানুষদের আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছে।

১৬১. যেহেতু এরা (লেনদেনে) সূদ গ্রহণ করে অথচ এদের তা (গ্রহণ করা) থেকে (সুস্পষ্টভাবে) নিষেধ করা হয়েছিলো এবং এরা অন্যের মাল-সম্পদ ধোকা-প্রতারণার মাধ্যমে গ্রাস করে। তাদের মধ্যে (এই সব অপরাধে লিপ্ত কাফেরদের জন্যে আমি এ কঠিন আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছি[২২২]।

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যাদের আবার জ্ঞানের গভীরতা রয়েছে এবং (এই জ্ঞানের কারণেই যারা ঈমানদার হয়েছে, এমন সব ঈমানদার (ব্যক্ত) যারা তোমার ওপর যা কিছু (আল্লাহর তরফ থেকে) নাযিল হযেছে, তার ওপর বিশ্বাস করে (সাথে সাথে) তোমার পূর্ববর্তী নবী-রসূলদের ওপর যা নাযিল হয়েছে, তার ওপরও বিশ্বাস করে। (বাস্তব জীবনে এর প্রমাণ দিতে গিয়ে) এরা নামায প্রতিষ্ঠা করে (নিয়মিত) যাকাত আদায় করে, সর্বোপরি এরা শেষ দিনের (বিচার ফয়সালার) ওপর ঈমান আনে। এরাই হচ্ছে সেই সব (সৌভাগ্যশালী) মানুষ- যাদের অচিরেই আমি মহান পুরস্কারে ভূষিত করবো[২২৩]।

---

২২০. হযরত ঈসা (আঃ) আসমানে জীবিত আছেন। দজ্জালের আবির্ভাব হলে তিনি দুনিয়ায় স্বশরীরে এসে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। সেদিন ইহুদী- খৃষ্টান সবাই তার প্রতি ঈমান আনবে। সেদিন তারা স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আঃ) জীবিত আছেন, তিনি মারা যাননি। কেয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আঃ) তাদের অবস্থা ও কর্মকান্ড প্রকাশ করবেন যে, ইহুদীরা আমাকে অস্বীকার করেছিলো আমার বিরোধিতা করেছিলো। আর খৃষ্টান-নাছারারা আমাকে বলেছিলো ইবনুল্লাহ-আল্লাহর পুত্র।

২২১. ইহুদীদের আগে-পরের বড় বড় দুষ্টামী থেকে তারা যে গুনায়র ব্যাপারে বে-পরোওয়া তা প্রকাশ পায়, প্রকাশ পায় তাদের ঔদ্ধত্যা-অবাধ্যতা। এসব আলোচনা করার পর এখন বলা হচ্ছে যে, এ কারণে আমরা তাদেরকে শরীয়তও দিয়েছিলাম কঠিন-যাতে তাদের ঔদ্ধত্য দমন করা যায়। এখন আর এ সন্দেহ থাকেনা যে, তাওরাতো তাদের ওপর ভালো জিনিষকে হারাম করা হয়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ)এর বিরোধিতা করা এবং হযরত মারইয়াম এর প্রতি অপবাদ আরোপ এসব ঘটনা ঘটিয়াছে তাওরাত নাযিলের অনেক পরে। তাহলে অপবাধ করার আগে শাস্তি হলো কি করে?

গোটা রুকুর সারকথা এ যে, আহলে কিতাবরা হযরত মূসা (আঃ) এর যমানা থেকেই একের পর এক দুষ্টামী, নাফারমানী, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং আম্বিয়ায়ে কেরামকে কষ্ট দিয়ে আসছে। হে মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (দঃ) এখন তারা যদি বিশেষশতঃ তোমার কাছে তাওরাতের মতো কিতাব এক দফায় দাবী করে সব কিতাবের শ্রেষ্ঠ কিতাব কুরআন মজীদকে যথেষ্ট মনে না করে, তবে এসব হঠকারী নালায়েকদের জন্য এটা কি অসম্ভব? এদের এহেন অবিবেচকের মতো কান্ড কারখানায় তুমি বিস্মিত হবে না। এতে অস্থির

হওয়ারও কোন কারণ নেই। এদের আগে-পরের ছোট-বড় সব কর্মকান্ডই আমাদের ভালো করে জানা আছে। আমরাও দুনিয়ায় শরীয়তকে তাদের জন্য কঠোর করেছি। আর আখেরাতে তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি আযাদের কঠোর শাস্তি।

২২২. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাদের জ্ঞান সুদৃঢ় এবং যারা ইমানদার, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীরা এবং তারা কোরআন মজীদ, তাওরাত-ইঞ্জীল সব কিছুকেই স্বীকার করে। যারা নামায কায়েম রাখে, তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য, যারা যাকাত দান করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে, এমন লোকদেরকে আমরা বড় সাওয়াব দান করবো। অবশ্য পথমোক্ত দল ছাড়া-এদের জন্য রয়েছে কঠিন শস্তি।

২২৩ আহলে কিতাব এবং মক্কার মুশরেকরাসহ সমস্ত কাফেররা কোরআন মজীদের সত্যতা-যথার্থতা সম্পর্কে নানা প্রকার অহেতুক সংশয় প্রকাশ করে। দেখুন, এ ক্ষেত্রেও তারা বলে দিয়াছে যে, তাওরাত যেমন একই সঙ্গে আসমান থেকে নাযিল হয়েছিল, তেমনি তুমিও একই সঙ্গে আসমান থেকে একটা কিতাব এনে দিলে তবেই আমরা তোমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবো। ফার্সীতে একটা কথা আছে 'বদখছলত লোকের জন্য অযুহাতের অভাব নেই'। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কয়েকটি আয়াত নাযিল করে সত্য উদঘাটন করে দিয়াছেন, ওহীর মূল তত্ত্ব এবং কাফেরদের সকল বাতেল-ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও অহেতুক সন্দেহ-সংশয় নিরসন করে দিয়েছেন। এবং সাধারণভাবে সকল ওহীর এবং বিশেষ কোরআন মজীদের অনুসরণ ব্যক্ত করে বলে দিয়াছেন যে, আল্লাহর মেনে নেয়া সকলেই ফরয অবশ্য কর্তব্য। এব্য-পারে কারো কোন ওযর-আপত্তি বলতে পারেনা। এটা মেনে নিতে যে দ্বিধা-দ্বন্দ ইতস্তত করে বা অস্বীকার করে, সে গোমরাহ-বেদ্বীন। উপরে ইলযামী জবাবের পর এখন এখান থেকে চূড়ান্ত জবাব দেয়া হচ্ছে।

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ

إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ

وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ

وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن

قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٤﴾ رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٥﴾ لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١٦٧﴾

রুকু ২৩

১৬৩. (হে মোহাম্মদ এই মানব জাতির হেদায়াতের জন্যে) আমি তোমার কাছে আমার ওহী পাঠিয়েছি[২২৪], যেমনি করে আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ ও তাঁর পরবর্তী (নবীর) প্রতি[২২৫], আমি আরো ওহী পাঠিয়েছি ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের কাছে (একই ভাবেই আমি ওহী পাঠিয়েছি) ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সোলায়মানের কাছে, অতপর আমি দাউদের ওপর যাবুর (গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছি।

১৬৪. এই রসূলদের মাঝে এমন অনেক আছে- যাদের কথা ইতিপূর্বে আমি তোমাদের কাছে বলেছি, কিন্তু এদের মাঝে বহু রসূল এমন আছে যাদের (নামধাম) বিবরণ কিছুই আমি তোমাকে বলিনি (এদেরই এক নবী) মূসার সাথে তো স্বয়ং আল্লাহ নিজেই সরাসরি কথা বলেছেন[২২৬]।

১৬৫. এই রসূলরা (ভালো কাজের পুরস্কার- জান্নাতের, মন্দ কাজের পরিণাম- জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী (হয়ে দুনিয়ায় এসেছিলো) যাতে করে এদের (আগমনের) পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানব জাতির কোনো অজুহাত খাড়া করার সুযোগ না থাকে, সত্যিই আল্লাহ তায়ালা মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়[২২৭]।

১৬৬. কিন্তু (মানুষ যতো খোঁড়া অজুহাতই পেশ করুক না কেন) আল্লাহ্ তোমার ওপর যা কিছু (ওহী) নাযিল করেছেন তা (একান্ত ভাবে) তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমেই করেছেন। তাছাড়া (যারা এটা রসূলদের কাছে বয়ে এনেছে সেই) ফেরেশতারাও তো (এ কথার) সাক্ষ্য দেবে, অবশ্য সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা একাই যথেষ্ট২২৮। ১

১৬৭. যারা (এই ওহীকে) মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং (অন্য মানুষদেরও) আল্লাহ্র পথ থেকে দূরে সরিয়ে-রাখে, তারা গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

---

২২৪. এ থেকে জানা যায় যে, ওহী আল্লাহর এক বিশেষ হুকুম। পয়গম্বরদের ওপর এ খোদায়ী পয়গাম নাযিল হয়। অতীত নবীদের ওপর যেমন খোদায়ী ওহী নাযিল হয়েছিল তেমনি মহানবী (সঃ) এর ওপরও আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওহী নাযিল করেছেন। সুতরাং নবীকে মানতে হলে ওহীকেও মানতে হয়,আর ওহীকে অস্বীকার করলে সকল নবীকেই অস্বীকার কর হয়। হযরত নূহ (আঃ) এবং পরবর্তীদের সঙ্গে সামঞ্জস্যদের কারণ সম্ভবতঃ এ যে, হযরত আদম (আঃ) এর সময় থেকে ওহীর যে সূচনা হয়েছিল সে সময়টা ছিলো একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়। হযরত নূহ (আঃ) এর ওপর এ প্রাথমিক পর্যায় সমাপ্ত হয়েছে। যেন প্রাথমিক পর্যায় ছিলো নিছক শিক্ষা দানের পর্যায়। হযরত নূহ (আঃ) এর যমানায় এ পর্যায় সমাপ্ত হয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করার উপযুক্ত হয়েছিল। উপযুক্ত হয়ে ছিলো অনুগতদেরকে ইমান দান এবং নাফরমানদেরকে শাস্তি দানের। দৃঢ় সংকল্প নবীদের সিলসিলাও শুরু হয়েছে, নূর (আঃ) থেকে। খোদায়ী ওহীর বিরুদ্ধাচারণ কারীদের ওপর আযাব নাযিলের ধারাও প্রথম শুরু হয়েছে হযরত নূহ (আঃ) এর সময় থেকেই।

সারকথা এ যে, খোদায়ী হুকুম এবং নবীদের বিরোধিতার জন্য আগে আযাব নাযিল হতোনা। বরং তাদেরকে অক্ষম বিবেচনা করে ঢিল দেওয়া হতো। কেবল বুঝাবার চেষ্টাই করা হতো। হযরত নূহ (আঃ) এর যুগে দ্বীন শিক্ষা ভালো ভাবে প্রকাশ পেলে খোদার হুকুম মেনে চলতে মানুষের জন্যও আর কোন অবশিষ্ট রইলনা। এখন নাফারমানদের ওপর আযাব নাযিলের ধারা শুরু হয়। প্রথমে হযরত নূহ (আঃ) এর যমানায় তুফান আসে। অতঃপর হযরত ইহুদী, হযরত সালেহ, হযরত শুয়াইব আলাইহিমুস সালম প্রমূখ নবীদের যমানায় কাফেরদের ওপর নানা রকমের আযাব আসে। একারনে মহানবী (সঃ) এর ওহীকে হযরত নূহ এবং তৎপরবর্তী নবীদের ওহীর সঙ্গে তুলনা করায় আহলে কিতাব এবং মক্কার মুশরেকদেরকে পূর্নরূপে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যার মহানবী (সঃ) এর ওহী অর্থাৎ কোরআরকে মানবে না, তারা মহা শাস্তির যোগ্য হবে।

২২৫. হযরত নূহ (আঃ) এর পরে যে সব নবী এসেছেন, সংক্ষেপে তাঁদের সকলের সম্পর্কে আলোচনা করার পর তাঁদের মধ্যে যারা মশহুর, বিরাট মর্যাদার অধিকারী এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, সবিশেষ ভাবে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ থেকে ভালো ভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) এর ওপর যে ওহী নাযিল হয়েছে। তাকে সত্য বলে স্বীকার করে তার অনুসরণ করা তেমনি জরুরী, যেমন জরুরী সকল মশহুর নবীদের ওহীকে স্বীকার করে নেওয়া আরও জানা যায় যে নবীদের কাছে যে ওহী আসে তা কখনো ফেরেশতা পয়গাম নিয়ে আসেন, আবার কখনো আসে লিখিত আকারে। আবার কখনো পয়গাম আর মাধ্যম ছাড়াই স্বয়ং আল্লাহ তআলা তার রসুলের সাঙ্গে কথা বলতেন। কিন্তু এ সকল আকারেই যেহেতু ওহী ছিলে আল্লাহর হুকুম, অন্য কারো হুকুম নয় সুতরং বান্দাহদের ওপর তা মেনে চলা ছিলো সমান ফরয। বান্দাহদের কছে পোছার মাধ্যম লিখিত হোক বা মৌখিক বা পায়গাম যা কিছুই হোকনা কেন। সুতরাং এখন ইহুদীদের এ দাবী করা যে, তাওরাতের মতো লিখিত পূরা কিতাব একই সঙ্গে আসমান থেকে নিয়ে এলে আমরা তোমাকে সত্য বলে স্বীকার করবো। অন্য- অবস্থায় স্বীকার করবোনা এটা নিছক বেঈমানী এবং বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। ওহী যখন খোদায়ী হুকুম, যদিও তা নযিল হওয়ার রূপ এক নয়, এখন যে কোন রূপেই আসুকনা কেন, তা মেনে নিতে ইতস্ততঃ করা, অস্বীকার করা অথবা একথা বলা হয় যে, অমুক বিশেষ রূপে আসলে মানবো, এ কথা স্পষ্ট কুফরী এবং বোকামী মাত্র।

২২৬. আল্লাহ তায়ালা সব সময় নবীদের প্রেরণ করেছেন মুমেনদেরকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য এবং কাফেরদেরকে ভয় দেখানো জন্য, যাতে কেয়ামতের দিন মানুষদের এ ওযর-আপত্তি করার সুযোগ না থাকে যে, কিসে তুমি রাযী, আর কিসে রাযী নয়, তা আমাদের জানা ছিলোনা। জানা থাকলে অবশ্যই সে অনুযায়ী চলতাম। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যখন পয়গম্বরদেরকে মুজেযা দিয়ে প্রেরণ করেছেন আর পয়গম্বররা সত্য পথ বলে দিয়েছেন, তখন দ্বীনে হক তথা সত্য-সঠিক দ্বীন কবুল না করার ব্যাপারে কারো কোন ওযর-আপত্তি গ্রাহ্য হতে পারেনা। খোদায়ী ওহী এমন এক অকাট্য প্রমাণ, যার সামনে অন্য কোন প্রমান গ্রাহ্য হতে পারেনা, বরং সকল প্রমাণই ওহীর সামনে ম্লান হয়ে যায়। এটাই আল্লাহর হেকমত-কৌশল। তিনি জবরদস্তী করলে বাধা দেয় কার সাধ্য? কিন্তু জবরদস্তী তার পছন্দ নয়।

২২৭. অর্থাৎ সকল পয়গম্বরের কাছেই ওহী এসেছে। এটা নতুন কিছু নয় সকলেরই জানা। কিন্তু এ কোরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশেষ ইল্‌ম নাযিল করেছেন। আল্লাহ এ সত্যকে প্রকাশ করবেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা জানে যে, কোরআন মজীদ থেকে যে সব জ্ঞান আর তত্ত্ব-তথ্য অর্জিত হয়েছে এবং সবসময় হবে, তা অন্য কোন গ্রন্থ থেকে অর্জিত হয়নি, হবেও না। আর মহানবী (দঃ) এর কাছে থেকে মানুষ যতই হেদায়াত লাভ করেছে, তা অন্য কারো নিকট থেকে লাভ করেনি।

২২৮. কোরআন মজীদ এবং হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সত্যতা প্রমাণ এবং সুদৃঢ় করণের পর বলা হচ্ছে যে, এখন যে কেউ তাঁকে অস্বীকার করবে তাওরাতে উল্লেখিত তার অবস্থা ও গুণাবলী যারা গোপন করবে, মানুষের কাছে একটার স্থলে অন্যটা প্রকাশ করে তাদেরকেও সত্য দ্বীন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবে, এমন লোকদের মাগফেরাত নসীব হবেনা, হেদায়াতও তাদের ভাগ্যে জুটবেনা। এ থেকে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে হেদায়াত মহানবী (সঃ) এর আনুগত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর গোমরাহী তার বিরোধিতার নাম। এ দ্বারা ইহুদীদের পূর্ণ প্রতিবাদ এবং তাদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ রদ করা হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ

طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ

ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ

الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ۚ

وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا

فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا

الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ

أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ

وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ

وَّاحِدٌ ۭ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٧١﴾

১৬৮. যারা (রসূলদের কাছে পাঠানো আল্লাহর এই হেদায়াতকে) অস্বীকার করলো এবং (এভাবেই সত্যের ব্যাপারে চরমভাবে) সীমালংঘন করলো- এটা কখনো হবে না যে, আল্লাহ্ তাদের (এ আচরণের জন্যে) ক্ষমা করে দেবেন। না তিনি তাদের কখনো সঠিক রাস্তা দেখাবেন।

১৬৯. হাঁ, একটি মাত্র রাস্তাই তাদের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে এবং তা হচ্ছে জাহান্নাম- যেখানে তারা অনন্তকাল ধরে পড়ে থাকবে- (শাস্তি বিধানের) এই কাজটি আল্লাহ্র জন্যে খুবই সহজ একটি কাজ

১৭০. হে মানুষরা, আল্লাহ্র কাছ থেকে তোমাদের জন্যে সঠিক বিধান নিয়ে রসূল এসেছে, (তার আনীত বিধানের ওপর) তোমরা ঈমান আনো তোমাদের জন্যে এতেই) কল্যাণ (নিহিত রয়েছে) আর তোমরা তা যদি মেনে নিতে অস্বীকার করো, তাহলে (জেনে রেখো তোমাদের এ অস্বীকার করায় তাঁর কিছুই আসে-যায় না)। এই আসমান-যমীনে (সর্বত্র যেখানে) যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে এবং আল্লাহ্ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী[২২৯]।

১৭১. হে কেতাবধারীরা, নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে (অহেতুক) কোনো বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য বৈ কোনো মিথ্যা বলো না- মরিয়মের পুত্র মসীহ ছিলো সত্যিই (আল্লাহ্র) রসূল ও তার এমন এক বাণী- যা তিনি (মানব সন্তানের আকারে) মরিয়মের ওপরই প্রেরণ করেছেন। ওপরন্তু সে ছিলো আল্লাহ্র কাছ থেকে পাঠানো এক 'রূহ', অতএব (হে আহলে কেতাব) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর (পাঠানো) রসূলের ওপর ঈমান আনো, আর কখনো এটা বলো না যে, (মাবুদ) তিন জন। এ (ধরনের অবাঞ্ছিত কথাবার্তা) থেকে তোমরা বেঁচে থেকো, এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম। আর (মহান সৃষ্টিকর্তা) আল্লাহ্! তিনি তো একক উপাস্য মালিক এবং (এই সার্বভৌমত্বের অধিপতি) আল্লাহ্ তায়ালা এই (অজ্ঞানতা ও মূর্খতা) থেকে অনেক পবিত্র যে, তাঁর সন্তান থাকবে[২৩০]। এ আকাশ ও ভূমন্ডলের সব মালিকানাই তো তাঁর জন্যে। আর (এগুলোর যথাযথ সংরক্ষণের জন্যে তাঁর কোনো সন্তানের প্রয়োজন নেই) তিনি একাই যথেষ্ট ।

২২৯ মহানবী (সঃ) এবং তাঁর উপস্থাপিত কিতাবের সত্যতা প্রতিপন্ন করার এবং তার বিরোধী অর্থাৎ আহলে কিতাবদের ভ্রান্তি ও বিভ্রান্ত বলে প্রমাণ করার পর এখন সকল মানুষকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ঃ হে লোক সকল! আমার রাসূল সত্য কিতাব আর সত্য দ্বীন নিয়া তোমাদের কাছে পৌঁছায়েছেন, এখন তার কথা মেনে নেয়ার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। আর তা না মানলে জেনে রাখবে যে, আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ তায়ালার। তিনি তোমাদের সব কাজ সব অবস্থা সম্পর্কে খবর রাখেন। তোমাদের আমলের পূর্ণ হিসাব-কিতাব শেষে তার বিনিময় দেয়া হবে।

আল্লাহর এ ঘোষণা থেকেও স্পষ্ট জানা যায় যে, পয়গম্বরদের প্রতি যে ওহী নাযিল হয়, তা মেনে নেয়া ফরয এবং তা অস্বীকার করা কুফ্‌র।

২৩০. আহলে কিতাবরা তাদের নবীদের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করতো, সীমা ছাড়িয়ে যেতো। তাদেরকে খোদা এবং খোদার পুত্র বলে আখ্যায়িত করতো । সুতরাং এ কারণে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জন করবে না। যাকে ভক্তি কর, তার প্রশংসায় সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। সত্যসত্যিই যতটুকু ঠিক, তার চেয়ে বেশী বলবো না। আল্লাহ তাআলার পবিত্র শানেও তাই বলবে, যা সত্য ও প্রতিষ্ঠিত। নিজেদের পক্ষ থেকে বাড়ায়ে কিছুই বলবে না। হযরত ঈসা তো আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর হুকুমেই তার জন্ম হয়েছে। ওহীর বিরুদ্ধে তাকে আল্লাহর পুত্র বলতে শুরু করে তোমরা কি গযবই না করে বসেছ। তাকে কেন্দ্র করে তোমরা তিন খোদায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছ। এক, আল্লাহ। দুই, হযরত ঈসা (আঃ) এবং তিন, হযরত মারইয়াম। এসব কথা থেকে তোমরা ফিরে আস। আল্লাহ তায়ালা এক ও একক। কেউ তাঁর শরীক নেই। নেই তাঁর কোন পুত্রও-সন্তান। তাঁর পবিত্র স্বত্ত্বা এ থেকে মুক্ত। এসব ক্রটি দেখা দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা ওহী অনুসরণ করনি, তা মেনে চলনি। ওহী মেনে চললে আল্লাহর জন্য পুত্র সাব্যস্ত করতে না। তিন খোদায় বিশ্বাসী হয়ে স্পষ্ট মোশরেক হতে না। রাসূল কুলের নেতা মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং সব কিতাবের সেরা কিতাব কোরআন মজীদকে অস্বীকার করে আজ সকল কাফের হতে না।

আহলে কিতাবের একটা উপদলতো হযরত ঈসা (আঃ)-কে রাসূল বলেও স্বীকার করেনি। তাঁকে হত্যা করাই তাদের পসন্দ। এদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় উপদলটি তাকে খোদার পুত্র বলেছে। উভয় দলই কাফের হয়েছে। ওহীর বিরোধিতা করাই তাদের গোমরাহীর কারণ হয়েছিল। এ থেকে জানা যায় যে, ওহীর অনুসরণের মধ্যেই মুক্তি নিহিত।

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا

الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿١٧٢﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧٣﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾

রুকু ২৪

১৭২. ঈসা মসীহ্ কখনো এ কথা বিন্দুমাত্রও হেয় মনে করেনি যে, সে নিজে একজন আল্লাহর বান্দা, না আল্লাহর একান্ত ঘনিষ্ঠ ফেরেশতারা[২৩২] (আল্লাহর বন্দেগী করাকে নিজেদের জন্যে লজ্জার বিষয় মনে করেছে।) কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর বন্দেগী করাকে সত্যিই একটা লজ্জাকর বিষয় মনে করে (এবং এটা ভেবে) অহংকার-গৌরব করে (তার জানা উচিত) অচিরেই আল্লাহ এদের সকলকে তাঁর সামনে একত্রিত করবেন এবং প্রতিটি ব্যক্তিকে তার এই অহংকারের শাস্তি প্রদান করবেন)।

১৭৩. যেসব মানুষ আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং (সে মোতাবেক) ভালো কাজ করেছে (সেদিন) কড়ায়-গন্ডায় তিনি তাঁদের এর জন্যে পুরস্কার দেবেন, আল্লাহ তাঁর একান্ত অনুগ্রহ থেকে তাদের (পাওনার অংক) আরো বাড়িয়ে দেবেন, অপরদিকে যারা আল্লাহর বিধান মেনে নেয়াকে নিজেদের জন্যে লজ্জাজনক কিছু মনে করলো এবং অহংকারজনক আচরণ করলো, তাদের (সবাইকেই) আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দান করবেন। (সেদিন) তারা আল্লাহকে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অভিভাবক কিংবা সাহায্যকারী পাবে না[২৩৩]।

১৭৪. হে মানুষ, তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে (সত্য-মিথ্যা যাচাই করনের জন্যে) একটি উজ্জ্বল প্রমাণ এসেছে। (তাছাড়া- অজ্ঞানতার অন্ধকারে পথ দেখানোর জন্যে) আমি তোমাদের কাছে এক উজ্জ্বল জ্যোতিও নাযিল করলাম।

১৭৫. অতপর যারা আল্লাহর ওপর দৃঢ়ভাবে টিকে থাকলো, তাদের আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তার অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবেন এবং এ ধরনের লোকদের তিনি (সর্বদাই) সঠিক পথে পরিচালিত করবেন[২৩৪]।

---

২৩২. অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাহ হওয়া, তার ইবাদাত করা এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলা অত্যন্ত উচ্চ স্তরের ইজ্জত-শরাফত। হযরত মাসীহ (আঃ) এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদের কাছে এ নেয়ামতের মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো। এজন্য তারা কি করে লজ্জা বোধ করতে পারে? আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদাত বন্দেগী করায়-ইতো লজ্জা হওয়ার কথা। যেমন খৃষ্টানরা হযরত মাসীহকে ইবনুল্লাহ-আল্লাহর পুত্র- এবং মা'বুদ বলে স্বীকার করে নিয়েছিল আর মোশরেকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা স্বীকার করে নিয়েছিল এবং তাঁদের এবং মূর্তির পূজা শুরু করে দিয়েছিলে। সুতরাং এদের জন্য রয়েছে চিরন্তর আবার আর যিল্লতি।

২৩৩. অর্থাৎ যে কেউ আল্লাহ তা'য়ালার বন্দেগীতো নাক সিটকাবে এবং ঔদ্ধত্য করবে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে না। বরং একদিন সকলকে আল্লাহর সমীপে হাযির হতে হবে। হিসাব দিতে হবে সুতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর বন্দেগী কবুল করে নিয়েছে, তারা নিজেদের কাজের পরিপূর্ণ সাওয়াব পাবে। বরং আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের সাওয়াবের চেয়েও বড় বড় নেয়ামত তাদেরকে দান করা হবে। আর যারা আল্লাহর বন্দেগীতে নাক সিটকায়েছে এবং ঔদ্ধত্য করেছে, তারা আযাবে আযীম অর্থাৎ মহাশাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে। তাদের কোন শুভাকাংখী থাকবে না, থাকবে না কোন সাহায্যকারী। আল্লাহর বন্দেগীতে যাদেরকে শরীক করে তারা আযাবে পড়েছে, সেদিন তারাও কোন কাজে আসবেনা। সুতরাং এখন খৃষ্টানরা ভালো ভাবে বুঝে নিক যে, এ দুটি অবস্থার মধ্যে কোনটি তাদের উপযোগী, আর কোনটি হযরত মাসীহ (আঃ) এর মর্যাদার অনুকূল।

২৩৪. আগে থেকে খোদায়ী ওহীর শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ করে কোরআন মজীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যত এবং তা মেনে চলার তাকীদ সম্পর্কে আলেচনা চলে আসছে। এ প্রসঙ্গে হযরত মাসীহ (আঃ)-এর উলুহিয়্যাত ও ইবনুল্লাহ হওয়া সম্পর্কেও আলোচনা হয়। কারণ, খৃষ্টানরা এ আকীদা পোষণ করতো। তা রদ ও বাতিল করার পর এখন শেষে পুনরায় সে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সকলকে তাকীদ করে বলা হচ্ছে 'হে লোক সকল! আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে পরিপূর্ণ দলীল এবং উজ্জ্বল আলো পৌছেছে। অর্থাৎ কোরআন মজীদ তোমাদের কাছে প্ররণ করেছে। তোমাদের হেদায়তের জন্য এটাই যথেষ্ট। এখন আর কোন চিন্তা-ভাবনা এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রয়োজন নেই। নেই এর কোন অবকাশ। সুতরাং যে কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং এ পবিত্র কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, সে আল্লাহর রহমত-অনুগ্রহে প্রবেশ করবে। আর যে এর বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে গোমরাহীর আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে হাবুডুবু খাবে।

يَسْتَفْتُونَكَ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. (হে মোহাম্মদ) মানুষরা তোমার কাছে তাদের প্রশ্নের ব্যাপারে (তোমার) মতামত জিজ্ঞেস করছে, তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির (উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে) তোমাদের তাঁর সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন[২৩৫]- যার মাতাপিতা কেউই নেই, আবার তার নিজেরও কোনো সন্তান নেই, (তেমন ধরনের) কোনো ব্যক্তি যদি মারা যায় এবং সে ব্যক্তি যদি সন্তানহীন হয় এবং তার একটি বোন থাকে, তাহলে

সে বোনটি সে (মৃত) ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক মালিক হবে[২৩৫], অপরদিকে সে যদি নিঃসন্তান হয়, তাহলে সে তার বোনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে[২৩৭]। হাঁ আবার যদি বোন দু'জন থাকে, তাহলে তারা দুই বোন সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ অংশের মালিক হবে[২৩৮]। আর যদি ভাইবোনেরা সংখ্যায় হয় কয়েকজন, তাহলে মেয়েদের অংশ এক ভাগ ও পুরুষদের অংশ দুই ভাগ হবে[২৩৯]। আল্লাহ্ তায়ালা উত্তরাধিকারের এই আইন-কানুনকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তোমাদের জন্যে বলে দিয়েছেন। যাতে করে (দুনিয়ার অন্যান্য উত্তরাধিকার আইনের গোলকধাঁধায়) তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ো[২৪০]। আর আল্লাহ্ তায়ালা সব কিছুর ব্যাপারেই সম্যক ওয়াকেবহাল[২৪১]। •

---

২৩৫. সূরার প্রথম দিকে মীরসের আয়াতে 'কালালার' মীরাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর কোন কোন সাহাবী এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে এ আয়াতটি নাযিল হয়। 'কালালা'র মূল অর্থ দুর্বল। এখানে কালালা'র অর্থ এমন লোক, যারা ওয়ারিসদের মধ্যে পিতা এবং সন্তান-কেউই নেই। একথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, আসল ওয়ারিস হচ্ছে পিতা-পুত্র। যে মৃত ব্যক্তির পিতা পুত্র কেউই নেই, তার আসল ভাই- বোন পুত্র ও কন্যার পর্যায়ভূক্ত। আর আসল ভাই-বোন না থেকে যদি সৎভাই-বোন থাকে, যাদের বাপ এক কিন্তু মা দুই; তারা এক বোন হলে অর্ধেক এবং দুই বোন হলে দুই তৃতীয়াংশ সম্পত্তি পাবে। আর ভাই-বোন উভয়ে থাকলে পুরুষ দুই অংশ নারী এক অংশ পাবে। আর যদি শুধু ভাই থাকে, কোন বোন না থাকে, তবে সে বোনের সম্পত্তির ওয়ারিস হবে, তার কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ নেই। কারণ, সে আছাবা। আয়াতে পরে এসব অবস্থায় উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট রয়েছে সে ভাই-বোন, যাদের মা এক, বাপ দুই। সূরার শুরুতে তাদের হুকুম বর্ণিত হয়েছে। তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ রয়েছে।

২৩৬. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি মাত্র একটা বোন রেখে মারা যায়, পিতা বা পুত্র। কাউকেই রেখে যায়নি, তবে মীরাসে অর্ধেক সম্পত্তি পাবে।

২৩৭. অর্থাৎ আর যদি এর বিপরীত হয়, অর্থাৎ কেন নারী যদি নিঃসন্তন অবস্থায় মারা যায়, সে রেখে যায় মা এক বাপ দুই, বা বাপ এক মা দুই ভাই, তবে সে বোনের সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। কারণ, সে আছাবা। কিন্তু সে যদি পুত্র রেখে মারা যায়, তবে ভাই কিছুই পাবেনা। কিন্তু কন্যা রেখে মারা গেলে কন্য পাওয়ার পর যা থাকবে, তা ভাই পাবে। মা এক, বাপ দুই- এমন ভাই-বোন রেখে গেলে তারা পাবে এক ষষ্টাংশ সূরার শুরুতেই এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২৩৮. দুই জনের বেশী বোন রেখে গেলে তারাও দুই তৃতীয়াংশ পাবে।

২৩৯. কিছু পুরুষ আর কিছু নারী অর্থাৎ কিছু ভই এবং কিছু বোন রেখে গেলে ভাই পাবে দুইভাগ এবং বোন পাবে এক ভাগ, যেমন সন্তানের হুকুম।

২৪০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দয়াময়, মেহেরবান। নিছক বান্দাহদের হেদায়াতের জন্য, তাদেরকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর সত্য-সঠিক বিধান বর্ণনা করেন। যেমন এখানে কালালার মীরাস সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এতে তাঁর কোন গরয নেই। তিনি সকলের চেয়ে ধনী-গনী। কারো মুখাপেক্ষী নন তিনি, এখন যে কেউ তাঁর এ মেহেরবানীর কদর না করে, বরং তাঁর হুকুম এড়িয়ে চলে, তার দুর্ভাগ্য আর দুর্ভোগের কোন সীমা নেই। এ থেকে জানা যায় যে, বান্দাহকে সমস্ত বিধানই মেনে চলতে হবে। এটা বান্দাহর অবশ্য কর্তব্য। কোন একটা মামুলী বিষয়ে বা অংশ বিশেষে বিরুদ্ধাচরণ করলেও গোমরাহীতে নিমজ্জিত হবে। এটাই যদি হয়ে থাকে আসল ব্যাপার, তবে যারা তাঁর পূত-পবিত্র স্বত্ত্বা এবং পরিপূর্ণ ছিফাত- গুণাবলীতে তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করে এবং তার মোকাবিলায় নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি আর খাহেশের অনুসরণ করে, তা যে কত বড় গোমরাহী ও খবীসীপনা, এ থেকেই তা আন্দাজ করা যায়।

২৪১. ইতিপূর্বে বলা হয়েছিলো যে, আল্লাহ তা'য়ালা আপন বান্দাহদের হেদায়াতকে পসন্দ করেন। আর এখন বলা হচ্ছে যে, তিনি সব কিছুই ভালো করে জানেন । সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায় এ যে, দ্বীনের ব্যাপারে যেসব প্রয়োজন দেখা দেয়, সেসব ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করে নেবে। এতে সাহাবায়ে কেরাম যে 'কালালা'র ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন তাকে পসন্দ করে আগামীতেও এ ধরণের প্রশ্ন সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করার প্রতিই ইঙ্গিতে করা হয়েছে। অন্ততঃ আমারতো এটাই মনে হয়। এও মনে হয় যে, আল্লাহ তা'য়ালাই সবকিছু জানেন অর্থাৎ তোমরা জাননা, তোমরা তো এটাই বলতে পারনা যে 'কালালা' এবং এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সব অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, আসলে তার কারণ কি। আর মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি এতযোগ্য হতে পারে কি করে, যে তার ওপর নির্ভর করে আল্লাহ তা'য়ালার যাত-সিফাতে ওহীর বিরুদ্ধাচরণের ঔধ্যত্ত্ব করা যেতে পারে। যে মানুষ নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং নিকটাত্মীয়দের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে অক্ষম, সে মানুষ কি করে মহান আল্লাহর অসীম স্বত্ত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কে তিনি না বলে দিলে মুখ খুলতে পারে।

এখানে কালালার হুকুম এবং তার নাযিলের কারণ বর্ণনা দ্বারা কয়েকটি কথা জানা যায়। প্রথম কথাটি এ যে, ইতিপূর্বে আর তোমরা কুফরী করলে অস্বীকার করলে, তবে (জেনে রাখ যে) আসমান যমীনে যা কিছু আছে, সবই তাঁর একথা বলে উদাহরণ হিসাবে আহলে কিতাবদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবে এরপর বলা হয়েছে

অনন্তর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং এটাকে শক্তভাবে ধারণ করেছে এ আয়াতে রাসূলে করীম (দঃ) এর সাহাবীদেরকে উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে, যাতে ওহীর বিরুদ্ধাচরণকারীদের গোমরাহী অনিষ্টতা এবং ওহীর অনুসরণকারীদের সত্যতা-যথার্থতা ভালো ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় এ কথাগুলিও প্রকাশ পেয়েছে যে, ইহুদীর মহান স্বত্বার জন্য শরীর এবং সন্তান সব্যস্ত করাকে তাদের ঈমানের অংশ করে নিয়েছে আর এ ক্ষেত্রে খোদারী ওহীর স্পষ্ট লংঘন করেছে। পক্ষান্তরে রাসূলে খোদা

(দঃ)-এর সাহাবীদের অবস্থা হচ্ছে, এ যে; ঈমানের মূলনীতি আর ইবাদাত তো দূরের কথা, মীরাস এবং বিবাহশাদী ইত্যাদি সংক্রান্ত মামুলী খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তারা ওহীর অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকেন, জ্ঞান-বুদ্ধি এবং খাহেশকে হুকুম দ্বারা মনে করেন না। এক দলের মনের সন্তুষ্টি সাধিত না হলে বারবার খেদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞাসা করেন। দেখুন, এদের উভয় পক্ষের মধ্যে মত ও পথের কতো হস্তের ব্যবধান! এটাও জানা যায় যে, ওহীর নির্দেশ ছাড়া হযরত সাইয়্যেদুল মুরসালীনও নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছুই বলতেন না। কোন ব্যাপারে ওহীর নির্দেশ বর্তমান না থাকলে তিনি ওহী নাযিলের অপেক্ষায় থাকতেন। ওহী নাযিল হলে তখন তিনি হুকুম বলে দিতেন। এ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, মহান আল্লাহ ওয়ায়দাহু লা-শারীকালাহু'র স্বত্ত্বা ছাড়া নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা ও অধিকার কারো নেই অন্য কেউই দিতে পারেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম নেই- এ ধরনের স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য অনেক আয়াতেই প্রকাশ করা হয়েছে। বাকী যা আছে, সবই মাধ্যম। এ সবের মধ্যেমেই অন্যদের কাছে আল্লাহর নির্দেশ পৌছানো হয়। অবশ্য এতটুকু পার্থক্য আছে যে, কোন মাধ্যম কাছের, আর কোন মাধ্যম দূরের। যেমন রাজা-বাদশাহের হুকুম পৌছাবার জন্যে ওযীর আ'যম ও শাহী দরবারের অন্যান্য ঘনিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং উচ্চ পর্যায়ের এবং নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারী রয়েছে। এরা সকলেই শাহী ফরমান পৌছানোর মাধ্যম মাত্র। নিজেদের পক্ষ থেকে কোন ফরমান জারী করার, কোন হুকুম দেয়ার ক্ষমতা ইখতিয়ার এদের কারোই আদৌ নেই। অতঃপর খোদারী ওহীর বিপক্ষে কেন গোমরাহ কারো কথা শুনবে এবং তদনুযায়ী আমল করলে- এর চেয়ে বেশী গোমরাহী আর কি হতে পারে?

এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আহলে কিতাবদের খাহেশ অনুযায়ী একই সঙ্গে গোটা কিতাব নাযিল করার মধ্যে সৌন্দর্য - বৈচিত্র নেই, এই সৌন্দয্য রয়েছে প্রয়োজন ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটু একটু করে নাযিল করার মধ্যে। কারণ, এ অবস্থায় যে কেউ নিজ নিজ প্রয়োজন অনুপাতে প্রশ্ন করতে পারে এবং পঠিত ওহীর মধ্যমে সে তার প্রশ্নের জবাবও পেতে পারে, যেমন এ ক্ষেত্রে এবং কোরআন মজীদে অনেক ক্ষেত্রেই রয়েছে। আর এ নিয়মটি কেবল কল্যাণকরই নয়, বরং উপরন্ত এটা বিরাট মর্যাদার ব্যাপার। কারণ, এর ফলে আল্লাহর যিকির স্মরনের শরাফত সৌভাগ্য অর্জিত হয়, আল্লাহ জাল্লাশানুহুর সম্বোধন পাওয়ার গৌরব লাভ হয়। অন্য কোন উম্মত এ সৌভাগ্য ও গৌরব অর্জন করতে পারেনি। আর আল্লাহই তো হচ্ছেন মহান অনুগ্রহের অধিকারী।

যে সাহাবীর কল্যাণ বা তার কোন জিজ্ঞাসার জবাবে কোন আয়াত নাযিল হয়, তা তাঁর গুণাবলীতে শুমার হয়। আর মত ভেদের ক্ষেত্রে যার রায় বা বক্তব্য অনুযায়ী ওহী নাযিল হয়, যা যুগ যুগ ধরে পাঠ করা হয়, কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর সৌন্দর্য ও শুনাম অক্ষুন্ন থাকবে। 'কালালা' সম্পর্কে প্রশ্ন ও উভয়ের উল্লেখ করে এ রকম কিছুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর সম্ভবতঃ এ ইঙ্গিতের কারণেই একে কোন বিশেষণে বিশোষিত করা হয়নি।

যার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছে, এর সঙ্গে তার উল্লেখ করা হয়নি। বরং জবাবে তাকে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কোরআন মজীদে এর জন্য কোন নজীর নেই। উপরন্তু জবাবকে স্পষ্টতঃ আল্লাহর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ-ই সবচেয়ে বেশী জানেন। তিনিই তো হেদায়াতকারী।

সার কথা এই যে, সমস্ত বিধানের জন্যই খোদারী ওহী হচ্ছে উৎস ও মূল কারণ। ওহীর অনুসরনের মধ্যেই হেদায়াত নিহিত, তার বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেই কুফরী গোমরাহী সীমায়িত। যেহেতু মহানবী (সঃ) এর যামানায় ইহুদী খৃষ্টান এবং সকল মুশরেক ও গোমরাহ লোকদের গোমরাহীর মূল ছিলো ওহীর বিরুদ্ধাচরণ, এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা কালামে পাকের বহু স্থানে ওহীর অনুসরণের সৌন্দর্য বৈশিষ্ট্য এবং তার বিরুদ্ধাচরণের ক্ষতি ও ত্রুটি সম্পর্কে বিষয়টির জন্য দুটি রুকু নাযিল করেছেন। অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝায়ে দিয়েছেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর কিতাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি ওহীর সূচনা কিতাবে হয়েছিলো। এ অধ্যায়ের শিরোণামে এই আয়াতকে অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন এবং এ রুকু দুটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন। এর তাৎপর্য এই যে, আয়াত গুলো শুরু থেকে হাদীসের শেষ পর্যন্ত স্পষ্টতই ওহীর বিষয় আলোচিত হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালাই ভালো জানেন। তিনিই সর্বজ্ঞ।